দ্বিতীয় খণ্ড

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

সিদ্ধযোগী বাবা মুক্তিনাথ

াবর,—

চিনি নাই আমি,

৬ৄ আমি কেন,—অনেকেই চেনে নাই।

যে বা যাহারা, সমাজের ভ্রান্ত পথহারা দেখিয়াছে প্রত্যক্ষ তোমায় ;—

এ মহানগর মাঝে শ্রীমানী বাজারে, দ্বিতলের এক ক্ষুদ্র ঘরে,—

দীর্ঘ-শীর্ণ-কালো-দীন সৌন্দর্য্য-বিহীন মূর্ত্তি তব,

চক্ষে কালোঠুলি সর্ব্বক্ষণ, আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ গৈরিকে ঢাকি,

মুক্ত মাত্র পৃষ্ঠদেশ গরমের দিনে, একমাত্র দক্ষিণের

বাতায়ন করিয়া পশ্চাতে,—

অপরূপ ছাঁদে আপন আসনে বসি। ঠিক এই ভাবে

দেখাদেখি,

পরিচয় তোমায় আমায়।

তুমি ছিলে সিদ্ধযন্ত্রী, আরও—দক্ষ বীণ্‌কার,

জানে না সকলে।

সেদিন, মুহূর্ত্তেকে চিনিলে আপন জনে, নিজ গুণে

কৃপা করি দিলে ধরা —

যন্ত্রবৎ করিয়া আমায়,—শক্তি-মন্ত্রে, তখনি বাঁধিয়া দিলে অন্তরের সপ্ত

তার,—

পরে দিনে দিনে, ধীরে ধীরে মৃড়ের বাহার, তারপরে আলাপের সূক্ষ্ম

কারুকলা দেখাইলে মোর দেহবীণে করিয়া আশ্রয় ;—

ভৈরব রাগের পালা করে দিলে শুরু, গুরুভাবে হয়ে প্রতিষ্ঠিত ;—

নিজ হাতে উদ্‌ঘাটিত করে দিলে সাধন দুয়ার,

রুদ্ধ ছিল এতদিন। আমায় দ্বিতীয় জনম ঘটাইলে সেইদিন,—বিচিত্র

আলোকে উদ্ভাসিত দশদিক।

আমি আত্মহারা—তারপর দিলে মোরে ছাড়ি।

সেই হতে পথে দিনু পাড়ি, ঘর ছাড়ি কয়েক বৎসর,

তীর্থ পর্য্যটনে আর সাধুসঙ্গে কাটিয়াছে দিনগুলি,

তারি ফল সাহিত্যের এ নব উদ্যম।

তোমারি দান।

পথে আনি তুমিই দেখিয়েছিলে অনন্ত শক্তির রাজ্য ব্যাপ্ত চারিদিকে,

তারি মাঝে এক বিন্দু আমি,—

কতো কতো স্বামী, মহারাজ, কতো কতো মত, দেখিতে দেখিতে যেথা যাই

দেখি মোর পথ নির্দ্ধারিত,

গতি তার ইষ্টের মন্দিরে।

তারি ইতিহাস, এই গ্রন্থটুকু।

পূজা অর্ঘ্যরূপে আজ তোমাতেই উৎসর্গ প্রয়াসী,—

ওগো মোক্ষরাজ্য-বাসী,—কত অকিঞ্চন আমি, মনে মনে জানো অন্তর্য্যামী,—

তোমা হতে প্রাপ্ত ধন, তোমাতেই করিয়া অর্পণ, কৃতার্থ হইতে চাই,

যথা গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।

অগ্রপশ্চাৎ কয়েকটি কথা

বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম তারপর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের একটু ইতিহাস আছে যাহা পূর্ব্বে ঠিক সুযোগ হয় নাই তাই বলাও হয় নাই। এখন সেই সম্পর্কে সকল কথা বলিয়া বিজ্ঞাপন শেষ করিব। অবশ্য এটা সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিবার পূর্ব্বের ঘটনা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, যখন ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গই ছিল আমার তখনকার জীবনের প্রধান অবলম্বন, তখন অনেক কিছুই লিখিয়াছিলাম। শুধু লেখা নয় অনেকগুলি পেন্সিল স্কেচও করিয়াছিলাম। লেখার বেশী ভাগ পেন্সিলেই চলিত কালিতেও চলিত ;—কাগজ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা বালির কাগজ ; সাদা ফুলস্কেপও কিছু ছিল আর নীল লাইনটানা চিঠির কাগজেও লেখা ছিল আমার বিবরণগুলি। মোট কথা তখন হাতের কাছে সহজেই যে কাগজ পাইতাম দেশ-বিদেশে তাহাতেই কাজ করিয়াছি। তখনকার সকল কিছু পেন্সিল পোর্ট্রেট এবং লেখা হাজার পাতার কম নয়, জমা হইয়াছিল।

তারপর যাহা হইয়া থাকে, কালক্রমে ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গের তাত জুড়াইয়া গেল, কাজেই ঐ বিচিত্র বর্ণনা নানা স্থানের পর্য্যটন-কথা, তাড়াবন্দী অবস্থায় পুরানো বাড়িতে পুরানো বইগুলির সঙ্গে জীর্ণ কীটদষ্ট র‍্যাকের উপর পড়িয়া রহিল ; তখনকার মত দৃশ্যান্তরে গেলাম।

তখন নূতন উদ্যম, ছবি আঁকার বন্যা আরম্ভ হইয়াছে, সংসারপ্রবেশ ঘটিয়াছে—উপার্জ্জনের প্রয়োজন এবং সুযোগ, শিল্পীর নবজীবনে প্রাতিষ্ঠার যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

প্রায় দশটি বছর পরে, প্রথমে 'হিমালয় পারে কৈলাস ও মানসসরোবর' প্রবাসীর আগ্রহে বাহির হইল। তখনও তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ তাড়াবন্দী অবস্থায় পড়িয়া আছে, তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, যদিও উহা আগেকার ঘটনা, এবং তন্ত্রের কথার উপর কারও আস্থা নাই বলিয়াই কোন উচ্চশ্রেণীর কাগজে প্রকাশ অসম্ভব ছিল। যাই হউক ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে পরিচয় পাইয়া বান্ধবেরা বিশেষতঃ সচিত্র সাধুসঙ্গের কথা উত্তরায় প্রকাশ করিবার জন্য উত্তরা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তীই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারই আহ্বানে

ও উৎসাহপূর্ণ ব্যবহারের ফলে উহা উত্তরায়-প্রায় সাড়ে তিন বৎসর বাহির হইয়াছিল এবং পাছে গ্রন্থ বড় হইয়া পড়ে সেই জন্য হঠাৎ বন্ধ করিতে হইল ; যেহেতু নাটক বা উপন্যাস ব্যতীত অন্য কোন সাহিত্য বেশী বড় হইলে প্রকাশকেরা গ্রহণ করিবেন না এই ভয়ই ছিল। অবশ্য গ্রন্থরূপে প্রকাশের যোগাযোগ অনেক পরেই ঘটিয়াছিল।

গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য কোন কোন বন্ধু যেন একটু বিশেষ ভাবেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে একদিন বর্ষার সকালে কোন বিখ্যাত মাসিকের স্বত্বাধিকারী ও বিশিষ্ট প্রকাশক মহাশয়ের বালিগঞ্জের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। এই মাসিকে প্রকাশের জন্য ছবি সম্পর্কে এমন মধ্যে মধ্যেই যাইতাম। এখন গিয়া দেখিলাম, কর্তা তাকিয়ায় আধোশোয়া ভাবে আরামে পা ছড়াইয়া তক্তার উপর, তাঁর সামনেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক সুরেন গাঙ্গুলী মহাশয়, শরৎবাবুর সুরেন মামা ;—বসিয়া আলাপে রত। আমার উপস্থিতিতে সুরেনবাবু খুশি হইলেন, অনেক দিন পরে দেখা এবং ফরাস হইতে নামিয়া কোলাকুলি করিলেন। তারপর উভয়েই আসন গ্রহণ করিলে,—গাঙ্গুলী মহাশয় কুশল প্রশ্নের পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, আপনার সাধুসঙ্গের কি হলো, এখনও বই বার করতে পারলেন না ? আমরা আশা করে আছি যে।

এমন সময়ে এই ভাবের একটা অপ্রত্যাশত প্রশ্নে আমি সহজেই বলিয়া ফেলিলাম,—এই যে, বই প্রকাশের কর্তা স্বয়ং রয়েছেন সামনেই ;—তারপর একটু প্রার্থনাসূচক বিনীত ভাবেই বলিলাম, একটু কৃপা করুন না দয়াময় ! বইখানার একটা গতি করে দিন না !

ঐ সময় প্রকাশক মহাশয় ফেসিয়্যাল প্যারালিসিসের আক্রমণে ভুগিতে-ছিলেন। তখন অসুখটা সারিয়াই আসিয়াছিল, সামান্য একটু বাঁকা ভাব কথাবার্তার সময় মুখে দেখা যাইত। যাই হোক,—এখন আমার কথা শুনিয়া তাঁর অভ্যস্ত অবিচলিত, স্থির, মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন, —কি জানেন, ওটা যখন মাসিকে বেরিয়েছিল—তখন কতক কতক দেখে-ছিলাম মনে হচ্ছে,—তা মাসিকে সব কিছুই বেরোতে পারে ;—তা বলে সবই কি গ্রন্থ হয় ? বলিয়া একটু থামিয়া একবার আমাদের উভয়েরই মুখের দিকে দেখিয়া লইলেন। পরে জানালার বাহিরে বাদলভরা আকাশের দিকে চাহিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন,—এই ধরুন বৃষ্টিবাদল, সারাদিন বাইরে

যাবার যো নেই, ইচ্ছেও নেই, তা শুয়ে শুয়ে হাতের কাছে যা পাই তাই দেখচি, পড়চি, হাতের কাছে একখানা পাঁজি রয়েচে,—বলিতে বলিতে পাশেই একখানা লাল-খেরো-বাঁধানো পাঁজি ছিল সেখানা তুলিয়া লইলেন এবং তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিতে লাগিলেন,—এই পাঁজিখানার মধ্যে হরেক রকম বিজ্ঞাপন, সেগুলোও তখন পড়চি, আর বেশ লাগচেও কিন্তু তা বলে কি ওগুলো ছাপিয়ে গ্রন্থ বার করা যায়?

এই ব্যাখ্যার পর তিনি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, তারপর একটি দীর্ঘ আরামের নিঃশ্বাসের সঙ্গে আ—া—া বলিতে বলিতে একেবারেই উঠিয়া বসিলেন। এবং অন্য দিকে চাহিয়া ঐ প্রসঙ্গ একেবারেই ঝাড়িয়া ফেলিলেন। বুঝিলাম এটা বিদায়ের সঙ্কেত। এমন অল্প কথার মানুষ দেখি নাই। সংযতবাক বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ঐ মানুষটির মধ্যেই দেখিয়াছিলাম।

অবশ্য বিধাতার বিধানে ইহার অল্পদিন পরেই গ্রন্থ বাহির হইল, এবং নানাদিকেই সমালোচনার ফলে বান্ধবেরা দ্বিতীয় ভাগের তাগিদ দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উৎসাহ প্রচুর, যখন অযত্নরক্ষিত আবর্জ্জনার মধ্যে তাড়াবন্দী পুরানো দপ্তর হইতে এই ধরনের একখানি গ্রন্থ সম্ভব হইয়াছে তখন দ্বিতীয় ভাগও সহজেই হইতে পারিবে। দ্বিতীয় ভাগ সুতরাং উত্তরায় আরম্ভ হইয়া গেল। তবে ঐ যে তারাপীঠের বামার কথার মাঝামাঝি আসিয়া হঠাৎ প্রথম ভাগখানি শেষ হইয়াছিল তাহার বাকী অংশ হইতেই দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করিতে হইল। কারণ তারাপীঠের বামার কথা তখনও অনেকটাই বাকী ছিল। ইতিমধ্যে আনন্দবাজার, যুগান্তর, হিন্দু, হিন্দুস্থান, কৃষক, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রভৃতিতে পূজার সংখ্যায় অনেকগুলি নানা স্থানের বিবরণ বিক্ষিপ্তভাবে বাহির হইয়া গেল ঐ তাড়াবন্দী পাণ্ডুলিপি হইতে। এখন উত্তরায় যখন শেষ হইল তখন সকলগুলি মিলাইয়া অর্থাৎ পূজার বিভিন্ন সংখ্যায় যাহা বাহির হইয়াছিল সেই সকল লইয়া এই দ্বিতীয় ভাগের আয়তন প্রথম ভাগের অনুরূপ হইবে এই বিশ্বাসেই দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থাকারে প্রকাশের তপস্যা আরম্ভ হইল। ভাগ্যক্রমে এখন প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণও নিঃশেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

এখন যখন দুই খণ্ড প্রায় একসঙ্গেই প্রকাশিত হইতে চলিল তখন শৃঙ্খলা ও ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য যদি কিছু অদল-বদল করিতে হয় এই-ই তাহার উপযুক্ত অবসর। প্রথম ভাগের শেষাংশে তারাপীঠের বামার সঙ্গ-কথার

কতকাংশ প্রথম ভাগে এবং বাকী অংশ দিয়া মাসিকে দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ হইয়াছিল। এখানে যখন দুই ভাগই নতুন করিয়া হইতেছে তখন দুই ভাগে খানিক খানিক বিবরণ না রাখিয়া সম্পূর্ণ তারাপীঠের কথা দিয়াই দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করাই ভাল। তারপর দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে যে সকল বিবরণ আছে তাহার মধ্যে কতকাংশ এমন রহিয়া গিয়াছে যাহা প্রথম ভাগের প্রথমাংশেরই বিষয়;--এই পরিবর্ত্তনে গ্রন্থের কোন ক্ষতি তো নয়ই বরং গুরুত্ব বাড়িয়াছে, আমার বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভেই একটি নূতন প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থের গুরুত্ব বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

৭৭ রসা রোড, সাউথ
কলিকাতা ৩৩।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচী

চিত্রসূচী

তন্ত্রমতে সাধনের উপযোগিতা

এ কথা সবারই জানা যে, তন্ত্রের আদি গুরু শিব। সেই সম্বন্ধে তন্ত্রের উৎপত্তি আর ভারতে দক্ষযজ্ঞের সূত্রে শিবকে আর্য্যমণ্ডলে প্রধান দেবতা বলে স্বীকৃতি এবং সর্ব্বত্র তাঁর প্রভাবের কথা আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। এখন তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে সাধনের কথাই আলোচনা করব।

এক কথায় তন্ত্র-ধর্ম্ম বলতে এই বুঝতে হবে যে, শিব প্রচারিত শক্তি-উপাসনা। যোগযুক্ত সাধনার সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এমনই একটি উদার ধর্ম্ম যার মধ্যে আর্য্য-অনার্য্য নির্ব্বিশেষে মানুষ-সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। এই তন্ত্রধর্ম্মই যথার্থ সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, যা সর্ব্বদেশে সর্ব্ব অবস্থায় মানুষসমাজের উপযোগী। তাই একসময়ে এই ধর্ম্ম সারা ভারতেই প্রসারলাভ করেছিল। বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মধ্যে, বাইরে থেকে প্রবেশ-পথ যেমন চারিদিকে বন্ধ, চারিদিকেই বিধিনিষেধের কড়াকড়ি, এ ধর্ম্ম ঠিক তার বিপরীত। বৈদিক আর্য্যধর্ম্মে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্যতীত অন্য জাতির প্রবেশাধিকার নেই। এমন কি শূদ্র এবং মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, বেদে তাদের অধিকার ছিল না; এবং এমনই সময় শিবের প্রচারিত ধর্ম্ম এদেশে প্রবেশ করেছিল বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ স্বরূপ এবং সর্ব্বজনীন ব'লে।

শিব বলেন, সুস্থ সবল নীরোগ শরীর, যৌবনের উদ্যম নিয়েই ধর্ম্মের সাধন আরম্ভ। এটি বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে যে, যৌবনই ধর্ম্মের, বিশেষতঃ অধ্যাত্ম ধর্ম্মের সাধনোপযোগী কাল, সুতরাং তন্ত্রধর্ম্মোক্ত সাধনেরও প্রশস্ত কাল। শিবের বিচারে জাতি বলতে স্ত্রী ও পুরুষ মানবের মধ্যে এই দুই জাতি। তাছাড়া মানবসমাজের বাইরে,—পশুজাতি, পক্ষীজাতি, পতঙ্গজাতি, কীটজাতি, উদ্ভিদ্‌জাতি এইভাবেই সৃষ্টির মধ্যে জাতির বিচার। আর মানুষসমাজে কর্ম্মের তারতম্য হিসাবে যে জাতির কথা তা বৃত্তির নাম ব'লেই তার ব্যবহার। না হলে উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ এসব মানুষের অধিকারের দম্ভ। শিবের চোখে একজন চামার বা একজন এখানকার ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় একই, তাদের একই আসনে বসতে হবে তাঁর কাছে গেলে।

তারপর শিবের বিচারে জীবমাত্রেই মোক্ষের অধিকারী। স্ত্রী ও পুরুষ—

এই দুই পৃথক জাতি হলেও অধিকার সমান। একা স্ত্রী বা পুরুষ অর্দ্ধ বা অসম্পূর্ণ সত্তা মাত্র। একটি নারী ও একটি পুরুষ উভয়েই প্রেমে আকৃষ্ট হলে প্রণয় উৎপন্ন হয়, এই দুটি তখন সৃষ্টি-শক্তিতে সক্ষম একটি পূর্ণ সত্তা। এই দুয়ে মিলিত জীবন এবং ঐ জীবনই সাধনের অধিকারী, একা সংসারসাধন অস্বাভাবিক। একা এ সংসারে কর্ম্মজীবন চালনা করা, আয়ত্ত করা এবং সম্পন্ন করা গার্হস্থ নয়; সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।

নারী ও নরের মিলিত জীবনই সংসার। যার প্রথম প্রবৃত্তি হল সৃষ্টি অর্থাৎ প্রজা-সৃষ্টি। আর তার প্রধান উপযোগিতা হল শক্তিলাভ করে উচ্চ উচ্চ শক্তির বিকাশের ফলে কর্ম্ম এবং ভোগ আর উপভোগের শেষে আত্মজ্ঞানের প্রসার ও মোক্ষ-মার্গে গতি। এটা মনে রাখতে হবে যে, সব কিছুই প্রকৃতিকে ধরে অথবা অবলম্বন করে।

তন্ত্রমতের সাধন আর পশুজীবনে ভোগ,—সরল এবং সহজ—প্রাকৃতিক নিয়মানুগ। কর্ম্মপ্রবৃত্তি জটিলতার সৃষ্টি করে জীবের জীবনে। কারণ ঐ কর্ম্মের ফলাশ্রয়ে, ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক নিয়মেই গতি হয় নানা জটিল পথে, শেষে উর্দ্ধ বা অধোগামী করে তাকে। সেইজন্যই এ ধর্ম্মে মানুষ সংযতভাবেই ভোগের সঙ্গে সাধনটি নিয়েই থাকে, যার ফলে হয় নিবৃত্তি; বাস্তব জ্ঞানের উন্মেষ আর যথার্থ সাধনের ফলে সে হয় মুক্তির অধিকারী। মুক্তি হল পুনঃ দুঃখময় জন্ম, জীবন, জরা, মৃত্যু, নানা দুঃখময় কর্ম্ম থেকে নিবৃত্তি, নিবৃত্তিই হল সাধনের ফলে নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থময় অনুভবের নাশ। জীবের স্বরূপ হল সচ্চিদানন্দময় শিবঃ, এই বোধের প্রতিষ্ঠাই হল সাধনের ফল।

তারপর সাংখ্যের মতে এই সৃষ্টির মধ্যে যেমন প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ, পুরুষ নিষ্ক্রিয়—সেইভাবেই শিবোক্ত তন্ত্রেও বলা হয়েছে যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের অধিষ্ঠাত্রী এবং চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী ঐ আদ্যাশক্তি ভগবতী স্বয়ং। আর কারো সে শক্তি নেই যাতে জীবকে মুক্তি দিতে পারে। ঐ বৈদিক পুরুষ দেবতা উপাসনা, তাও প্রকৃতি বা শক্তি উপাসনা, কারণ জীবের, অর্থাৎ মানুষের বোধে এই যে পুরুষ, আর নারী, এই দুইটি প্রকৃতি বা শক্তিই। যাকে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান বা পুরুষ যাঁকে ঈশ্বর বলা হয় এই পার্থিব জীবপুরুষ, সত্তায় এক হলেও ব্যবহারে সে বস্তু মোটেই নয়, কারণ জীবের সে অনুভূতিই নেই। তাই এই পুরুষ-সংজ্ঞা একটা হেঁয়ালির সৃষ্টি করেছে। বৈদিক দেবতা সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদিকে পুরুষ বলা হয়েছে, কিন্তু আসলে এরা মূল প্রকৃতির অন্তর্গত একটি একটি

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থ শক্তি মাত্র। এ নিয়ে যাঁরা যতই ঝগড়া করুন, আসল প্রকৃতির এই বিশাল সৃষ্টির অন্তর্গত মানবজীবের পক্ষে ব্রহ্ম বা পুরুষ যেমন ধারণার অতীত, আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতি সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী যে মহামায়া বা মহাশক্তি তাও জীবের ধারণার অতীত।

শিব বুঝেছিলেন যে বৈদিক দেবতার উপাসনা আসলে প্রকৃতির বা শক্তিরই উপাসনা তাই তিনি ও পথে না গিয়ে একেবারে মূলা-প্রকৃতি যাঁকে দেবতারা জগদম্বা বা বিশ্বজননী বলে স্তব করতেন তাঁকেই জীবের একমাত্র ইষ্ট ব'লে তাঁরই উপাসনায় জীবকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমাদের মধ্যে এই যে নারী আর নর বোধটি, এমন একটি মিশেল জটিল ভাব, যাতে করে আমরা আসল প্রকৃতি, যিনি এই সৃষ্টির মূলে থেকে এই বিশাল বিশ্ব-জগৎকে প্রসব রক্ষা এবং পরিবর্ত্তিত করেছেন তাঁকে আর সেই একমাত্র পুরুষ যিনি এই প্রকৃতির অতীত অব্যয় চেতনা বা পরমাত্মা, উভয়েরই স্বরূপ নির্দ্ধারণে চিরবঞ্চিত। শিব বলেন, তুমি প্রকৃতিজাত বলে তোমার পক্ষে প্রকৃতিকে ধরা সহজ, সেইজন্য প্রকৃতির নিয়মানুগ হয়েই তোমায় ক্রম-বিকশিত হতে হবে। অন্তে সেই মূলা প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হলেই তোমার মুক্তি বা পুরুষ-অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটবে।

তন্ত্রশাস্ত্রে ক্রম-বিকাশের অপূর্ব্ব সমর্থন আছে। তন্ত্রে বিবর্ত্তনবাদ শুধু বাদানুবাদ নয় একটি জীবন্ত সত্য। আমাদের মধ্যে অর্থাৎ এদেশের এই তিনশো তেত্রিশ জাতের মানুষসমাজের মধ্যে যাকে আমরা সর্ব্বনিম্ন স্তর বলে মনে করি—যদিও আমাদের বুদ্ধির মাপকাঠিটা বড় মোটা আর এবড়ো-খেবড়ো, তবুও আমরা এটা বুঝতে পারি—বুদ্ধি যাদের মধ্যে বিকশিত হয়নি তাদেরই আমরা ছোট বা নিম্নস্তরের মানুষ বলি, যারা নিজের শরীর মাত্র ভাঙিয়ে খায় অর্থাৎ শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকেরাই আমাদের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন স্তর। কিন্তু যথার্থ যারা শ্রমজীবী শ্রেণীর তারাই কি সর্বনিম্ন স্তর? শহরের শ্রমজীবীরা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান। সেই যে সুদূর পল্লীর কৃষকশ্রেণী, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন সে নিজেকে কখনও সর্ব্বনিম্ন স্তরে ফেলে না —সে বলে কাওরা বাগদী মেথর ভাঙ্গি এরাই সব চেয়ে নীচে। আমি প্রাচীন কালের সমাজের নিম্নশ্রেণীর কথা ছেড়েই দিয়েছি, কারণ এখনকার দেশ ও কালের সঙ্গে তা খাপ খাবে না। আমাদের হিসাবে এই অবধি হল সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরের ধারণা কিন্তু শিব বলেন, দেহাত্ম বুদ্ধি যাদেরই তারাই সর্ব্বনিম্ন

স্তরের জীব। অর্থাৎ দেহটাকেই আমি সত্তা বলে যারা ধারণা করে তারাই সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর জীব—পশু তার অপর নাম।

তারপর পরমাপ্রকৃতি, এই চরাচর বিশ্বে শুধু কারণ বা নিয়ন্তা নন, স্রষ্টা ও পাতাও বটেন। মানুষের মন ও বুদ্ধি যতদূর যায়, বাস্তব ছাড়িয়ে কল্পনার গতি তার যতই প্রসারিত হোক না কেন, প্রকৃতির রাজ্য ছাড়িয়ে তার যাবার যো-টি নাই। সেই পরমগুরু শিব বুঝেছিলেন, আর্য্যদের দেবতাবাদ শেষ অবধি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই প্রাকৃত-গণ্ডীর মধ্যেই এনে ফেলবে। সেই জন্য তিনি একেবারে সোজা প্রকৃতিকে ধরবার সোজা কৌশলটি দিয়েছিলেন যোগশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে। যার লক্ষ্য হল প্রকৃতির রাজ্য ছাড়িয়ে চৈতন্য-রাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা লাভ। কারণ আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতির হাতে জীবের মুক্তির চাবিকাঠি। তন্ত্রমতের শ্রেষ্ঠ এবং স্পষ্ট অভিব্যক্তি বিবেকানন্দের একটি লাইনের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে, যা শুনলে বৈষ্ণবেরা হয়তো অশান্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু তত্ত্বতঃ ঐ একটি লাইন একখানি বিরাট মহাভারতের ভাবকে প্রকাশ করেছে। আপনারা সকলেই জানেন তাঁর কবিতা "নাচুক তাহাতে শ্যামা", তাতে তিনি বলেছেন, "সত্য তুমি, মৃত্যুরূপা কালী ;—সুখ বনমালী, তোমার মায়ার ছায়া।" সত্য, সত্য, সত্য, আমি ত্রিসত্য করেই বলছি, এটি উপলব্ধ সত্য। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে ভগবানের কল্পনা যতই প্রসারিত হোক, মানব-মন-বুদ্ধি তার মধ্যে যতটা নিরাপদ আশ্রয়লাভ করে জনম-জীবন সার্থক ও ধন্য করুক না কেন, কিন্তু ঐ বিশাল আদ্যাশক্তির অব্যক্ত মূল ভাবটি ধরবার অধিকার না হলে কৃষ্ণের পুরুষতত্ত্ব অজ্ঞাতই থেকে যায়। কাল্পনিক কৃষ্ণ, প্রকৃতিই থেকে যান,—তাই আদ্যাশক্তিকে না ধরলে সাধনকর্ম্ম কোন উপকারেই আসে না। আর সেটি না ধরলে জগৎ-রহস্য, আত্ম-চৈতন্যের উদ্বোধনই ফাঁকা থেকে যায়। এই আবিষ্কারের জন্যই শিব জগৎ-গুরু হয়ে আছেন। সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব শিবেরই। কপিল শৈব বা শিবভক্ত এবং শিবেরই উপাসক ছিলেন।

তন্ত্রের মধ্যে শিব সেইজন্যই প্রকৃতির অনুগামী হয়েই সাধনপথে চলতে উপদেশ করেছেন, যা সর্ব্বজনীন, সহস্র পন্থা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর এই তিন আদি, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের দেবতার কোন একটিকে ধরলেও সেই প্রকৃতির অংশকেই ধরা হল—কারণ মানুষ-মনের ধারণায় যে পুরুষপ্রকৃতি —এ আদৌ প্রকৃতিই বুঝতে হবে। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে

চমৎকার বিভাগ করে দেখানো হয়েছে, কেমন করে সৃষ্টিতে প্রকৃতির মধ্যে এই পঞ্চীকরণ ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছিল, যার ফলে এই বিচিত্র জীব-জগৎ প্রকাশিত অর্থাৎ সম্ভব ও সার্থক হয়েছে।

তন্ত্রের সাধনা সারা মানব সমাজ অর্থাৎ সারা জগতের অধিবাসী মানব সমাজ নিয়ে। অতি স্থূলবুদ্ধি মানব থেকেই তার আরম্ভ। শিব বিশ্বের কল্যাণের জন্য সর্ব্বনিম্ন স্তরের মানব থেকে শুরু করে সর্ব্বউচ্চ স্তরের মানব পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেছেন তাঁর প্রবর্ত্তিত পথে। তন্ত্রমতে মানব প্রথমে থাকে পশুধর্ম্মী,—তারপরে হয় বীর, তারপর হয় দেবতা। শিব বলেন, তোমায় কোন দেবতার আলাদা উপাসনা করতে হবে না, তোমার ক্রমোন্নতিই তোমায় দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করবে প্রকৃতির অনুগামী হয়ে চললে। মানবজন্মের সার্থকতা পরমাত্মা তথা শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। এখানে এইটুকু মনে রাখলে ভাল হয় যে, বৈদিক ধর্ম্মেও বলা হয়েছে যে, জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারে দ্বিজ,—শেষে ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ। তাই বেদান্তের যে প্রতিপাদ্য,—জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ,—তন্ত্রেও তাই জীবৈ শিবঃ। এসব তত্ত্বতঃ সত্য।

এইভাবে দেখা যায়, শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্বে দুইই এক; এখন বৈদিক ধর্ম্মে শিবের প্রভাব আছে কিনা এই নিয়ে বিবাদ আছে, কিন্তু যত বড় বড় বৈদান্তিক সকলেই শৈব, যার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের নামটা প্রথমেই মনে আসে, কারণ তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, আর যুগাবতার বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তিনি একের নম্বর শৈব ছিলেন, প্রমাণ আছে।

যাই হোক তন্ত্রে শিব বললেন, প্রকৃতি নিয়মানুগ হলে মুক্ত হওয়া যায়, যে মুক্তি জীবের একমাত্র কাম্য। এখন দেখা যাক প্রকৃতির নিয়মানুগ পন্থাটি কি? কি রকম?

আমরা তো জীব।

আগেই বলা হয়েছে যে তন্ত্রশাস্ত্রে জীব প্রথম অবস্থায় পশু। সুতরাং ঐ পশু-ধর্ম্মের নিয়মেই তোমায় সাধনাদি আরম্ভ করতে হবে। মানুষের উপর পশু কথাটা শুনে যাঁরা দ্বিধা করবেন তাঁরা যেন নিজে নিজের ব্যক্ত এবং গোপনীয় প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম এবং অতীত ও বর্ত্তমান মনোভাবগুলির উপর একটু সজাগ দৃষ্টিপাত করেন। এখনকার কথা এই যে, পঞ্চ ম-কার নিয়ে সাধনাকে প্রকৃতির নিয়মানুগ সাধনা বলা হয়েছে। পশ্বাচারের এই যে কয়েকটি প্রাথমিক নিয়ম তাতে নারী ব্যতীত সাধন হয় না। যেহেতু প্রথম স্তরের যে মানব তাকে

শক্তি আশ্রয় করেই অগ্রসর হতে হয় আর তন্ত্রে শক্তি বলতে নারীকে বুঝতে হবে, কারণ এই যে পুরুষ জীব ইনি আধখানা নারী বা শক্তি হয়ে তার আশ্রয় স্বরূপ, অপর অর্দ্ধ কেউ না দাঁড়ালে তিনি আধখানাই থেকে যাবেন,—সৃষ্টির অধিকারী হতে পারবেন না। কর্ম্মজগতেও ঐ অর্দ্ধাবস্থায় তিনি কোনও কর্ম্মে যুক্ত হতে পারবেন না। একটি নর আর একটি নারী এই দুটিতে মনে-প্রাণে ঐক্যবদ্ধ হলে, অর্থাৎ প্রেমে মিলিত হলে তখনই দুজনের মনে এবং প্রাণে এক সম্পূর্ণ সত্তার উপলব্ধি আসবে, যাতে করে উভয়ের অস্তিত্বই সৃষ্টি শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। যাকে ইংরাজীতে বলে ডায়নামিক পাওয়ার। তারাই বলে তারা যে শুধু স্থূল কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে তা নয়, অব্যক্ত এবং মহৎ প্রকৃতির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শক্তিমান হয়ে তারা জীব অর্থাৎ তাদেরই মন প্রাণ ও চৈতন্যময় জীবসৃষ্টি করতে সক্ষম এবং অধিকারী হবে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই পাঁচটি হল পশ্বাচারের উপকরণ। আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, স্পষ্ট ভাষায় এই সভ্যসমাজের মাঝে ধর্ম্মসাধনের নামে ঐ কয়টি উপকরণের নাম শুনে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলে মহা ভুল হবে। কারণ শুধু যে প্রাচীনকালে পশ্বাচারের অধিকারীদের সাধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই পরম লোভনীয় স্থূল ভোগের উপকরণ নিয়ে ধর্ম্মসাধন আরম্ভের উপদেশ ছিল তা নয়,—এখনও এই নিয়ে সাধনের উপযোগিতা বর্ত্তমান সমাজে পূর্ণভাবেই আছে। আমাদের এই বর্ত্তমান সমাজ, নানা সভ্যতার প্রভাবে সর্ব্বদাই বহির্মুখ, এই সমাজে যথার্থ যাদের দেবচরিত্রের মানুষ বলি, সে কয়জন? তারপর মনুষ্যত্ব-প্রবল যাদের মধ্যে কর্ম্মবুদ্ধির বিস্তার হয়েছে, জ্ঞানের বিকাশ হয়েচে, এমন মানুষ যাঁরা আমাদের দেশে বা সমাজের সাধারণের লক্ষ্যস্থল তাঁদের বাদ দিলে যে বিরাট এক স্তরের অস্তিত্ব এই শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজেই আছে, তাদের পশ্বাচারের অধিকারী বলে মনে করলে কিছু ভুল হবে কি? তাঁরা যাই হোক, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত,—তাঁদের মধ্যে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনে প্রবল আসক্তি থেকেই বোঝা যায় যে তাঁরা সহজেই পশ্বাচার সাধনের উপযুক্ত। তাঁরা এই সাধনের পথে এলে শুধু উচ্ছৃঙ্খল ভোগবৃত্তি নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাধনকর্ম্মের দ্বারা তাঁদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে, সেইজন্য এইটিই প্রথম স্তরের জীবের প্রকৃতির নিয়মানুগ সাধন।

আমাদের সমাজ পঞ্চ ম-কারে আসক্ত জীবের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে

প্রাকৃতিক নিয়মেই এখনকার দিনেও পঞ্চ ম-কার সাধনের প্রয়োজন এবং উপযোগিতা দুইই আছে। তন্ত্রমতের এই প্রথম সাধনই দেখিয়ে দেবে যে এর বিকৃতটা অর্থাৎ জঙ্গল, পালা, আগাছা বাদ দিলে এই ধর্ম্ম কত উদার— যা একটি মহাজাতির সর্ব্বস্তরের লোকের উপযোগী, আর এর প্রবর্ত্তক যিনি, তাঁর কি অসাধারণ দূরদৃষ্টি। সমাজের কেউই এই কল্যাণময় ধর্ম্মের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবে না। আর এমনই একটি উদার ধর্ম্ম তিনি সৃষ্টি করেছেন যার প্রভাব এবং উপযোগিতা সর্ব্বকালেই অনুভূত হবে।

মনে-প্রাণে ঐ পঞ্চ ম-কারের উপর আসক্ত অর্থাৎ স্থূল ভোগ-প্রবৃত্তি যাঁদের প্রবল, তাঁদের আরও একটা কথা জানা উচিত। তন্ত্র বলেন, পাঁড় মাতাল অথবা অপরিমিত মদ্য মাংস ও স্ত্রী-সেবী যারা, তাদের দ্বারা তান্ত্রিকসাধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, কারণ ঐ পঞ্চ ম-কারের ব্যবস্থা এমনই চমৎকার বিধি-পূর্ব্বক নিয়ন্ত্রিত, যার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নেই। পঞ্চ ম-কারের সমতা রাখতে হলে মাত্রার বাইরে যাওয়া চলবে না। এমনই মাত্রা নিয়মিত আছে যাতে এসকল বস্তু ব্যবহারের ফলে সাধকের মধ্যে স্বাস্থ্যপূর্ণ একটি সৎ ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মনের সমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ধীশক্তি প্রবল হয়। এক কথায় যাকে আমরা প্রবল মনশক্তিসম্পন্ন বলি, সাধক তাই হয়ে যান এই সাধনের নিয়মেই। কারণ সংযমই সকল সাধনার গোড়ার কথা।

প্রকৃতির নিয়মানুগ সাধনায় উচ্ছৃঙ্খলতার সাধন নেই, আগেই বলা হয়েছে। কারণ তন্ত্রমতে প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা কোথাও নেই, সবই সুনিয়ন্ত্রিত। তবে কোন মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হবে, বিশেষতঃ সে যখন ধর্ম্ম-সাধনের দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চলেছে। আরও একটু কথা আছে। এখনকার সমাজে, বিদেশীয় বা বিজাতীয় যে এই বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের আমলে চলেছে—যার প্রভাবে আজ আমরা একই সমাজে থেকেও বিচ্ছিন্ন, সেটা মাত্র বিবাহ আদি সংস্কারের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আমাদের মনে থাকে না, একমাত্র ধন বা টাকাকে অবলম্বন করে আমরা সামাজিক ভাবে অবচেতন থেকে অচেতনতর এবং বিচ্ছিন্ন হতে চলেছি;—অর্থকরী যা কিছু তাহাতেই বিশ্বাস, আর যা কিছু মহৎ, যা কিছু জাতীয় ধর্ম্মের বিকাশ ও আত্মশক্তি বিস্তারের পন্থা তাতে অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধচিত্ত হতেই শিখেছি;—এ শিক্ষার কোনও উপযোগিতা এই তন্ত্রধর্ম্মে তো নেই-ই, পরন্তু অপর কোন ধর্ম্মেও আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং তন্ত্রে যে তিনটি স্তর, সমস্ত মানুষ সমাজকে নিয়ে স্পষ্ট

ভাবে বিভক্ত হয়েছে, তা শুধু ভারতীয় নয়, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-এর ভিতর সকল অবস্থাই বর্ত্তমান। পক্ষান্তরে উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তথাকথিত ভারতীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আচার্য্য যাঁরা তাঁদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করে করজোড় এবং নাকেখৎ দিয়ে তাঁদেরই ভাষায় বলছি যে ব্রাহ্মণ হয়ে এই ভারতবর্ষে না জন্মালে ঐ পবিত্র ধর্ম্মে এবং বেদে আর কারো অধিকার নেই, একথা যাঁরা আমাদের মনের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই গেঁথে দিতে চান, তাঁদের ঐ বাণীর মধ্যে কোন সত্যই নেই, আর তার সঙ্গে সহানুভূতিও এই তন্ত্র অথবা শিবের ধর্ম্মের মধ্যে কোথাও নেই। যাহোক এখন বোধ হয় আমাদের এটা বুঝতে ভুল হবে না যে তন্ত্রমতে প্রকৃতির নিয়মানুগ যে সাধনা তার মধ্যে জটিলতা এমন কিছুই নেই, যাতে ঐ স্তরের মানুষ যাঁরা তাঁদের ধারণার ঐ পঞ্চ উপকরণের ভিতর দিয়ে সাধনাকে অন্যায় বা কঠিন মনে হবে। প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার নিয়ম থাকার জন্যই তাঁদের ভোগের মধ্যে দিয়ে সংযমের পথে তুলে দেবে পরবর্ত্তী সাধনের মার্গে অর্থাৎ দ্বিতীয় বা মধ্যম স্তরে উঠবার পথটা সহজই হবে। এখানে আমি প্রত্যেক উপকরণের খুঁটিনাটি নিয়ম বা মন্ত্রাদির সহায়ে কেমনভাবে পাঁচটির ব্যবহার করতে হয় সে সকল তথ্য দিতে পারবো না, কারণ তাহলে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে কুলাবে না। মোটামুটি সাধারণভাবে তন্ত্রের সাধনা সম্বন্ধে প্রথম স্তরের পর এখন দ্বিতীয় স্তরের কথাই আলোচনার বিষয় আমাদের।

তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষেরা বলেন, যৌবনকালই হল ধর্ম্মসাধনের একমাত্র প্রশস্ত কাল এবং তার আরম্ভ যৌবনের উন্মেষ থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন পশ্বাচার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা ধরুন পাঁচ-ছয় বৎসরের সাধনায় তার ক্রম-পরিণতি কি ভাবে গতি পেতে পারে সেটা দেখা যাক। এমন অনেকেই আছেন এখানে, —পাঠকগণের মধ্যে যাঁরা হয়তো মনে করেছেন যে, আমরা যখন পঞ্চ ম-কার সাধক অর্থাৎ প্রথম স্তরের নই, তার উপরের লোক, অর্থাৎ তাঁরা মদ্যপান করেন না, মৎস্য মাংস খান না, আবার বয়সের গুণে মৈথুনে অথবা পঞ্চম উপকরণের উপরও স্পৃহা নেই, তাঁদের আমি স্পষ্ট বলতে বাধ্য হচ্ছি যে একমাত্র হরিনাম ছাড়া তাঁদের আর কোন গতি নেই, তাঁদের তন্ত্রধর্ম্মের মধ্যে কোনও স্থান নেই। কারণ গোড়ায়ই বলেছি সুস্থ শরীর ও সবল মনই হল ধর্ম্মজীবনের প্রধান অবলম্বন। যাঁরা মনে করেন, ধর্ম্ম জিনিসটা বৃদ্ধ বয়সের, তাঁদের পক্ষে কোনও ধর্ম্মসঙ্ঘের সভ্য হয়ে মাসিক বা বার্ষিক বা এককালীন চাঁদা দেওয়া আর শুভ ইচ্ছা পোষণ ছাড়া আর কোনও কর্ত্তব্য নেই। তবে এতে নিরাশ

হবার কিছুই নেই কারণ হাতের পাঁচ স্বরূপ শ্রীহরির নামটি তো তাঁদের হাতেই আছে। অবশিষ্ট জীবন তাঁরা ইচ্ছামত ভগবানের চিন্তায় কাটাতে পারেন। কোন বাধা যদি তাতে পান তো সুমুখে চেয়ে দেখলেই হবে। জীবের সকল অবস্থায় ঈশ্বর-চিন্তার পথ সর্ব্বকালেই মুক্ত আছে, সে হিসাবে পরমা প্রকৃতি বা জগদম্বার বিধান বড়ই উদার, একথা সকলেই স্বীকার করবে। এখন যা বলছিলাম, প্রথম স্তরে সাধক পঞ্চ ম-কার নিয়ে, ধরুন পাঁচ বৎসর, নিয়মিত সাধনের পর দেখা গেল তিনি এতে আর সুখী নন, স্বভাবতই, তাঁর মনে এ কথাটা জেগেছে যে এটা তাঁর কাম্য নয়। একটা সত্য মনে রাখলেই সকল কথাই সহজ হবে যে, প্রকৃতির এমনই বিচিত্র নিয়ম যে, নিত্য নিত্য একই ভোগ কস্মিনকালেও কারো রুচিকর হয় না। কাজেই পাঁচ বৎসর পরিমিত ব্যবহারের ফলে বিরাগ আসাই স্বাভাবিক। এই নিয়ে জীবন কাটানো কখনই তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে না, কারণ এতে স্থায়ী সুখ বা আনন্দের বা উচ্চতর শক্তিলাভের যে কামনা জাগে, তা কিন্তু পাওয়া যায় না, কাজেই তার অধিকারী হওয়া যায় না। তখন তিনি যে অবস্থা পেতে চান সেটি এক মহাশক্তির লাভের অবস্থা। তাঁর ক্ষেত্রটি এবার কমবেশী প্রস্তুত হয়েছে, মদ মাংস স্ত্রী সম্ভোগে পার্থিব ভোগাকাঙ্ক্ষার ও প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে ঐগুলি আর তাঁর কাছে বড় বেশী লোভের বস্তু নয়, পশ্বাচারের ফলে এখন তার বীরাচারের যোগ্যতা এসেছে। তখন স্বভাবতই সাধকের লোভ পড়ল শক্তিমান হওয়ার দিকে, যে শক্তির দ্বারা উচ্চ উচ্চ কর্ম্ম এবং ভোগ এই জীবিতকালের মধ্যেই সম্ভব হতে পারে।

আচ্ছা, আমাদের মুক্তির পথে প্রধান বাধাগুলি কি কি? অর্থাৎ কোন্ কোন্ অবস্থাটা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অন্তরায় হচ্ছে যা থেকে মুক্তি পেলে আমরা স্থায়ীভাবে সুখী হতে পারি বলে মনে করি? আমাদের জীবনে সুখের মূল বাধা যেগুলি, তন্ত্রমতে তার নাম হল পাশ। আটটি পাশ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘৃণা, ভয়, লজ্জা, মান, রাগ, দ্বেষ। মতান্তরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা। শিব বলেন, এই আটটি পাশই তোমায় আত্মচৈতন্য-বিমুখ করে রেখেছে, যার ফলে তোমার যে কতটা শক্তি তুমি জানতে পার না। এই পাশমুক্ত হলেই তুমি হবে শিব। সুতরাং যে আচার পালন বা সাধনার দ্বারা তুমি পাশ-মুক্ত হবে তার নাম বীরাচার।

এখন ধরে নেওয়া যাক যে পশ্বাচার থেকে সাধক এখন শক্তিলাভ বা

আত্মশক্তি স্ফুরণের পথে এগিয়েছেন বা এগিয়ে যাবার মত অবস্থা হয়েছে। আর গুরুমুখে উপদেশের দ্বারা তিনি বুঝেছেন যে এই পাশগুলি যথার্থ তাঁর শক্তিলাভের অন্তরায়। কেন ও কি ভাবের অন্তরায় সে খুঁটিনাটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন এখানে নেই, শুধু মোটামুটি সাধনের কথাই এখানে বলা দরকার। প্রত্যেক পাশটি থেকে মুক্তির জন্য পৃথক পৃথক সাধনা আছে। দেখা যাক দুই একটা নিয়ে যে, তন্ত্রমতে পাশমুক্তির সাধনা কি রকম হতে পারে! ভয় একটি প্রকাণ্ড পাশ, যার কথা এখনকার উপস্থিত কাকেও বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে না যে সেই বস্তুটি কি? কারণ শিশুকাল থেকে প্রত্যেক সংসারী ঐ ভয়ের কারণে বা পিছনে কত শক্তি বা আয়ু ক্ষয় করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ঘোর অমানিশায় শ্মশানে শবের উপর আসন করে নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে সাধন আছে, যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে সাধককে এগিয়ে যেতে হয়, তা শুনলে হয়তো আপনারা এখানে বসেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। এই সিদ্ধির পর সাধকের আর এ পার্থিব কোন অবস্থায়ই ভয় থাকা কি সম্ভব? এইভাবে অন্যান্য পাশমুক্তির সাধনাও আছে।

ধরুন আর একটা পাশ ঘৃণা। এই ঘৃণা এখনকার দিনে শুধু নয়, সেকালেও মানুষকে মুক্তপ্রাণের আনন্দ থেকে কতটা বঞ্চিত করে রেখেছে তা একটু অবহিত হলেই বুঝতে পারবেন। আমরা যে অবস্থার লোক, সেই সমাজের আর একজনের উপর ঘৃণা পোষণ করা কিংবা তাকে হেয় করা এবং নানা রকমে তারই উপকার নিয়ে তাকেই ঘৃণ্য প্রচার করা এ কি রকম ব্যবহার? আমরা সমাজে মেলামেশার পথ বন্ধ করে, শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সমাজের কাছে মহা অপরাধী হয়েই রয়েছি, যার ফলে এখন সমাজ এতটা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এটা কে না জানে? ও তো গেল মানুষ মানুষকে ঘৃণার কথা, এমন বস্তু আমাদের চারিদিকেই ছড়ানো আছে—একমাত্র ঘৃণার জন্য আমরা তার পুষ্টিকর প্রভাব এবং উপকারিতা থেকে চিরবঞ্চিত। এখন টম্যাটো, চিচিঙ্গা, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি কত কত শাকসব্জীর উপকারিতা আমরা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমার বাড়ীতে স্ত্রী ও মায়ের কাছে তা ঘৃণার বস্তু। এইভাবে ঐ এক ঘৃণা আমাদের কত রকমে সঙ্কীর্ণ করে রেখেছে। ঘৃণা জয় করেছেন শুধু নয়, এমন কি সর্ব্বপাশমুক্ত হলে একজন কেমন হয় তা ভাগ্যক্রমে আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং তাঁর সহবাসও

করেছি। তাঁর অপূর্ব্ব ব্যবহার এখানে দীর্ঘকাল লক্ষ্য করেছি। এই গ্রন্থেরই প্রথম ভাগে তা পাবেন।

এইভাবে অষ্টপাশমুক্ত হয়ে বীর হতে হলে যে কঠোর সাধনা দরকার তা বোধ হয় আর বলতে হবে না। সিদ্ধির পর যে শক্তির অধিকারী হওয়া যায় তা প্রকাশের ভাষা নেই। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনার যত কিছু বিপদ ঐ সিদ্ধির পথে, কারণ সেই মহাশক্তি বিকাশের পর, আধার যদি হীন দুর্ব্বলচিত্ত হয় তা হলে বিভূতিলাভের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। সেই বিভূতিই হয় তার কাল। যদি উপযুক্ত গুরু বা উত্তরসাধকের সহায়তা না থাকে তাহলে হয়তো তার এত বড় শোচনীয় অধঃপতন হতে পারে যা দেখলে আপনারা হয়তো চোখের জল রাখতে পারবেন না। তার কতক মত দৃষ্টান্ত বামাক্ষেপার প্রসঙ্গে আছে এই গ্রন্থেই। কিন্তু আসল কথা হল, ঐ অবস্থাটা পেরিয়ে গেলেই সে দিব্যভাবের অধিকারী হয়ে যায়। দিব্যাচারের কথা বলছি এখন।

এই যে শ্রেষ্ঠ আচার, এর মধ্যে নিয়মপূর্ব্বক কোন কর্ম্মানুষ্ঠান নেই। আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের বাইরেই দিব্যাচার সাধন। সম্পূর্ণ মানসিক ও চৈতন্যঘটিত ব্যাপার—যার ফলে সমাধি আসে। এ জড়সমাধি নয়। এক-একটি তত্ত্বে সমাহিত হবার শক্তি আসে। এই বিশ্বজগতে এমন কোন বস্তু নেই যা তিনি জানতে ইচ্ছা হলে জানতে পারেন না।

আপনারা হয়তো নানাপ্রকার আভিচারিক ক্রিয়ার কথা শুনেছেন। সে সকল যে তন্ত্রের জঞ্জাল, পালা আগাছার মত তা পূর্ব্বেই বলেছি। ঐ সকল অভিচার, মন্ত্রশক্তির সিদ্ধি পূর্ব্বোক্ত তান্ত্রিক আসল সাধনের আগাছা। শিব কখনও নিজে ওসকল উপদেশ করেননি। যে কথাটা আমাদের মত একজন বুঝতে পারে, এই যে শক্তির চালাচালি যার ভয়ঙ্কর ফল দু'পক্ষকেই ভোগ করতে হয়, এ সকল ব্যাপারের কুফলের কথা আমরা যখন বুঝতে পারি, এত বড় একজন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যে তা বুঝতেন না তা আমার মনে হয় না। বৌদ্ধ তিব্বতে যে সকল ভয়ঙ্কর শক্তি চালাচালির ব্যাপার আছে এবং পূর্ব্বে খুব বেশীই ছিল, হয়তো সেখানকার এক শ্রেণীর কাপালিক ঐ সকল এদেশে নিয়ে আসেন যার ফলে বাঙলায় কিছুদিন তন্ত্রধর্ম্মের সাধকদের মধ্যেও তার অনুশীলন এবং সিদ্ধি চলেছিল।

মন্ত্র নিয়ে যে শক্তির সাধন আর তাতে যে সিদ্ধি আসে সেই সিদ্ধির ফলে সমাজের অসাধারণ কল্যাণ করা যায়। শিবের যে তন্ত্রধর্ম্ম সেটি মোটেই

অভিচারের ক্রিয়া সমর্থন করে না, বরং বিপরীত—অনেক স্থলে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন।

মন্ত্র যে শব্দমাত্র নয় একথা এখন কাকেও বিশ্বাস করানো অসম্ভব। তবে এটা সত্য, বিদগ্ধজনের সহজেই বোধায়ত্ত হতে পারে যে ব্যক্তিবিশেষ ঐকান্তিক শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা মনঃসংযমের ফলে ঐ শব্দ-মাত্র মন্ত্রটি জাগ্রত করে অভীষ্ট ফললাভ করতে পারবেন। তার নাম মন্ত্রসিদ্ধি। মন্ত্রটি আত্মশক্তির প্রভাবে জীবন্ত অর্থাৎ চৈতন্যশক্তিমান হয়ে সিদ্ধির সহায় হয়ে থাকে।

ঐ মন্ত্রশক্তিতেই আগে ডাকিনী যোগিনী হাঁকিনী কাকিনী প্রভৃতি শক্তির মহান বিকাশ এবং সিদ্ধিলাভের ফলে সাধকের সঙ্গে এ জগতের বহুবিধ দুর্ল্লভ বস্তুসমূহের যোগাযোগ পর্য্যন্ত ঘটিয়ে দিতো। যথার্থ ইচ্ছাশক্তির প্রসার কতদূর গভীর হতে পারে তা ঐ মন্ত্রসিদ্ধির অধিকারেই জানা যায়। কিন্তু যে সব শক্তিসিদ্ধির ফলে জগতের কতই না কল্যাণ হতে পারতো, মানুষের দুর্ব্বল হীন চিত্তের ফলে তার গতি বিপরীতমুখী হয়ে মহা অকল্যাণ সাধনের পথে ভারত থেকে লোপ হয়ে গেল। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যেই মন্ত্রশক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছিল আর ঐ বৌদ্ধধর্ম্ম ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ থেকে তা অন্তর্হিত হয়েছে। এখন তারই ঝড়তি-পড়তি কোথাও কোন শক্তিধর সংযতাত্মা সিদ্ধযোগীর কাছে থাকতে পারে কিন্তু তাকে আয়ত্ত করে সমবেত সমাজের কল্যাণের আশা নেই।

তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

১

তারাপুর আসিতে মল্লারপুর স্টেশন হইতে যতটা, বোধ হয় রামপুরহাট স্টেশন হইতে তার চেয়ে একটু বেশী হাঁটিতে হয়। আমি এখানে মল্লারপুর হইয়াই আসিয়াছিলাম। মাঠের পথে, অনেকটা দূর হইতে তারা মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। তারাপুর গ্রামখানি ধানজমি হইতে অনেকটাই উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। বর্ষাকাল,—পথে কাদা হইয়াছে। গ্রামখানি বড় অপরিষ্কার, গ্রামের মধ্যে রাস্তাটায় দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইয়াছিল। মন্দিরসংলগ্ন স্থান, ক্ষ্যাপাবাবার কুটির। শ্মশান-ক্ষেত্র বেশ বিস্তৃত স্থান, দ্বারকা নদী পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শ্মশানে দেখিলাম ছোট্ট ছোট্ট জাম নীচে পড়িয়া আছে, এইরূপ জামগাছ এখানে অনেক।

গিয়া উঠিলাম একেবারেই বামার কুটিরে অথবা চালাঘরের সম্মুখের চালায়। বামার ভাল নামটি বামদেব। তিনি কুটিরের বাহিরেই বসিয়া ছিলেন। বৃদ্ধ এবং অথর্ব্ব অবস্থা তখন তাঁহার, বসিয়া বসিয়া যেন ঝিমাইতেছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এক বান্ধব একবার এখানে ক্ষ্যাপার কাছে আসিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কাছে যেসব গল্প করিয়াছেন তাহাতে মানুষটিকে পিশাচ-সিদ্ধ মনে হইয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁহার নিজ মুখের একটা কথা এইরূপ ;—তাঁর কাছে বসে আছি, দেখলাম শ্মশান থেকে একটা কেলে কুকুর একটুক্‌রো মাংস মুখে করে এলো, তিনি সেটা তার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিলেন, খানিকটা আবার তা থেকে ছিঁড়ে বার করে নিয়ে কুকুরটাকে খাইয়ে দিলেন, খা, খা বাবা খা, এই কথা বোলে। এখনো এ সকল কথা আমার মনে ছিল ; ভাবিতেছিলাম, সত্যই কি

এই মানুষটি ঐ কাজ করিয়াছিলেন? অবশ্য পাশ-মুক্ত হইলে মানুষের মনে ঘৃণার ভাব থাকে না, কোন দ্রব্য অথবা কোন ব্যক্তি অথবা কোন অবস্থায় উপর ঘৃণার ভাবটা একেবারেই লোপ পায় জানা ছিল, সেইজন্য আরও বিশেষ করিয়াই দেখিতেছিলাম, ঐ মূর্তির মধ্যে যাহা আছে বাহিরে তাহার কিছু দেখা বা বুঝা যায় কিনা। যাহা হোক, তিনি ঝটিতি একবার চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলাম কি বিশালায়ত চক্ষু—তাহাতে লালের আভা। অবাক হইয়া দেখিতেছিলাম। প্রথমে প্রণাম করি নাই। দুই একজন আরো যাঁহারা সেখানে ছিলেন, তাঁহাদের একজন বলিলেন: ইনি ক্ষ্যাপা বাবা যে, প্রণাম করলেন না! আমি তখন উঠিয়া প্রণাম করিলাম। তাঁহার মূর্তিতে এমন একটি আকর্ষণ আছে যাহাতে প্রণামের কথা মনেই হয় নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: কোথা হতে আসা হচ্ছে বাবা!

আমি অট্টহাসের কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন: ওখানে গৌরীকান্ত ভৈরব আছে নাকি? আমি বলিলাম: নামটি তাঁর জানি না তো। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ পর তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে চলিয়া গেলেন। বাবার সঙ্গে দুই একজন ভক্তও গেলেন, আমিও উঠিয়া সরোবর এবং মন্দিরাদি স্থান দেখিতে লাগিলাম।

মন্দিরটি পুরানো, বাংলার বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্য—তাহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রাচুর্য্য ততটা নাই, পোড়া ইটের নানাপ্রকার গড়ন আছে, মন্দিরসংলগ্ন ভোগ-রান্নার স্থান, বিশাল প্রাঙ্গণ—চারিদিকেই প্রাচীর। বক্রেশ্বর কালীবাড়ীর যে

ভাবের সংস্থান তারামন্দির তাহাপেক্ষা অনেক প্রাচীন, উন্নত, সুরক্ষিত এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ। স্থানটি দেখিয়াই আমার প্রাণে আনন্দ হইল, ভাবিলাম কিছুদিন এইখানে থাকিব। মন্দির-পার্শ্বেই একটি ঘাট-বাঁধানো রম্য সরোবর।

একটি ব্যক্তি শ্যামবর্ণ, মধ্য আকারের, দীর্ঘ কেশ, শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল বড় চক্ষু দুটি—নামটি তাঁর নগেন পাণ্ডা। তিনি ঘাটের চাতালে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। এখানে পাণ্ডাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী, নগেন পাণ্ডা এখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বলিতে হইবে না, ইনি একজন গোঁড়া তান্ত্রিক। গলায় তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কবচ। চরস আর গাঁজাই হইল সারাদিনের চল্‌তি নেশা। 'কারণ'টা রাত্রেই চলে। একজন যুবা, বেশ ফর্সা রঙ, চক্ষু দুইটি তার কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, রোগা শরীর, বড় বড় চুল, অল্প গোঁফদাড়ি—তিনি বাবার কুটীরের সব সময় সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধান করেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন, আবার গাঁজা ডলাই-মলাই করেন আর শেষে বাবার প্রসাদ পান।

স্নানাদি সারিয়া লইলাম। শুনিলাম, দ্বিপ্রহরের পর মা'র মন্দিরে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা। এখনও অনেক দেরি দেখিয়া শ্মশানের দিকে বেড়াইতে গেলাম। বেশ বিস্তৃত শ্মশান। তাহার মধ্যে জাম গাছই যেন বেশী। পথ হইতে নদীতীরে অনেকটা লম্বা শ্মশানভূমি। চারিদিকেই নরকপাল ও অস্থির ছড়াছড়ি। বামার সাধনস্থানটুকু বেশ চওড়া করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেদিনটা এইভাবে দেখাশুনা করিয়াই কাটাইলাম। রাত্রে বাবার আশ্রম-কুটীরের চালার একপার্শ্বে শয়নস্থান ঠিক করিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমি একপার্শ্বে আর বাবার ঘরের সেই অধ্যক্ষ যুবাটি অপর পার্শ্বে।

সকালে বাবা পুকুরঘাটে বসিয়াছিলেন—সঙ্গে পাণ্ডাদেরও কেহ কেহ ছিলেন। শরীর খারাপ যাইতেছিল কয়দিন, আজ স্নান করিবেন। একটি শিশু বালককে যেমন করিয়া স্নান করানো হয়, বাবাকে সেইরকম সকলে মিলিয়া স্নান করাইয়া দিল। তারপর বাবা একটু ধূমপান করিলেন।

আজ সারাদিন এত বাইরের ভক্তগণের আমদানি ছিল যে একটু শান্তিতে কথা কহিতে বা তাঁহার কাছে কিছু আসল কথা শুনিতে পাই নাই।

বৈকালে একটু ফাঁক পড়িল, বাবা তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, আমি গিয়া বসিলাম। নগেন পাণ্ডা ও আরও সব কে কে ছিল যেন।

একজন আসিয়া বলিল: বাবা, বাবু আইচেন যে, তাঁর মেয়্যাও আইচেন,

ছেল্যাকে নিয়ে আইচেন আপনাকে দেখাতে। মন্দির-বাড়ীতে আছেন, এই আসবেন এইখানে এখনি। মেয়্যে অর্থাৎ স্ত্রী।

বাবা কিছুই বলিলেন না, না রাম না গঙ্গা।

কতক্ষণ পরে একটি ভদ্রলোক সঙ্গে স্ত্রী, কোলে একটি এক বৎসরের ক্ষুদ্র রুগ্ন শিশুসন্তান আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

বাবা বলিলেন: তোর ছেলেকে নিয়ে এসেছিস্? কিন্তু ওরকম নিয়ে এলে হবে না, তুই ওকে আমায় দিতে পারবি?

ভদ্রব্যক্তি বড় কাতরকণ্ঠে তাঁহার চরণের প্রান্তে মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন: বাবা এ আপনারই সন্তান, আমার নয়, যা আপনার ইচ্ছা তাই হবে বাবা—

আচ্ছা, আচ্ছা। বেশ ত বল্লি,—এখন যা বলি তাই কর দিকি! ছেলেটার গা থেকে সব কাপড় খুলে নে—নিয়ে ঐ শ্মশানের উপর মাটিতে ফেলে রেখে আয় গা, যা।

শুনিয়া জননী আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রাণে বল ছিল, তিনি বলিলেন: তোমার কান্না কেন? যাঁর ছেলে তিনি যেখানে রাখতে বোলবেন সেইখানেই রাখতে হবে। চলো, ওঠো—

স্নেহ-কাতরা জননী মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিলেন: ওখানে শেয়াল কুকুর ঘুরে বেড়াচ্চে যে কি ক'রে ওখানে,—

স্বামী কোন কথায় কান না দিয়া,- চলো চলো, ওঠো—বলিয়া সন্তানকে কোলে লইয়া চলিলেন। জননীও উঠিতেছিলেন, বাবা তাঁহাকে বলিলেন: মা, ওখানে তুই যাবি কেনে, তুই হেথা বসে থাক বাবু আসুন, এলে যাবি গা।

কাজেই তিনি বসিয়া অবগুণ্ঠনের মধ্যে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণেই তাঁহার স্বামী আসিলেন। তখন বাবা বলিলেন: যা তোরা এখান হোতে চলে যা, যেয়ে মন্দিরে বোস্ গা যা। তাঁহারা আবার বাবাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বাবা তখন তাঁহারই একজনকে বলিলেন: দেখ ত বাবা কেলোটা কোথা?

একটু উঠিয়া সে ব্যক্তি বাহিরে দাঁড়াইয়া ড় গলায় কেলো' 'কেলো' বলিয়া ডাকিলেন, অল্পক্ষণেই ফিরিয়া আসিলেন—সঙ্গে এক কালো কুকুর।

কুকুরটা ভয়ানক কালো, দেশী গ্রাম্য কুকুর হিসাবে বেশ বড়, চক্ষু দুইটি যেন জ্বলিতেছে। সে আসিয়া বাবার কাছে সুমুখের পা দুটি ছড়াইয়া তাহার

উপর মাথাটি রাখিয়া দিল। বাবা তাহার গায়ে হাত দিয়া একটু আদর করিলেন, তারপর যেমন করিয়া আপন অনুগতজনকে আজ্ঞা করেন সেই ভাবে বলিলেন,—যা কেলো, তুই শ্মশানে ছেলেটাকে স্থাখ গা যা। শুনিবামাত্র কুকুরটি উঠিয়া শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল। বাবা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। যে সকল ব্যক্তি ওখানে ছিলেন—তিন-চারটি লোক, একটা আতঙ্কে সকলেই যেন অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে বাক্য নাই।

আমার একবার মনে হইল দেখিয়া আসি শিশুটি কি ভাবে শ্মশানে পড়িয়া আছে। কিন্তু কৌতূহল থাকিলেও বিস্ময় এবং একট আতঙ্ক মিলিয়া এমন একটি ভাবে আমায় অভিভূত করিয়াছিল, আমি উঠিতেই পারিলাম না।

দ্বিপ্রহরের পর প্রসাদ পাইবার সময় ওখানে সকলে সমবেত হইলে দেখিয়াছিলাম, সেই ভদ্র ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে একটি বিষাদের ছায়া।

আমরা প্রায় পাশাপাশি বসিয়াছিলাম, কিছু কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। পরিচয়ে জানিলাম, কলিকাতায় থাকেন এবং রেল অফিসে কর্ম্ম করেন, নিজ বাড়ী জিরেট বলাগড়। সন্তান হইয়া বাঁচে না, চারিটি সন্তান শিশুকালেই

গিয়াছে—এইবার তাই বাবার কাছে আনিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষেই বাবার শিষ্য, সাত বৎসর। বাবা বৈকালে যাইতে বলিয়াছেন ছেলেটিকে লইয়া—

প্রায় দেড়টা নাগাৎ প্রসাদ পাওয়ার পর যখন আমি বাবার কুটীরে আসিয়া বসিলাম তখন বাবা নিজ শয্যায় শুইয়া ছিলেন, ঘুমান নাই। পাশে একজন বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে তিনি শুইয়া আছেন; দুই একটি কথা অস্পষ্ট গোঙানির মত মধ্যে মধ্যে আমার কানে আসিতেছিল। তাঁহার আওয়াজই ঐরূপ, অবশ্য বয়স হইয়াছিল বলিয়াও বটে, তাহার উপর দাঁতগুলি বোধ হয় বেশীর ভাগই গিয়াছে—সেইজন্য কথা কহিতে গেলে গলার স্বর ঐরূপ অস্পষ্ট হইত।

যিনি বাতাস করিতেছিলেন তিনি নিকটেই ছিলেন—আমি ছিলাম কতটা দূরে, বাহিরের দিকে। সেই কালো কুকুরটি ছাড়া অপর চারটি কুকুর বাবার ঘরের দরজার নিকটেই শুইয়া ছিল। একটি সাদা, একটি লাল, একটি হলুদ রঙ, অপরটি খয়ের রঙ—বোধ হয় উহাদের মধ্যে সাদাটি গর্ভবতী ছিল, সে মধ্যে মধ্যে বাবার কাছে যাইতেছিল, তখন বাবা তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছিলেন। কুকুরগুলির উপর বাবার অসীম স্নেহ দেখিলাম। উহাদের নাম আছে। যথা—কেলো, ভুলো, শ্বেতফুলি, লালি এইরূপ।

বেলা তিনটা নাগাদ বাবা উঠিলেন,—গাঁজা চলিল, তারপর বাবা আমার দিকে দেখাইয়া বলিলেন: ওঁকে দাও।

নগেন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন: উনি এ সব খান না।

বাবা তখন আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনি ব্রহ্মচারী বট।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম: না না, আমি গৃহী,—আপনাকে দর্শন করতেই এখানে এসেছি।

শুনিয়া বাবা বলিলেন: তোমার কিছু অসুখ আছে নাকি?

আমি বলিলাম: না, আমার শরীরে কিছু অসুখ নেই। তবে ভবব্যাধি যদি বলেন তা আছে।

বাবা: শরীরে অসুখ-বিসুখ কিছু নেই, তবে আমার কাছে কি করতে এয়েছ?

আমি: অসুখ কি ব্যাধি না থাকলে কি আপনার কাছে আসতে নেই?

তিনি: কৈ, কঠিন রোগ না হোলে ত কেউ আমার কাছে আসে না।

ঐ দেখ না, এক মরা ছেলে নিয়ে এলো গা, বাঁচিয়ে দাও,—আমি কি করবো, তারা-মা যা করবেন তাই হবে। আমি কি ডাক্তার বটি ?

তখন দেখিলাম, বাবার ভাবটি বেশ প্রফুল্ল।

কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে গঁরদের জামা-চাদর-পরা মোটাসোটা একজন ধনবান ভদ্রলোক আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন।

বাবা মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে বলিলেন : কে, অমর্ত ?

হাঁ বাবা। বলিয়া তিনি আবার প্রণাম করিলেন।
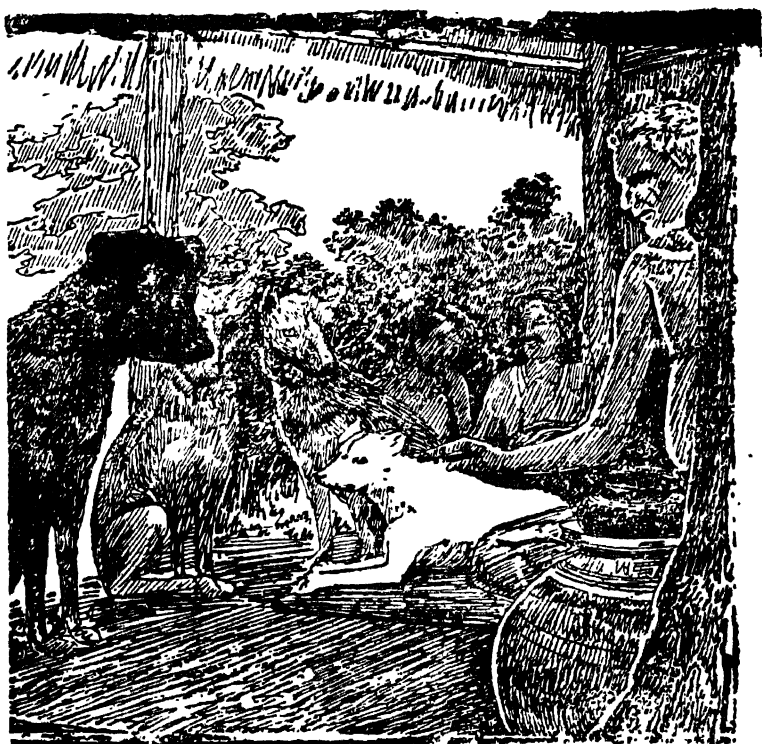
মেয়্যাটি মারা গেছে বটে ?

তিনি বলিলেন : কি আর বলব বাবা, মায় ইচ্ছা। তারপর,—অসুখের সমস্ত ইতিহাস বিবৃতি, সে কথায় আমাদের কাজ নাই।

বাবা আমাদের বড়ই সরল লোক। এতটা বয়স হইয়াছে কিন্তু গম্ভীর বলিয়া ধরিবার যো নাই। আমাদের পক্ষে তাঁর ভাষা বুঝা শক্ত। কারণ

একে ত বাবা পল্লীগ্রামের মানুষ, তার উপর তাঁহার কথা সংক্ষিপ্ত—বুঝিয়া লইতে পারি, কিন্তু ব্যাখ্যায় বড় হইয়া যায়। সেইজন্য মাঝে মাঝে ঠিক বাবার উক্তিগুলি যথাসম্ভব সোজা করিয়া বলিবার চেষ্টাই করিতেছি।

বাবা খুব রসিক লোক, বোধ হয় তাঁর প্রত্যেক কথাই রসিকতা মাখানো। একটা কথা বলিয়া এমন ভাবে মুখের দিকে চাহিবেন, যাহাতে কথার সহজ রহস্যটি অনুভব করা যায়—তবে তিনি গম্ভীর, নিজে যেন ধরা দিতে চান না। কিন্তু সে গাম্ভীর্য্যও রহস্য-মাখানো। এইভাবে তিনি কথা কহিতেন। আজ সকালে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া কিছু শুনিব বলিয়াই বাবার কাছে গিয়া বসিয়াছি। একজন নিয়তই তাঁর কাছে আছে, উঠা-বসার সাহায্য করিতেছে। ব্যাধি তাঁর বিশেষ কিছু আছে বলিয়া বোধ হইল না, কিন্তু কেমন অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন, কথা সব সময়ই চলিতেছে, মাঝে মাঝে অতি করুণ, হৃদয়ভেদী স্বরে—মা কিম্বা তারা তারা, বলিয়া ডাকিতেছেন। চক্ষু যেন জল-ভরা, রক্তবর্ণ, তাহাতে জ্যোতি। যখন আমার দিকে চাহিলেন, মনে হইল একেবারে আমাকে গ্রাস করিয়া লইলেন। একটু ভয় হয় সে চাহনি দেখিলে, কিন্তু কথা শুনিলে সাহস আসে।

আমার দিকে চাহিয়া রসিকতা করিয়া বলিলেন,—বাবা, বড় ছোটবেলায় ঘর ছেড়েছো, গিন্নীটি কি মনের মত হোলো না বুঝি?

আমি চুপ করিয়াই থাকিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু জবাব দিতে হইল। বলিলাম: আমি ত ঘর ছাড়ি নি।

তিনি: ঐ হোলো, বৈরিগীর খাঁচা নিয়ে ত ঘোরা-ফেরা হচ্ছে। কিছু বলিলাম না দেখিয়া তিনি নিজেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—যথা, বেশ করে ঝেড়ে, দমভোর যৌবনটা ভোগ করে এলে ভাল হোতো বাবা, বুঝছ না। দুটি চারটি ফলও হয়ত হোতো, জীবনের রসটা ভাল করে ভোগ করলে যোগটা ভালই হোতো তাই বলছি।

এমন সময় কলিকাতার বাবুটি তাঁর সেই রুগ্ন সন্তানটি কোলে, প্রফুল্লমনে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন, পশ্চাতে স্ত্রী আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। বাবার সহচর সেবকও গাঁজার কলিকাটি সেই সময় লইয়া বাবার হাতে পৌঁছাইয়া দিলেন। বাবা প্রফুল্লভাবে বলিলেন: কেমন তোর ছেলে ত বাঁচল?

সে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্রণাম করিয়া ভক্তিগদগদ স্বরে বলিলেন: বাবা, এ ত আপনার, আমার ছেলে কেন বলছেন?

বাবা বলিলেন: মা-ই বাঁচিয়েছেন—আমার কি সাধ্য—ও কথা বলতে নেই। তবে তোকে ত মানুষ করতে হবে। আমি ত ওকে মানুষ করতে পারবো না। যা—ঘরে যা যেয়ে তারা মার নামে ওকে ডাকবি। সে ব্যক্তি তখন পকেট হইতে কি একটা বস্তু তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া কি ভাবিয়া আবার রাখিয়া দিলেন, পরে বলিলেন: ও বেলা যাবো তখন আমরা, এ বেলা প্রসাদ খাবো এখানে। তবুও বাবাকে ত কিছুক্ষণ দেখতে পাবো। বাবার সঙ্গে আমাদের—

বাবা বাধা দিয়া বলিলেন: সব শালা চোর এখানে—টাকা-কড়ি দিস না, কোথায় রাখবো। তার চেয়ে কিছু মাল দিয়ে যাস্। মাল অর্থে নেশার জিনিস।

বাবা এবার কলিকাটি লইয়া টান দিলেন, একটি কেমন আওয়াজ হইল। এমন কখনও শুনি নাই। প্রসাদ লইয়া সেবক পশ্চাতে বসিয়া গেল।

সেই ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া বাবা তখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: এই দেখ কেমন গেরস্ত সংসারী, সাধনও আছে মার কৃপায় আবার সংসারী, কাজকর্ম্মও হচ্ছে। ছাড়াছাড়ি নেই, সংসারকে ভয় নেই। এমন না হোলে মার কৃপা হবে কেন? বাবাজীর গোড়ায় গলদ।

আমি বলিলাম: খুলে বলুন, তা হোলে বুঝতে পারবো।

তিনি: ঐ ত গোড়াতেই ভয়। ঘরে থাকবো, না বাইরে যাবো। শেষে ভেবেছিস্ কি ধাঁধায় পড়তে হবে নি? মাকে ত জানো নাই বাবা—কে কেমন মেয়ে,—দেখবে তখন বুঝবে যখন ঘোরপাক খাওয়াবেক।

আমি বলিলাম: যদি বলি মা-ই ত সব করাচ্ছেন।

বাবা তখন সেই ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন: এই দেখ্ ঠ্যাটা, যদি মা-ই সব করে থাকে জানছিস্, তবে অত হিসাব করে সব কাজ করছিস্ কেনে? মা-কে ধরে এক জায়গা বসে থাক গা যা না।

আমার এ সময় তর্ক-বিতর্ক আনার অভিপ্রায় নয়, উদ্দেশ্য বরং সাধুসঙ্গ করা—তার ফলে যদি কিছু পাওয়া যায়। বামাক্ষেপারও শরীর খারাপ। মনে হয় ইহার পর এক বৎসরের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তখন আমি কলিকাতায়। যাহা হউক এখন আর কিছু বলিলাম না।

আমার যেমন ধারণা হইয়াছিল—অন্যান্য সাধু যেমন লোকসঙ্গ হইতে দূরে থাকেন, কিছু জানিতে বা বুঝিতে চাহিলে বিশেষভাবে ধরিতে হয়, বাবার সে-সব নাই। কারণ বাবার সর্বদাই শিশুর মত ভাব, বিচার-বুদ্ধি পূর্ব্বক

কিছু বলেন বা করেন তাহা বোধ হইল না। যখন তিনি কারও সঙ্গে কথা কন, সে কথার মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তাহা বুঝা যায় না, আর তাঁর ভাষা এমন যে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না তাহা বলিয়াছি। যাঁহারা নিয়তই তাঁহার কাছে থাকেন তাঁহারা ব্যতীত অন্যস্থানের লোক চট্ করিয়া তাঁহার কথা ধরিতে পারেন না।

ভাবিলাম, ওখানকার একজনকে না ধরিলে তাঁহার সঙ্গে কথা কওয়ার সুবিধা হইবে না। নগেন পাণ্ডা বলিয়া একজনের কথা বলিয়াছি বাবার সঙ্গলাভের আশায় গিয়াছি এবং আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া এখানে কিছু সাহায্যের জন্য কা৷ অনুরোধ করিয়াছিলাম, আমার মনে হইল তাঁহার পরিচিত এবং ভক্ত-বিশেষ ব্যতীত বাবা আর কাহাকেও তে৲ন আমল দিবেন না। কিন্তু নগেন পাণ্ডা বলিলেন যে উহা ঠিক নয়, বাবার স্বভাবই ঐরূপ, তাঁহাকে জোর করিয়া না ধরিতে পারিলে, নূতন লোক হোক বা পরিচিতই হোক কেহ সহজে তাঁর কৃপা বা স্নেহ পাইতে পারে না। তারপর যে ব্যক্তি যে ভাবের, যে দলের অর্থাৎ সম্প্রদায়ের লোক তিনি তাহা বুঝিতে পারেন, এবং সেই ভাবেই তার সঙ্গে ব্যবহারও করিয়া থাকেন। নগেন বলিলেন, যদি আমি তামাক বা গাঁজা প্রভৃতি খাইতে পারিতাম তাহা হইলে সুবিধা হইত। অর্থা৲ সেখানে চট্ করিয়া স্থান পাইতাম, বাবারও অনুগ্রহ হইত। কিন্তু প৲র বুঝিয়াছিলাম, উহা ঠিক নয়।

যাহা হউক, এখন নগেন পাণ্ডা বাবাকে আমার সম্বন্ধে বলিলেন: বাবা, ইনি আপনার কাছে কিছু শুনতে চান, সেইজন্যই এসেছেন। শুনিয়া বাবা বলিলেন: ওঃ—কথা শুনতে এসেছে? এই ত কথা হচ্ছে, শুনে যাও,—কিছু দক্ষিণে এনেছ? বাবা রসিক লোক। দক্ষিণে অর্থাৎ গাঁজা আমি বুঝিতে পারি নাই, নগেন বুঝিয়াছিলেন সেইজন্য বলিলেন, উনি ওসব পছন্দ করেন না, তা ছাড়া উনি ছেলেমানুষ, ওঁর কাছে ওসব কিছু নাই। উনি বেদাচারী।

বাবা বলিলেন: তবে কালী বল তারা বল, বাবা। মায়ের নামই সার, আর কি করতে পারবি বল। আমরা মদ ভাং খাই আর মায়ের চরণে পড়ে থাকি, মা যা করেন। আর কিছু কথাবার্ত্তা তো জানি না। বলিয়া একবার তারা-মা এমন অপূর্ব্বভাবে বলিলেন যে তাহা শুনিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। যেমন শিশু মাকে ডাকে সেইরূপ তাঁহার মধ্যে একটি জীবন্ত এবং ব্যাকুল অনুভূতি।

তারপর বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন: হ্যাঁ, বাবা, তোমার গুণের কথা ত কিছু জানলাম না।

আমি বলিলাম: আপনার কাছে এসেছি, আমাকে দয়া করুন। আমার ত গুণ এমন কিছু নাই যার কথা বলে আপনাকে খুশী করতে পারবো।

তিনি বললেন: তা হোক, মুখে যে গুণের কথা লেখা আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি বাবা, লুকালে হবেক কেনে।

সস্ত্রীক ভদ্রলোকটি শিশু-কোলে, এই সময় বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মন্দিরের দিকে গেলেন।

এমন সময় বেশ হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ শরীর, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চক্ষু, উজ্জ্বল কপালে সিন্দূরের ফোঁটা, লাল কাপড়-পরা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ হইবে,—এক ব্যক্তি আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিল। বাবা নবাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া যেন সজীব হইয়া উঠিলেন, বলিলেন: সাঁইতে থেকে এই এলি নাকি?

সে ব্যক্তি বলিল: মজুমদার মশাইও এসেছে, দুপুরে আপনার কাছেই আসবে বলে গাঁয়ের মধ্যে গেল। কাল সারা রাত ধরেই কাজ চলেছিল—দেখছি উয়ার মনের গতিক ভাল নয়।

বাবা বলিলেন: তবে উ মরবে গা, ক্রিয়া-কর্ম্ম না করে শুধু কারণ খেয়ে ফুর্ত্তি করবো বল্লেই কি মার দয়া হয়,— উয়ার কথায় আর কাজ নাই, মা বুঝবেন গা। তু একটা মায়ের নাম কর—সেই ভাল হবে।

তখন সেই ব্যক্তি বেশ সতেজ গলায় রাজা রামকৃষ্ণের একখানি গান ধরিল,—

দীন-তারিণী, দুরিতবারিণী, সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন-পালন-নিধন-কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।

সে গানটি এমনই মধুর—শুনিতে শুনিতে বাবার চক্ষে আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। গানের শেষ লাইনটিও মনে আছে—

বৈশেষিক বেদান্ত নাহি পেয়ে অন্ত, অনন্ত তোমায় চিনিতে পারেনি।

তারপর বাবা বলিলেন: সেইটা বল্ ত!

নগেন পাণ্ডা বলিলেন: কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে—সেইটা? তখন তিনি সেইটি ধরিলেন—

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে বিষয়-বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়া মহতত্ত্ব, ছাড়ি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনে আপনে।

গানখানি শেষ হইলে গাঁজা চলিল, বাবা প্রসাদ করিলেন। বাবা ঢুলিতেছেন, চক্ষে ধারা, আবার টানিতেছেন,—শেষে কাশিতে কাশিতে ছিলিমটা ভক্তের হাতে দিলেন।

নগেন পাণ্ডাও প্রসাদ পাইলেন, পাইয়া উঠিয়া গেলেন। তখন বাবার দিকে চাহিয়া একজন বলিল: আপনার কাছে আমার কথা আছে বাবা। বাবা বলিলেন: বল্ কেনে। কিন্তু সে আমার দিকে চাহিয়া দেখিল, ভাবটা এই যে আমার সম্মুখে অর্থাৎ আমি সেখানে থাকায়, তাহার কথা বলিতে আপত্তি আছে। দেখিয়া আমি তখনই নদীতীরে শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া এক জাম-গাছের তলায় বসিলাম। ভাবিতেছিলাম এখানে কি করিতে আসিলাম, কেনই-বা আসিলাম। বাবার সাঙ্গোপাঙ্গ এমনভাবে ঘিরিয়া আছেন, নিরিবিলি একটু যে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিব তার যো নাই। মনটা খারাপ হইয়া গেল। এখানে আর থাকিব কি না ভাবিতেছি এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল: বাবা আপনাকে ডাকছেন, আসুন।

২

অন্তরে একটু বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দ উপস্থিত হইল, ভাবিলাম হয়ত বাবার দয়া হইয়াছে। গিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে না বসিতেই তিনি বলিলেন: বাবা, মনে দুঃখ পেলে তাই ডাকলাম। তা উ শালা আমায় যে চুরির কথা বলে—সে হয়ে গেছে উ কথায় আর কাজ কি, যা হয়ে গেছে তার কথায় আবশ্যক কি আছে। তু গান করিস নাকি? *ছিচরণ তু কি বলিস?

* তাহার নামটি মনে নাই, হয় শ্রীচরণ গোবিন্দ কিংবা ঐ রকম একটা কিছু হইবে। আর চুরির কথা এই যে, বাবার কিছু টাকা কিছুদিন পূর্ব্বে চুরি হইয়া যায়—সে কথা যথাসময়ে হইবে।

ঐ ছিচরণই গোপনীয় কথা বলিয়া আমায় উঠাইয়া দিল। সে ব্যক্তি সায় দিল, বলিল: হ্যাঁ, উয়ার কলকাতার গান একটা হোক না।

আমি তো অবাক, শেষে অব্যাহতি পাইলাম একখানা ব্রাহ্ম-সঙ্গীত গাহিয়া। বাবা বলিলেন: তোর স্বরটা নরম বটে।

ঐ ছিচরণ দেখিলাম, তখন হইতে আমায় একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। বাবার সভায় গাঁজা-প্রসাদ পাইয়া ছিচরণ উঠিল, আরও দুই তিন জন উঠিল। লোক কমিয়া গেলে আমারই সুবিধা। দুজন ছাড়া আর সব যখন গেল--আমি তখন বাবার কাছ ঘেঁষিয়া পায়ে হাত দিলাম। দিবামাত্রই বাবা চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন: ওরে শালা পায়ে হাত দিতে হবেক নাই, তু বল না কি বলিস। পায়ে হাত দিয়ে আমার মন ভুলাতে আইচিস্, খোসামুদ্ধা!

আমি বলিলাম: আপনি তো মনের কথা বুঝেছেন, আপনি আমায় দয়া করুন। তিনি বলিলেন: তু ত এখন দু-চার দিন এখানে থাকবি, একটু ঠাণ্ডা হ কেনে, তবে সব হবে যেঁয়ে। মনটা তোর ভাল বটে।

আমি বলিলাম: আপনি আমায় ঠাণ্ডা করে দিন। আমি বড়ই চঞ্চল।

তিনি: আমি করলে হবেক কেনে, তু আমার কথা লিবি কেনে। তোর এখন প্রাণটা ঘুরতে চাইছে, ঘুরতেও হবেক তোরে অনেক—তা বেশ, ঘোর না দিন কত। দেখ যেঁয়ে মায়ের কাণ্ডকারখানাটা। একটু থামিয়া মৃদুকণ্ঠে আবার বলিলেন, ঠাণ্ডা হতে চাস্ ত আমি যা বলি তা শুন, আমি বলি, ঘরকে যা। ঠাণ্ডা হোতে আর জায়গা কোথা, কোনখানে ঠাণ্ডা হোতে হবেক নাই। তোর মা বাবা আছে?

আমি: হাঁ বাবা, মা, ঠাকুরমা, দিদিমা -

তিনি: আর বলতে হবেক নাই—ঐ হয়েছে ঘরে যেঁয়ে বাপমায়ের চরণপূজা করগা, তাইতেই সব পাবি গা, সব হবে। শুনিয়া আমার মনে হইল যে আমাকে ভাগাইবার জন্য এরূপ ভাবের কথা বলিতেছেন।

আমি তখন বলিলাম: দেখুন, একটা অন্তরের কথা আজ আপনাকে বলছি। সদা সত্য কথা কহিবে, কখনও মিথ্যা বলিবে না, কাহারও কিছু চুরি করিবে না, প্রবঞ্চনা করিবে না, পিতামাতার সেবা করিবে, তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে অথবা তাঁহাদের ভগবান জানিয়া মনে-প্রাণে অনুগত থাকিয়া তাঁহাদের তুষ্ট রাখিবে ইত্যাদি ভাল ভাল কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি আর নীতিপুস্তকে পড়ে আসছি কিন্তু প্রাণ ত চায় না তাঁদের

দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে। ভগবান্‌কে দেখতে পাই না, কল্পনায় তাই হয়ত বেশ একটা আকর্ষণ অনুভব করি—কিন্তু বাপ-মাকে চক্ষের সামনে নানাভাবে আমাদেরই মত সহজভাবেই পাই বোলে হয়ত ভগবানের মত ভাবতে কোন কালেই পারলুম না। কেমন যে একটা দুর্ব্বলতা এসে পড়ে—মনে মনে ঠিক করলেও কাজে পারি না।

তিনি বলিলেন: কেন রে—

আমি বলিলাম: বাপ-মার উপর ভগবানের ভাব এনে যে ভক্তি তা আমার আসে না। আমি তাঁদের সৎ-পুত্র হোতে পারলাম না, আমার বাড়ী ভাল লাগে না, তাঁদের সঙ্গ ভাল লাগে না।

তিনি বলিলেন: হ্যাঁ দেখ আমার দিকে, যে যেমন ছ্যেলা তার বাবা-মা—ভগবানও সেই রকম দেয়। তুই ঠ্যাটা হয়েছিস্ তাই উঁয়ারাও ত ঐ রকম হইচে। তু যদি ভাল—সোজা রকম মানুষ হতিস উঁয়ারাও ভাল হোতো। আসলে তু ত ভগবান চাস না, তুই হেথা যাবি, আর কয়ে বেড়াবি, এখন তাই তোর মন। তা তাই কর কেনে,—তবে বাপ-মাকে ভক্তি করে কর্‌বি. তাদের দোষ দেখে তাদের অমন হেলা করবি কেনে?

আমি: আপনার কথায় এখন তাই ভাল মনে হচ্চে—কিন্তু তাদের ভগবান বোলে ত ভাবতে পারি না এইটাই বড় দুঃখ যে।

তিনি: মনে জানবি বুড়া বাপ-মাকে যে খেতে না দেয়, সেবা না করে সে শালা কোনদিনও ভগবানকে পাবে নাই।

আমি: বাবা আমার কাছে খেতে পরতে চান না সেজন্যে ভাবনা নেই, কিন্তু তিনি ত আসলে আমাদের এড়িয়ে থাকতে চান। এখন আমরা মানুষ হয়েছি, আপনি চরে খাব, তাঁর কাছে আসবো না, কোন কিছু জানাবো না এই তিনি চান। তবে আমি উপার্জ্জন করে যদি তাঁর হাতে এনে দিতে পারি আর তাঁর কাছে কিছু আশা না করি তাহোলে তিনি সুখী হবেন।

তিনি: আমার কথা তুই ত নিছিস না, আমি বলি তু তাদের সেবা করবি, তাদের প্রসন্ন রাখবি। তাতেই তোর কাজ হবেক।

আমি: আমার সেবা ত তিনি চান না—

তিনি: তু বড় ঠ্যাট', তিনি চাইবে কেনে, তু আপনি করবি গা।

আমি: দেখুন, সত্যি কথা, আমার এমন প্রবল ভক্তি নেই যে তিনি না চাইলেও আমার মনের জোরে তাঁকে আমার উপর সন্তুষ্ট করে নিজের জন্ম সার্থক

করি। আমার মনে হয়, এখন তাঁর কাছ থেকে তফাতে থাকলেই ভালো হয়। দূরে থেকে যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা মনে রাখতে পারি, কাছে থাকলে নানা প্রকার ব্যবহার দেখে তা পারি না। কাজেই তাতে লাভ নেই জেনেই আমি বাইরে দূরে দূরেই থাকি।

তিনি: দেখ্ তোর যখন বিয়া হইচে তখন তোর এমনটা ভাব তাঁদের ভাল লাগে নাই। তু ঘরকে যা চলে, মায়ের চরণ ধরে পড়ে থাক গা--সেই তোর এখন কাজ। টাকা আনবি, বাপের হাতে দিবি, সংসার-ধর্ম্ম করবি; তাই ভালো।

বাবা এই সব কথাই বলিতে লাগিলেন। যখন বুঝিলেন তাঁর কথা আমার মনে ধরিতেছে না, তখন বলিলেন: এই দেখ্ কেনে মানুষের বুদ্ধি—আমরা মুখ্য, জানিস কিনা, কলেজে পড়ে পণ্ডিত হই নাই, শাস্তোর পড়ি নাই, কিছু জানি নাই,—বল ত, বাপ মা বেঁচে থাকতে কোথায়, কোন শাস্তোরে ঘর ছেড়ে বৈরিগী হয়ে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে? তোরা এমনই ঠ্যাটা হয়েছিস, ঘরের ভগবান ফেলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মরিস—তোর কি লাজ লাগে নাই?

আমি: দেখুন, সত্যিই আমি যে হতভাগা তাতে কোন সন্দেহ নেই, নাহলে বাপ-মাকে ভগবান বোলে ভক্তি না করতে পেরে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? সময় সময় যেন বুঝতেও পারি যে হয়ত আমি ঠিক কাজ করছি না—কিন্তু বাপের উপর ভগবান বোলে ভক্তি যদি না আসে ত কি করি, বলে দিন আমাকে।

কেন হয় না বল দেখি তোর, আমি ত ছেলেবেলা থেকে বাবা যা বলতো তাই শিরোধার্য্য করেছি। বাপে বোললে—চল গানের পালা গাইবি গা, আমি তখনি গেছি। বাপে বোললে- ও কাজ করিস না, তখন সে কাজে গুরুজ্ঞান করিচি। (গুরুজ্ঞান অর্থাৎ অনিষ্ট জ্ঞানে পরিত্যাগ) তু-ই পারিস না কেনে?

আমি বলিলাম: আপনার মত বুদ্ধি যদি আমার থাকবে, তাহলে আমার এমন অবস্থা কেন,—আমরা বেশী বুদ্ধিমান কিনা। বাপের মধ্যে অনেক দোষ দেখতে পাই। কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ,- এই সব নিত্য নিত্য দেখে আর ভক্তি থাকে না।

আরে তু শালা, বাপের খুব ঠেঙ্গানি খেয়েছিস বুঝি? আমি কি

ঠেঙ্গানি খাইনি মনে করেছিস? আমিও খুব খেয়েছি, মার হাতেও ঠেঙ্গানি খেয়েছি, তাতে কি হয়, দোষ করেছিস মারবেন নাই?

আমি: ভগবানের কি অমন কাম ক্রোধ আছে, তিনি কি তাঁর সন্তানকে এমনভাবে পীড়ন করেন?

আরে এটা বুঝিস না, বাঁকা-ত্যাড়া একটা নোয়াকে সোজা করতে হোলে পিটতে হয়—সোজা হোলে ত কথা ছিল না, তুই ত্যাড়া-বাঁকা ছিলি, তাই ঠেঙ্গানি খেয়েছিস—ভগবান যাকে বলিস তিনি ঐ মা তারা, ওই কি মাবে নি বাবা? উ ও ত মারে সময় সময়—যখন দেখে যে না ঠ্যাঙ্গালে ছেল্যাটা সোজা হয় নাই তখন দেয় খুব করে বসায়ে।

আপনার কথা শুনে এখন বুঝতে পারছি ব্যাপার, কিন্তু তখন ওসব ভাবতে পারি নি, তাঁদের দোষ বলেই ভেবেছি।

তিনি: আমি এত কথা কইব কেনে, তুই আপনি বুঝে লে না, তোর বুঝবার ইচ্ছা থাকলে তিনি বুঝিয়ে দেবেন যেঁয়ে। তুর ভগবান আর কুথা আছে, যাদের থেকে ঐ শরীর হয়েছে তিনিই তুম্বার ভগবান। মা যিনি গভ্যে ধরেছেন তিনি ঐ মা, তাই বলি ঘরকে চলে যা—যেঁয়ে করে দেখ না কেনে ঠিক হবে গা।

আমি: তাঁরা চান আমি চাকরি করি উপার্জ্জন করি তাহোলে তাঁরা সুখী হন। কিন্তু আমাব যে চাকরি কবতে ভাল লাগে না।

তিনি: ঐ ত গাঁয়ের কুঁড়ের মরণ,—কেনে তু চাকরি কর না, তাতে দোষ কি?

আমি: চাকরি কবতে আমার ইচ্ছা যায় না, কি করি বলুন দেখি?

তিনি: বাপ-মায়ের সঙ্গে সন্তানেব সম্বন্ধ কি, তাঁদের দ্বারা ছেল্যার কতটা ভাল হতে পারে, তাব ধারণা এখনকার সন্তানদের ত নাইই আবার বাপ-মায়েরও নাই। এই কথা বলিয়া বাবা একটু নিরীক্ষণ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন।

আমার বোধ হইল ইনি দেখিতেছেন, আমি তাঁহার কথা কিরূপভাবে লইতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কেন এমনটা হোল বলুন, আপনার মুখে শুনলে তবে যদি বুঝতে পারি।

তিনি তখন বলিলেন: তুই ঘরকে যেয়ে তাঁদের অনুগত হয়ে ভক্তি করে দেখ্ গা যা, তাহলে সব বুঝতে পারবি।

আমি বলিলাম: জোর করে ভক্তি করা যায় কি? আমার প্রাণ যা চায়

তা না পেলে তাঁকে কেমন করে ভক্তি করি—মনে হয় বাল্যকাল থেকেই আমার বাবাকে যমের মত ভয় করতে শিখেছি, তাঁকে দেখলেই আমার ভয় আসে মনে, তাঁর কাছে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারি না, তিনিও আমাদের কাকেও নিজের কাছে নিয়ে দু'দণ্ড বসতে চান না। বড় হয়ে কাজের জন্য যেটুকু যাওয়া, তাঁর নিজের দরকারমত ডাকেন, সেটি হয়ে গেলেই আর যেন কোন সম্বন্ধ নেই।

তিনি সব শুনিয়া বলিলেন: দেখ আমি মুখ্যু মানুষ, বড় বড় কথা জানি নি, সোজা কথা বলি শোন্। তোর মধ্যে যেসব ভাল ভাল ভাব, জ্ঞান, ভক্তির এই যে সব ধারণা জন্মেছে—সেটা তুই কি করে পেলি আমায় বল দিকি?

আমি: আমার বোধ হয় আমি যেমন ভাব, সংস্কার নিয়ে জন্মেছি সেই সবই এখানে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠছে—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: ওরে ঠ্যাটা দুশমন কোথাকার, যে তোকে ছিষ্টি করেছে সে যদি তার গুণগুলা না দিয়ে ছিষ্টি করতো তা হোলে তু কোথা পেতিস বল দিকি আমায়? তোর ভিতরে যে যে গুণ আছে বোলে গরব করিস তু—সে সবই তোর জন্মদাতার দেওয়া—না হোলে তু পাবি কুথাকে —য়্যা—

আমি: তবে সে জিনিসগুলি আমি তাঁর মধ্যে আমার মনোমতভাবে দেখতে পাই না কেন?

তিনি: তাঁর মধ্যে অবশ্যই তা আছে, তুই বুঝতে পারিস নাই, তবে তার প্রকাশের ধরন আলাদা রকম এই যা,—এই দেখ্ তোর মধ্যে ভগবানে সহজ ভক্তিও আছে, আবার সন্দেহও আছে—সেইজন্যে তুই জ্ঞানের দিকটাই ভাল মনে করেছিস, আর তাই পাঁচ জায়গায় অম্বল চেকে বেড়াচ্ছিস—তোকে দেখে পষ্ট বোঝা যায় তোর জন্মদাতারও ভগবানে সহজ ভক্তি আছে—আবার বিচার করতে গেলে সন্দেহ অবিশ্বাসও আছে, তবে তাই নিয়ে সে কিছু যাচাই করে নি, বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করে নি, যার জন্যে তোর মনের মত ভাবগুলি তার মধ্যে দেখতে পাস নাই। আর ঐ যে তোর ভয় বলছিস্ ঐ ভয়টা তাঁর পীড়নের জন্যই হোক বা রাগী স্বভাবের জন্যই হোক সেটা ত ঐ ভক্তির আর এক ভাব। ভয় দিয়ে তোর সম্বন্ধটাকে জোর করে রেখে দিয়েছে। একটু বুদ্ধি করে ঐ বাপকে ধরলেই তোর সব-কিছু হয়ে যায়—তাতে তারও কল্যাণ হয়, তোকে সৃষ্টি করা সার্থক হয়।

আমি: আমি বেশ ভালই জানি তিনি আমাকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দিতে চান না। তিনি আমাদের দূরে রাখতে চান।

একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—সেটাও মানে আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম: কি তাঁর ভাব, দয়া করে বলুন শুনি।

তিনি: তিনি গোড়া থেকে যে সব ব্যবহার করেছেন সেগুলিকে তুই অন্যায়, অত্যাচার ভেবেছিস, সেগুলা সে ত জানে তাঁর মনে আছে, তু ত সেগুলা তাঁর অপরাধ বোলেই ধরে নিয়েছিস, মন থেকে মিটাতে পারিস নাই, সেই কারণেই ত সে আর তুর ঘেঁষ নিতে চায় নি। আবার এদিকে দেখ কেনে, তু যেমন তাকে ভাল দেখিস নাই, সেও ত তুকে তার মনের মত দেখে নাই, তু ত তার মনের মত হতে পারিস নাই, সে কেমন করে ঘেঁষ দিবেক তুকে? তোর দিক থেকেও তাঁকে যেমন বিচার করেছিস, তাঁর দিক থেকেও ত তোকে দেখতে হবেক। তা তুকে যদি সে না ল্যায় তু মনে কোন খোঁটা রাখিস না। সে পিতা, জন্ম দিইছে ত, তার লেগে মনে কিছু গোল রাখিস না,—

আমি বলিলাম: যদিও একটা ভয় গোড়া থেকেই আছে বটে কিন্তু তার জন্যে আমি বরং নিজেকে তাঁর কাছে অপরাধী মনে করি কারণ আমি যে ঠিক তাঁর মনের মত হোতে পারি নি সেটা আমি বেশ বুঝতে পারি। দুঃখও এটুকু আমার মনে বরাবরই আছে যে বাবার সঙ্গে আমার একটা প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারলো না, যা অন্য অনেকের আছে। যেখানে কোন সংসারে বাপে ছেলেতে একটা ভালবাসার, প্রেমের সম্বন্ধ দেখি, আমার প্রাণটা হু হু করে ওঠে যে, আমার জীবনে সে স্কৃতি নেই। তবে আমি এটা জানি যে, তিনি আমায় মনে মনে ভাল বলেই জানেন, মুখে প্রকাশ করেন না।

তিনি: দেখ্ দেহ ফুরালে সম্বন্ধ ফুরায় নি। তু যত ভাল, যত বড় হবি সে তুর বাপ হয়েই থাকবেক, শেষ অবধি দুজনায় প্রেম না হোলে চলবে নি। তু ঠিক জানবি তার তুকে চাই, সে তুকে ভুলবেক নি। হেথায় যতটা দূরে সে থাকে, সেই পরলোকে আর তা নাই, সব সোজা হয়ে যায়। আচ্ছা, জন্মদাতার কথা ত হঁয়্যা গেল, এখন মায়ের কথা বল দেখি, তু মাকে ত পূজা করতে পারিস? মাকে তুষ্ট করলেও জগদম্বাকে পাবি।

আমি: দেখুন, মা আমার খুব ধার্ম্মিক আর ভালমানুষ, কিন্তু আমাদের সংসারে যত কিছু অশান্তি,,—তার বেশীর ভাগ যিনি সংসারের কর্ত্তা বা গিন্নী —তাঁদের উদার ব্যবহারের অভাবে কিম্বা সংকীর্ণতার ফলেই হয়ে থাকে।

মেয়েমানুষের এইসব দুর্ব্বলতা আমরা যদি উপেক্ষা করতে পারি তা হোলেই ভাল, না হোলে আমাদেরও তার মধ্যে জড়ায়, আর দুঃখের একশেষ করে। সেই জন্যেই আমার ধারণা হয়েছে যে সংসার থেকে বেরিয়ে না গেলে, সম্বন্ধচ্ছেদ না করলে, কোনপ্রকারে আত্মকল্যাণ নেই। বাড়ীতে আমাদের নিত্যই অশান্তি, বাড়ীতে ত থাকতে পারি না কাজেই জননীকে সেবা আমার ঘটে ওঠে না,—মায়ের উপর আমার যে ভক্তি তা মনে মনেই থাকে।

তিনি বলিলেন: সে কথা লয়, অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে ঐ মাকেই জগৎজননী ধারণা করে তারই চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারলে, তোর আর অন্য কিছুই দরকার হবে নি।

আমি: যে সব তত্ত্ব আমি জানতে চাই তা ত মায়ের কাছে পাই না, তিনি লেখাপড়া বা জ্ঞান-বিদ্যার ধার ধারেন না;—বাবাও কখনো তাঁকে শিক্ষা দেন নি কিছু, কাজেই আমার সেইজন্যে বাইরে আসতে হয়।

তিনি: যদি মনেপ্রাণে ঐ মাকেই ইষ্ট বোলে বুঝতে পারিস ত ঐ থেকেই তু যা যা চাইবি সে সবই তোর মাঝে আপনি ফুটবে গা। তা তোর সে সব ত হবে না, আপনার মাকে ইষ্টদেবতা করে ধরা, এ কি সহজ কথা, এ সবার হয় কি? তাই ত এত ঘোরপাক খেতে হয়। ঘরে আছে ভগবান, তু তাকে চাবি না। তু কর কেনে যা তোর মনে লাগে। হঁ্যা দেখ,—বাপে মায়ে মেল না হোলে সন্তান মেল হবে কি করে। বাপের এক ধাঁচা (প্রকৃতি) মায়েরও আর এক রকম, তার ফলও হবেক তেমনি।

আমি: সত্য কথা,—আমার মা বাবার কথা আমি জানি, বলতে পারি। বাবা আমার ভয়ঙ্কর বলবান, উদ্ধত-প্রকৃতি, অনাচারী (ভোগী), আর মা আমার নিরীহ, ত্যাগী, শান্ত-শিষ্ট, নিরক্ষর, শুদ্ধাচারী, পূজাতপস্যা-পরায়ণা, ভীরু স্বভাব—

তিনি: ঐ রকমই পনের গণ্ডা এখানে, কাজেই এ ভাবের ছেল্যা মেয়্যা জন্মাচ্ছে। হঁ্যা দেখ, তারা মা ঐ রকম মেয়্যার সাথে ঐ রকম দম্ভি পুরুষগুলোর মেল করায়ে মনের মত মানুষ তৈরী করেন। আমরা তাঁর খেলা কি বুঝি, তিনি কি ভাবে কি রকম মানুষ তৈরী করেন—কোন্ কাজে লাগান তা কি আমরা জানি? মা মা, তারা—বলিয়া বাবা অন্তর্ম্মুখী হইলেন।

এমন সময় বাবার পরিচারক ব্যতীত সকলেই উঠিয়া গেল। আমি আরো কাছে সরিয়া বসিলাম। বাবা স্থির নিস্পন্দ।

কতক্ষণ পর আমার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন: তোর ভাল হবেক, ইটা তোর উঠতি জন্ম, মা তোকে ভাল পথেই নিয়ে যাবেন। তু তোর মা বাবা হোতেই উঠ্‌বি গা, বাপ তোর ভৈরব বটে?

আমি: তা ত জানি না—তিনি ত মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই নেন নি—তিনি বলেন, যাঁকে ভক্তি হবে, গুরু বলে মানতে ইচ্ছা হবে তাঁর দেখা পেলে মন্ত্র নেবেন। আমার বোধ হয় তাঁর মন্ত্রদীক্ষার উপর বিশেষ আস্থা নেই। বিশেষত কুলগুরুর উপর তাঁর মোটেই শ্রদ্ধা নেই, আর আমারও ঠিক সেই ভাবটা এসেছে। বাবা বলেন, ভগবান সকলকার, মনে মনে ডাকলেই হোলো।

তিনি: মদ ভাঙ্গ খায় বটে?

আমি: হ্যাঁ, ওসব যৌবনকালে খুব বেশী ছিল, এখন অন্য ভাবে—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: কোন্ ঠাকুরে তাঁর মন, জানিস তু?

আমি: তা ঠিক জানি না, তবে তাঁর মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প কখনও কখনও শুনেছি—রাম, কৃষ্ণ আর শিব, এই তিনের কথাই তিনি বিশেষ বলতেন। যখনই যার কথা বলেন আমার মনে হয় সেই তাঁর ইষ্ট, কিন্তু কাজে অনাচারী—

তিনি: হ্যাঁ হ্যাঁ, তু শালাদের আবার আচার—শক্ত মনিষ আচার মানবে কেন,—তবে গুরু না হোলে ত কুণ্ডলিনী জাগবেন নাই!

এই কুণ্ডলিনীর ব্যাপার আমায় জানিতে হইবে, এখন বোধ হয় সুযোগ উপস্থিত।

৩

পরদিন একটু সুবিধা বুঝিয়া ক্ষ্যাপার কাছে গিয়া বসিলাম, তখন সেখানে আরও দু'তিনজন উপস্থিত। বাবা রসিক লোক, একটু রসিকতা না করিয়া কথা কহিবেন না, বলিলেন: চিল পড়েছে যখন, কুটাটা না লয়ে উঠবেক্ না। ছিলিম চলিতেছে—সেটা আর না বলিলেও চলে। এখন কাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথাটা বলিলেন, আমি বুঝিলাম,—কিন্তু আর কেহ মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া—একবার আমার দিকে, একবার বাবার দিকে চাহিতে চাহিতে কত কি ভাবিতে লাগিল কে জানে!

নগেন পাণ্ডা ছিল চালাক লোক, বুঝিল আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন,—খুশী হইয়া বসিল: কেমন, এবার বাবাকে পেয়েছেন দেখি।

আমি বলিলাম: বাবা যে সদাশিব, তা কি জানেন না!

এইবার বাবা একটু চেষ্টা করিয়া উঠিবার ইচ্ছা করিলেন, অমনি তাঁর সেবক আসিয়া ধরিয়া সাহায্য করিলেন এবং চালার বাহিরে লইয়া গেলেন, দুই তিনটি কুকুরও চলিল।

জন দুই-তিন গ্রামের লোক আসিতেছিল,—পথে বাবাকে দেখিয়াই প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন: তোরা কে বটিস?—তাদের মধ্যে একজন বলিল: আমরা পলুর পাতা নিতে এসেছি গুটিপোকার লেগে, হোই ওখানে গাড়ীতে চালান দিয়েছি, বলি বাবাকে দেখ্যা আসি একবার।

ইহারা গুটিপোকার চাষ করে, ভিন্ন গ্রামে থাকে, মধ্যে মধ্যে গুটির জন্য পলু-পাতা যোগাড় করিতে দূরে আসিতে হয়। একেবারে অনেক দিনের খোরাক যোগাড় করিয়া গো-গাড়ী বোম্বাই দিয়া লইয়া যায়। সেই সময় ফিরিবার মুখে একবার বাবাকে প্রণাম করিয়া যায়। বাবা এদের ভালবাসেন, স্নেহ করেন, আর অন্তরে অন্তরে আশীর্ব্বাদ করেন। গাঁজাটা-আস্টা সাধ্যমত সেবার জন্য তাহারা কিছু দিয়াও যায়. কারণ বাবার আশীর্ব্বাদের ফল তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। তারা বলে, বাবা জেন্ত দেবতা।

বাবা যখন তাহাদের বলিলেন: দিয়্যা যা কিছু গাঁজার লেগে,—শুনিবামাত্রই তাহাদের একজন কোঁচার খুঁট খুলিয়া কিছু পয়সা, ডবল পয়সা, আর একটা দুয়ানি মিলাইয়া চার-ছয় আনা বাবার পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল। বাবা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন: যা, তোদের গুটি তাড়ায় পাকবে, দেখবি।

এখানে যারা বসিয়াছিল—নগেন পাণ্ডা, আর দুই একজন, তারা ত প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া গেল। আমি অপেক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে আমার পাশে, কেলো, ভুলো, লালী প্রভৃতি দুই তিনটি বাবার প্রিয় ভক্ত, পচা মড়া খাইয়া আসিয়া নানা ভঙ্গিতে শুইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। যে সকল খাদ্য তাহারা খাইয়াছে, জঠরে গিয়া বিষম দ্বন্দ্ব শুরু করিয়াছে, পাশে বসিয়া নানাপ্রকার শব্দ—চোঁ-চোঁ, গোঁ-গোঁ শুনিতেছি, আর দেখিতেছি, তাহারা স্থির থাকিতে পারিতেছে না, মধ্যে মধ্যে বড় ছট্‌ফট করিতেছে, বেশ বুঝা যায় একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছে।

কতক্ষণ পর বাবা আসিলেন—আমি এবার কুণ্ডলিনীতত্ত্ব শুনিবার জন্য একটু কাছে ঘেঁষিয়া কেমন করিয়া কথাটা উঠাইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

বাবা বসিয়াই,—মা, মা, বলিয়া দুইবার ডাকিলেন—সেই শব্দে আমার অন্তর কেমন করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যত কিছু সঙ্কোচ সব কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে আমি শুরু করিলাম: আপনি যে কুলকুণ্ডলিনী জাগার কথা কাল বলেছিলেন –

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ পর বলিলেন: মা যে ঘুমিয়ে আছেন ঐ মূলাধারে, তাঁকে জাগাতে হবে নাই? সে না জাগলে কে মুক্তি দিবে —কার সাধ্য?

আমি: আপনি আমাকে একটু অনুগ্রহ করুন, খুলে না বললে আমি কি করে বুঝবো বলুন,—

তিনি: ক্যানে আমি তোকে ও গুহ্য কথা বোলতে যাবো, তুই কি দীক্ষা নিবি, না তন্ত্রমতে সাধন করবি, যে জানতে চাস।

আমি: ঐ সকল গুহ্যতত্ত্ব আমার জানবার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু আপনি যদি আমায় অপাত্র মনে ক'রে না বলেন, তবে আর কি করতে পারি। আপনার কাছেই পাবো এই ভরসায় অত দূর থেকে এসেছি। যদি আপনি আমায় বুঝিয়ে দেন তবে ক্ষতি কি হবে আমি বুঝতে পারি না।

তিনি: যে সাধন ভজন করবে না, কেবল হেথা-সেথা বেড়াবে, আর পাঁচজনের কাছে পাঁচটা শুন্‌বে তার কাছে এ সব বল্‌লে নষ্ট হবে যে,—

আমি: আপনি বোলতে চান কুলকুণ্ডলিনী কেবল তান্ত্রিকদেরই শক্তি, অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধক যাঁরা, তাদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নেই, না তান্ত্রিক-মতে সাধন না করলে তাদের ও শক্তি জাগবে না কখনও?

তিনি: দেখ তু চালাক বটে,—খুব বুদ্ধির কথা বোলেছিস। কুণ্ডলিনী সবারই আছে, সবারই জাগবে, তবে সাধন করলে, আর সময় হোলে। কুণ্ডলিনী না জাগলে কারো কিছুই হবে নাই। এক স্থানে, ধীর হয়ে সাধন করলে তবে জাগবে। আবার সাধন না করলে ঘুমাবেক।

আমি: তাই ত আমার জানতে ইচ্ছা, কেমন ব্যাপারটি, এসব আপনার কাছে শুনতেই এসেছি। শুনলে উপকার ছাড়া অপকার ত হবে না।

তিনি: তবে কিছু গাঁজা নিয়ে আয়। অমনি শুন্‌বি নাকি?

আমি: আমার কাছে কিছু পয়সা আছে, গাঁজা ত নাই। বলিয়া চার আনা বাহির করিয়া সেবকের হাতে দিলাম। তখন তিনি বলিলেন: সরে আমার আরো কাছে আয়। যেই তিনি ঐ কথাটি বলিলেন, আমি তাঁহার

মুখের দিকে চাহিলাম। চক্ষু তাঁহার করুণায় পূর্ণ এবং অমানুষিক জ্যোতিতে উজ্জ্বল, যেন অনন্ত রহস্যের আধার, এমনই বোধ হইল, আর তাহা দেখিয়া বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, আমি যেন কি রকম হইয়া গেলাম। সাহস বা শক্তি যেন সবই লোপ পাইল।

কাছে গেলে তিনি সস্নেহে আমার পিঠে হাত দিলেন, বলিলেন: চাদর খোল্, কাপড়ের কসি আল্‌গা করে দে। সেই সব করা হইলে তিনি হাত নামাইয়া একেবারে মেরুদণ্ডের শেষ যেখানে, সেখানে আনিলেন: দেখ্, আমি বলে যাই, তুই দেখে নে,—তা হোলে সব বুঝতে পারবি।

তাঁহার স্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চে, হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। দৃষ্টি সহজেই অন্তর্ম্মুখী হইয়া গেল,—আমি স্থির।

শিরদাঁড়ার নীচে যেখানে শেষ গাঁট সেই অস্থির উপর একটি আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া তিনি বলিতেছেন: ওরে তোর যে সে কাজ হয়ে গেছে,—তবে শালা তুই আমার সঙ্গে চালাকি করছিস বটে? শুনিয়া একটা ভয়ের ভাব আসিল, তারপর আনন্দ হইল। আমি বলিলাম: আপনি কি বোলছেন, সত্য বলছি আমি কিছুই জানি না, বিশ্বাস করুন।

তিনি: দেখ, তুই জানিস আর নাই জানিস, হয়ত জানতে নাও পারিস, এখানে আমি দেখছি যে তোর পাক খুলেছে। এই এখানে কুণ্ডলিনী-শক্তি সাড়ে তিন পাক দেওয়া সকলকারই থাকে। মায়ের যে সংসার-গণ্ডী এইখানেই, —এই মায়া-মমতা, অহঙ্কারের এমন কি যত কিছু ভোগ আর স্বার্থ এইখানেই তার প্রথম গাঁট। খুব বড় রকম গাঁট, এটা শক্ত করে বাঁধা আছে। যাদের খোলে—এই ছোট্ট সংসার-গণ্ডীতে আর তারা সুখ পায় না। ছাড়িয়ে যাবার জন্যে যখন ছট্‌ফট করে তখন গুরু বা সৎপুরুষের আশ্রয় পেলে এইখানকার গাঁট খুলতে থাকে। এখানকার পাক খুললে প্রথম লক্ষণ তার এই দেখা যায় তার ভগবানে ভক্তি হয়, এ ছোট্ট সংসার থেকে মা জগদম্বার বিবাট সংসারে প্রবেশ করতে প্রবৃত্তি হয়। আর তার প্রকৃতি পাগলের মত সেদিকে ছুটতে থাকে। সংসারের ছোটখাটো কোন জিনিসেই আর কিছুমাত্র সুখ থাকে না। এমন কি মাগছেলে, ইন্দ্রিয়-সুখ পর্য্যাপ্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই সময় বুঝতে হবে যে পাক খুলে সোজা হয়েছে। আর সোজা হলেই তার মুখটা উপরের দিকে ফিরে যায়; তখন উপর-মুখো চলতে থাকে।

এই যে শিরদাঁড়ার সব নীচের জায়গা, এর নাম মূলাধার-চক্র—এইখানেই

গাঁট, ঐ গাঁট খুলতে বড় গোল—ওটা খুললেই কুণ্ডলিনী আর কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে না, সোজা হয়ে উপরের দিকে যেতে থাকে। মা, মা, তারা—

বাবা একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন: তোর গুরুসঙ্গ কতদিন হয়েছে রে? আমি বলিলাম: প্রায় ছ বছর হোলো। শুনিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: কি রকম অবস্থায় হোলো খুলে বল্ আমাকে।

আমি সব বলিলাম: ভগবান রামকৃষ্ণের কথাই প্রথম—তিনিই আমার জীবনে সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণ, প্রথম গুরু, তাঁকে স্বপ্ন দেখা, কথা শুনা; তারপরে ঘরে কিছুই ভাল না লাগা, জীবন্ত গুরু কোথায় পাবো বলিয়া নানা স্থানে সাধু-দর্শন—শেষে কলিকাতায় স্বামী পরমানন্দের সাক্ষাৎ, তাঁর আকর্ষণ, তারপর ক্রমে ক্রমে দীক্ষা ইত্যাদি।* সব শুনিয়া তিনি বলিলেন: দেখছি ঐ সময়েই তোর এটা হয়েছে,—এখন ত উর্দ্ধগতিই দেখছি—দেখিস সাধন যেন ছাড়িস না বাবা, তা হোলে আবার ঘুমাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, আপনারা বলেন যে তান্ত্রিক সাধন-প্রকরণের মধ্যে দিয়ে না গেলে কুণ্ডলিনী-শক্তি নাকি কারো জাগে না। একথা কি সত্যি? অন্য কোন ধর্ম্মের সাধনে তা হবে না?

তিনি: একথা তোকে কে বোলেছে - যত শালা অপোগণ্ডের কথা। তোর খিদে যদি পায় তখন ভাত খেলে তোর যেমন পেট ভরবে, ডাল-রুটি খেলে কি তার চেয়ে কম পেট ভরবে? আসল কথা যার যা জোটে তার তাই খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করতে হয় ত! এখানে কত রকমের মানুষ, কত রকমের খাওয়া, যে বলে ভাত ছাড়া আর কিছুতেই পেট ভরবে না সে নিশ্চয়ই গেঁও মনিষ —ভাত ছাড়া আর কিছু খাওয়ার ধারণা নাই। তারা মা ত এই সব ছিষ্টি করেছে—যত ধর্ম্ম সব ত তারই ছিষ্টি। যার দেশে যে রকম খাওয়া চলিত সে তাই খাবে ত, ধর্ম্মও ত সেই রকম?

আমি বলিলাম: রামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথা বোলতেন, এমন সহজ সত্য সুমুখে থাকতে তবু ধর্ম্ম সাধন নিয়ে এত লাঠালাঠি আমাদের এ দেশে দেখা যায়।

তিনি বলিলেন: এক রাজার রাজত্ব,—তার মন্ত্রী আছে, লেঠেল সেপাই আছে, সেনাপতি আছে, গোমস্তা, চাকরবাকর, সংসারের কত সবই আছে। আবার গুরু-পুরুত ঠাকুর-বামনও আছে। যে যা কাজ করে তার প্রকৃতি, বুদ্ধি

* প্রথম কথা তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ।

সেই রকমই হয়ে থাকে। যারা লেঠেল—তারা লাঠিবাজিই বোঝে ভাল, তা ধর্ম্ম নিয়েই হোক বা ঘরের মাগ, ছেলে, পাড়াপড়শী নিয়েই হোক,—ওই রকমই তাদের বুদ্ধি।

ঠিক যেন রামকৃষ্ণের কথাই শুনিতেছি। বলিলাম: এখন, তারপর বলুন।

তিনি বলিলেন: কুণ্ডলিনী জাগেন মানে মানুষের মধ্যে যত ছোট ছোট হীনভাব আছে, মন সে-সব ছেড়ে বড়র দিকে লক্ষ্য করে। করো যোগযাগ, করো বিদ্যা, করো ধর্ম্ম, করো ভগবান,—করো বড় বড় কর্ম্ম যাতে অনেক মানুষের ভাল হয়, ঐ সব দিকে প্রবৃত্তি যায়। জীবের মধ্যে কুণ্ডলিনী জাগার প্রথম লক্ষণই হোলো যে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাকে হীন, কষ্টকর, ঘেন্নার জিনিস বোলে মনে হয়। সে কিছুতেই আর সে অবস্থায় থাকতে চায় না, পারেও না; বিষম ছট্‌ফটানি আসে—বেরিয়ে যাবার জন্যে।

আমি: তারপর?

তিনি: তারপর, এই যে মেরুদণ্ড,—এর মাঝ দিয়ে পথ আছে বরাবর মাথার ভিতর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত। কিন্তু সে-পথে কি ঐ শক্তি নাড়ী ধরে একেবারেই যাবে? তা যাবে না, গাঁট খুলে যাবার পরও আর একটা চক্র আছে, স্বাধিষ্ঠান চক্র বলে তাকে—সেইখানে ঠেকে যায়।

তিনি তাঁর স্পর্শ দিয়া স্থানটি দেখাইলেন, বলিলেন: এখানে ঠেকে গেলে সাধন চাই পেরিয়ে যেতে। যার যে-পথ সেই পথে এগিয়ে যেতে চেষ্টা লাগে না? বিনা চেষ্টায় কি বস্তু লাভ হয়? যারা যোগ-ধ্যান নিয়ে থাকে তারা ঐখানে একটু কঠিন তপস্যা করে। তান্ত্রিকদের কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে, গুরু দেখিয়ে দেন, তাই করলে চক্র পেরিয়ে যায়। এই দেখ এইখানে মূলাধার আর ঠিক তার উপর এই স্বাধিষ্ঠান।

আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, আর শরীরের মধ্যে অপূর্ব্ব এক ভাবের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমি: যারা তন্ত্রমতে সাধন করে না?

তিনি: তাদের কথা তারাই জানে। তাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে যে চেষ্টা—তাই ত সাধন। সব ধর্ম্মেই এই ক্রম আছে, একটার পর একটা পেরিয়ে যেতে হয়,—না হোলে একেবারে হুড়মুড় করে কি যাবার যো আছে! ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে যেতে হবে।

আমি: তারপর?

তিনি : তারপর মণিপুর চক্র বোলে আর একটি গাঁট আছে। নাভির বিপরীত দিকে মেরুদণ্ড যেথানে, এই দেখ্ হেথায বলিয়া, সেখানে স্পর্শ করিয়া দেখাইলেন এটি পার হোলে তখন কাজ সহজ হয। নূতন নূতন শক্তি তার মধ্যে জাগে আব তখন মনেব আনন্দে সাধক আপন পথে এগিয়ে চলতে থাকে। এই মণিপুর অবধিই যা।কছু স্থূল তুচ্ছ ভোগের বাধা থাকে। এই মণিপুর চক্র পর্য্যন্ত মানুষের যত ছোট ছোট ভোগ আব কামনাব ভাব-গুলির প্রভাব প্রবল থাকে, কিন্তু যাব লক্ষ্য বড আছে, মনের জোর আছে তাকে আর ওদিকে টেনে বাখতে পাবে না তবে খুব সহজেও একে পেবিয়ে যাবার যো নাই। যাবা অসাধারণ মানুষ, খুব শক্তিমান, তারা কাটিযে যায়। যাদের মনের জোব কম তারা এই তিনটির মধ্যে পাক খায়, -মোটের উপর লক্ষ্য যার স্থির নয় -মন উন্নত হয় নি, তাব পক্ষে এ চক্র ছাডিয়ে উঠা কষ্টকব। এর উপরে না উঠলে কেউ মানুষ হোতে পারে না,—তন্ত্রমতে এর উপরে উঠলে তবে বীর সাধক হয়, না হোলে পশু। পশুভাব যত কিছু তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ এই তিন চক্রেব মধ্যে বাঁধা থাকে।

আমি : এই তিনটি হোলো কঠিন, পবমহংসদেবেব কথাতেও আছে। তিনি বলেছেন গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি, সাধাবণ মানুষেব মন এই তিন চক্রের ভিতর ঘোরাফেরা করে, আপনাব সঙ্গে তাঁর কথার মিল—

তিনি বলিলেন : হাঁ, হাঁ, তিনি মাকে পেযেছেন, সিদ্ধ মনিষ, তিনি এ সব ত জানেন। যে জানে সে বলবে নি ক্যানে!

আমি বলিলাম : তা আমি বলি নি, আপনি মেরুদণ্ডের দিকে ঐ স্থানগুলি দেখিয়ে দিলেন আর তিনি বলেছেন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—তাই বলছি।

তিনি : কুণ্ডলিনী শক্তির আনাগোনার পথ হোলো ঐ মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে—তিনি হয়ত সাধারণ মনিষের কাছে লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি বলেই বলেছেন। আসলে গুহ্য বা লিঙ্গ বা নাভি দিয়ে নাড়ীর পথ নয়, কি রকম জানিস, এই দেখ্ হেথা। তু সহজ মনিষ নয়, শালা চালাকি করে সব জেনে লিছিস। বলিয়া স্পর্শ করিলেন—আমি অপূর্ব্ব সুখময় অনুভূতির সঙ্গে পর পর গাঁট অতিক্রম করিতে লাগিলাম।

এইবার বাবা সদয় হইয়া কুণ্ডলিনী তত্ত্ব দেখাইলেন। আর এখন প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োজন নাই জানিয়া সরলভাবেই বলিতেছি। আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে আগাগোড়া একটি অতি সূক্ষ্ম পথ আছে। সেই পথই প্রাণের পথ বা

নাড়ী, আমাদের প্রাণশক্তি এই পথে নিরন্তর ঊর্দ্ধ-অধঃ গতাগতি করেন। অতীব সূক্ষ্ম ইহার অস্তিত্ব।

ঐ প্রাণ বায়ু নয়, বা বায়ুর সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে মেরুপথে সাধারণত প্রাণের গতাগতি। গতাগতি অর্থে একবার উপর হইতে নীচে মূলাধার আবার নীচে মূলাধার হইতে শত উপরে সহস্রারে যাতায়াত চলিতেছে, ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। চক্ষের পলক পড়িতে যতটা সময় আমরা হিসাব করিতে পারি, সেই সময়ের মধ্যে আমাদের সুস্থ শরীরে প্রাণের যে কতবার ঊর্দ্ধ-অধঃ গতাগতি হয় তাহার ধারণা করিতে পারি না। ঐরূপ ক্রিয়ারত প্রাণশক্তিকে ধরিয়া যোগমার্গে প্রবেশ করিতে হয়। তন্ত্রে ঐ প্রাণশক্তিকে মা আর ঊর্দ্ধ-অধঃ গতি-ক্রিয়াকে নৃত্য বলা হইয়াছে অর্থাৎ মা নাচিতেছেন, ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই। বিজ্ঞানের ভাষায়, প্রাণের স্পন্দন ইহাকেই বলে।

এখন ঐ ক্রমে প্রাণশক্তিকে ধরিয়া অগ্রসর হইলে সর্ব্বনিম্নে মূলাধার, যেখানে মেরুদণ্ডের একেবারে শেষ প্রান্ত, ঠিক তাহার উপর একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ আছে দেখা যায়, তাহাকেই যোগশাস্ত্রে মূলাধার চক্র বলে। নিরন্তর স্পন্দিত প্রাণশক্তি সেই পথে বাহির হইয়া গুহ্যদেশে ক্রিয়া করেন। ঐরূপে মূলাধারের কিছু উপরে লিঙ্গমূলে মেরুপথের মধ্যে আর একটি দ্বার বা অতি সূক্ষ্ম পথ প্রাণশক্তি সেই পথে নিঃসৃত হইয়া ঐ অংশে ক্রিয়া করেন, তাহার তান্ত্রিক নাম স্বাধিষ্ঠান-চক্র। ঠিক নাভির সোজা মেরুদণ্ডের মাঝে ঐরূপ আবার একটি সূক্ষ্ম পথ, তাহাকে মণিপুর-চক্র বলে। তাহার উপর হৃদপিণ্ডের সমসূত্রে মেরুপথে অপর সূক্ষ্ম দ্বার, যাহা হইতে প্রাণশক্তি ঐস্থানে অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদয়ে ক্রিয়া করেন। তাহার তান্ত্রিক নাম অনাহত-চক্র, যেহেতু আমাদের ধুক্‌-ধুকি বা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া শব্দময় এবং মৃত্যু অথবা নির্ব্বিকল্প সমাধি ব্যতীত কথনও সে শব্দ-ধ্বনি বন্ধ হয় না। তাহার উপরে, কণ্ঠের সমসূত্রে যে সূক্ষ্ম পথ প্রাণশক্তি সেই পথে নির্গত হইয়া কণ্ঠে ক্রিয়া করেন,—তাহাকে বিশুদ্ধাক্ষ্য-চক্র বলে। তাহার উপর শেষ চক্র—যেখানে মেরুদণ্ড আরম্ভ, চলিত কথায় সেই স্থান ভ্রূ দুইটির মধ্যে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। অর্থাৎ মেরুদণ্ডের আরম্ভ যেখানে সেই স্থান, অতীব সূক্ষ্ম ভাবের সৃষ্টি, যেখান হইতে প্রাণক্রিয়ার আরম্ভ, তাহার নাম আজ্ঞা বা প্রজ্ঞা-চক্র। তাহার উপর আর কোন চক্র বা কর্ম্মকেন্দ্র নাই। উপরে অনন্ত-ব্যোম, দেহাতিরিক্ত অখণ্ড

চৈতন্য সত্তা,—সেই পরমাত্মার রাজ্য,—তাহাকে সহস্রার বলা হইয়াছে। মেরু মধ্যগত সূক্ষ্মতম প্রাণপথের কর্ম্মকেন্দ্ররূপে যে ছয়টি চক্র উহা ভেদ হইলে আত্মা পরমাত্মায় অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবে মিলিত হন, সুতরাং সৃষ্টির পারে চলিয়া যান।

এখনও এই যে মেরুদণ্ডের আরম্ভ স্থানে প্রথম চক্র যাহাকে প্রজ্ঞা চক্র বলে,—যেস্থান হইতে প্রাণশক্তির ক্রিয়া শেষপ্রান্ত মূলাধার পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে, ঐ প্রজ্ঞা-চক্রই প্রাণের আরম্ভ এবং লয়ের স্থান। ঐ স্থান নাড়ীচক্রের মধ্যে প্রধান, মহান এবং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ স্থান, যেহেতু ধারণা ধ্যান তত্ত্বনির্ণয়, উচ্চ উচ্চ অনুভূতি, প্রকাশ, আবিষ্কার, মোট কথা মনুষ্যজীবনের মন, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক প্রেরণা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অমূল্য সম্পদ যাহা কিছু ঐখানেই লাভ হয়। ঐ স্থানে উন্নত জীবের তৃতীয় নয়ন প্রকাশিত হয়।

এখন গুরুকৃপায় বুঝা যাইতেছে প্রাণের স্বাভাবিক রূপটি যাহা, অতি সূক্ষ্ম ঊর্দ্ধ-অধঃ স্পন্দনময় আর, আশীর্ষ মূলাধারাবধি স্পন্দনের অবকাশে মেরুপথে সংযুক্ত দেহযন্ত্রের ছয়টি কেন্দ্র হইতে অবিরাম নিঃসৃত প্রাণশক্তি যাহা এই স্থূল শরীরের সর্ব্বাংশ ক্রিয়াশীল রাখিয়াছে। আরও দেখিতেছি, প্রাণের দ্বিবিধ ক্রিয়া—এক হইল—স্থূল দেহাদি চালনা, অপর চিন্তা অনুভূতি প্রভৃতি মন বুদ্ধির ক্রিয়া—এই প্রাণ দুই ভাবেই অবিরাম ক্রিয়াশীল। ছয়টি কেন্দ্রপথে প্রবাহিত হইয়া যেমন দেহের প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে—সেই প্রাণ আবার প্রজ্ঞাচক্রে স্থির হইয়া অন্তঃকরণের যাবতীয় ক্রিয়াও সম্পন্ন করিতেছে—এই সকল কার্য্য যুগপৎ চলিতেছে—বিরাম বা বিচ্ছেদ নাই। এইবার কুলকুণ্ডলিনীর সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুভূতি এবং বিচারের সময় আসিয়াছে।

বিবর্ত্তনবাদটিকে মনুষ্য-জীবনের মধ্যে আনিয়া ধরিতে হইবে। এই বিশাল জগৎ সৃষ্টির মধ্যে প্রাণী-জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি হইল মানুষ। যেহেতু দেখা যায় মানুষই সকল ইতর জীবের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। এই যে মানুষ বংশ, নানা ভাবের বৈচিত্র্য লইয়া জগতের সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হইয়াছে,—তন্ত্রশাস্ত্রে এই মানবের পরিণতি অনুসারে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা আছে। তাহা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ প্রথমে পশু, তারপর মানুষ বা বীর—তারপর দিব্য অর্থাৎ দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশু হইতে মানব-শরীরে বিবর্ত্তনকালে সেই জীবের উন্নত প্রাণশক্তির কতকাংশ

আত্মারূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়—যাহা ক্রমোন্নতির ফলে (অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর ভোগ কর্ম্ম জ্ঞানাদির ফলে) জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হইয়া শেষে পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। পশুভাবে মানবের প্রথম অবস্থায় জীব-প্রাণের উত্তমাংশ ঐ যে আত্মা, তখন সুপ্তভাবে অর্থাৎ অবিকশিত অবস্থায় মূলাধারে বর্ত্তমান থাকে। মূলাধার বলিতে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম নাড়ী বা প্রাণপথের শেষ প্রান্তে অবস্থিত প্রধান কেন্দ্র বা চক্র বোঝায়। প্রাণের মধ্যস্থতায় ঐ স্থান হইতে জীবাত্মার প্রথম মানব-জীবনের কর্ম্ম আরম্ভ হইয়া থাকে এবং ঐ কেন্দ্রকে মূল করিয়া জীবাত্মার সর্ব্ববিধ গতি নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া এবং প্রাণশক্তিরূপে আত্মার আধাররূপে ঐখানে অবস্থিতি বলিয়া ঐ কেন্দ্র বা চক্রকে তন্ত্রশাস্ত্রে মূলাধার বলা হইয়া থাকে।

যেমন কালের মধ্য দিয়া জীব পশু হইতে মানব হয় তেমনই কালের মধ্য দিয়া ঐ আধারভূত প্রাণশক্তির মূল যে আত্মা, মনুষ্যত্বে বিকশিত হইবার প্রতীক্ষায় থাকেন, যেমন গর্ভস্থ শিশু মায়ের উদরে বাড়িতে থাকে ঠিক তেমনি। তখন আত্মার অবিকশিত অর্থাৎ ঠিক গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা, সেইজন্য তন্ত্রের মধ্যে এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া সুপ্ত বলা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন যে স্থূল-ভাবাপন্ন পশু-প্রকৃতির প্রথম স্তরের মানুষের ঐ সুপ্ত আত্মা প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাড়ে তিন পাক দিয়া কুণ্ডলাকারে সাপের মত মূলাধারে অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকেন। এই ভাবে ভোগ ও কর্ম্মদ্বারা জন্ম-জন্মান্তরে জ্ঞান বা চৈতন্য শক্তির সহায়তায় তাঁহার সম্যক্ পুষ্টি হয় তখন সেই আত্মা বিকশিত হন। ইহাতেই বুঝা যায় যে জীবাত্মা স্বরূপে প্রতিভাত হইতে ক্রমবিকাশের অবস্থায় কতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন, পরে উপযুক্তরূপে শক্তিমান হইলে তবে পূর্ণ বিকাশের অবস্থা প্রাপ্ত হন। কালের মধ্যে শক্তিতে পটু হইয়া শেষে কালাতীত হইয়া যায়। প্রকৃতিই এ শক্তি যোগাইয়া তাঁহার বিকাশের সহায়তা করিয়া থাকেন, সেইজন্য এক সম্পর্কে শক্তিরূপা প্রকৃতি আত্মার জননী, পূর্ণ বিকাশের অবস্থায় তিনি হন প্রিয়তমা। কুলকুণ্ডলিনা জাগরণের ইহাই সার কথা। মানুষের দেহে আত্মা বুদ্ধি ঐ পর্য্যন্ত থাকে যে পর্যন্ত কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিত না হন—এটুকুও জানিয়া রাখা ভাল।

যত কিছু শিবশক্তি-রহস্য রূপকের আকারে ইহার মধ্যে আছে যাহা সহজ সত্যকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের তাহাতে প্রয়োজন কিনা সুধীজনে ভাবিয়া দেখিবেন।

ক্ষ্যাপা বাবা বলিলেন: তু এখন যা, হজম করগা—

আমি বলিলাম: ষট্চক্র মধ্যে আর আর ব্যাপার যে বাকি,—বাবা,—

তিনি:—তু এখন উঠে যা ত, কাল আসবি আবার, যা। দক্ষিণা চাই,—নিয়ে আসবি দক্ষিণা, অমনি হবে না এ সব অমনি অমনি হবার নয়, জানবি।

৪

দুই দিন আর ক্ষ্যাপার কাছে আমলই পাইলাম না। নানা প্রকারের মানুষ তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে,—আর সে সমাজে যে সব কথা হয়, পরস্পর যে ভাবে সম্ভাষণ চলে তাহাতে সাধুসঙ্গের আসা ক্ষীণ হইয়া যায়। বাবার কোন দিকে লক্ষ্যই নাই, আপন মনে, আপন ভাবেই সমাহিত:—কেবল মাঝে মাঝে, মা, মা বলিয়া ডাকেন, আর যত গ্রাম্য কথার প্রভাব ঝাড়িয়া ফেলেন।

বাবার কিছু টাকা ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বের কথা,—এই টাকার যে ঠিক পরিমাণ কত তা নির্ণয় করিতে পারি নাই,—তবে, ওখানকার কোন কোন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম তিন-চার হাজার টাকা হইবে,—টাকাটার কথা, যিনি তাঁর বিশেষ বিশ্বাসভাজন—অমুক পাণ্ডা ছাড়া সম্ভবত আর কেহ জানিত না। কারণ সেই ব্যক্তি তখন বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভক্ত বা সেবক ছিল। তারপর সেই টাকা বাবা তাঁহার আশ্রমের একস্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। স্থান বাবা ব্যতীত আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই ধূর্ত্ত সেবক পাণ্ডা কোনপ্রকারে তাহা জানিতে পারে। টাকা লোভের বস্তু, বিশেষত সংসারী মানুষের পক্ষে। ইহার লোভ সামলানো খুবই শক্ত। বেচারা উহার আকর্ষণ এড়াইতে পারে নাই। পাণ্ডা ঠাকুর খুব সাহসী লোক বলিতে হইবে যেহেতু তাহার এই কাজটি একেবারেই সেখানকার লোকের কল্পনার অতীত।

একদিন সকালের দিকে ক্ষ্যাপা বাবা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন,—সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমার টাকাটা কোথায় গেল! সে দিন আবার অমুক পাণ্ডা অনুপস্থিত, বাবা ঠিক বুঝিতে পারিলেন, এ কাজ তারই,—অন্য কাহারও এতটা সাহস হইবার নয়। যখন অমুক পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হইল, বাবা তাহাকে বেশ শান্তভাবে, পিঠে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন: টাকাটা বার কোরে দে, তোর ভালো হবে। কিন্তু যে ভালোটা সম্প্রতি হস্তগত, তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য রকমের ভালোর গুরুত্ব

বুঝা সকলের ধাতে সয় না, বিশেষত তার মত এক পাকা সংসারী মানুষের। কাজেই সে ব্যক্তি তখন, বাবার টাকা হারাইয়াছে শুনিয়া একেবারে যেন আকাশ হইতেই পড়িল। তখন বাবার বুঝি তাহাকে একটু জব্দ করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি থানা পুলিস করিলেন। শেষে আদালতেও গড়াইল। তারপর যখন, তাঁহার কাহাকে সন্দেহ হয় জিজ্ঞাসা করা হইল, বিচারকের কাছে বাবা নিঃসঙ্কোচে তখন সেই অমুকের নাম বলিয়া শেষে জানাইলেন—সে ব্যতীত আর কেহ এ কাজ করিতে পারে না, কারণ কেবল সে-ই এটা জানিত আর কেহই ইহার কথা জানে না।

তারপর যখন সে ব্যক্তি দেখিল আর রক্ষা নাই, তখন যা হইয়া থাকে,—বাবার পায়ে জড়াইয়া কাঁদা-কাটা করিল।—বাবাও জল হইয়া গেলেন, বলিলেন: আগে বলিস নাই কেনে? বাবা শেষে তাহাকে এই দণ্ডদান করিলেন যে তাঁহার আশ্রমে সে আর যেন না আসে। দিন কতক দণ্ড ভোগের পরে সকলে দেখিতে পাইল তাহার হাঁপানির অসুখ হইয়াছে—আর সে বাবার আশ্রমের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু আবার ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিলেও তাহার কিছু সুবিধা হইল না, অসুখও সারিল না।

আমি যখন যাই তাহাকে প্রত্যহই বাবার দরবারে হাজির দেখিতাম। বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বাবার সঙ্গে কথা কহিতেও দেখিতাম কিন্তু বাবার তেমন স্নেহের প্রকাশ দেখি নাই।

সেই অবধি বাবা, কাহারো নিকট কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, ঐ অর্থ যে অনর্থ, দেখিস না?

যে ব্যক্তির আছে এই সকল শুনিলাম সে বলিল: আমি একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি সাধু লোক, মার কৃপায় কিছুরই অভাব নাই—আপনি কেন টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন? তাহাতে বাবা বলিলেন: ও সব ঐ বেটি মায়েরই ঘটাঘটি জানিস না,—টাকাটা আপনিই এলো, ভাবলাম এখন রাখি যখন কারো কাজে লাগিবে তখন দেওয়া যাবে। তা হোলো ভালো, যার কাজে লাগলো সে মনিষটাকেও চেনা গেল। মায়ের টাকা, তিনিই ওটার ব্যবস্থা করলেন যেঁয়ে।

এখন যাহা বলিতেছিলাম—

দুইটি দিন কাটাইয়া বাবা তৃতীয় দিনে সদয় হইলেন, আমিও কাছ ঘেঁষিয়া বসিলাম। আজ এখন আমি তাঁকে ধরিয়া বসিলাম,—আপনি খুলে বলুন যে

সকলকারই কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগে কিনা ; বিনা সাধনে জাগে কিম্বা এই জাগার জন্য বিশেষ সাধনের প্রয়োজন হয় ?

বাবা বলিলেন : যারা তান্ত্রিক, এই ধর্ম্ম আশ্রয় করেছে, দীক্ষা পেয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথম সাধনও হোলো কুণ্ডলিনী জাগা নিয়ে। সবার গোড়াও বটে সবার শেষেও বটে।

আমি : যারা অন্য ধর্ম্মের লোক,—

তিনি : তাদের ধর্ম্মের মধ্যেও এই কুণ্ডলিনী জাগাবার সাধন আছে, হয়ত তার চেহারা এ৲টু আলাদা, কিন্তু সব কিছু সাধনের গোড়ার কথাই হোলো ঐ কুণ্ডলিনী, ও না জাগলে কিছুই হবে নাই।

আসল কথা এই যে, তন্ত্রশাস্ত্রে যে শক্তি সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ গতানুগতিক ভাবের ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে প্রেরণা জোগাইয়া উচ্চতর জীবন-পথে পরিচালিত করে তাহাই কুণ্ডলিনী শক্তি। সে শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে প্রথমে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, পরে দেশ-কাল ও পাত্রের মধ্য দিয়া বিকশিত হয়। ক্যাপা বাবা বলেন যে, পুরুষের পক্ষে নারী আর যৌবন এই দুইটির সঙ্গে ঐ শক্তি জাগরণের প্রধান সম্বন্ধ। এই জন্য তন্ত্রোক্ত বামমার্গের সাধনে ঐ দুইটিই প্রধান। অনেকে বলেন, এই বামা ক্ষ্যাপা দক্ষিণমার্গের সাধক। এখন তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু প্রথম হইতে বহুকাল ইনি বামাচারী অর্থাৎ ভৈরবী লইয়া সাধন করিয়াছেন, এখানকার অনেকের কাছেই শুনিয়াছি। নগেন পাণ্ডা বাবার সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে অনেক কাল কাটাইয়াছিলেন—তাঁহার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহা যথাসময়ে বলিব।

সাধারণত তন্ত্রের মধ্যে সাধনের দুইটি পথ,—বামমার্গ ও দক্ষিণমার্গ। এই সাধন, দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালীর সঙ্গে সহজ নিয়মেই বাঁধা। যখন তন্ত্রধর্ম এদেশে প্রবল ছিল তখন ঐ সকল সহজ প্রণালীর সাধন কতকটা সম্ভব হইত এখন কিন্তু সম্ভব নহে। এখনকার সমাজে সাধারণ মানুষের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও ভুল হয় না। যেভাবে এখনকার শিক্ষা-দীক্ষা চলিতেছে তাহাতে সাধারণ দেশবাসী-জনের ওভাবে বামমার্গে সাধন চলিতেই পারে না। কারণ সমাজের যে অবস্থায় ইহা আচরণীয়—সে অবস্থায় সাধারণভাবে প্রত্যেক নরনারীর নিজ নিজ জীবন-পথ নির্ব্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন। কোনও এক বিশিষ্ট ধারায় জীবনযাপন প্রণালীর প্রভাব ইহার মধ্যে থাকিলে সাধনে

সহজেই বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। কারণ আসল তন্ত্রে, স্ত্রী-পুরুষের যে সম্বন্ধ তাহা হিন্দু বিধি-নিয়মের বহির্ভূত। সেই কারণে আরও হিন্দুপ্রধান ভারতে তন্ত্রধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দু-ধর্ম্মের একটা আপস হইতে পারিয়াছিল, পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিকাশ ঘটে নাই। সেকালে যাহা কিছু তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছিল—তাহা হিন্দু সমাজের বাহিরেই ঘটিয়াছিল। যাহা হউক কথা এই যে,—বামার কথা শুনিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের ব্যাপারেই এখন আমার ধারণার মধ্যে যাহা স্পষ্ট হইল তাহা এই যে,–যখন কারো জীবন আর কিছুতেই গতানুগতিকভাবে বদ্ধ থাকিতে চায় না—অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি ও স্থূল স্বার্থময় ভোগের মধ্যে তৃপ্তি পায় না তখনই তার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হন। জাগরণের লক্ষণই হইল গতানুতিকতার বিরুদ্ধে মনের ক্ষেত্রে প্রবল আলোড়ন—একথা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। এখন, সকল জাতির, সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অন্তরক্ষেত্রে এই ব্যাপার ঘটে তাহা জানা গেল। এই নিয়মেই মানুষ পশুভাবের প্রভাব ছাড়াইয়া—মনোবুদ্ধি-প্রধান হইয়া ক্রমে উচ্চ উচ্চ ভাবানুরূপ কর্ম্মে অগ্রসর হয়। এইরূপে সে গুরুভাবে পৌঁছায় এবং বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ইহাই জগদম্বার সনাতন নিয়ম,—এই নিয়মের মধ্য দিয়া পার্থিব সকল জীবের গতিই নির্দ্দিষ্ট। তন্ত্রের কুণ্ডলিনী জাগরণ বৈজ্ঞানিক সত্য, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে মানুষ সমাজের অন্তরক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল—ব্যষ্টিতেও যেমন ইহার ব্যতিক্রম হয় না, সমষ্টিতেও তাই। তবে সমষ্টির কথা বহুদূর।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই কথা দুইটি ব্যাপারকে সহজ করিবার জন্য আমিই লাগাইয়াছি—বাবা ও-কথা দুইটি ব্যবহার করেন নাই। তিনি ভাবের মুখে বলিয়াছিলেন, একজন মনিষের যেমন কুণ্ডলিনী শক্তি জাগে তেমনি মানুষ-গোষ্ঠীর ভিতরও জাগে, তবে তখন সত্যযুগ আসে। ব্যাপারটি পরিষ্কার করিতেছি। বাবার কথা সাধারণ লোকে কিভাবে লইত তাহা আমি জানি না, কারণ সাধারণ লোকে তাঁহার মুখের কথা শুনিয়াই যে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে বা ধরিতে পারিবে তাহা আমার মনে হয় না। তাঁহার কথা প্রথমটা গ্রাম্য ভাষার সহজ সরল প্রকাশ বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু সেভাবে শুনিলে সাধারণে কেহই বোধ করি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর তাহা ছাড়া, তাঁহার কথার আক্ষরিক অনুসরণও খুব সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষত যখন কোন বিশেষ তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কন; যাহা তিনি প্রায়ই করেন

না। সেভাবে আমি (সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই) তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির করিয়াছিলাম—কদাচ কেহ এরূপ যোগাযোগ ঘটাইতে পারিয়াছেন। একথা তিনিই আমাকে কয়েকবার বলিয়াছিলেন। যাহা হউক এখন সমষ্টির কথা এই যে,—

মানুষ প্রত্যেকেই ভিন্ন প্রকৃতির—প্রত্যেক জনই আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজে কতকটা মিলে-মিশে থাকে তো! প্রত্যেকেরই একটি আলাদা শরীর, নাড়ী (সূক্ষ্ম শক্তি এবং প্রাণের যাতায়াতের পথকে তন্ত্রে নাড়ী বলে),—প্রাণশক্তি, বুদ্ধি, মন, আত্মা এইসব নিয়েই একজন মানুষ, তেমনি এই পৃথিবী জুড়ে একটি শরীর আছে আর সেই বিরাট শরীরেরও ঐসব নাড়ী, প্রাণ, মন বুদ্ধি, আত্মা আছে, আমরা জগতের জীবকোটি তার মধ্যেই আছি। সাধারণ মানুষ যারা পশুত্ব নিয়ে আছে তারা এর কিছুই জানেন না, যারা মানুষ বা বীর হয়েছে তারা আভাস মাত্র পায়, যারা দিব্যভাবে গিয়েছে তারা জানতে পারে, যারা একেবারে পাশমুক্ত হয়েছে তারাই প্রত্যক্ষ করে। এক সময় মায়ের ইচ্ছায় এখানকার মানুষগোষ্ঠীর ভিতর কুণ্ডলিনী জেগে ওঠেন, তখনই সত্যযুগের পালা পড়ে।

অর্থাৎ তখন এই হয় যে মানুষ সমাজে তুচ্ছ স্থূল ভোগাদির প্রভাব ছাড়াইয়া একটি বিরাট চৈতন্যের প্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখনই তাহাকে সত্যযুগের আবির্ভাব বলিতে হয়। যে যুগে মানবসমাজ আত্ম-তত্ত্বে অথবা ধর্ম্মের চরম অনুভূতিতে মুখ্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকে সেই ত সত্যযুগ! যে যুগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তপঃ, আচার সবই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দমুখী হইয়া গতিমান—সেই যুগই ত সত্যযুগ!

এখন কথা হইল, একজনের মধ্যে কি ভাবে, কোন্ অবস্থায় কুণ্ডলিনী জাগেন এই কথা লইয়া আজ অনেক কথা বলিলেন, তাহা বিশদ ভাবেই বলিতেছি। উত্তরে তিনি প্রথমে সাধারণ ভাবেই বলিয়াছিলেন যে, বিশেষ অধিকারী না হইলে কাহারও কুণ্ডলিনী শক্তি জাগে না, মূলাধারে ঘুমাইয়াই থাকে। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনায় বলিলেন,—সকলকার জীবনে একবার ঐ শক্তি জাগিয়া উঠে, কিন্তু আবার ঘুমাইয়া পড়ে। তখন কোন্ কোন্ অবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ শক্তি জাগে তাহাই ছিল প্রশ্ন। এখন ইহাও জানিয়া রাখা ভাল এ ব্যাপারে তথাকথিত বিদ্বান্-মূর্খে ভেদ নাই অর্থাৎ অর্থকরী বিদ্যার স্থান নাই।

তিনি বলেন,—মানুষের যখন যৌবন আসে, সহজ ভাবেই তখন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য প্রাণ ছট্‌ফট করে। তারপর যখন তাদের মিলন হয়, ভালবাসা সহজভাবেই তাদের প্রাণের মধ্যে বিকশিত হয়—নাম তার প্রেম, প্রণয় এইসব, তখন তাদের জীবনে যে আনন্দ তা হিসাব করবার জিনিস নয়—তখনই কুণ্ডলিনী জাগেন। এই গেল স্বাভাবিকভাবে জাগরণের কথা—তারপর কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর মত কেউ কেউ আবার অল্পবয়স থেকেই অর্থাৎ যৌবন আসবার পূর্ব্ব থেকেই ইন্দ্রিয়-সুখের আস্বাদ পাবার জন্যে লালায়, তারপর যৌবনের মধ্যে এসেও নানা উপায়ে লালসা মেটাবার চেষ্টা করে এমনও ত দেখা যায়,—তাদের কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটে না। তাদের চঞ্চল চিত্তের মধ্যে ইন্দ্রিয়সুখটুকু ছাড়া আর কিছুতেই লক্ষ্য থাকে না বলে তাদের অধোগতিই হয়ে পড়া স্বাভাবিক। যৌবন-বিকাশের সঙ্গে যাদের জাতীয়-সংস্কার অনুযায়ী সামাজিক প্রথায় বিবাহের মধ্যে দিয়ে মিলন ঘটে, তাদের জীবনের মধ্যে যে আনন্দ, যে সার্থকতা বা যে বস্তু লাভ হয়, সে জিনিস ঐ লম্পটদের ত হোতে পারেই না। তাদের হয় কি, বেশী দিন ইন্দ্রিয়-সুখকেই প্রবলভাবে ধরে থাকলে সামাজিক ন্যায়ধর্ম্ম না মেনে কেবল ঐ একটা জানোয়ারী সুখের আস্বাদন করতে করতে প্রতিক্রিয়ার আবর্ত্তে পড়ে যায়—যে সব লোকের যৌবনের শেষের দিকে একটা বৈরাগ্য আসে.—ঐ সময়েই কুণ্ডলিনী জেগে উঠেন।

আমি বললাম: যারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, যারা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকায় বললেন, তাদের ঐ অবস্থায় অনাচারের ফলে তাদের কুণ্ডলিনী শক্তি তখন কিভাবে কিরূপ অবস্থায় থাকেন?

আমার এই কূট প্রশ্নটি শুনিয়াই তিনি চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন: তাতে তোর কাজ কি রে শালা, ও-সব ব্যাজার কথা বলিস কেনে? ওতে তোর লাভ কি?

আমি তখন মিনতি করিয়াই বলিলাম: দেখুন, আমরা গোড়া থেকেই সকলে সাধুপ্রকৃতির মানুষ নয়, যৌবনের আগে স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু কিছু অন্যায় যে করি নি তা সাহস করে বলতে পারি না। আর এখনকার দিনে যে প্রকৃতির নিয়মেই আমাদের সকলকার যৌবনের পূর্ণ বিকাশ হয়ে প্রেমানন্দে জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনের যোগাযোগ ঘটছে তা নয়—সেই জন্যেই জানতে ইচ্ছা করে—

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: সত্য করে বল দিকি তোর কত বয়সে রসবোধ হয়েছিল ?

আমি বলিলাম: বোধ হয় নয়-দশ বছর বয়স থেকেই নারী-রূপের প্রভাব, দেখাশুনায় অনুভব করেছি—

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: তার আগে ?

আমি: তার আগে মা, মাসীমা, দিদিমা, ঠাকুরমাদের মুখে, রূপকথার গল্পে নানা-প্রকার বর্ণনায, নায়ক-নায়িকাদের মিলন-বিরহের ব্যাপারে বেশ একটা আকর্ষণ অনুভব করেছি মনে হয়। কোন কোন রূপবতী, দীপ্তিময়ী কিশোরীর রূপ, তাদের লাবণ্য মনকে আকর্ষণ করতো, তাতে মনেব মধ্যে একটা অস্ফুট বেদনা অনুভব করতাম—এসব কথা এখনো মনে আছে।

তিনি: আচ্ছা আরও আগে, কত ছোট বয়সের কথা মনে আছে বলতে পারিস ?

আমি: বোধ হয় যখন আমার বয়স ছু'বৎসর তখন আমার শরীরের উপর ভয়ানক একটা আঘাত লাগে--তখন থেকেই বোধ হয় আমার সব কথাই মনে আছে।

তিনি: দেখ, শিশুকাল থেকেই যে ছেলেমেয়েদেব মধ্যে ঐ রসানুভূতি জাগে, তাব বেশীর ভাগ কারণ মেযেদেব গাযেব গন্ধ, স্নেহবশে কোলে নিয়ে টেপাটেপি, চুমু খাওযা, বুকে নেওযা, নানারকমেব কাতুকুতু দেওযা ইত্যাদি। শিশু-ছেলে নিয়ে অসংযত যত কিছু আদর, আত্মীযা মেয়ে হলে ঘটে থাকে। আমাদেব বাঙ্গালার প্রত্যেক সংসারে বিশেষত অ-শিক্ষিত মূর্খ মেয়েদের মধ্যে শিশু-ছেলেকে নিযে এমন অনেক ভাবের ঘাঁটাঘাঁটি হয—যাতে অতি অল্প বয়স থেকেই বেশ স্পষ্টভাবে ওটা জেগে ওঠে আর সংস্কারকে প্রবল করে। এসব প্রত্যেক ঘরে হয়, এ তো গোড়াব কথা,—ছোঁয়া-ছুঁই ব্যবহার যে ঐ সব রসের ব্যাপাবে কত বড় শক্তিমান তাব হিসাব নাই। শিশুরা ত অসহায় তাদের ত সহজে হয়, বালক যুবা বৃদ্ধ লোকের শরীরেও ওর প্রভাব কম নয়। আচ্ছা এখন বল, সুর গান বা বাজনায় প্রভাব তোর উপর কি রকম ছিল ? তোর গান ভালো লাগতো ?

আমি বলিলাম: শিশুবেলা থেকেই ভাল লাগতো খুব,—এত ভাল লাগতো যে ছেলেবেলায পড়াশুনা ফেলে যাত্রা শুনতে ভালবাসতাম। একবার যাত্রা শুনলে ছু'তিনদিন পড়াশুনায় মন লাগতো না।

তিনি বলিলেন: গান আমারও খুব ভাল লাগতো। খুব ছেল্যা বয়স থেকেই ভালো লাগতো। আমিও গান করতে পারতাম ভালো রে। গানও ত রস বটে—সব রসই এক রস হোতে—এই আদিরসই গোড়া জানবি।

আমি বলিলাম: এখন প্রসন্ন হয়ে বলুন যা জিজ্ঞাসা করেছি?

তিনি যেন অবাক হইয়া বলিলেন: কি!

আমি: ঐ যে উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের,—

তখন স্মরণ করিয়াই বলিলেন: হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি বে-বাগে জেগে ওঠে, তাদের মাথা খেয়ে দেয় যে,—

আমি: কি রকম, খুলে একটু বলুন, না হোলে বুঝতে পারবো কি করে?

তিনি: বুঝতে পারিস নাই?—তাদের লক্ষ্য থাকে ত শুধু ঐ শরীরের আয়েস, তাতে হয় কি, কেবল ঐ সুখের ইচ্ছাই খুব বেড়ে উঠে, কোনও মেয়্যাকে ভালবাসতে পারে না; মেয়্যা দেখলেই কেবল ঐ সুখের কথাই মনে হবেক—তা ছাড়া আর কিছুই তার মনে হবে না। মায়ের সোজা নিয়মের দিকে তাকাতে পারে না, মন যেদিকে টানে সেই দিকেই যেতে হবেক তাকে। যখন ঐ ভাবে যেতে যেতে ইন্দ্রিয়-সুখ অনেকটা ভোগ হয়ে যায় তখন ভিতরে ভিতরে কুণ্ডলিনী পাক খুলতে থাকে, তাদের মধ্যে তখন একটা অবসাদও এসে পড়ে, তেজক্ষয় হোলে পর।

আমি: তা হোলে ও-ভাবে উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের শক্তিক্ষয়েও কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগেন?

তিনি: তা জাগবেন নাই? তু যদি গোঁ-ভরে, লালস করে একদিকে অন্ধ হয়ে ছুটিস্ ত ধাক্কা খাবি না? পথ না দেখে ছুটলেই পড়তে হবে যে। তখনই চৈতন্য হবে। যে কেউ ভুল করে গোঁয়ারের পারা, চোখে দেখে না, কানে শুনে না—একেবারে দৌড়ায়, ফলে তাকে এক জায়গায় ধাক্কা খেতেই হবে যে; আর তখন চৈতন্য হবেক। ও শক্তি আর ঘুমিয়ে থাকতে পারবে না, জেগে উঠবে। মায়ের রাজত্বে ওটি হবার যো নাই যে গো!

আমি: আর যৌবনের স্বাভাবিক গতিতে বয়সের সঙ্গে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনে বিবাহিত জীবনেও ত কুণ্ডলিনী জাগেন?

তিনি: হাঁ, যদি দুঁয়ার মধ্যে ভালবাসা জন্মে থাকে তবেই হবে;—না হোলে শুধু ইন্দ্রিয়-সুখের লক্ষ্যটাই বলবান হোলে শক্তি জাগে না। যেখানে

দেখবি একজন আর একজনকে না ভেবে থাকতে পারে না, দু'জনার মধ্যে খুব টান ধরেছে—ঐখানেই শক্তি জাগার কথা বুঝতে হবেক।

আমি: তা হোলে একজনের মধ্যে প্রেমের বিকাশ হোলেও জাগে?

তিনি: হাঁ, তা জাগবেক নাই, প্রেম কি সহজ কথা নাকি, সকলকার বিয়ায় কি প্রেম জন্মায়? মায়ের কত অনুগ্রহ থাকলে তবে সে একজনা প্রেমের অধিকারী হয়?

আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, আর কোন্ কোন্ অবস্থায় কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগেন বলুন না? আপনার কথা শুনে আশা হয় যে তা হোলে সকলকারই কোন না কোন সময় কুণ্ডলিনী জাগবেন।

তিনি: দেখ, গুরু লাভ হোলেই শক্তি জাগেন। সে-রকম গুরু হোলে চ্যালার শক্তি জাগিয়ে দিবেন যে।

আমি বলিলাম,—কেউ যদি গুরু না মানে?

তিনি চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন: গুরু-কৃপা ছাড়া কিছু হবার যো আছে নাকি! যখনই হবে, গুরুর কৃপা ছাড়া কি করে হবে; বলিয়া উদ্দেশে তিনি যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিলেন: শালা গুরুর কৃপা মানবেন নাই—খৃস্তান হয়েছেন।

অনেক কষ্টে শেষে বুঝাইতে পারিলাম যে গুরুর কৃপা প্রাণপণ করিয়াই মানিয়া থাকি—এখন অন্য কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি বলিলেন: হ্যাঁ দেখ—যদি কারো কঠিন বিপদ-আপদ আসে, কি কঠিন রোগ হয় যেমন মরণের কাল এলো মনে হবে, সে অবস্থায়ও তার কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠেন। আর অতিরিক্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-ঘটিত মনঃকষ্টে পড়লেও ঐ শক্তি জাগে,—আর বাড়াবাড়ি করিস্ না—বুঝলি?

তাহা হইলে ইহাই পাওয়া গেল যে কুণ্ডলিনী-শক্তি কার কিভাবে জাগিবে তাহার ঠিক নাই। মোটামুটি যে কয়েকটি অবস্থায় জাগে তাহা এই:—

১—স্বাভাবিক যৌবনকালে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ে, মানবের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ঐ শক্তি জাগে।

২—অস্বাভাবিকভাবে যৌবনের ব্যভিচারে, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ-প্রতিক্রিয়ার ফলেও ঐ শক্তি জাগে।

৩—যাতে প্রাণের ভয় আছে এরূপ কোন কঠিন বিপদের মধ্যে পড়লেও ঐ শক্তি জাগে।

৪—কঠিন রোগের মধ্যেও ঐ শক্তি জাগে।

৫—অতিরিক্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-ঘটিত গভীরতম মনঃকষ্টে, অথবা যে কোন কারণে হোক—অসহনীয় দুঃখের ফলেও কুণ্ডলিনী-শক্তি মানুষের মধ্যে জাগিয়া উঠেন।

ইহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, কঠিন দুঃখ বা গভীর মনোবেদনার ফলে যদি শক্তি জাগতে পারেন তা হোলে বেশী কিছু সুখের ব্যাপারেও ত তা হতে পারে ?

তিনি একবার তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন: হাঁ তা ত হোতে পারে বটে। কোনো সময় কারো জীবনে হয়তো এমন কিছু ঘটে যাতে তার আনন্দের সীমা থাকে না—এমন সুখ, যাতে সংসারের আর কোন সুখকে সুখ বলে মনে হবে না, তখনও ঐ শক্তি জেগে উঠবেন। সুখ হউক বা দুঃখই হউক মানুষের জীবনে বা প্রাণে যাতে জোরে ঘা লাগে তাইতেই জেগে উঠেন যে।

তাহা হইলে মানুষের অতি সুখের মধ্যে বা ফলেও ঐ শক্তি জাগরিতা হন ?

৫

একটু থামিয়া ক্ষ্যাপা কতক্ষণ পর বলিতেছেন: যেভাবেই জাগুক না কেন আবার ঘুমাবার সম্ভাবনা আছে। যখন জাগলো তখন কিছুকাল খুব উচ্চ অবস্থা থাকলো—তারপর আবার ধীরে ধীরে অহঙ্কার জেগে উঠল, মনে হোলো, আমার এতটা উচ্চ অবস্থা হয়েছে—কৈ আর কারো ত এমন অবস্থা দেখতে পাই না—এইভাবে আবার ক্রমে নেমে পড়তে আরম্ভ করলে—শেষে আবার ঐ শক্তি ঘুমিয়ে পড়লো ; এই রকমই ঘটে থাকে।

আমি বলিলাম: তা হোলে উপায় ?

তিনি: উপায়, পিছনে গুরু-শক্তি না থাকলে এমন ত হবেই। গুরু শক্তি না পিছনে থাকলে কারো সোজা উঠ্‌বার যো নাই হেথা, মায়ের কড়া নিয়ম যে,—তবে লোকের চক্ষে গুরু-শক্তি দেখা দিক বা না দিক, ভাল মনিষের দিকে গুরুর দিষ্টি থেকেই যায়—আবার তাকে তুলে দেন। কি-রকমটা হয় জানিস—পতন হোলে পর তার আবার সেই অবস্থা পাবার লেগে প্রাণটা ছট্‌ফটায়,—তখন সে আবার একটু কষ্ট করে- সেই অবস্থা পাবার জন্যে, পেয়েও

যায় শেষে অবশ্য। ও এমনই সুখ যে একবার সে সুখের আস্বাদ পেলে আর কিছু ভাল লাগবে না। যার ও শক্তি জেগেছে সে বুঝে, অপরে কি জানবে?

তিনি কতক্ষণ পর বলিতে লাগিলেন: যেটা পরে মানুষকে বড করে উচ্চ স্তরে নিয়ে যায়, ছোট ছেল্যা অবস্থার মধ্যেও সেই রসাভাস দেখা যায়। ও সংস্কার ত মানবসমাজে আদি কাল থেকেই চলে আসছে। কারো খুব অল্প বয়সেই ইন্দ্রিয় বা মনে প্রকাশ পায়, তবে ওটা ঢাকবার জিনিস বোলে ঢাকাই থাকে। আবার ওদিকে যে রসবোধ জাগে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, কোন সুযোগ সংযোগের ফলেই ত জাগে। আবার সেই সুযোগ সংযোগের অভাবে আপনিই ঢাকা পড়ে যায় ছেল্যা-মেয়েদের মধ্যে। প্রকৃতি নিজেই ঐ রসঘটিত ব্যাপারকে গুপ্ত রেখেছে। যার প্রকাশ হয় তার নিজের কাছেই হয়, সাধারণত অপরের কাছে গোপন থাকে। কোন কোন ছেলে বা মেয়্যার ও সংস্কার খুব তেজি দেখা যায় ত, তাদের খুব তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি। তাদের ভিতরে শক্তির প্রভাব বেশী থাকে বলেই ঐ সব ব্যাপারেও সাধারণের তুলনায় একটু আগেই প্রকাশ পায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: যাদের তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি বলছেন, তাই বলেই কি তাদের রসবোধ খুব কম বয়সেই দেখা দেয়?

তিনি: ওই আদিরসের অনুভূতি সূক্ষ্মভাবে সংস্কারগত হয়ে সকল শিশুরই মনের মধ্যে থাকে, সুপ্তভাবেই থাকে এটা বুঝিস ত? তা হোলে, যেমন যেমন চৈতন্যশক্তির বিকাশ হোতে থাকে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে নানাবিধ ভোগ আস্বাদনের শক্তি বাড়তে থাকে। যে শিশুর সব ইন্দ্রিয় সুস্থ, সবল, তাদের মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে জেগে উঠে—যখনই সুযোগ পায় বা যোগাযোগ ঘটে, তবে দুর্ব্বল বা অসুস্থ শরীর যাদের তাদের তুলনায় সুস্থ ছেল্যাদের আগেই প্রকাশ পায়। সব বাপ-মায়েতেই তা জানতে পারে সকলের আগে, যদি লক্ষ্য করে,—বাপ-মা থেকেই সন্তানে ওটা পায় কিনা!

আমি: আচ্ছা, তখন থেকে শিক্ষা দ্বারা ঐ সব শিশুদের ভিতর থেকে ও সকল ভাব দূর করতে পারা যায় না?

তিনি: মর্ শালা, শিক্ষে দিয়ে আগুনকে চাপবি কি করে, সেদিকে যা দিয়ে আগুনকে ঢাকা দিবি তাই-ই পোড়াবে যে। তুই বলিস কি রে বোকা, আদিরস, যা সৃষ্টির মূল শক্তি তাকে শিক্ষে দিয়ে উল্‌টে দিবি! এ কি কিছু বুঝবার বা জানবার জিনিস নাকি, বাইরের কিছু একটা, যা থেকে ওদের তফাৎ

রাখবি! এ যে ইন্দ্রিয়ের জেন্ত অনুভব, অন্য কিছুতেই ঢাকা পড়বে নাই। সব কিছু শিক্ষা দেওয়া যায়—ওটিকে আর কাউকে শিকুতে হয় নি।

ঐ শক্তিটাই সব শক্তির মূল, সেই জন্যই ওকে মূলাধার শক্তি বলে। যার যতটা ঐ শক্তি প্রবল তার অনুভব শক্তি অতীব তীক্ষ্ণ হয়, ধী বা ধারণা-শক্তি প্রখর, অতি অল্প বয়সেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতের যে ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি, গভীর তত্ত্ব সকল বিচার, সিদ্ধান্ত,—সব ঐ মূলীভূত আধার শক্তিরই ফল। যে শিশু ভবিষ্যতে মহা বিদ্বান বা জ্ঞানী বা কর্ম্মী হবে, তার গোড়া থেকেই এমন কি বালক অবস্থায় আগে থেকেই আদিরসের সংস্কার খুব প্রবল দেখা যায়। কিন্তু এমনই প্রকৃতির নিয়ম শিশু অবস্থা থেকেই সেই সব ছেলে-মেয়েদের মনে এটা যে বিশেষ গোপনীয় এ সংস্কারও স্পষ্টভাবে তাদের মধ্যে দেখা দেয়,—তাই-ই শেষে এ ব্যাপারে সংযমের সহায়তা করে।

আমি: ঐ অবস্থায় তাদের সংযম বোলে কিছু একটা ফোটে কি?

তিনি: যোগাযোগের অভাব আর সংযম এক জিনিস না হোলেও বাইরের চেহারাটা একই। যার দ্বারা মহৎ কিছু হবে তাদের বেলা রসবোধ জাগলেও প্রকৃতি-জননী ঐ ব্যাপারে কাজের বেলা যোগাযোগের অভাব ঘটিয়ে দেন, শেষে সংযমে পরিণত হয়ে তার প্রতিভা নানাদিকে বিকাশ পায়।

আমি: যোগাযোগের ঘটাঘটির ব্যাপারেও তাঁর হাত আছে নাকি, আশ্চর্য্য ঠেকে!

তিনি: দেখিস্ না, ঐ অবস্থায় সংযমের মত একটা কিছু যদি না থাকতো তা হোলে মানব-সমাজে ছেলেরা অতি অল্প বয়সে, বালক বলে গণ্য হবার আগে থেকেই যৌন ব্যবহার লোকচক্ষের সুমুখেই শুরু করে দিতো, লাজ-লজ্জা, কোন রকম সঙ্কোচ কিছুই থাকতো না। একটি শিশু হয়ত আর একটির সঙ্গে ঐ রসের খেলা করচে এমন সময় যদি বয়স্ক কেউ সেথায় এসে পড়ে তখন স্বভাবতই তারা বিরত হয়,—তার সংস্কারে আপনা থেকেই একটা সঙ্কোচ এসে পড়ে—তাই-ই পরে বয়সকালে সংযমের স্পষ্ট কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম একটা সঙ্কোচ যদি ঐ শিশু বয়স থেকেই না থাকতো তা হোলে মানব-সমাজ ছাগলের সমাজে পরিণত হোতো যে। আর এটা ঠিক জানবি, কি শিশু, কি বালক-বালিকা কি যুবক-যুবতী যতই গোপনে তাদের আদিরস-ঘটিত অথবা অবৈধ ব্যাপারকে গোপন রাখতে যত্ন করুক না কেন প্রকৃতি

সাহায্য না করলে সেটা গোপন থাকতে পারে না। প্রকৃতি ঠিক জানেন কার কোন্ কাজটা কতটা গোপন রাখতে হবে। তাঁরই অভিপ্রায় অনুসারে সব কিছু ঘটনাই গোপন বা লোকচক্ষে প্রকাশ পায়। নিজ সৃষ্টি রক্ষার জন্যই তিনি কোনও ব্যাপার প্রকাশ বা গোপন করেন। সমাজে এমনটা দেখতে পাওয়া যায় না কি যে এক ব্যাপার এমন বহুদিন গোপন থেকে পরে প্রকাশ পায়, -সংশ্লিষ্ট লোকেও তা জানতে পারে না,—যখন প্রকাশ করবার হয় তখনই তাঁর ইচ্ছায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন কর্ম্মকর্ত্তারা তার ফলভোগ করেন। সকল ব্যাপারেই এটা হয়ে থাকে, শুধু ইন্দ্রিয়-ঘটিত ব্যাপার বোলে নয়। গুপ্ত ততদিন যতদিন তাঁর অভিপ্রায়।

আমি বলিলাম: এ ত বড অদ্ভুত ঠেকে, প্রকৃতির হাত আছে এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে!

তিনি: তুচ্ছ, উচ্চ ওসব কথা নয়,—আমবা এখানে রয়েছি কেমন, ঠিক মায়ের কোলে শিশু যেমন থাকে ঠিক তেমনি। শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে তখন মায়ের দৃষ্টিতে শিশুর সবটাই দেখা যায়। শিশু বরং মায়ের অনেকটাই দেখতে পায় না। আমাদেব যতই কেন বিদ্যা-বুদ্ধি-চাতুরী থাক না ও চক্ষুকে এড়াবার যো নাই।

আমি: আচ্ছা, সে চোখটা থাকে কোথায়, কোনখান দিয়ে তিনি এ সব দেখেন?

তিনি: ভেবে দেখ দেখি, কোনখান দিযে তিনি আমাদের সবটাই দেখতে পান?

আমি: ধারণাটা বডই শক্ত,—তবে আমার যা মনে হয় বোলতে ভরসা হয় না।

তিনি অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বল না, না হয় ভুলই হবে তাতে ক্ষতি কি,—আমি ত শেষে তোকে বোলতে পারব—

আমি বলিলাম: আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের চক্ষেই আমাদের সব কিছুই তিনি দেখেন।

তিনি: কি রকম, খুলে বল না।

আমি: ধরুন, আমরা যা কিছুই করি না কেন, ভাল বা মন্দ যত কাজ সে সব আমি করছি বোলেই ত করি,—আমাদের সব কাজ আমাদের ত ভালমতে জানা থাকে। আর তিনি ত অন্তর্যামী, আমাদের সকল ব্যাপারই আমাদের

মধ্যে অন্তর্যামী হয়ে তিনি খুব স্পষ্টভাবেই জেনে ফেলেন। যা আমরা জানি তা তিনি সবই জানেন।

তিনি : হাঁ, এ ত ঠিকই বোলেছিস্—তু শালা সব জানিস্ ন্যাকা সেজে হেথায় এসেছিস্—বল্ দেখি ঠিক কিনা ?

আমি : আচ্ছা, এটা খুব আশ্চর্য্য মনে হয় না কি যে, তিনি এতটা কাছে আমাদের অন্তরের মধ্যে আছেন অথচ আমরা তাঁর থাকাটা কল্পনায়ও আনতে পারি না। কোনও গোপন কাজ করে যেন একটা সংস্কার বশে মনে করি সকলের চক্ষু এড়িয়ে চতুরের কাজ করলাম।

তিনি : পশুজন্ম ঘুচলে পর তবে ঐ সব জ্ঞান হয়। (তন্ত্রে মানবের যে তিন অবস্থার কথা আছে : যথা—মানুষ প্রথমে পশু, তারপর বীর বা মানুষ, শেষে দিব্য-শক্তির বিকাশে দেবতা—সেই হিসাবেই এই পশুর কথা বলিতেছেন।) কুণ্ডলিনী না জাগলে ত সে দিকে যাবার পথ নাই। পশু-জন্ম আর বীর বা মানব-জন্ম এই দুইটা জন্মই দীর্ঘকালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সব কিছুই কালের ভিতর দিয়ে হবে যে। ছিষ্টির এতটা ভোগ, এতটা শক্তির খেলা এ সব ত ভোগ করতে, জানতে হবে—সে কি দুই এক দিনের ব্যাপার ?

আমি : থাক্ ও সব কথা, এখন বলুন আমাদের মত মানুষ যাদের এ সব জানতে শুনতে ইচ্ছা হয়, সৎপথে যেতে প্রবৃত্তি হয়, কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠলেও এত বাধা আসে কেন, সোজা পথ যাওয়া যায় না কেন ? উদ্দেশ্য ত সৎ আছে, অবশ্য অহঙ্কার করে বলি নি,—

তিনি : না, না, অহঙ্কার হবে কেনে, যথার্থ কথাই ত বলছিস্। হাঁ দেখ, তুই যে সৎ উদ্দেশ্যের কথা বলছিস্—এখন কতটা তুই ঐ সৎভাবকে আঁটালো করে ধরেছিস তা তো তুর জানা নাই। মনে হয়ত হোলো তুই সৎ ভাবেই চলেছিস্, কাজে দেখা গেল কোন স্থযোগ যদি এলো ত অসৎভাবেই ফেঁসে গেলি, এমন ত ঘটে।

আমি : হাঁ তা ঘটতে পারে বটে, সত্যি কথা গলদ আছে আমাদের এই সৎভাবে থাকার মধ্যে—এটা আমরাও দেখতে পাই যখন মনটা সরল থাকে। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলেও অনেক সময় পথের জটিলতা ঘুচাতে পারি না—

তিনি : একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে আছে এখানকার সকলকার সব ব্যাপার যে,—কোনটা নিছক আলাদা নেই ত, কাজেই ব্যাপার সব জটিল। চট করে কাজ হবে কি করে। তেমন তেমন জোর যদি থাকে ত তবেই

জটগুলা কাটা যায়, ছেঁড়া যায়। তবে কুণ্ডলিনী জাগার সঙ্গে সঙ্গে এমনই একটা শক্তি পাওয়া যায় যে সব থেকে নিজের উদ্দেশ্যটি ঠিক আলাদা করে নেওয়া যায় তাইতেই ভাল হয়। তারপর পশুজন্মের সকল মানুষেরই মেয়্যাদের আসল পরিচয়টা পেতেই বিলম্ব হয বেশী, তাইতেই অনেক কাল যায় যে। তারপর ধন-মান-টাকার কথা আছে, মেয্যা আর টাকা এই দুটাই আগুন নিয়ে খেলা করার পারা। শুধু সহবাসের সুখটি লক্ষ্য করে মেয়্যাদের দেখলেই পুড়তে হবে।

আমি: রামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথা বলেছেন, তিনি সাধুদের ও দুটাই ত্যাগ করতে বলেছেন। কিন্তু দেখুন পুরুষদের বিপদটা এই ব্যাপারে খুব বেশী, মেয়েদের কিন্তু ওসব ভাবই নাই, তাদেব মধ্যে সংযম এতটা বেশী, বা লালস, অবশ্য ভগবানের ইচ্ছাতে, এতটা কম যে তাদের প˙নের সম্ভাবনা খুবই কম। গোড়া থেকেই তারা সব ত্যাগ করতে পারে।

তিনি: না তা ঠিক না। ত্যাগ তারা মন থেকে সহজে করতে পারে না, তবে সবু কিছুই ধৈর্য্য ধরে সইতে পারে, কিন্তু পুরুষেব সঙ্গে পডলে তারা ভালবাসার জন্যে সব কিছুই ছাড়তে পারে। অত দিনের ধৈর্য্য, অত দিনের ত্যাগ এক কথায় ছেড়ে দেয় যদি পুরুষকে অনুগত দেখতে পায়। আসলে সরল মন বোলে তাদের ভোগাস্তিও বেশী। মহাপ্রকৃতি মেয়েদের অতটা সহ্য করবার শক্তি যদি না দিতেন তা হোলে এ সংসাব ছারখাব হযে যেতো।

আমি বলিলাম: পশুভাবের মানুষ যারা তাদের কথায় আমাদের কাজ নেই। ভাগ্যক্রমে যথাসময়ে ঐ যে কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠেন তখন থেকেই ত মনুষ্যত্বের কাজ আরম্ভ হয়, কিন্তু তাও আবার ঘুমিয়ে পড়ে বোলছেন যে—এ ত ভয়ের কথা?

তিনি: হাঁ, যৌবনের সময় ঐ যে স্বাভাবিক কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগা, ও জায়গায় যদি সতর্ক না থাকা যায় তাহোলে আবার সুপ্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তারপর আবার যে জাগে সেই জাগাতেই মহৎ ফল লাভ হয়।

আমি: যদি বা জাগলো আবার সুপ্ত হবাব সম্ভাবনা কেন?

তিনি: প্রথম জাগায় ভাল ঘুম ছাড়ে না—ভেবে দেখ, যে সব প্রবৃত্তি এতকাল একজনের ধাতে স্থায়ী হয়ে বোসেছে তা কি একেবারেই বদলে যেতে পারে? যেতে যেতে কতদিন যায়, সেই জন্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়লেও একেবারেই সে-রকম ঘুমাতে পারে না, আবার জেগে উঠবার জন্যেই মুকিয়ে

থাকে। মনে কর, পশুভাবের ইন্দ্রিয়, সুখের লালস, স্বার্থপরতা, অপরের সুখ-দুঃখকে তুচ্ছ করে নিজের সুখ-দুঃখকেই বড় করে দেখ সেগুলো কি একেবারেই যায়? প্রথমে যৌবনের কামজ-সম্বন্ধ নিয়ে নারী-সম্ভোগ, যার আকর্ষণ এতটা প্রবল থাকে সেটা থাকতে ত কিছু ভাল কাজ বা উচ্চ ভূমিতে গতি হবে না—সেই জন্য দ্বিতীয়বার যখন শক্তি জাগে ঐ ভাবের কামজ-নারী-সম্বন্ধের উপরও একটা ঘৃণা এসে পড়ে।

আমি বলিলাম: ঘৃণা থাকাও তো ভাল নয়, ঘৃণা লজ্জা এ সব তো এক-একটা পাশ, ঘৃণা যদি কোন জিনিসের উপর থাকে তা হোলে ত সেই পাশে বদ্ধ থাকাই হোলো?—নয় কি?

তিনি: অবশ্য প্রথমটা তা হয় বটে, সেটা প্রতিক্রিয়ার ফলেঃ হয়। কিন্তু তারপর আপনার প্রকৃতির সঙ্গে সেটা মানিয়ে নিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষের আসল সম্বন্ধ জ্ঞান হোলেই সেই ঘৃণার ভাবটা উবে যায়—তাই হোলো কুণ্ডলিনী জাগরণের মুখ্য ফল।

আমি: তাহোলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের মুখ্য ফল কি এই নর-নারীর যথার্থ সম্বন্ধ-জ্ঞান?

তিনি: মনে কর যখনই মানুষ বড় হয়ে নিজ শক্তিতে মহৎ ভাব সকল প্রকাশ করতে থাকে,-যেমন ঋষিকল্প মানুষেরা, আসলে তাদের স্ত্রীকে ত্যাগ করবার আর দরকার হয় না—তাদের এমনই একটা সহজ ভাবের স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ জ্ঞান পাকা হয়ে যায় যাতে রক্ত-মাংসের দেহগত সম্বন্ধটা একেবারেই তুচ্ছ হয়ে যায়। শুধু যৌন-সম্বন্ধ-জ্ঞান মাত্র নয়, জগতের সকল ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধটাও বদলে যায়। ঐ জ্ঞানই হোলো ঐ শক্তি জাগরণের মুখ্য ফল। প্রথমে যে সব ভোগ আকর্ষণের বস্তু থাকে,—পরে চৈতন্যের আলোতে সে সকলের রূপ বা প্রভাব উল্টে যায় অথচ কোন বস্তুর লোপ হয় না। দ্বিতীয়, জাগরণে এই সব উচ্চ ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়—তা থেকে পতন নাই। তখনই এখানকার সকল বস্তুর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ সার্থক হয়, তত্ত্বজ্ঞান ফোটে, সকল ভোগ সকল জিনিসের স্বরূপ দেখা যায়।

আমি: এ জগতে ভোগ আর কর্ম্ম, শেষে জ্ঞান—এই ত এখানকার মোটা কথা; অবশ্য শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভেদ অধিকার নিয়ে কথা আছে।

তিনি: হাঁ, সাধারণভাবে ভোগ, কর্ম্ম আর জ্ঞান এই তিনটিই আসল। ভোগের মধ্যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—নিয়ে যে ভোগ, তার মধ্যে মৈথুনে

ঐ সব কটাই একসঙ্গে তৃপ্ত হয় বোলে যৌবনে তার আকর্ষণই সকলের বড়। তারপর হোলো অর্থ বা ঐশ্বর্য ভোগ, তার পর শেষ হোলো জ্ঞান এবং লোক-কল্যাণ সম্পর্কে যত কর্ম্ম আছে—গুরুভাবে তার শেষ ফল হোলো জন এবং সমাজ থেকে শ্রদ্ধার আকাঙ্ক্ষা—গুরুপদে প্রতিষ্ঠাই হোলো এখানকার শেষ ভোগ বা কর্ম্ম।

আমি: মোটামুটি ভোগ এই তিনটি হোলেও আমার মনে হয় চতুর্থ একটি আছে।

তিনি: কি?

আমি: আত্মজ্ঞান বা কোন বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য তপস্যা বা কর্ম্ম।

তিনি: আত্মজ্ঞানের জন্য ঐকান্তিক যত্ন হোলো এ জীবনের মূল উদ্দেশ্য—তার ফলাফল শেষে ঐ গুরুভাবের মধ্যে গিয়েই পড়লো—আলাদা হোলো কি করে?

আমি: কেন, এই জগৎসৃষ্টির কৌশল, পদার্থ-বিজ্ঞান ব্যাপারে সৃষ্টিতে কত কত মূল উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান—ও দেশের কত পণ্ডিত মহাত্মা এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের তপস্যায় জীবনপাত করছেন—কত কত আবিষ্কার করেছেন, তাতে—

তিনি: তাঁরা কি লোক-সমাজের উপকারের উদ্দেশ্য নিয়ে এ-সব করছেন না?

আমি: তা হোতে পারে—তবে মূলত সে সব কাজ ত প্রেরণামূলক,—আর নিঃস্বার্থ ভাবেরই মনে হয়।

তিনি: তা হবে। কিন্তু প্রথমত তার মধ্যেও তাঁদের আনন্দ পূর্ণমাত্রায় আছে—কাজেই সেটা উচ্চ স্তরের ভোগের মধ্যেই এসে পড়লো। তারপর তাঁর তপোলব্ধ জ্ঞান, যা তিনি রেখে যেতে চান, সেও ত ঐ গুরুপদের পর্য্যায়ের মধ্যে পড়লো। ঐ মূল তিনটি থেকে পৃথক আর একটি তাকে কি করে বলা যায়?

আমি: তা ঠিক না হোক, এসব ত উচ্চ উচ্চ ভাবের অবস্থা বলতে হবে।

তিনি: ত' তো হবেই, ঐগুলাই ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভোগের মধ্যে এলো। তাতে দেখতে পাবি—ঐ সব উচ্চ ভোগের মধ্যে তাঁদের উঁচু অবস্থায় নারী, ধন বা অর্থের সম্বন্ধ থাকলেও তার সঙ্গে কোন মলিন ভাবের সম্বন্ধই নেই। এটুকু বুঝে লাভ আছে।

আমি: তা বটে, ঐ সব উচ্চ স্তরের মানুষ যাঁরা—তাঁরা সঙ্গে স্ত্রীও

রেখেছেন অর্থও রেখেছেন, কিছুই ত্যাগ করেন নি। এতে আমার মনে হয় যে আমাদের ভারতে মানুষের ধাতে ত্যাগ ত্যাগ করে একটা যাপ্য বায়ু-রোগের প্রভাব আছে।

তিনি: এই দেখ্‌ না কেন, মেয়্যা মানুষই বল্ আর ধন বা অর্থই বল্ এদের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় হয়ে গেলে সে সব ত তার জীবনে সাধনের সহায় হয়ে যায়। হেথায় মেয়্যা-মরদের স্বরূপ-জ্ঞান হোলেই এদের সঙ্গে তোর যথার্থ সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়ে যায়, তখনই জীবন সার্থক হয়। আর সেইটাই বুঝবার লেগেই না মেয়্যা-মরদের এতটা ঘাঁটাঘাঁটি! পশুভাবের যা-কিছু সবই এই দেহকে নিয়ে—দেহজ্ঞান যাদের বেশী তারাই ত পশু, আর ভোগ-বিলাসের জঙ্গলের মাঝে দল বেঁধে ঐ পশুগুলাই ত চরে বেড়াচ্ছে, এটা ত বুঝেছিস?

আমি বললাম: তা তো খুব ভাল করেই বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই অগাধ পশুত্ব থেকে মুক্তি পাবার সহজ উপায় কি বলে দিন আপনি।

তিনি: আহা, এতটা শুনে, এতটা বুঝেও বোকার মত কথা বলিস কেনে! অনায়াসে পশুত্ব ঘোচাবার কত সহজ পথ এখানে রয়েছে,—শক্তি হলেই পশুত্ব ঘুচবে, শক্তিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করলেই শাক্ত হওয়া যায়। শুধু এ দেশের মানুষের কথা নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের শাক্ত হওয়া ছাড়া পশুত্ব ঘোচাতে আর অন্য উপায়ও নাই। দেবীসূক্তে জানিস দেবী কি বলছেন?

আমি: সে আর জানবার দরকার নেই, এখন একটা শুভ খবর আপনাকে দি, শুনে সুখী হবেন যে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষই শাক্ত হয়ে গিয়েছে। সহজ ভাবেই তারা অনেককাল আগেই শক্তিকে আশ্রয় করে জগদম্বার শ্রেষ্ঠ সন্তান বোলে পরিচয় দিয়েছে,—কেবল ভারতবর্ষের হিন্দু বলতে যাদের বুঝায় তারা ছাড়া। দেশের এরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, যে কোনও উপায়েই হোক শক্তিকে দেশের সকল হিন্দু অধিবাসীর ভিতর থেকে তাড়িয়ে জড়া-বস্থা আনতেই হবে, না হোলে অন্তঃসারশূন্য হয়ে শীঘ্র পরলোকে পৌঁছে বৈকুণ্ঠ অধিকার করা যাবে না,—এরা বলছেও শাক্ত হয়ে কোন লাভ নেই—কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থটুকুই হোলো ভাববার জিনিস।

শুনিয়া ক্ষ্যাপা বাবা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন: তাঁরা না হয় শীঘ্র শীঘ্র গিয়ে ভূতনাথের দল বাড়ালেন, কিন্তু যাদের সৃষ্টি করে গেলেন, তাঁদের বংশধরেরা,—তাদের জন্য কি করে গেলেন?

আমি : তাদের জন্যে—যাতে তারা জগতের শ্রেষ্ঠ শাক্তদের চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে পদসেবা এবং পাদপূজা করে ধন্য হোতে পারে তার পাকা উপায় করে গেলেন, আর শেষে বাপ-পিতামোর পাকা মার্কামারা পথ ত আছেই—আর বাবা ভূতনাথও আছেন। যাক ওকথা…এখন আমার শেষ কথা একটু আছে দয়া করে যদি শেষ করে দেন,…সেটা এই যে তান্ত্রিকদের যেমনভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় অ-তান্ত্রিকদের কি ঠিক সেই রকম হয় ?

তিনি : তান্ত্রিকদের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগানো, আর তাকে প্রত্যেক চক্রের ভিতর দিয়ে তোলা—সে সব আলাদা সাধন, তাতে মজা আছে। সাধারণ মানুষ সে সব মজা পায় না। মনে কর, অনেককাল থেকে কত কত সাধক যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেক চক্রে পদ্মের কথা বলেছেন,—প্রত্যেক পদ্মের মধ্যে পৃথক পৃথক দলের কল্পনা আছে—প্রত্যেক চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী আছেন, বীজমন্ত্র আছে—যেমন যেমন এক একটি চক্র ছড়ায় কুণ্ডলিনী-শক্তির নানা ভাবের বিকাশ অনুভব করা যায়। এ সব আলাদা সাধন—এর একটা মহৎ উপকার এই হয় যে শক্তির উপর আয়ত্ত বিস্তার করা যায়। অনুভব করা যায় ঐ শক্তি কখন কোন্ চক্রে কিভাবে ক্রিয়া করছে—তার ফলে কি হচ্ছে! তাতে ধী-শক্তি তীক্ষ্ণ হয়, অন্যান্য শক্তির বিকাশ হয়। এই পদ্ধতি অতি প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত। এর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী-শক্তি প্রত্যেক চক্রের মধ্যে থাকার ফলে যে যে ভাব হয়, যে যে স্ফুরণ হয়, সে সকল অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দের স্ফুরণ হয় তার তুলনা নেই। তান্ত্রিক যাঁরা ঐ শাস্ত্র অনুযায়ী যথার্থরূপে সাধন করেন, তাঁদের সেটা বিশেষ লাভ যা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ পেতে পারে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ঐ ধরনের কিছু কিছু সুবিধা আছে যা অপর দলে নাই। এ ত জানা কথা। তান্ত্রিকদের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি নামে যা বলে হয়েছে তা অন্যান্য ধর্মের মধ্যে আত্মশক্তি-রূপে প্রকাশ। প্রথমে অবস্থা বিশ্লেষণ করেই ওকে কুণ্ডলিনী বলা হয়েছে—ঐ শক্তি জাগরণের পর আত্মাতেই ওর চরম পরিণতি অর্থাৎ ওর শেষ, আত্মার সঙ্গে এক হোয়ে মিলে যাওয়ায়।

আমি : আপনার কথায় এ বিষয়ে আসল কথা এই বুঝা গেল যে, অধ্যাত্ম জীব-চৈতন্যকেই তান্ত্রিকেরা কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে ধারণা করেছেন। তারই জাগরণ থেকে চরম পরিণতি পর্য্যন্ত একটি অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-সাধন পথ তাঁরা সৃষ্টি করে নিয়েছেন, যার হদিস অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কেহ পায় না। তন্ত্রে এই-ই

পরম গৌরবময় সর্ব্বার্থ সিদ্ধির পথ। জগতের যত ধর্ম্ম-সাধনের পথ আছে, এটি তার মধ্যে একটি নিজ বিশেষ মহিমায় উজ্জ্বল, অনন্যসাধারণ একটি পথ যার কথা সভ্যসমাজের অধিকাংশরই অজ্ঞাত। কেমন এই ত? এখন বলুন জীবাত্মার সঙ্গে কুণ্ডলিনীর আসল সম্বন্ধটা কি?

তিনি: এখন জীব বলতে হবে, জীবাত্মা নয়। জীবের সঙ্গে তার সম্বন্ধ, প্রথম অবস্থায় তাকে তার অংশ বলা যায় আবার তার প্রকৃতিও বলা যায়। যৌবনে যেমন মানুষ তার প্রেমের আধার-স্বরূপ জীবন-সঙ্গিনীকে পেয়ে পূর্ণ হয়—আনন্দময় হয়, সেই রকমই এদের সম্বন্ধ, তারপর শেষে জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার আশ্রয় পেয়ে পূর্ণ হয়, -সেই রকমই এক কুণ্ডলিনী, জীবের সঙ্গে মিলিত হয়ে, এক হয়ে উভয়েই পূর্ণ হয়, যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ দুই-ই অপূর্ণ থাকে। তারপর, এটা বুঝতে হবে যে প্রথম স্তরের স্থূল মানুষের মধ্যে যে জীব, তা শক্তিরূপেই অধিষ্ঠান করেন। তারপর নানাভাবে ভোগ-আবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে যেমন অবস্থা-বিশেষে কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা হন তখন দুজনেই দুজনকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কালের মধ্য দিয়েই এই শক্তির বিকাশ হয়,—বিকাশের পূর্ব্বে জীব নিজেকে শক্তি মাত্র ভাবতে পারে, কারণ তখন দেহ-ইন্দ্রিযাদির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ থাকে—তখন তার অস্তিত্বের সবটাই স্থূল। ক্রমে ইন্দ্রিয়-গ্রামের সঙ্গে মনাদি পুষ্ট হোলে পর,—কুণ্ডলিনী-শক্তির উদ্ভব হয়,—এই-ই চৈতন্য শক্তি,—সাধারণত একেই লুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ বলে। প্রথমে ছিল ঘুমিয়ে—অর্থাৎ তার ক্রিয়া দেখা যায় নি—এখন জাগরণে তার ক্রিয়া দেখা গেল। আসলে জীবের চৈতন্য-শক্তিই হোলো কুণ্ডলিনী,—জেগে উঠে তার গতি হয় বিকাশের পথে অর্থাৎ প্রাণকেন্দ্রের পানে;—সেই কেন্দ্র হোলো প্রজ্ঞাচক্র, যেটা প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা সবেরই কেন্দ্র, কি-না অধিষ্ঠান-স্থান; মানুষের সব কিছু ধারণার স্থানই হোলো ঐখানে। পূর্ণ যৌবনের প্রভাবে যেমন নারী তার স্বাভাবিক প্রাণের টানে ভর্ত্তার সঙ্গে যোগাযোগ অপেক্ষা করে, মিলনের কাল যত নিকট হয়, ততই তার ব্যাকুলতা বাড়ে—তারপর হয় যোগাযোগ বা মিলন। একই সত্তায় পরিণত হয়ে, জীবের হয় পুনর্জন্ম, চৈতন্য শক্তির যোগে তখন তাঁর উপাধি হয় জীবাত্মা। তখন পরমাত্মার পূর্ণতা ও অনন্ত ভাব দুটি ছাড়া আর সব ভাব বা ঐশ্বর্য্য ফুটতে থাকে জীবাত্মার মধ্যে। অবশ্য এই ফোটার ব্যাপারে কত জন্ম-জন্মান্তর হয়, তার হিসাব রাখছে কে, ও-দিকে জীবের স্থূল ইন্দ্রিয়জ

ভোগের ঘোর যেটা.তেই কত জন্ম কাটে—তার ঠিক নাই। পরে জীবাত্মা পরমাত্মার লাগ পেয়ে সর্ব্বজ্ঞ হন, পূর্ণ হন, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়ে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হন,—এই হোলো জীবাত্মার ইতিহাস; আর রাধা-তন্ত্রের সারা কথা।

আমি স্তম্ভিত,—নির্ব্বাক বিস্ময়ে, অবাক হইয়াই রহিলাম কতক্ষণ।

বাবা বলিলেন: যাঃ, এখন আর জ্বালাস না ত, চলে যা।

আমি বলিলাম: তা ত হোলো, এখনও একটা কথার মীমাংসা হয়নি যে!

বাবা বলিলেন: আবার কি? এর পর আরও কি কথা হবে রে শালা, তু বলিস্ কি?

আমি: এর পরের কথা নয়, আগের কথা। নরনারীর আসল সম্বন্ধটা কি? কেমন করে আমরা এই মোহঘটিত সম্পর্ক থেকে উদ্ধার পেতে পারি?

তিনি বললেন: ও ত আপনিই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হবে, ও কারুকে বোলে দিতে হয় না। তোর ত বিয়া হয়েছে, সন্তান হয়েছে, তু ত সব জানিস,—কেমন করে জন্ম দিতে হয় সে কি তোকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে নাকি?

আমি: সে ত একটা ব্যাপক মোহঘটিত ব্যাপার,—আসল সম্বন্ধটা তা হোলে কি? জানতে ইচ্ছা হয় না কি?

তিনি: ও ত শেষের কথা, এখন সে কথা কেন? সময় হোলে মানুষে তা আপনি বুঝে।

আমি: দেখুন, আপনার সঙ্গ পেয়ে আমার কত লাভ। আমরা যে সব তত্ত্ব জানতাম না তা আপনার আছে শুনে আমাদের কত উপকার। কুণ্ডলিনীর কথা শুনে ভরসা হোলো যে প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই ও শক্তি জাগে—এমন কথা আগে কোথাও শুনিনি যে তান্ত্রিক না হোলেও শক্তি জাগে।

তিনি: ও সবই গুহ্য কথা, রহস্য প্রকাশ করতে নাই,—সব কি বলতে আছে রে! আচ্ছা, তুই-ই চেষ্টা কর-না কেন ভাবতে, নরের সঙ্গে নারীর আসল সম্বন্ধটা কি! আমি বরং একটু আভাসে তোকে সাহায্য করছি,—

ভেবে দেখ, ঐ মেয়্যারা কি রকমে ছিষ্টি রাখছে—তাকে প্রথমে তুই পেলি কোথা? প্রথমে দেখ, তোকে মা হয়ে পেটে ধরলে, তারপর এই জগৎ স্থষ্টির মাঝে তোর উপযুক্ত ক্ষেত্রে তোকে প্রবল করলে—তারপর বুকের রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ করলে—তুই বড় হলি। যেমন যেমন তোর ভাব তেমন তেমন শক্তি পেলি, সামর্থ্য পেলি, শৌর্য্য-বীর্য্য পেলি, ক্রমে জোয়ান হয়ে কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনতে লেগে গেলি। আর একলা যেন থাকা চলে, না, এতো সব

থাকতেও কোনখানে বড় একা একা ঠেকে। তখন বৌ হয়ে এলো তোর জীবনের সাধ পূর্ণ করতে, সংসারের রহস্যময় নূতন নূতন সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য পড়লো, ভোগের নেশা লেগে গেল, একেবারে মশগুল। নেশারে ঘোর কত সৃষ্টি করে ফেললি, তার সঙ্গে মিলে জগতের কত কিছু দেখলি, কত কিছু জানলি—যদি সঙ্গে সঙ্গে দিব্য-ভাবের খোঁজ পেয়ে গেলি তো ভাল, সব সম্বন্ধ সার্থক হয়ে গেল,—নিজের সঙ্গে সকলকার স্বরূপ দেখতে পেলি;—আর তা যদি না হোলো তবে মানুষ হয়েই রয়ে গেলি, পুরোনো ভোগের মক্‌সো চলতে লাগলো, যার সে তোকে শান্ত রাখলে, কোনো তাপ না লাগে, তোকে আগলে তোর সেবাতেই লেগে রইলো। যত-কিছু তোর পাপ, তাপ, অসুখ, অশান্তি—আবার অপরদিকে তোর সুখ, সম্পদ, দুঃখ, উচ্চ-নীচ যত ভাব, তোর আদর অনাদর, মান-অপমানের বেগ ধরে জীবন-সঙ্গিনী হোয়েই রইলো। তোর সৃষ্ট জীবগুলি বড় হোয়ে তোর জগৎ-সংসারকে সকল করলো,—তুই হলি কর্ত্তা, সে তোর পিছনে, তোর সব-কিছুর বোঝা নিয়ে সঙ্গী হোয়ে রইলো। তারপর কাল পূর্ণ হলে, যদি তুই আগে টেঁসে গেলি তো ফাঁকি দিলি; আর যদি সে আগে গেল ত তোকেই বুঝবার ভার দিয়ে গেল যে সে তোর কে ছিল? সে না হোলে তোর আসা, এত বড় হওয়া—এত কাণ্ড করার কোন সম্ভাবনাই ছিল কি?

এখন বুঝে দেখ্ না কেনে তার সঙ্গে তোর কিসের সম্বন্ধ—বা কোথায় সম্বন্ধ।

আমি অনেকক্ষণ যেন স্তম্ভিত হইয়াই রহিলাম। বাবা স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না বটে কিন্তু যে বস্তুর আভাস দিলেন সেটা ত সহজ বা সরল ব্যাপার মনে হয় না। একটি অস্পষ্ট বিশাল নগ্ন সত্য যেন মূর্ত্তি ধরিয়া অন্তঃকরণের সবটা জুড়িয়া উঁকি মারিতেছে,—এ কি!

ইতিমধ্যে বাবার সেবক, ছিলিম প্রস্তুত করিয়া হাতে ধরাইয়া দিল এবং দূরে পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আমি ভাবিতেছি,—এক জীবনেই যেন চক্র সম্পূর্ণ হইয়া গেল—ব্যাস্ তারপর আর কোনই সম্বন্ধ নাই। তারপর আবার মনে হইল ঠিক যেন বিরাট পথে পথিকের সঙ্গে দেখার মত—মধ্যে কতকটা পথ একসঙ্গে চলিয়া শেষে আর যেন সম্বন্ধ নাই,—তাহা হইলে দার্শনিকেরা যেমন বলিয়া থাকে। এ কথাটা কিন্তু অত্যন্ত স্থূল।

ইতিমধ্যে বাবা কখন কলিকার কাজ শেষ করিয়াছেন লক্ষ্য ছিল না, হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, বলিতেছেন : না না, এক জন্মেই সব শেষ হবে কেন, আসলে দুজনের শেষ একসঙ্গেই হবে যে!

শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : সে কখন, জন্মান্তরে নাকি ?

তিনি বলিলেন : জন্মান্তর ? ও ত দিনরাতের ব্যাপার! তার হতে যদি তোব কিছু ভালো হয়ে থাকে, তোর হতেও তার কিছু ভালো ত হয়েছে বটে ? তুইও যেমন তাকে চাস, সেও ত তোকে তেমনি চায়, তু যেমন তাকে ছাডতে চাস নাই সেও ত তোকে ছাড়তে চায় নাই—দুজনা দুজনার কাজ গুছিয়ে ল্যায় যে! ছাডাছাড়ি এই শরীরটাতে হোলো, কিন্তু বাকি সবই রইলো। যতক্ষণ না শেষের কাজ মিটে।

আমি : জীবন-সঙ্গিনী আবার জন্মজন্মান্তরেও ধাওয়া করেন নাকি ?

তিনি : ভয় করে নাকি তোর ? যথার্থই তুই য'দি তাকে চাস, সত্যই তোর টান যদি থাকে তবেই তো ধাওয়া, যদি তা না থাকে তবে কে তোকে ধরতে যাবেক, কার এত মাথা-ব্যথা বল্ দিকি ?

৬

তারাপীঠে বামার সঙ্গ আরও কিছুদিন, বোধ হয় দশ-বারো দিন পাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে যে কয়টি দিনের ব্যাপাব আমার মধ্যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা বলিয়াই ক্ষ্যাপা বাবার প্রসঙ্গ শেষ কবিব।

একদিন সকালে দেখি, তাঁর ঐ চালার মধ্যেই তিন-চারজন ভক্ত, তার সঙ্গে ক্ষ্যাপা বাবাও আছেন। বাবা একেবারে চুপচাপ বসিয়া আছেন, মনটা বোধ হয় ভাল ছিল না, কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব তাঁর মুখে। শরীরটা বাঁকিয়া গিয়াছে, -সোজা বসিতে পারেন না, তাহার উপর অসুস্থ শবীর। কুকুরগুলি ঠিক কাছেই আছে, লালি, শ্বেতফুলি, কেলো, ভুলো এরা সব বাবার সাঙ্গপাঙ্গ। এদের সম্বন্ধে তাঁর যে ভাব তা অসাধারণ। অসাধারণ এইজন্যই বলিতেছি যে আমরা বা আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ কুকুর পুষি অনেকটা সখের খাতিরেই, তাও আবার উহা য়ুরোপীয় সভ্যতার অনুকরণেই। আবার একদল বাড়ি হইতে চোরছ্যাঁচড় তাড়াইবার জন্য পোষে, আবার এক শ্রেণীর গৃহস্থ কুকুর পোষে, পায়রা পাখি পোষে, বিড়াল পোষে জীবে দয়া আছে তাই। তবে এই শেষের ভাবটা খুব কম লোকেরই হয়। কিন্তু ক্ষ্যাপা বাবা তাঁর এই

কুকুরগুলিকে যেভাবে দেখেন তা ঠিকমত বিচার করিলে তাহাকে অপত্যস্নেহ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। বাপ তার ছেলে ও মেয়েকে যেভাবে দেখিয়া থাকেন—কেলো, ভুলো, শ্বেতফুলি প্রভৃতিকে তিনি ঠিক সেইভাবেই দেখিয়া থাকেন একথা বলিলে কিছুমাত্র বেশী বলা হয় না। যাই হোক এই কুকুরের মধ্যে শ্বেতফুলি যেটি, সেটি সে সময় ছিল গর্ভবতী। আজ সকালে এখন দেখি বাবা তার পিঠে হাত বুলাইতেছেন। আমি কিছুই আশ্চর্য হই নাই, চুপ করিয়াই দেখিতেছিলাম। হাত বুলাইতে বুলাইতে বাবা একজনের দিকে ফিরিয়া—বোধ হয় নগেন পাণ্ডাই হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন,—আর কতদিন আছে বল্ দিকি এর বাচ্ছা হতে? সে বলিল,—এই শীঘ্রই হবে বোধ হয়। বাবা বলিলেন, এইবার প্রথম কিনা তাই ভয়-তা কি রকম হবে বল্ তো?

সে বলিল,—কোন চিন্তা নেই বাবা, মায়ের দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক মনে হয় দূরস্থ ভক্তই হইবেন, তিনি বলিলেন,—এগুলি সব ঠিক যেন আপনার সন্তান—এমনটা আর কোথাও দেখিনি।

বাবা একবার সেই ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন, আমার সন্তান? ঐ তারা মায়ের সন্তান। এখানে যারা আছে সব তারা মায়ের। এরা কেউ ছোট জীব নয়। কৈ নিয়ে যাও দিকি এদের কোথাও এখান থেকে,—পারবে না, কখনো পারবে না। এরা সবাই মায়ের আশ্রিত।

এই পর্য্যন্ত ঐ কুকুর সম্বন্ধে কথা তখন হইয়াছিল,—তারপর আমি উঠিয়া গেলাম। দেখিলাম, আমার কথা এখন হইবে না—এরা ত এখন কেহই উঠিবে না, গাঁজা ডলাই-মালাই হইতেছে, উহা শেষ হইতে অনেক দেরি,—অন্য সময়ে একবার চেষ্টা করিব। দুই এক দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবার প্রবন্ধ আছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম হইয়া গেলে বৈকালের দিকে গিয়াছি, তখন একা বসিয়া একটা বালিসে হেলান দিয়া,- আর কেহই নাই। উত্তম সুযোগ বুঝিয়া বসিবা মাত্রই তিনি বলিলেন, —আমি ত তুমার কথাই ভাবছিলাম —কি ব্যাপারটা বল দেখি?

আমি বলিলাম, আপনি যে ঐ কুকুরগুলিকে মায়ের আশ্রিত সন্তান বললেন, সেটা কি রকম তাই জিজ্ঞাসা করচি।

ওরা ত মায়ের আশ্রিতই বটে, ওরা সব মায়ের ভক্ত, জন্ম-জন্মান্তরের কর্মক্ষয় করতেই এখানে রয়েচে, ওরা সবাই সাধুলোক।

সাধুলোক ? – এই সাধুলোক বলতে আমি কি বুঝবো দয়া করে বলুন—

দেখ্ তোরা ভারি তর্ক করিস্, আমি ত বললুম—তবুও বুঝতে নারলি ? ওরা কত তপস্যা করেচে—কত সাধন করেচে তবে না এখানে মায়ের থানে এসে থাকতে পেয়েচে ? তুই থাক্ দিকি কতো দিন এখানে থাকতে পারবি ? তা হচ্চে না বাবা, মা তোকে রাখবেন না, তোকে যেতেই হবে।

আমি ত যাব যাব করেই এখানকার দিনগুলি কাটাইতেছি—মন ত উঠিয়াছে, বুদ্ধি কেবল আরও কিছু পাইবার আশায় ধৈর্য্য ধরিয়া বিলম্ব ঘটাইাতছে !

সেদিন আর কোন কথাই হইল না—প্রকাণ্ড একদল যাত্রা প্রায় বারো-পনেরো জন মেয়ে-মরদ ছানা-পোনা সিউড়ি হইতে আসিয়া হাজির হইল ঐ আশ্রমে। আমি তো উঠিলাম।

বীরভূম ছাড়িয়া যাইব ঠিক করিয়াছি—এবার কামাখ্যা কামরূপের দিকে মন টানিতেছে। কিন্তু বামার কাছে যেন আরও কিছু পাইবার বস্তু আছে এই আশাতেই এখনও যাইতে পারি নাই। মনে হয় এমন মানুষ গেলে আর হইবার নয়।

অনেকেই জানেন না যে বামাই বীরভূমকে গত চল্লিশ বৎসর সাধন-কেন্দ্ররূপে জাগ্রত রাখিয়াছেন। এই জাগানোর একটা ইতিহাস আছে। বীরভূম এমনই স্থান যেখানে তন্ত্রধর্ম্মের অভ্যুদয়-কাল হইতে কোন-না-কোন মহাত্মা বা তন্ত্রমতে সিদ্ধযোগী, কোন-না-কোন সিদ্ধস্থান আশ্রয় করিয়া তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তি প্রসারিত এবং এই ভূমির লোকসমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন যাহা পরবর্ত্তী সাধকগণের পক্ষে সিদ্ধিলাভের পথ সুগম করিতেছে। এই বীরভূমই কখনও দীর্ঘকাল সাধক-সিদ্ধ-কৌল-শূন্য ছিল না। কতকাল হইতে, যাঁরা যাঁরা এই বীরাচারের ক্ষেত্রে, কোন না-কোন সিদ্ধ-পীঠের সিদ্ধাসন আশ্রয় করিয়া সিদ্ধিলাভের পর বহুদিন পর্য্যন্ত তন্ত্রমাহাত্ম্য সজীব রাখিয়াছেন,—পর পর তাঁহাদের নাম একদিন কথাপ্রসঙ্গে ক্ষ্যাপা বাবা বলিয়া দিলেন। সেখানে নগেন পাণ্ডাও ছিল। আগেই বলিয়াছি এই নগেন, যদিও লোকটার অধ্যাত্ম-রাজ্যে বড় বেশী অধিকার হয় নাই কারণ তাহার পার্থিব কামিনীকাঞ্চনে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল তথাপি বাবা তাকে

কতকটা আলগা দিতেন। তিনি বলিতেন, হোক কেনে ঢেঁটা, মনিষটার বুদ্ধি আছে, চালাক বটে—অত বুদ্ধি কারও নাই। বাবা সেদিন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধপীঠের সিদ্ধকৌলগণের নাম করিলেন, আমরা সবাই আগ্রহপূর্ব্বক শুনিতেছিলাম। যখন তিনি চুপ করিলেন তখন নগেন জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, আপনার পর আর কে এখানকার মাহাত্ম্য রাখবে? উপস্থিত এমন ত কাকেও এখানে দেখি না। বোধ হয় শেষ হয়ে গেল তন্ত্রের সিদ্ধি।

ঐটুকু শুনিয়াই তিনি বাধা দিয়া বলিলেন,—মা তারার ইচ্ছা, তিনি আবার কাকেও রাখবেন থানে;—কেন?—আমাদের তারা, (অর্থাৎ তারানাথ, তাঁর শিষ্য) সে হবে না কেউ একজন?*

শুনিয়া নগেন কি যেন একটা কথা বলিতে গেল কিন্তু তাকে বলিতে হইল না, —বাবা স্বয়ং যেন বুঝিয়াই বলিলেন, ওটার একটা দোষ আছে বটে,—উ বড্ড রাগী মনিষ বটে,—ওটি থাকতে সিদ্ধি নাই।

নগেন বলিয়া ফেলিল, বড্ড অহঙ্কার, দম্ভও আছে। শুনিয়া বাবা খুশি হইলেন না। বলিলেন—তারা মায়ের ইচ্ছা হয়ত—ওসব দোষ যেতে কতক্ষণ? ও গলদ থাকবে নাই, এখন থেকে ওর নজর পড়েছে দেখিস নাই?

এই পর্য্যন্ত কথা। নগেনের একটু যেন ঈর্ষার ভাব ছিল তাহার উপর। তারা বাবাকে খুব বশ করেচে একথাও নগেনের মুখে একবার শুনিয়াছিলাম। আসলে তারা একটু স্বাধীন প্রকৃতির লোক,—এখানে তার মত শক্তিশালী আর কেউ নাই সেই জন্যই বাবা তাকে বেশী ভালবাসেন। এ বিষয়ে তারা,—হয়তো একটু অধিক মাত্রায় সচেতন ছিল। একবার মাত্র তাকে বাবার কাছে দেখিয়াছিলাম। তাহার শক্তির দম্ভ তখনই তাহার ব্যবহারে প্রকট ছিল।

যাক্ সেদিনের কথা ঐ পর্য্যন্ত। তারপর দিন সকালে বাবার আড্ডায় কড়া তামুক চলিতেছিল,—বাবার আসনের পাশেই, একরকম গা ঘেঁষিয়া সাদা কুকুরটি শুইয়াছিল। সে এখন বাবার কাছ-ছাড়া হয় না। শুধু গর্ভবতী নয়, বোধ হয় আসন্নপ্রসবা। বাবা বলিলেন, শ্বেতফুলিটা কেমন দুর্ব্বল বোধ হঁচে না রে?—

নগেন ছিল, রহস্য করিয়া বলিল,—এইবার আঁতুড়ের ব্যবস্থা আর একটা দাইয়ের দরকার যে বাবা?

---

* এ সম্বন্ধে বাবার মন্তব্য ভিত্তিশূন্য প্রমাণিত হয় নাই,—তাঁর অন্তর্দৃষ্টিই তাঁহাকে দেখাইয়াছিল যে তারানাথ সিদ্ধ হইয়া কালে তন্ত্রসাধনার ধারা বজায় রাখিবে। তবে উত্তরকালে তাঁহাকে আসন পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। শেষে তারার আসন ছিল বহরমপুরের গঙ্গাতীরে।

বাবা, বালকের মত সরল,—বলিলেন, তাই ত বটে রে, তুই কেনে একটু তল্লাস কর না বাবা, গাঁয়ের মধ্যে তোদের জানাশোনা আছে সব? নগেন বলিল, ভাবচেন কেনে আপনি,—মা তারা সব ঠিক করে দেবেন। বাবা পরম আহ্লাদিত হইলেন, বলিলেন,—তা বটে তো, তবু কেমন ভয় লাগেরে—বাঁচবে তো? কটা বাচ্চা হয়রে?—আমি ত দেখি নাই, তু জানিস?

নগেন বলিল, তা দুটো থেকে চারটে পর্য্যন্ত হয় বাবা।

আমার ভাল লাগিল না এইসব কথা, উঠিয়া যাইব কিনা ভাবিতেছি,—বাবার নজরটা ক্ষীণ হইলেও সেই বড় বড় চোখ দুটি অতি করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের উপর ধরিলেন এবং মনের ভাবটি তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিলেন,—বাবা এবার যাবার সময় জ্ঞানের পুঁটলি বোঝাই দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টায় আছ বটে! কুত্তোর কথায় কিছু জ্ঞান নাই, তাই উঠিবে কিনা ভাবচো বটে!—এঁ্যা? না কি বল ত ঠিক করে!

বাধ্য হইয়াই সত্য বলিলাম। তখন বাবা খতকটা সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন— এই তো বুদ্ধি তুমার গো,- তাই বলচি। কুকুর কি মানুষ লয়, মা জগদম্বার সৃষ্টি লয় বটে?

আমি হাসিয়া বলিলাম, কুকুর মানুষ?

বাবা বলিলেন,- মানুষ লয়?—এমন সময় ভুলো কোথা হইতে আসিয়া বাবার কাছেই তার ল্যাজের উপর বসিল এবং অতি সহজভাবে, বেশ বুদ্ধিমানের মত যেন বাবার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাইল - মনে হইল এখানকার কথা শুনিতে আসিয়াছে, সে যেন আমাদেরই একজন। আমি অন্তঃকরণের মধ্যে যেন সত্যই কিছু একটা অনুভব করিলাম,—অদ্ভুত অনুভূতি। বাবা বলিলেন,—কোলকাতার বাবু — এসব তুমাদের কালেজের পুঁথিতে লিখা নাই যে গো।

তারপর কেলোও আসিল, সেও ঐ ভাবে ল্যাজের উপর বসিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। অন্য সময় দেখিয়াছি তার চক্ষু দুটি বড় ভয়ানক, যেন জ্বলিতেছে—কিন্তু এখন দেখি অতীব করুণ দৃষ্টি লইয়া মধ্যে মধ্যে মাথাটি নীচু করিয়া কুঁই কুঁই শব্দ করিতেছে; আমার ভয় ছিল কুকুরটাকে,—তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সময় সময় ওখানকার অনেক যাত্রীরই ভয়ের কারণ ছিল কিন্তু সে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই। বাবা বলিতেন, ছদ্মবেশে কেলোটা চণ্ড-ভৈরব। তাহাকে অধিকাংশ সময়েই মায়ের মন্দির, দ্বারে শুইয়া আছে দেখা যাইত। আরও একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি—বাবার কাছে সকলেই একসঙ্গে

জুটিত,—কিন্তু অন্য কোথাও, বাবার আশ্রমের বাহিরে আসিলেই তৎক্ষণাৎ সে সঙ্গছাড়া হইত। সে ছিল নির্ব্বিবাদী,– কখনও কাহাকেও আক্রমণ করিত না। অনেক সময় ভোজনশেষে কেহ পাতের ভাত ঘাটের ধারে ফেলিয়া দিল—কেলো আসিতেছিল, এমন সময়ে দৌড়িয়া আসিল ভুলো বা অন্য কোন কুকুর। পাতার কাছে ভুলোকে দেখিবা মাত্রই কেলো মুখ নীচু করিয়া চলিয়া গেল, তা সত্ত্বেও ভুলো গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। কালো বলিয়াই বোধ হয় তার মধ্যে কতকটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ছিল। সে যেন দল-ছাড়া আলাদা—এটা সবাই লক্ষ্য করিত। তথাপি সবাই তাহাকে, তাহার ভয়ানক কালো রূপটিকে ভয় করিত।

এইভাবে যখন কেলোর দিকে চাহিয়া বাবা আবার সেই কথাটা বলিলেন, এরা মানুষ নয় ?

তখন নগেন পাণ্ডা বলিল, বাবা আপনার কথার মর্ম্ম এরা ধরতে পারচেন না,—একটু খুলে বলতে হবে।

বাবা বলিলেন,—এঁর আবার খোলাখুলি কি আছে, যেমন তুমি আমি মানুষ তেমনি কেলো ভুলোও মানুষ, এর আবার লুকোনো কি আছে ?

শুনিয়া আমি বলিলাম, আমরা এখানে যতগুলি আছি সবাই ত আপনার এগুলিকে কুকুরই দেখচি।

বাবা জোড় হাতে নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমার কেন হবে, ওরা মায়ের ভক্ত,—মা-ই ত ওদের ঐ মূর্ত্তি দিয়েচেন ? নয় ? আমি জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে তখন একটু থামিয়া আবার বলিলেন, ধরো না কেনে তুমি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়া ভৈরব হয়েচ, সাধনভজন করচো। ক্রমে ক্রমে তুমি বেশ এগোয়ে যেতে লাগলে, শক্তি পেয়ে জোর সাধনা চোললো। ক্রমে তোমার শক্তির পর শক্তি পাবার লোভ জাগতে লাগলো। বীরের সাধনে লেগে গেলে, ক্রমে শক্তি লাভও হোলো—যেমনটি চাইছিলে, মায়ের কৃপায় ; তারপর কাঁচা তান্ত্রিক সাধকদের যা হয়ে থাকে তাই হোলো তোমার—ইষ্টের দিক থেকে দিষ্টি গেল কিনা শক্তি চালনার দিকে, ভোগের নেশা, এত বড় শত্রু সাধকের আর নাই যে বাবা, কাছে গুরু নাই যে সাবধান করবেন। তখন চার হাত পায় ভোগে লেগে রইলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির বশে—(এখানে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করলেন তা লিখিয়া সাধারণের চক্ষের সামনে ধরা যায় না) এমন সব জঘন্য, কুৎসিত ভোগে মেতে রইলে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য

বাবা, বালকের মত সরল,—বলিলেন, তাই ত বটে রে, তুই কেনে একটু তল্লাস কর না বাবা, গাঁয়ের মধ্যে তোদের জানাশোনা আছে সব? নগেন বলিল, ভাবচেন কেনে আপনি,—মা তারা সব ঠিক করে দেবেন। বাবা পরম আহ্লাদিত হইলেন, বলিলেন,—তা বটে তো, তবু কেমন ভয় লাগেরে—বাঁচবে তো? কটা বাচ্চা হয়রে?—আমি ত দেখি নাই, তু জানিস?

নগেন বলিল, তা দুটো থেকে চারটে পর্য্যন্ত হয় বাবা।

আমার ভাল লাগিল না এইসব কথা, উঠিয়া যাইব কিনা ভাবিতেছি,—বাবার নজরটা ক্ষীণ হইলেও সেই বড় বড় চোখ দুটি অতি করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের উপর ধরিলেন এবং মনের ভাবটি তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিলেন,—বাবা এবার যাবার সময় জ্ঞানের পুঁটলি বোঝাই দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টায় আছ বটে! কুত্তোর কথায় কিছু জ্ঞান নাই, তাই উঠিবে কিনা ভাবচো বটে।—এ্যা? না কি বল ত ঠিক করে।

বাধ্য হইয়াই সত্য বলিলাম। তখন বাবা একটা সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন- এই তো বুদ্ধি তুমার গো,- তাই বলচি। কুকুর কি মানুষ লয়, মা জগদম্বার সৃষ্টি লয় বটে?

আমি হাসিয়া বলিলাম, কুকুর মানুষ?

বাবা বলিলেন,- মানুষ লয়?—এমন সময় ভুলো কোথা হইতে আসিয়া বাবার কাছেই তার ল্যাজের উপর বসিল এবং অতি সহজভাবে, বেশ বুদ্ধিমানের মত যেন বাবার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাইল - মনে হইল এখানকার কথা শুনিতে আসিয়াছে, সে যেন আমাদেরই একজন। আমি অন্তঃকরণের মধ্যে যেন সত্যই কিছু একটা অনুভব করিলাম,—অদ্ভুত অনুভূতি। বাবা বলিলেন,—কোলকাতার বাবু—এসব তুমাদের কালেজের পুথিতে লিখা নাই যে গো।

তারপর কেলোও আসিল, সেও ঐ ভাবে ল্যাজের উপর বসিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। অন্য সময় দেখিয়াছি তার চক্ষু দুটি বড় ভয়ানক, যেন জ্বলিতেছে—কিন্তু এখন দেখি অতীব করুণ দৃষ্টি লইয়া মধ্যে মধ্যে মাথাটি নীচু করিয়া কুঁই কুঁই শব্দ করিতেছে, আমার ভয় ছিল কুকুরটাকে,—তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সময় সময় ওখানকার অনেক যাত্রীরই ভয়ের কারণ ছিল কিন্তু সে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই। বাবা বলিতেন, ছদ্মবেশে কেলোটা চণ্ড-ভৈরব। তাহাকে অধিকাংশ সময়েই মায়ের মন্দির-দ্বারে শুইয়া আছে দেখা যাইত। আরও একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি—বাবার কাছে সকলেই একসঙ্গে

জুটিত,—কিন্তু অন্য কোথাও, বাবার আশ্রমের বাহিরে আসিলেই তৎক্ষণাৎ সে সঙ্গছাড়া হইত। সে ছিল নির্ব্বিবাদী,—কখনও কাহাকেও আক্রমণ করিত না। অনেক সময় ভোজনশেষে কেহ পাতের ভাত ঘাটের ধারে ফেলিয়া দিল—কেলো আসিতেছিল, এমন সময়ে দৌড়িয়া আসিল ভুলো বা অন্য কোন কুকুর। পাতার কাছে ভুলোকে দেখিবা মাত্রই কেলো মুখ নীচু করিয়া চলিয়া গেল, তা সত্ত্বেও ভুলো গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। কালো বলিয়াই বোধ হয় তার মধ্যে কতকটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ছিল। সে যেন দল-ছাড়া আলাদা—এটা সবাই লক্ষ্য করিত। তথাপি সবাই তাহাকে, তাহার ভয়ানক কালো রূপটিকে ভয় করিত।

এইভাবে যখন কেলোর দিকে চাহিয়া বাবা আবার সেই কথাটা বলিলেন, এরা মানুষ নয় ?

তখন নগেন পাণ্ডা বলিল, বাবা আপনার কথার মর্ম্ম এরা ধরতে পারচেন না,—একটু খুলে বলতে হবে।

বাবা বলিলেন,—এঁর আবার খোলাখুলি কি আছে, যেমন তুমি আমি মানুষ তেমনি কেলো ভুলোও মানুষ, এর আবার লুকোনো কি আছে ?

শুনিয়া আমি বলিলাম, আমরা এখানে যতগুলি আছি সবাই ত আপনার এগুলিকে কুকুরই দেখচি।

বাবা জোড় হাতে নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমার কেন হবে, ওরা মায়ের ভক্ত,—মা-ই ত ওদের ঐ মূর্ত্তি দিয়েচেন ? নয় ? আমি জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে তখন একটু থামিয়া আবার বলিলেন, ধরো না কেনে তুমি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়া ভৈরব হয়েচ, সাধনভজন করচো। ক্রমে ক্রমে তুমি বেশ এগোয়ে যেতে লাগলে, শক্তি পেয়ে জোর সাধনা চোললো। ক্রমে তোমার শক্তির পর শক্তি পাবার লোভ জাগতে লাগলো। বীরের সাধনে লেগে গেলে, ক্রমে শক্তি লাভও হোলো—যেমনটি চাইছিলে, মায়ের কৃপায় ; তারপর কাঁচা তান্ত্রিক সাধকদের যা হয়ে থাকে তাই হোলো তোমার—ইষ্টের দিক থেকে দিষ্টি গেল কিনা শক্তি চালনার দিকে, ভোগের নেশা, এত বড় শত্রু সাধকের আর নাই যে বাবা, কাছে গুরু নাই যে সাবধান করবেন। তখন চার হাত পায় ভোগে লেগে রইলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির বশে—(এখানে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করলেন তা লিখিয়া সাধারণের চক্ষের সামনে ধরা যায় না) এমন সব জঘন্য, কুৎসিত ভোগে মেতে রইলে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য

হয়ে, যা মানুষের নিয়মের বাইরে। শেষে ডুবলে। মায়ের সৃষ্টির নিয়ম ভাঙলে, তুমি এমন কাজ করলে যাতে মানুষের পর্য্যায়ে আর তোমাকে ফেলা যায় না। তখন মা তোমাকে দণ্ড করবেন নাই? তাই ত—(কেলোর দিকে দেখাইয়া) তাই ত এখন ঐ কেলো কুকুব হয়ে—মায়ের দুয়ারে পড়ে আছে। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর শ্মশানে যেয়ে আকাশের দিকে নাক উঁচু করে করে কাঁদে,—শুন নাই?

অতটা লক্ষ্য করি নাই, এই কথা বলাতে তিনি বলিলেন,—আজ শুনো কেন্নে, রেতের আরতি করে ভোগ শীতল হয়ে গেলে পর, এখানে বসেই একটু কান কবে শুনলেই ওর কান্না শুনতে পাবে। এরা সবাই শুনেচে কত দিন, নয় নগেন বাবা?

নগেন বলিল, আমরা ত রোজই শুনি, উনি শুনেন নাই কাজেই এটা নতুন লাগে বৈকি?

আমাব মনে আর তিল-মাত্র সন্দেহ রহিল না তাঁহার কথায়। যদিও সেই রাত্রেই উহা আমি শুনিয়াছিলাম। কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমার ধারণা ছিল যে মানুষ হইয়া ক্রমবিকাশের ফলে উন্নত পর্য্যায়ে পৌঁছিবার পর আর পশুযোনিতে অবনতি অর্থাৎ বিলোমগতি সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে। সুখ বা উৎকট দুঃখ ভোগ যাহা কর্ম্মাস্তিকের ফলে ভোগ হয় তাহা মানুষজন্মেই হবে।

আমার মনের কথাটা বাবা বুঝিয়া ফেলিলেন, বলিলেন: আরে বাবা গোলকধাম খেলো নাই? ছয় চিতে নরকে গমন,—সাত চিতে রসাতলে গমন?

—ঐ ত রসাতলের ; নরকের কথা। তারপর আবার কবে ভোগ কাটবে কে জানে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ওর কি পূর্ব্বজন্মের স্পষ্ট রকমের স্মৃতি আছে? বাবা বলিলেন,—যেটুকু থাকলে ওর পাতকের জন্য মনটা পুড়বে সেইটুকুই আছে আবার সব কিছুর দরকার কি? এক এক সময় এখানকার সব কথা শুনে ওর চোখ দিয়ে জল পড়ে দেখেছি, কতক কতক বুঝে বৈকি?—নয়, নগেন বাবা?

নগেন বাবা একটু ডিপ্লোম্যাসির সঙ্গে বলিলেন, বাবা আপনি যেমন এসব স্পষ্ট দেখেন বা বুঝেন আমরা ত তা দেখি না, আপনার কথায় বিশ্বাস করি, তাই মনে হয় যেন বুঝেছি। সে দৃষ্টি তো আমাদের নাই,—আশীর্ব্বাদ করুন বাবা শেষ পর্য্যন্ত আপনাতে ভক্তি আমাদের অচলা থাকে। বলিয়া পায়ের ধুলা লইতে গেলেন। বাবা পা সরাইয়া লইলেন, বলিলেন—শালার মায়ের চরণে বুদ্ধি গেল না, ভক্তি হোলো না—আমার এই ভাঙা হাঁড়ির উপর ভক্তি দেখাতে এলেন—তু শালা চোর কোথাকার।

নগেনের মুখখানা ক্ষণেকের তরে যেন একটু বিমর্ষ হইয়া গেল। কিন্তু এতগুলি লোকের সামনে অপ্রতিভ হইবার পাত্রই নয় সে, সপ্রতিভভাবে তৎক্ষণাৎ আবার বলিল, বাবা আপনাকে ধরেই না মায়ের নাগাল পাবো, ঐ হাঁড়ি ভাঙা হোক ফুটা হোক উয়াতেই এখন আমরা আমাদের খোরাক পাক করে নেবো।

শুনিয়া বাবা প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন: নগেন বাবাকে পারবার যো নাই,—কৈ বাবা, একটু তামুক চলুক না কেনে।

ভোগবিকৃতির কি ভয়ঙ্কর পরিণাম! এতটা সাধনার পর ঐ অবস্থা? অনাচারের পরিণাম-ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আমার অন্তরে ঐ প্রসঙ্গ লইয়াই প্রবল আলোড়ন চলিতেছিল। এই মহাত্মার কথাগুলি, আমার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষবৎ অনুভূতি জাগাইয়াছিল,—এখন উহা যেন আঘাতের মতই পীড়াদায়ক হইয়া হয়তো বাহিরে, মুখে কিছু ভাব ফুটাইয়া থাকিবে, বাবা তাহাতেই বুঝিয়াছিলেন- আমার অন্তরে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এখন তিনি সস্নেহে বলিলেন,—দেখতে হয়, বাবা! এই মনিষ জনম, কত বড় দুর্লভ পদার্থ,—এখানে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে যদি মা মহামায়াকে না জানলে, যদি খানিক উপর ছুঁয়ে না উঠতে পারলে তবে আর হোলো কি?

এ সত্য বচন প্রত্যক্ষের মতই শক্তিশালী,—ভগবৎবাণীর মতই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া ওখানকার সবাইকেই অভিভূত করিল। তিনি আবার বলিলেন,—মেয়ামানুষ, ধন, প্রভুত্ব করবার মোহ এর পিছনেই সবাই দৌড়াচ্ছে নাই? বল না বাবা? উয়ার পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করতে করতেই পরমায়ুটুকু ফুরায় ত কি আর হোলো মনিষ হয়ে জন্মে—বুঝেই দেখ না কেনে, বাবা!—বলিয়া সবার দিকেই এক-একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

সত্য! হায় হায় আমরা কি অকর্ম্মের পিছনেই না ছুটিতেছি, কি ভাবে জীবনের দিনগুলি কাটাইতেছি। আমাদের মধ্যে সবাই ত নিজ নিজ দুর্ব্বলতায় এক একবার সচেতন হইয়া উঠে,—বিশেষতঃ কোন কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ দেখিলে অথবা কোন আপ্ত পুরুষের বাণী শুনিলে বা তাঁহাদের সত্য অভিজ্ঞতার আলো দেখিলে। তখন কতক সময় হয়তো সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু বিশ্বাস কি আমার এই ভোগমুখী মনবুদ্ধিযুক্ত 'আমি' জ্ঞানকে? ভোগের পিছনে ছুটিবার ফলে পরিণাম কি হইতে পারে এই জ্ঞান কতক্ষণ আমায় রক্ষা করিতে পারে, যদি কোন ভোগের অনুকূল অবস্থার যোগাযোগ ঘটে? ডুবাইতে কতক্ষণ ঐ সাময়িক জ্ঞানকে? ইচ্ছামত শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে সর্ব্ব সময়ে বর্ত্তমান, ইহার সঙ্গে ভোগ-প্রবৃত্তির যোগাযোগ,—চাঁদে চূড়ার মতই,—বলিয়াই ধরিতে পারিলাম। সুধাময় তন্ময়তায়, মন বুদ্ধি শুদ্ধভাবে যখন উচ্চ-স্তরেই রহিয়াছে, অহংবুদ্ধি অধ্যাত্ম চৈতন্যমুখী হইয়া বেশ কতক সময় রহিল, তারপর কর্ম্মান্তরে যখন যাইতে হইল তখনও তাহার রেশ রহিয়াছে,—কর্ম্মও চলিতেছে তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদও রহিয়াছে। এমনই সময়, যে রিপুর প্রভাবে আমি দুর্ব্বল, যাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে সময় সময় কায়মনো-বাক্যে ছটফট করিয়াছি, শরীর-মনে কঠোরতা পর্য্যন্ত কতই না করিয়াছি,—ভাবের ঘরে চুরি না করিয়াই করিয়াছি, সংসারধর্ম্ম সম্পর্কে আবার এমনই এক যোগাযোগের মধ্যে পড়িলাম, যাহার ফলে কাজে না করিলেও মনের মধ্যে বেশ অনেকটাই ঘুরপাক খাওয়াইয়া দিল। কোথায় নামিয়া গেলাম তাহার ঠিক নাই। অনুশোচনায় কাতর হইলেও পরিত্রাণ নাই। দফায় দফায় অতর্কিতে ঠিক আক্রমণ করিবেই। ভোগ-প্রবৃত্তি যেন ওৎ পাতিয়াই বসিয়া আছে। প্রত্যক্ষই দেখিয়াছি যে যে বিষয়ে দুর্ব্বল, অর্থাৎ জীবনের কোনকালে ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি প্রবল মনকে প্রশ্রয় দিয়াছে তাহাদের দ্বারাই প্রবৃত্তিমূলক সকল অকার্য্যই সম্ভব! গুরুশক্তির পূর্ণ আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহাদের পরিত্রাণ নাই।

বাবা আমার দিকে চাহিয়া, ঠিক যেন স্বচ্ছ দর্পণের মতই আমার মনের ছবি দেখিতে পাইতেছেন এইভাবেই করুণার্দ্র হইয়া বলিলেন,—ভয় নাই বাবা, তোমাদের ভয় নাই। মা যে তোমাদের সব সময়েই দেখছেন, তোমরা যে মায়ের শরণাগত।

সত্য সত্যই,—ঐ কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে বল, সাহস এবং আত্মবিশ্বাস প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনুভব করিলাম মহতের কৃপা। তাঁহার চরণে হাত দিলাম তারপর সেই হাত মাথায় রাখিলাম।

তারপর আজিকার মত উঠিব কিনা ভাবিতেছি, দেখি একে একে নগেন পাণ্ডা প্রভৃতি দু'তিনজন যাহারা ছিল সবাই উঠিয়া পড়িল। দেখিয়া আমি আর উঠিলাম না। কেবল বাবার সেবক ছোকরাটি রহিল। পরে বাবার হুকুমে সে ঘরের ভিতরে কি একটা কাজে গেল। আমি তখন কাছ ঘেঁষিয়া বাবার পা হাত দিয়া ধরিলাম, বলিলাম, শুনেছি আপনি কুমার ব্রহ্মচারী, কামজিৎ উর্ধ্বরেতা, আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি ঐ ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থেকে মুক্তি পাই। ও প্রবৃত্তি আমার মধ্যে উৎকট ভাবেই রয়েছে। তাই আমার ভয় খুব বেশী।

শুনিবা মাত্র বাবা পায়ের উপর রাখা হাত দুটি নিজের দুটি হাত দিয়া ধরিলেন;—তারপর এক অদ্ভুত বিস্ময়ের ভাব তাঁহার ঐ বিশাল নয়ন দুটিতে ফুটিয়া উঠিল, এমনই ভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আমি কুমার ব্রহ্মচারী? কার কাছে শুনেছ বাবা? লগেন বাবা বলেছে বটে?

আমি বলিলাম,—না, তিনি নয়, তবে এখানকারই একজন বলেছে।

বাবা বলিলেন,—সে লতুন এসেছে বোধ হয়,—জানে না, তুমায় ভুল বলেছে বাবা। আমরা তান্ত্রিক, এককালে ভৈরবী-চক্রে নিয়মমতোই না ক্রিয়া করেছি? -পঞ্চ-মকারের কোনটাই বাকি রাখিনি বাবা। তবে কখনও পাগল হয়ে ইন্দ্রিয়সুখের ভরাডুবি করিনি। বাবা এটুকু সত্যি মায়ের কৃপায়, ক্রিয়ার মধ্যেই সব শেষ করেছি, তা ঐ মদই বলো আর ভৈরবী মেয়েমানুষই বলো। গুরু ছিলেন কাছে, টিকি ছিল তাঁর হাতে বাঁধা, তাই পার হতে পেরেছি।

বাবা বলিলেন,-বালক-বেলা থেকে মাকে ধরেই পথ চলেছি, মাকে ধরে থাকলে আর ভয় নেই। ঐ মা-ই সকল সাধনই করিয়েছেন তন্ত্রের নিয়মে। গুরুরূপে কাছে কাছে থেকেই শেষ পর্য্যন্ত সাধন হয়ে গেলে তখন ছেড়েছেন,

আর তখন থেকেই মায়ের কোলকে বসে আছি গা। কিন্তু উ বড় কঠিন। একবার যে স্বাদ পেয়েছে তার আর গতি নাই। বাঘের ছা রক্তের স্বাদ পেলে আর রক্ষা নাই। সেইজন্য গোড়া থেকেই পথ বন্ধ করতে হয় যে বাবা, সে কি সবার হয়? মা আমাকে দিয়ে সৃষ্টি করাবেন নাই, তার আর ও কাজের দরকার হোলো না।—হাঁ ছাখো, বলিয়া আমার গা ঠেলিয়া বলিলেন: মন তোমার যতই সাধনের ভিতর বসবে,—ততই ওসব তুচ্ছ হয়ে যাবে। তুমাদের ত এখানকার তন্ত্রের সাধন লয়, তোমাদের শক্তি-চালাচালির ব্যাপার নাই—তোমাদের এসব ভয় নাই বাবা।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—হ্যাঁ ছাখো, একটি মেয়্যা, নিজ স্ত্রী ভোগ করলেই তো গেয়ান হয়ে গেল, সুখটা এই রকম। ও সুখ দু'রকম হয় না, এক স্ত্রী সম্ভোগেই ওর দফা শেষ করে দিতে হয়। বুদ্ধিমান, যারা গুরুশক্তির আশ্রয় পেয়েচে, যারা বুঝতে পারে রূপের মোহে মেয়্যামানুষ ঘাঁটা, ও নরক ঘাঁটা—নিবৃত্তিমার্গের মনিষকে মা ঠিক বুঝিয়ে দেন—ঐ ভাবের বুদ্ধি থেকেই সংযমের শক্তি আসে। এই সার কথা জেনে রাখ, বাবা।

আবার একটু থামিয়া বলিলেন,—হাঁ ছাখো, বাবা। একটা গূঢ় আছে এর মাঝে। পুরুষ অভিমান যাদের কঠিন, ষাঁড়ের পারা, তাদের হতে মা ছিষ্টি করায়ে নেন, ঐ ছিষ্টির জন্যেই তাঁদের কামের আগুন বেশী থাকে। গাঁয়ে দেখ নাই, গাই গরু কতো ষাঁড় একটা-দুটোই যথেষ্ট, তাতেই কত গরু হঁয়্যা যাবে।

বুঝিলাম।

আবার বলিলেন, তবে ছিষ্টির বীজ ভিতরে থাকতে সংযম, মিথ্যা কথা,—সে কখনও হবেক নাই।

আজ এইখানেই শেষ।

৭

ক্ষ্যাপা বাবার কাছেই শুনিয়াছি,—

তারাপীঠের সঙ্গে রাজা রামকৃষ্ণের সম্বন্ধ ছিল বড়ই ঘনিষ্ঠ। এখানে তিনি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁর প্রথম এখানে আসিবার কথা এইরূপ শুনা যায়,—এক সময়ে যখন তিনি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, তখন রাণী তাঁহাকে সামলাইয়া চলিতে বলেন। অর্থব্যয়ে তিনি বিচারশূন্য ছিলেন। কতকগুলি বেকার, কর্মহীন

অলস, ধর্ম্মের ভান করিয়া তাঁহার কাছে আসিত এবং স্থান পাইত,—এইজন্য রাণী একটু কঠিন হইয়াছিলেন। তাহাতে অভিমানভরে তিনি, আর কখনও নাটোরে ফিরিব না বলিয়া এখানে চলিয়া আসেন। রাণী কিছুই বলেন নাই বা বারণও করেন নাই। তাহাতে তাঁহার অভিমান দুর্জ্জয় হইয়া উঠে।

এখানে আসিবার পর এক অমাবস্যার রাত্রে তিনি এই তারা মন্দিরের মধ্যেই আসন করিয়া সারারাত্রি সাধনে কাটাইতে সংকল্প করিলেন। মন্দিরের ভোগারতির পর সবাই চলিয়া গেলে একলা উপস্থিত হইলেন,— এবং দ্বিপ্রহরে সন্ধিক্ষণে আসনে বসিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। ক্রমে,—আসনেই তিনি যখন তন্ময় অবস্থায়, জপে অভিনিবিষ্টচিত্ত, দেখিলেন—মন্দিরদ্বার খোলা, ভিতরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর মূর্ত্তি। কিন্তু দেবীর মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিতেই দেখিলেন, দেবীর স্থানে রাণী চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। বিস্ময়-অভিভূত চিত্তে বার বার দেখিতে লাগিলেন, শরীর রোমাঞ্চিত হইল। প্রথমে ভ্রম মনে হইল, কিন্তু বারবারই রাণীর চতুর্ভুজা মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কিন্তু উঠিয়া আর সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। তখন দৈববাণী শুনিলেন, 'নাটোরে ফিরিয়া যাও, দেবীকে তুষ্ট করো, তিনি তুষ্ট হইলেই তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইবে। এই পীঠের দেবী, রাণী স্বয়ং।' রাজা পরদিনই নাটোরে ফিরিলেন।

পরে রাণী তাঁহাকে বীরাচার সাধনে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য শুনা যায় রাজা সাধনের অর্দ্ধপথে সাধনের ক্রমপরিবর্ত্তন করেন। রাণীর ভালবাসা স্নেহ যত ছিল, শাসনও ছিল ততটাই।

ক্ষ্যাপা বাবার কাছেই এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। শরীর ভাল থাকিলে তিনি মধ্যে মধ্যে মহা আনন্দেই সিদ্ধ ও সাধকগণের পুরানো বৃত্তান্ত বলিতে ভালবাসিতেন। রাণীর প্রতি ক্ষ্যাপার অসীম শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহাকে আদ্যাশক্তির অংশ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার কাছে রাণীর কাহিনী অনেকেই শুনিয়াছে। শেষ জীবনে রাণী কাশীতেই থাকিতেন। একান্তে নিজভাবে মগ্ন ও নিঃসঙ্গই থাকিতেন। শেষে তিনি অঙ্গে কোনপ্রকার বন্ধন রাখিতে পারিতেন না, বস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেইজন্য কারো তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার বা তাঁহার কাছে যাইবার অধিকার ছিল না। একটি দাসী মাত্র তাঁহার কাছে থাকিতে পাইত। শিশু বালিকার মতই তাঁহার স্বভাব হইয়াছিল। আপন-পর বিচাররহিত, তিনি দানে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। রাত্রি থাকিতে,

শীতের সময়েও একখানি কম্বল জড়াইয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িতেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া স্নান করিতে তাঁহার বড় আনন্দ হইত। সহজে উঠিতে চাহিতেন না। পূর্ব্ব গগনে অরুণোদয়ের আভাস পাইলে তখন উঠিতেন ও কম্বলখানি জড়াইয়া ছুটিতে ছুটিতে বিশ্বনাথ মন্দিরের পথে যাইতেন। সঙ্গে দোল্লাবাহক প্রভৃতি থাকিত কিন্তু ক্বচিৎ ব্যবহার করিতেন। বিশ্বেশ্বরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেই দ্বারবান দ্বার বন্ধ করিয়া দিত। যতক্ষণ ভিতরে রাণী থাকিতেন দ্বার খোলার হুকুম ছিল না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নিজ মহলে ফিরিয়া আসিতেন। সেইজন্য দীর্ঘকাল কাশীতে থাকিলেও কেহ তাঁহার দর্শন পাইত না। সেখানকার সবাই তাঁহাকে দেবী বলিয়া বিশ্বাস করিত। দান তাঁহার নিত্য এবং নৈমিত্তিক দুই প্রকারই ছিল।

যখন ব্রাহ্মণ বা দণ্ডীভোজন হইত তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিভৃতে নিঃসঙ্গ হইয়া বসিয়া বসিযা সব কিছুই দেখিতেন,—কোন ব্যাপারে কোন খুঁত বা ত্রুটি হইবার যো ছিল না; ত্রুটি হইলে কঠোর ব্যবস্থা ছিল, সেইজন্য তাঁহার নিয়ম সমুদয় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত। তাঁহার প্রতি ভালবাসা এবং ভক্তি নিজ দেশের স্বার ত ছিলই পবন্তু বিদেশীয়গণেরও ছিল।

তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদে কাশীতে সবাই মাতৃহীন হইলাম বলিয়া কাঁদিয়াছিল।

বাবার কাছে অতীতের কত কথা, সাধক সিদ্ধ এবং এ অঞ্চলেব মধ্যে যাঁহারা ঐতিহাসিক মহান্ কর্ম্মে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন, সেই সকল ব্যক্তিবর্গের কথা এতই আছে যে উহা সংগ্রহ করিতে পারিলে উৎকৃষ্ট একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়,—কে সে সকল লইয়া মাথা ঘামাইতেছে? লোকে অনেকেই ত আসে। তাঁহার কাছে আসে; থাকেও অনেকেই। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের ঐ গাঁজার কলকে পর্য্যন্তই গতি, ঐ প্রসাদ পাইয়াই চলিয়া যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করিতে চায় না ইহারা। বাবাও বেশ কাটাইতেছেন দিনগুলি এদের সঙ্গে। কোনও বিরক্তি নাই।

ক্ষ্যাপার কাছে ইতিমধ্যে একদিন কাঠিয়া বাবার কথাও শুনিয়াছিলাম। "কাঠিয়া বাবা" নামটি কেমন করিয়া তিনি পাইলেন, শুনিয়া তিতিক্ষার অভ্যাদ যে তখনকার দিনে কতটা কঠিন তাহা বুঝিতে পারা যায়। একটা কাঠের বেড় তিনি হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জ্জনী মিলাইয়া একটা গোল করিয়া দেখাইলেন, এতটা মোটা, প্রায় দু ইঞ্চি হইবে তার বেড়,—তাঁর কোমর বেড়িয়া সর্ব্বক্ষণ

থাকিত, তাহাতে কৌপীন বাঁধা হইত দুদিকে—পিছনে ও সামনে। ঐ কাঠের বেড় আজীবন তাঁর সাথী ছিল। সেই কাঠের বেড়টিই তাঁর নাম "কাঠিয়া বাবা" দিয়াছিল, গুরু তাঁকে কাঠিয়া নামেই ডাকিতেন। গুরু, তাঁর তিতিক্ষা অভ্যাসের প্রাথমিক ব্যবস্থা ঐ রূপই করিয়াছিলেন। ইহাতে অলসভাবে শুইয়া ঘুমাইবার যো ছিল না। হয় আসনে বসিয়া থাক, না হয় দাঁড়াও,—শয়নের সম্ভাবনা নাশ করিতেই এই অদ্ভুত উপায়। যদি আলস্য রাখিতে হয় তো আসনের উপর বসিয়াই তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে সাধন-জীবনে প্রবেশ করিয়াই শয়ন-নিদ্রার অভ্যাস চিরজীবনের তরে ত্যাগ করিতে হইল। সংযমের প্রথম দফা এইরূপ।

গুরু ছিলেন সিদ্ধযোগী—তাঁর সিদ্ধি যোগমার্গেই, সুতরাং কাঠিয়া বাবা প্রথম হইতেই যোগমার্গে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাহ্য ব্যবহারে গুরুর মেজাজটা ছিল অত্যন্ত কঠোর রকমের। তিনি প্রথম হইতে বালক শিষ্যটিকে বড় কঠোর ভাবেই তাড়না করিতেন। কাঠিয়া বলিয়া ডাকিলেই কাঠিয়া বুঝিতে পারিতেন কি কারণে তাঁহার ডাক পড়িয়াছে। তিনি বলিতেন,—গুরুর প্রত্যেক আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতাম; মনে মনে এই সংকল্প তখন প্রবল হইয়াছিল যে, কোন কাজে খুঁত রাখিব না, এমন করিব যাহাতে তিনি নিশ্চিত সুখী হইবেন। কিন্তু এমনই ভাগ্য যে কিছু-না-কিছু খুঁত ঠিক বাহির হইত। প্রথম ছয়টি বৎসর আমি কোন মতেই তাঁহার মনোমত কিছু করিতে পারি নাই। আমার বোধ হইত, মনে মনে তিনি আমার কাজে নিষ্ঠা এবং অধিকার দেখিয়া বাস্তবিক সুখী ছিলেন---কিন্তু কখনও আমার প্রতি কোন ব্যবহারে রূঢ়তা পরিত্যাগ করেন নাই।

এইভাবে ছয় বৎসর পর, কাঠিয়া তখন আঠারো বৎসরের কিশোর, গুরু তখন হইতে তাঁহার সকল কর্ম্মই যাহা এতদিন দেন নাই, তাঁহাকে করিতে দিতেন। তাঁহার নিত্য যোগাভ্যাস কর্ম্মের জন্য যে সময়টি নির্দ্ধারিত ছিল, যাহাতে তাহার ক্ষতি না হয় এমন ভাবে বাঁচাইয়া গুরুর সকল কর্ম্মই করিতে হইত। কিন্তু গুরু কখনও কখনও এমন সকল আজ্ঞা করিয়া বসিতেন যাহাতে যোগাভ্যাসের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। তিনি বুঝিয়া কোন কথা বলিতেন না। ক্রমে তিনি বিকট ভাবেই তাড়না আরম্ভ করিলেন,—সাধনক্ষেত্রে শিষ্যের তখন উচ্চ অবস্থা, কাঠিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে নিত্য নিজ কর্ম্মের ক্ষতি করিয়াও গুরুর অভিপ্রেত প্রত্যেক কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। শেষে একদিন হইল কি, এক তুচ্ছ অপরাধ

উপলক্ষ্য করিয়া গুরু তাঁহার প্রকাণ্ড চিম্‌টা লইয়া কাঠিয়াকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে এমন নির্দ্দয় প্রহার কথনও করেন নাই। কাঠিয়া তাঁর স্বাভাবিক সহ্য করিবার শক্তির সীমায় পৌছিয়া আজ দেখিলেন তিনি আর সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত ঝরিতেছে। তখন এই বলিয়া গুরুর চরণে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন যে,—প্রভু! আজ আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার এ দেহ আপনারই, আপনি আমায় একবাবে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হোন।

গুরু তখন চিম্‌টা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর দুই বাহু প্রসারিত কবিয়া সবলে কাঠিয়াকে তুলিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। সে স্পর্শে কাঠিয়ার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত এবং পরক্ষণেই স্নিগ্ধ শীতল হইয়া গেল, তিনি গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাতে অবিরাম করুণা ঝরিতেছে,—আজ গুরুর অপর এক মূর্ত্তি দেখিলেন যাহা কখনও পূর্ব্বে দেখেন নাই। তখন সেই প্রশস্ত বুকের মাঝে কাঠিয়া নিরাপদে মস্তক রক্ষা করিয়া ক্ষণেকের তরে চক্ষু মুদিয়া রহিলেন।

তারপর গুরু শিষ্যকে লইয়া বসিলেন,—বৎস, আজ তোমার সিদ্ধির দিন, আমি জানিতাম তুমি কাম জয় করিতে পারিবে—কিন্তু কামজয়ী হইলেও ক্রোধ অবশিষ্ট প্রবল রিপু, তোমাব পক্ষে উহা সম্ভব কিনা ইহাতে কিছু সন্দেহ ছিল। প্রধানতঃ মুক্তির হন্তা ঐ দুইটি, একই রিপুর ঐ দুই দিক, কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। তোমাকে অনেক কাজ করিতে হইবে, ঈশ্বরের মহিমা তোমার ভিতব দিয়া প্রচারিত হইবে বলিযাই তোমার সিদ্ধির মুহূর্ত্ত এতই কঠোর হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ সাধকদের মধ্যে কদাচিৎ তোমার মত আধার পাওয়া যায়,—এসো, আজ সকল ভেদ ঘুচাইয়া আমরা একরূপে মিলিত হই।

ক্ষ্যাপা বাবা এ সকল তাঁহার মত কবিয়াই বলিয়াছিলেন। যেমনটি শুনিয়াছি ঠিক সেই ভাষা দিয়া বলিতে আমি অক্ষম, তা ছাড়া অনেকেরই উহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে বলিয়াই আমার মত করিয়া বলিলাম। কাঠিয়া বাবার সঙ্গে বামার অখণ্ড বন্ধুত্ব বা একত্ব ছিল। উভয়ে ভিন্ন পথে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধির পর আর সিদ্ধকের মধ্যে উপলব্ধিগত ভেদ থাকে না। তাঁহাদেরও ছিল না। ক্ষ্যাপার মুখে যাঁহারা এসব শুনিয়াছেন তাঁহারা যেমন প্রকৃতির মানুষই হোন না কেন মুগ্ধ হইয়াছেন। সাধুর কথা সাধুর মুখে এমন মিষ্ট

লাগে, একজন সাধারণের মুখে তেমন লাগে না। সাধু না হইলে সাধুকে ঠিক চিনে না। ক্ষ্যাপা বলিতেন,—ক্রোধের মত এত বড় শত্রু সাধুদের আর নাই। গৃহস্থ লইয়াই সাধুদের জীবন বাঁচাইতে হয়, গৃহস্থের দ্বারা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। গৃহস্থ যারা, তাহারা সর্ব্বদাই নানা ভাবে নানা কাজে ব্যস্ত, হয়তো সাধুকে ভিক্ষাদানে বিলম্ব হইল, অথবা ত্রুটি হইল, কত রকমে উহা হইতে পারে,—তাহাতে সাধু যদি ক্ষমাশীল অথবা উপেক্ষা-প্রবণ না হইয়া ক্রোধ-পরবশ হন তাহা হইলে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য শুধু কামজিৎ হইলেই হয় না—কামজিৎ হইলেও ক্রোধ অন্তরে সুপ্তভাবে প্রতীক্ষায় থাকে, সূত্র পাইলেই প্রবল হইয়া সাধকদের সর্ব্বনাশ করে, সেইজন্য সাধুজীবনে ঐ দুটিকেই নিঃশেষে দমন প্রয়োজন।

ক্ষ্যাপা ক্রোধের অপর ফলের কথা বলিয়াছিলেন যা যোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। কামজিৎ ব্যক্তি স্বভাবতই ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন। ঐ রেতঃ ঊর্দ্ধমুখী হইলেও যদি কোন কারণে ক্রোধ উৎপন্ন হয় সঙ্গে সঙ্গেই আবার রেতঃ নিম্নমুখী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ক্রোধের সময়, শারীরিক প্রচেষ্টা বর্জ্জিত হইলেও এমন কি মুখে কিছু না বলিলেও, ভিতরে ভিতরে দ্রুত সঞ্চরণবত প্রাণবায়ুর দ্রুত স্পন্দনের ফলে, স্খলন স্বভাবতই হইয়া যায়, যদিও ইন্দ্রিয়পথে তখন বাহিরে যাইবার সুযোগ হয় না। এ সকল আভ্যন্তরিক ক্রিয়া যথাক্রমে ভিতরে ভিতরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। খিটখিটে স্বভাব যাদের (শর্ট টেম্পার), অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় অথবা ইন্দ্রিয়-চালনার ফলেই হইয়া থাকে,—অপর কোন কারণে একজনের স্বভাব ওরূপ হওয়া সম্ভব নয়। ঊর্দ্ধরেতা যাঁরা তাঁদের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ, বুদ্ধি তাঁদের স্থির ও কারণমুখী হইবেই। ক্ষ্যাপা কারণমুখী বুদ্ধির চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।—'ধর না কেনে তু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিস, একজন এসে পাশ থেকে তুকে ঠেলে দিয়ে এমনভাবে ফেলে দিলে যে তোর হাড়ের উপর বাজলো। এখন সাধারণ মনিষ হয়ত তাকে ফিরিয়ে মেরে বোসলো, কোন কথা বলবার আগেই তার রক্ত গেল মাথায় উঠে, জ্বলে উঠলো ক্রোধ, তাকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে মেরেই বোসলো। ধাতু তরল যাদের, তাদের ঐ ধরনের প্রতিহিংসার ভাব কোন-না-কোন সূত্রে জ্বলে উঠবে গা। কিন্তু ধীমান, সুস্থ, ঊর্দ্ধরেতা যারা তাদের বুদ্ধি ও-ভাবের হতেই পারবে না,—সে মানুষ মার খেয়ে ফিরিয়ে মারতে যায় না, বুদ্ধি তার ভাবতে থাকবে যে, কেন, কি কারণে ও এমন কাজ করলে? সেই কারণটি সে তৎক্ষণাৎ বুঝবে আর যদি সহজ প্রতিবিধান

থাকে তাই করবে; হিংসার ভাব তার মধ্যে মাথা তুলতেই পারবে না। এরই নাম কারণমুখী বুদ্ধি।'

৮

আজ চলিয়া যাইব, তারাপীঠের উপর একটা আকর্ষণ বেশ অনুভব করিতেছি, মনটি যেন এখান হইতে যাইতে চাহে না। অবশ্য এখানকার মূল আকর্ষণই ঐ বামদেব। ক্ষ্যাপা বাবার আকর্ষণ এখন মনে অনুভব করিতে করিতে মায়ের মন্দির হইতে বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম এবং প্রণাম করিয়া বলিলাম,—আজ ত যাব ঠিক করেচি, তাই বিদায় নিতে এলাম।

হোই মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে এসো গা! বলিলাম, - তা হয়ে গেছে। এখন আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন ঐ কঠিন কামের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই।

মেজাজ প্রফুল্ল ছিল। বলিলেন, হাসি পায় যে বাবা, তুমার কথা শুনে। ওটা গেলে রইল কি? তোমার শক্তি,—আসল পদার্থই তো ঐটুকু। উয়াকে ইন্দ্রিয়সুখের পানে লাগিয়েছিলে তাই বোকা বনেচ, ঠকেচ। মূলাধার তোমার ঐ শক্তিকে ঐ যন্ত্র দিয়ে ব্যবহার করবে কেন? একে যৌ নকাল তার উপর মতিগতি উদ্দাম, একবার বেবোবার পথ পেলে তখন কালের গুণেই দৌড় কবাবে। রাশ টান করতেও তুমি, আলগা দিতেও তুমি— মনের জোর থাকলেই হয়ে যাবে বাবা।

একটু যেন ভাবিয়া তারপর বলিলেন,—হাঁ ত্যাখো, ওটা আদিমকাল থেকে ঐভাবে চলেছে কিনা, তাই এখন যেন মনিষ ওটাতে বাঁধা পড়েচে মনে হয়, যেন পরিত্রাণ নাই—কিন্তু আবার এমন মনিষও ত আছে ঐ শক্তিকে চৈতন্যের দিকে চালিয়ে কতো উঁচা গতি পেয়ে গেছে। শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিকাশের মূল হোলো ঐ শক্তি। ক্রমে তুমার শক্তির কেন্দ্রের পানে টেনে নিয়ে যাবে, মা জগদম্বার কোলকে নিয়ে ফেলবে, তখন আর কিছু পাবার বাকি থাকবে না, বাবা। ভোগ, উপভোগগুলো শেষ হয়ে যাক, এর জন্যে কারো কাছে তুমায় যেতে হবে না; মা তারা, আপুনিই তোমায় পর পর যা কিছু আছে তা সবই জানিয়ে দেবেন। ঘরে বসে বসে পাবে সব।

আমি বললাম, যদি সত্যসত্যই ঐ ভাবটি আয়ত্ত করে ধরে রাখতে পারতাম, তা হলে ভাবনা কি? আমরা এমন সমাজের মধ্যে বাস করি

যেখানে ওটা ঐভাবে দেখতে বুঝতে আর করতে প্রবৃত্তিটাই অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে। ইন্দ্রিয়সুখের ধারণা পাল্টে একেবারে ঐ ভাবকে উল্টে দেবার এবং উচ্চস্তরে কর্ম্ম এবং চিন্তাশক্তি পরিচালনা করবার যে প্রবৃত্তি শিক্ষার দ্বারাই তার প্রবর্ত্তন সম্ভব। কিন্তু সে শিক্ষাই নাই, ও-ভাবের শিক্ষা এখনকার দিনে,—দেশবাসীর স্বপনেরও অগোচর, নয় কি?

বামা উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, -কেনে বাবা, তোমাদের কোলকাতার মাঝেই তো তার ব্যবস্থা রয়েচে?

কোথায়? আমি ত শুনিনি?

শুনবে কেনে, গ্রামের যোগী ভিক্ পায় না। তোমরা দেশবিদেশ ঘুরে লম্বাচওড়া সাধু দেখে তবে ভক্তি কর, তার কাছ থেকে গীতার বুলি শুনতে ভালবাস। ঘরে যে ঠাকুর রয়েছে, তাঁর কাছে সব পাওয়া যায়, কোথাও যেতেই হবে না,—সেখানে তোমরা যাবে কেনে বাবা! সেদিকে নজরই পড়বে না।

কার কথা বলচেন? জিজ্ঞাসা কবিলাম।

কেনে বাবা, ঐ রামকিষ্টো পরমহংসের নাম শুন নাই? পরে শ্রদ্ধাভরে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন,—তোমাদের গাঁয়েব যোগী যে গো। তাঁর কাছে তোমরা যাবে কেনে?

শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম, তিনি আমার ঐ ভাব লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন,—শেষে তিনি ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে কাছে রেখে কেমন করে কামিনীসংসর্গ, সাংসারিক ভোগের দিক থেকে মনকে তুলে নিয়ে ঈশ্বরপানে চালায়ে দিতে হয় মনকে শুদ্ধ পবিত্র করে ভগবানের চিন্তায়, তাঁরই কাজে লাগাতে হবেক, এইভাবে তাদের তৈরী করে যান নাই? হোই হোথা, দক্ষিণেশ্বরের মায়ের হোথা তাঁর হাতে-গড়া ছেলের দল, এখন তারা কত বড় হয়েচে, বেলুড়ে মঠ দিয়েচে, শুন নাই? বিবেকানন্দ রামকিষ্ট মিশন করে কত দেশের কাজ করচে? তুমি কি বাবা দেশকে থাক না?

ভাবিয়া দেখিলাম, ক্ষ্যাপা এই রামকৃষ্ণকে লইয়া আজ এক নূতন আলোকপাত করিলেন আমার মধ্যে। কৈ এভাবে ত ভাবিয়া দেখি নাই,—পরমহংসদেবের ক্রিয়াকর্ম্ম শেষের দিকে কোন্ পথে গিয়াছিল? অথচ শ্রীম-কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত কতবার পড়িয়াছি, তাঁর ঐ অমৃতময় বাণী অন্তরে অনুভব করিয়াছি, ভক্ত রামচন্দ্রের রামকৃষ্ণচরিত পড়িয়া অন্তরে অধ্যাত্ম

প্রেরণা অনুভব করিয়াছি—এমন কি বেলুড় মঠেও আমি অপরিচিত নই। মনের মধ্যে এই ধারণা হইয়াছিল যেন তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার তাহা জানিয়া গিয়াছি। আর জানিবার কিছুই নাই। সত্যই তো! তিনি শুদ্ধসত্ত্ব বালকদের লইয়াই শেষের দিকে থাকিতেন, তাহাদের লইয়াই অপার্থিব আনন্দ পাইতেন, কি গভীর ভালবাসা দিয়া তাহাদের বাঁধিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তো পাইয়াছি--তাহাদের লইয়াই ত তিনি এক পবিত্র সঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—তাহা হইতে কি বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে "রামকৃষ্ণ মিশন"। আমি ত যথার্থ আকাশ হইতে পড়ি নাই। রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজ এঁদের সঙ্গে আমি পরিচিত। সময়ে সময়ে কত আনন্দই না করিয়াছি ঠাকুরের এবং স্বামীজীর তিথিপূজা উপলক্ষে বেলুড়ে রাত্রিবাস করিয়া। কিন্তু এই সকল কিছুই ঠাকুরের শিক্ষার ফল, জীবের সেবা নারায়ণ জ্ঞানে,—একথা কে না জানে? অথচ ঠাকুরের শেষ জীবনের সঙ্গে পরিচয় অভাবে, ঐ সঙ্ঘের সব কিছুই তাঁহার শিক্ষার ফল এটুকু লক্ষ্য করি নাই। সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবেই এরূপ হইয়াছে বুঝিলাম।

শেষে বলিলেন,—বাবা পথ তো পড়েই আছে, যাচ্চে কে? কেবল তক্ক আর তক্ক, আর কেউ শিখায় না, বোলে দেয় না—এই রকম অভিযোগ; এই করতে করতেই তো বেলা ফুরিয়ে এলো বাবা, শিখবে কখন? ক্ষ্যাপার প্রকৃতির উদারতায় বিস্মিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত একজন সাধু অপরের কথায় শ্রদ্ধান্বিত দেখি নাই, ক্ষ্যাপার কাছে সবই সরল সত্য—ঈর্ষা-দ্বেষশূন্য মুক্ত আত্মা, গুণগ্রাহী প্রকৃতি তাঁহার। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কখনও যান নাই। এইখানে বসিয়াই সব কিছুই দেখিয়াছেন। অবশ্য মুক্তপুরুষ তিনি, যা কিছু দেখিয়াছেন মুক্তভাবেই দেখিয়াছেন।

এবার তারাপীঠ হইতে বিদায় লইয়া নলহাটির দিকে যাত্রা করিলাম। পথে রামপুরহাট, রাত্রে রামপুরহাটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সারা পথটাই বামার কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি। সিদ্ধ তান্ত্রিক মানুষ, ও রকম আর হইবে না। যতক্ষণ জীবিত থাকেন ততক্ষণ অতি অল্প লোকেই তাঁহাদের সন্ধান পায়। তারপর যখন দেহত্যাগ করেন তখন স্মৃতিরক্ষার প্রবৃত্তি বলবান হইয়া, ঐদিকে তখন কর্ম্ম শুরু হয়। বামার সাধনস্থান এখনও আছে কিন্তু সেখানে বসিবার উপযুক্ত কেউ আসিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

তাঁর শিষ্য তারা,—তিনিও ক্ষ্যাপা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষ্যাপা পদবীধারী এক শ্রেণীর তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায়, তাদের দলের সবাই ক্ষ্যাপা। ঐ তারা ক্ষ্যাপার সঙ্গে আমার মাত্র একবার দেখা হইয়াছিল। তখন তাঁর যোগবিভূতির কথা শিষ্যপ্রমুখ অনেক ব্যক্তির কাছে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু আমার নিজের ধারণা অন্যরূপ বলিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ আর উল্লেখ করিলাম না।

৯

রামপুরহাট থেকে নলহাটি গেলাম। এরা বলে, এই মহাপীঠে দুর্গার গলার নলি পড়িয়াছিল, তাই দেবী নলাটেশ্বরী। মন্দির, নাটমন্দির এবং তৎসংলগ্ন যাত্রীনিবাস কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত, পুরাতন, সংস্কারহীন অপরিষ্কার।

উপরের ঘরে একজন নবীন জটাধারী সন্ন্যাসী বসিয়া পুঁথি দেখিতেছিলেন একখানি জীর্ণ গুলবাঘের ছালের উপর, তাঁহার পাশে কয়েকখানি পুঁথি লাল কাপড়ে বাঁধা। আমি নমস্কার বলিতেই নমস্কার বলিয়া তিনি মুখ তুলিয়া আমায় দেখিলেন, মিনিটখানেক মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,— হুঁ—উঁউঁউঁ—ম, দীর্ঘ টান হুম্ শব্দের পর, চক্ষু নামাইয়া পুনরায় পুঁথিতে মনোনিবেশ করিলেন। আমি কাঁধ হইতে কম্বলখানি একদিকে নামাইয়া জীর্ণ মাদুরের উপর উহা পাতিয়া রাখিলাম, তখনই বসিলাম না। কমণ্ডলু রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম কিন্তু ঐ জটাজুট সমাযুক্ত হুম্ শব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগীর কথাই মনের মধ্যে চলিতেছিল। ঐ শাক্তর বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ না করিলে হয়তো কাছে বসিয়া কিছু কথাবার্ত্তা বলিতাম। উনি হয়তো ভাবিতেছেন ছেলেমানুষ আমি, সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইব—তাই দৃষ্টিমাত্রেই নিজ শক্তিমত্তার বিজ্ঞাপনটি ঐভাবেই দেখাইলেন।

বাহিরের চারিদিক দেখিয়া আমার মন বসিল না, ভিতরপানেই টানিতে লাগিল। হোক্ না ভণ্ড, আমার কি,—আমি ত কিছু পাইতে পারি, একটু অভিমান ঘুচাইয়া নিকটে যাইয়া বসিতে ক্ষতি কি? আবার ফিরিয়া ভিতরে আসিলাম। এবার তিনি নিজেই আগে কথা কহিলেন,—বাবার তারাপীঠ থেকে আসা হচ্চে বুঝি?

বিস্ময় লুকাইয়া সপ্রতিভ ভাব দেখাইয়া বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি কি বৈদ্যনাথধাম থেকে আসচেন?

না, কামরূপ থেকে আজ চার-পাঁচ দিন হল এসেছি। দেখিলাম

আমার অনুমান ব্যর্থ হইয়া গেল, এবার নিজেকে ছোট মনে হইতে লাগিল। মনে আরও এই কথা উঠিল যে, ইনি সাধারণ ভৈরব শ্রেণীর শাক্ত নন। তা বলিয়া তারাপীঠের বামার মতও নন।

বাবাজীর বুঝি কামরূপ যাবার ইচ্ছা?

এবার অকপটে সত্য স্বীকার করিলাম।

শুনিয়া বলিলেন,—ওখানে উমাপতি বাবার কাছে যাবেন—তিনি এখনও কিছুদিন ঐখানে থাকবেন।

বলিলাম,—নিশ্চয় যাবো।

তিনি কামাখ্যার উপরে ভুবনেশ্বরীতেই থাকেন। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—বাবার গুরুস্থান কোথা?

বলিলাম—শিঙের মঠ, স্বামী পরমানন্দ আমার ইষ্ট।

জানি, কলকাতা রামবাজাতলায় শঙ্কর মঠের স্বামী ত?

আপনি ত সব জানেন দেখছি, বলিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবেই বসিলাম।

আপনার প্রথম কিম্বা আসল গুরু ত তিনি নন, তিনি আপনার উপগুরু,—নয় কি?

আপনি যথার্থই বলেছেন, কিন্তু যখন তিনি জীবিত তখন আসল গুরুও বলা যায় তো?

তা হলেও তিনি আপনার আসল বা যথার্থ গুরু হতেই পারেন না।

কেন আপনি এমন কথাটা বললেন বুঝলাম না।

কারণ যাঁর বিত্তৈষণা, লোকৈষণা প্রভৃতি প্রাকৃত দুর্ব্বলতা আছে, আপনি জেনে শুনে তাঁকে গুরুস্থান দিতে পারেন কি?

বা, এ তো দেখি সাঙ্ঘাতিক স্পষ্টবাদী মানুষ। বলিলাম,—আপনি কি তাঁর ওরকম কিছু পরিচয় পেয়েছেন?

আপনি নিজ সিদ্ধান্ত গোপন করচেন কেন? আপনিও কি পাননি? তবে শেষে পেয়েছেন, আগে পেলে কিছুতেই সম্বন্ধ ঘটতো না—বলুন না সত্যি কিনা?

সত্য, সত্য, সত্য, আপনার প্রত্যেক কথাই সত্য, তাঁর কথা আর আলোচনায় কাজ নেই।

না,—বলিয়া তিনি স্থির হইলেন। আমার মনে তখন আর একটা কথা উঠিল,—এসব কি উনি যোগসিদ্ধির ফলে বলচেন?

না, না। সহজ ব্যবহারিক সত্যগুলি জানা বা প্রকাশ করার জন্য কোন সিদ্ধাইয়ের প্রয়োজন নেই, তবে স্থির ও সহজ বুদ্ধির প্রয়োজন আছে এটি সত্য।

আমার প্রথম বা প্রধান গুরু সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন?

আপনি জিজ্ঞাসা করেন ত বলতে পারি, তবে কেমন করে জানলাম একথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি বলব যে তিনি আমারও ইষ্ট, তাঁকে ধরেই আমার প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ,—আমার সব কিছুই তিনি—এখনও আছেন, চিরকালই থাকবেন যতদিন আমার অস্তিত্ব থাকবে। আরও জানি, তিনি শুধু আপনার আমার নন,—তিনি জগদ্‌গুরু। তাঁর স্থান সবার উপরে। অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে আমাদের।

আমার মনে হইল, ওসব পুঁথিপত্রগুলি কি—বা কেন?

তার উত্তরে বলিলেন—তিনি ত বারণ করেননি? নিজ সাধনের সঙ্গে ও সকল কিছু কিছু মিলিয়ে দেখতে হয়। তাতে ভালই হয়, নিজের সাধনের উপর, নিজ নির্ব্বাচিত পথের উপর বিশ্বাস বাড়ে।

এইবার আমাদের যথার্থই মিলন হইল,—বুঝিলাম ইনিও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত।

তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—জটাজুট রেখেছেন কেন? তিনি বলিলেন,—প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, তারপর সন্ন্যাস। ব্রহ্মচারী অবস্থায় রুদ্রাক্ষ ও জটাজুট ধারণের বিধি আছে, তাতে শক্তি সঞ্চিত হয়। আমাদের এতে শক্তির অপব্যবহারের সম্ভাবনা নেই। এইবার পর্য্যটন শেষ করে মঠে (বেলুড়) ফিরে যাব, শিখা-সূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবো। রাখাল মহারাজ এই আদেশ দিয়েছেন।

আমারও মঠে যাতায়াত আছে, সেই সূত্রেই শুনেছি রাখাল মহারাজ একসময় অনেক কিছু কঠোর তপস্যা করেছেন।

তিনি বলিলেন,—ঠাকুরের সন্তান যাঁরা, প্রত্যেকেই কঠোর সাধনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের সাধন-কথা এতটা প্রচ্ছন্ন আছে যে বেশীর ভাগ লোকই জানে না।

সত্য, কথামৃত এবং তাঁর সম্বন্ধে আরও অন্যান্য বই পড়ে মনে হয় যেন নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম প্রভৃতি যাঁরা তাঁর প্রিয় সন্তান তাঁরা সবাই যেন তাঁর আদরেই মানুষ হয়েছেন। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত কঠোরভাবেই সাধনা করেছেন। সাধনকে প্রচ্ছন্ন রাখাই এঁদের বৈশিষ্ট্য।

ঠাকুরের মধুর ব্যবহার আর মধুর কথায় আমরা এতটাই মুগ্ধ যে, তাঁহার মধ্যে কতটা কঠোরতা ছিল সেদিকে লক্ষ্যই করিতে পারি না।

ইতিমধ্যে আমরা একটু মনের কথাও কহিয়া ফেলিলাম।

ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ অনুভূতি জাগিয়াছিল, তাহাও এই সূত্রে তাঁহাকে বলিলাম,—ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালীই ছিল অপূর্ব্ব, পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় এ নূতন। এতাবৎকাল যা পড়ে শুনে বা দেখে এসেছি, জগতের সর্ব্বদেশের আচার্য্যগণ তাঁদের উপলব্ধ সত্য সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, শিষ্যবর্গকেও সদুপদেশ দিয়েছেন, শিষ্যবর্গও গুরু বা আচার্য্যকে শ্রদ্ধা বা সম্মান দিয়ে এবং সর্ব্বদাই আজ্ঞাবাহী সেবকভাবেই গুরুর সঙ্গে সম্ভ্রম-গভীর সম্বন্ধ রক্ষা করেছেন, কিন্তু ঠাকুরের ব্যবহারে তাঁর অনুগতজনের প্রতি প্রীতির তুলনা নাই। এত ভালবাসা, এ ভাবের ভক্ত-প্রীতি শ্রীচৈতন্যের পর আর কারো দেখা যায়নি।

ব্রহ্মচারীর নাম ভরত. শুনিয়া তিনি বলিলেন,—প্রথম কথাটি আপনার বাস্তবিকই সত্য এবং অতুলনীয়। তাঁর শিক্ষাপ্রণালী আশ্চর্য্যরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ; এমন অদ্ভুত শিক্ষাদানপ্রণালী আর কোথাও দেখা যায়নি। যাদের তিনি পরীক্ষা করে একবার আশ্রয় অথবা আত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা চিরকালের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছেন। সবাই আলাদা আলাদা প্রকৃতির মানুষ, কাকে কি ভাবে চলতে হবে,—তারপর কথা, কারো আত্মভাব নষ্ট না করে, তার নিজ সংস্কারের ভেতর দিয়ে আপন পথে চালানো এ যুগের একটি পরমাশ্চর্য্য তত্ত্ব,—এ-কথা ধারণা করতেও বহুদিন লাগবে।

আমি বলিলাম,- এটা পদার্থ বা বস্তু-বিজ্ঞানের যুগ হলেও, যে কল্যাণময় পন্থা তিনি আবিষ্কার করে গিয়েছেন তা সর্ব্বযুগে স্মরণীয় তত্ত্ব বোলে চিরদিনই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে,—আমাদের পথের আলো দেবে তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি ব্যবহার—দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে, শেষ কাশীপুরের বাগানে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত।

তিনি বলিলেন,—রাখাল মহারাজ বলেন, ঐ প্রবল ক্ষয়কারী-ব্যাধির যন্ত্রণার মধ্যেও, এমন কি তাঁর দেহত্যাগের পূর্বমুহূর্ত্তেও তাঁর প্রকৃতিগত পরমানন্দময় ভাবের ব্যতিক্রম দেখিনি আমরা।

প্রত্যেক ভক্তটি,—গৃহী হোন বা সন্ন্যাসীই হোন, সবাই মনে করেন যে সর্ব্বাপেক্ষা তাকেই তিনি বেশী স্নেহ করেন। মহাপুরুষ মনে ক'রে কেউ তাঁর কাছে যেতে সঙ্কোচ করেচে, এমন কাকেও কত সহজভাবে আপন করে নিয়েছেন,—তাতে তার জীবন সার্থক হয়ে গেছে—এমন কত কত হয়েচে।

এমন অভিমানশূন্য ভাব আর পাশমুক্তির এমন জীবন-দৃষ্টান্ত বিরল—

এইসব কারণেই তাঁকে মানুষ বলা যায় না, অবতার বলে নিশ্চয় করেছিলেন অগ্রগণ্য ভক্তবৃন্দ সব। অবতার বলতে আমাদের যে ভাবটি আসে তা নিছক কল্পনা, সেই কারণে তা মিথ্যা—তাই তাঁকে আমার অবতার বলতে প্রাণ চায় না, মনে হয় তাঁকে বরং ইষ্ট বলতে পারি,—আমার ইষ্ট, তার চেয়ে আর বড় কি হতে পারে? যিনি ইষ্ট আমার,—কত নিকট, কত আপন; সম্বন্ধটি সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু ভগবান বা অবতার বলতে যেন কতদূর, আমা থেকে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে, তাঁকে তফাতে রাখা হয়। ও আমি মোটেই চাই না—আমার এই ভাব। আপনার কি ভাব?

আমি—আপনি যেমন সরলভাবে সহজেই তাঁর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধের কথাটা এমনি করে বোলে দিলেন, আমি কিন্তু অতটা সরল হতে পারিনি। আমার মনে হয় যখন ঠাকুর হলেন আমার গুরুমহারাজের ইষ্ট, তখন আমার পক্ষে ত তাঁর কথা, তাঁর জীবন অতটা বিশ্লেষণ, আলোচনার যেন অধিকারই নেই। তাঁর কথা আমরা সব ধারণাই করতে পারি না। বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব-সকল অত সহজ কথায় হলেও, আমাদের পক্ষে কত কঠিন। তাঁর নিজ জীবনই ছিল বেদান্ত-তত্ত্বময়,—আমাদের পক্ষে কত কঠিন তা ধারণা করা?

পরমহংসদেব সম্বন্ধে কথা আমাদের সারাদিন আর রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিল, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন কথা এমন হইল না যাহাতে তাঁহার যথার্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। অবশ্য আমরা উভয়েই তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত একথা বলিলে ভুল হয় না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে অনুভূতির তারতম্য আছে। ব্রহ্মচারী ভরত রাখাল মহারাজকে অবলম্বন করিয়াছেন, ঠাকুরকে ঠিক ঠাকুরের মত স্থানে রাখিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিচার নাই,—ঠাকুর যখন তিনি ঠাকুরই, তাঁহার চরিত্র-কথা আলোচনার যোগ্যই নই আমরা, আমাদের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ একমাত্র ভক্তির,—বিচারের নয়। আমার কিন্তু ভিন্ন ভাব। রাখাল, বাবুরাম, শশি, তারক, শরৎ, মাষ্টারমশাই, মহিনদা, রামলালদা, এমন কি লাটু মহারাজ পর্য্যন্ত এঁরা সবাই আমার গভীর শ্রদ্ধার অধিকারী, সবাই আমাকে স্নেহ করিতেন, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ একসময় সবার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ছিল (যথাসময়ে সে সকল কথা বলিব), কিন্তু তা বলিয়া ঠাকুর চরিত্র আলোচনা কম ছিল না,—আমার মূল উদ্দেশ্য, ঐ ঠাকুর সম্বন্ধে সকল কিছু জানিবার জন্যই মঠে যাইতাম এবং ইঁহাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম। তখনকার বায়ুমণ্ডল—বেলুড় বা দক্ষিণেশ্বরে

যাঁহারা যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা সবাই হয়ত অনুভব করিয়াছেন,—ঐ সকল স্থান ঠাকুরের প্রভাবে তৃপ্ত ছিল, অন্ততঃ আমি এইরূপ প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করিতাম। জন্ম-উৎসব বা তিথিপূজার কথা স্বতন্ত্র,—তখন আনন্দ-উৎসব সংক্রান্ত একটা বিরাট আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহাতে বিক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্থান নির্জ্জন হইলে, অথবা বেলুড় মঠে দৈনন্দিন ব্যবহারে যাঁহারা রাখাল মহারাজ প্রভৃতির নিজমুখে ঠাকুরের কথা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন সে কি বস্তু! জিজ্ঞাসার উত্তরে একরকম, আবার যখন নিজেরাই ঠাকুর সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতেন তখন আর একরকম,—যেন প্রতক্ষ্যভাবেই ঠাকুরের সঙ্গলাভ হইত। শ্রীম-কথিত কথামৃত ছাড়া, লীলাপ্রসঙ্গ যাহা শরৎ মহারাজের অক্ষয়কীর্ত্তি, রামচন্দ্রের রামকৃষ্ণ-চরিত্র প্রভৃতি পড়িয়া তাঁহার সম্বন্ধে আরও জানিবার প্রবল তৃষ্ণা জাগিত, সেই কারণেই মঠে বা দক্ষিণেশ্বরে রামলালদাদার শরণাগত হইতাম। সেই বাল্য বা কৈশোর হইতে ঠাকুরের কথা পড়িয়া এবং আলোচনা করিয়া (আজ আয়ুপ্রান্তে আসিয়া) যতই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, ততই দেখিয়াছি পর পর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তিত হইয়া গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্বে তাঁহার অস্তিত্ব ফুটিয়া যেন সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইতে চাহিতেছে। এক এক সময় মনে হইয়াছে তিনি চিরদুর্জ্ঞেয়, তাঁহার ইতি করিবার যো নাই।

যাহা হোক, নলহাটিতে ব্রহ্মচারীর সঙ্গেই আমার সবটা সময় কাটিয়া গেল, আর কিছু দেখাশুনা হইল না, ভালই লাগিল না,—পরে উভয়েই একসঙ্গে আজিমগঞ্জে আসিলাম,—তিনি কলিকাতার দিকে গেলেন, আমি আজিমগঞ্জে এক নবীন বন্ধু ফতে সিং কুটারীর আশ্রয়ে দিন দুই কাটাইয়া পরপারে জিয়াগঞ্জে আসিয়া কামরূপের পথেই রওনা হইলাম এবং তৃতীয় দিনে আমিনগাঁওয়ে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলাম।

১০

এপারে আমিনগাঁও ষ্টেশন পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলাম, পাণ্ডু ষ্টেশনে একখানি ট্রেন দাঁড়াইয়া, আসামে যাইবে। প্রথম ষ্টেশনই কামরূপ। প্রাচীন কামরূপের মহিমার কথা ও ওখানকার তন্ত্রমন্ত্র জাদুবিদ্যার কথা ত আমাদের এই বাঙলার বোধ হয় সকলকারই কানে শোনা আছে, আর তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, কামাখ্যা দেবীর প্রভাব আমাদের এ দেশের মানুষের উপর তখনকার দিনেও অনেক বেশী ছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের

কাছে কামাখ্যা-মাহাত্ম্য বা কামরূপ সম্বন্ধীয় জনপ্রবাদের প্রভাব এখন যতটা নিষ্প্রভ মনে হোক না কেন, আমার মত একজন কল্পনাপ্রবণ শিল্পীর মনের মধ্যে তখন উহার প্রভাব বেশ ভালো রকমই ছিল। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে যাইতেছি তখন ঐ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও অপূর্ব্ব মানবমনের বৈচিত্র্যহেতু তখন এমন একটা স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ হইয়াছিল, যাহা সম্পূর্ণ একালেরই গুণ। তাহা তখন প্রবল ভাবেই আমার মধ্যে কাজ এবং অবস্থা বিশেষে আমায় রক্ষাও করিয়াছিল। যাহা হোক্, এখন আমি ত পাণ্ডু ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ঐ ট্রেনে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিলাম, যদিও আমার মত যাত্রীর এটুকু হাঁটিয়া যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তারাপীঠ ছাড়িবার পর শরীর ভালো ছিল না। কেমন যেন মাথার উপর সর্ব্বক্ষণ একটা ভার অনুভব করিতাম। সেইজন্য ট্রেনে যাওয়াই ভালো মনে করিলাম।

যে গাড়ীতে বসিয়াছি তাহার চারিখানি বেঞ্চ; দেওয়ালে লেখা আছে চব্বিশ জন বসিবেক। তবে এখন তাহাতে আট-দশ জন লোক বা যাত্রী বসিয়াছিল। প্রকৃতিগত চাঞ্চল্যবশত বসিয়াই একবার ভালো করিয়া সকল দিক দেখিয়া লইলাম, এইজন্য যে কি ভাবের লোকসঙ্গ পাইয়াছি।

দেখিলাম সম্মুখে একখানি বেঞ্চে অপরূপ একটি মূর্ত্তি, তাঁহার দুই দিকে তাঁহারই সব ঝাঁপি-বোচকা ইত্যাদি, মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তি নিজ মহিমায় উপস্থিত সকলকারই আকর্ষণের বস্তু হইয়া আছেন। আরও দেখিলাম সবারই লক্ষ্য তাঁহার দিকে ত নিশ্চয় ছিলই, উপরন্তু তাঁহার সম্বন্ধেই যা কিছু কথাবার্ত্তা মৃদুস্বরে তাহাদের মধ্যে হইতেছিল। তাহাদের লক্ষ্য স্থটি আমার পক্ষেও কম আকর্ষণের হইল না। কিন্তু মুগ্ধ হইবার ভার আমার অন্যান্য সহযাত্রীদের উপর দিয়া, এখন তাঁহার কথাই একটু বিশেষভাবে বলিয়া লইতে চাই।

মাঝামাঝি লম্বা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ লোকটির মূর্ত্তি মোটাসোটা নয়, অত্যন্ত সুস্থ এবং বেশ বলবান। বড় বড় চুলের সঙ্গে মাথায় জটার বোঝা, ঘন ভ্রূযুগলের নিচে উজ্জ্বল দুটি রক্তাভ চোখ আর কপালে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক বিভূতির উপর তৈলাক্ত সিন্দূরের বেশ বড় একটি উজ্জ্বল ফোঁটা। স্থূল অধরোষ্ঠ, তাহাতে অল্প মানানসই গোঁফ এবং দাড়ি, ইহাই তাঁহার রূপের প্রধান বস্তু। পরনে লাল বস্ত্র এবং উত্তরীয় বা বহির্বাস, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, আবার প্রবালসংযুক্ত ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালাও আছে। দুই হাতের উপরে নানা রত্নসংযুক্ত বড় বড় রুদ্রাক্ষের তাগা। সব মিলিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে এই

যে মূর্ত্তিটি, তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না। আরও একটি কারণে তাঁহাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব,—সেটি তাঁহার বসিবার ভঙ্গী। বেঞ্চিতে পা ঝুলাইয়া আমরা সাধারণতঃ বসি, কিন্তু তাঁহার বসাটা সে-প্রকারের নয়। মেরুদণ্ডের ঙ্গে মস্তক এবং উপর-শরীরটি সোজা কাঠের মতই শক্ত করিয়া রাখা,—উহাকেই জালন্ধর মুদ্রা বলে। দুইখানি হাত জড়াজড়ি করিয়া বুকের উপর বদ্ধ, দেওয়ালে পিঠটি ঠেকানো আছে বটে কিন্তু পা দুটি একেবারে সোজা মেঝের উপর এমনই দৃঢ়ভাবে রাখা যেন কখনই নড়িবে না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি নিচের দিকে, ঠিক যেন কতকটা দূরস্থ কোন একটি বিন্দুতেই আবদ্ধ,—বয়স তাঁহার পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যেই। তাঁহার ঐ দৃষ্টির মধ্যে আরও একটু বৈশিষ্ট্য দেখিলাম, চক্ষু দুটি মুখের সঙ্গে বেশ মানানো বটে কিন্তু তারা দুটি আকারে একটু ছোট বলিয়া রক্তাভ শ্বেতক্ষেত্রটি বেশ বড়ই দেখাইতেছে। মনে হয় তাঁহার সহজ চাহনিটা হয়ত মধুর ভাবেরই হইবে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা মোটেই সহজ ছিল না। প্রায় রক্তবর্ণ চক্ষু, তাহাতে একটা প্রখর নিম্নদৃষ্টি,—ঐখানেই যেন কতকটা ভয়ের ভাব আনিয়া দেয় সাধারণের মনে। আরও মনে হয় প্রত্যেককেই তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবার একটা উদ্দেশ্যে তাহার মনে প্রচ্ছন্ন আছে। অন্ততঃ মনে মনে আমি ঐরকমই তখন বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার সম্মুখস্থ যাত্রীগণ যাহারা আমার পূর্ব্বে আসিয়াছিল, তাহারা মুগ্ধ হইয়া মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যেই তাঁহার মাহাত্ম্য আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, ইহা আমি অনুমানের সাহায্য না লইয়াই বলিতে পারি।

দেখিতে দেখিতে দুই-চারিজন করিয়া যাত্রী আসিয়া পড়িল এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বেঞ্চের সকল স্থানই পূর্ণ হইল ;—দেখা গেল এখন একমাত্র ঐ ভৈরব মূর্ত্তির বেঞ্চটি তখনও অনেকটাই খালি ছিল, তিনি এবং তাঁর বোঁচকা-বুঁচকি সমেত। এমন সময় একটি ফুটফুটে গৌরবর্ণ, হাফ্‌প্যাণ্ট ও হাফ্-হাতা খাকি সার্ট পরা, দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার, বয়স প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ—যুবাপুরুষ যাহাকে বলে এমনি একজন, হাতে এ্যাটাচিকেস, পিছনে কুলির মাথায় পোর্ট-ম্যাণ্টোর উপর বাঁধা বেডিং আসিয়া ঢুকিল। ঝটিতি একদৃষ্টিতে কামরার সকল বেঞ্চের অবস্থা দেখিয়াই ঐ ভৈরব মূর্ত্তির কাছে আসিয়া—তাহার নিজ মালপত্র ব্যাঙ্কের উপর তুলিয়া রাখিল, পরে কুলিকে বিদায় করিল। তারপর একবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সকল দিকই দেখিয়া [illegible] ইতিমধ্যে আরও দুজন আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াই দেখিতেছে, তাহারা আসিয়া বসিতে সাহস

করে নাই। এখানেও যুবার দৃষ্টি পড়িয়াছিল, যদিও তাহার একলার বসিবার জায়গা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে না বসিয়া জটাধারী ভৈরবের দিকে তাকাইয়া বলিল, —আপনার মালপত্রগুলো বেঞ্চের নিচে কিংবা উপরের বাঙ্কে রাখলে এখানে দু'চারজন বসতে পারেন, ওগুলো একটু সরান্ না!

না রাম না গঙ্গা, কোন কথাই নয়। এমন কি এতগুলি কথা যে তাঁহাকেই বলা হইয়াছে অথবা কথাগুলি তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে বাহ্যভাবে ইহার কোন লক্ষণই সেই অচলায়তনের মধ্যে পাওয়া গেল না। কোন অঙ্গও তাঁহার নড়িল না,—ঠিক প্রস্তরমূর্ত্তির মতই স্থির। যোগী বটে। তখন সেই যুবাপুরুষ আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, —তাহলে আমি সরিয়ে রাখচি, কিছু মনে কর্ব্বেন না—বলিয়া ভৈরবের মালগুলি কতক উপরে কতক নিচে রাখিয়া দিল এবং যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, —আসুন না বসা যাক্। সন্তুষ্ট চিত্তে এখন তাহারা আসিয়া বসিল, যুবাও বসিল। তখন

দেখা গেল তবুও ঐ ভৈরবের পাশে আরও দু-তিনজনের বসিবার মত জায়গা খালি পড়িয়া আছে। কতক্ষণে গাড়ী ছাড়িবে—এইবার আমার সেই ভাবনা হইল, যদিও ভৈরব অথবা ঐ যোগীবরের একাসনে একই ভঙ্গিতে দৃঢ়-উপবেশনের দৃশ্যে আমার মনে নানা অদ্ভুত ভাবের আলোড়ন চলিতেছিল। এবার আর এক বিচিত্র ব্যাপার দেখিলাম, আমার পার্শ্ববর্ত্তী সেই প্রথমাগত যাত্রীগণ যাহারা মুগ্ধ হইয়াই ঐ ভৈরবের কথা আলোচনায় রত ছিল, তাহারা বেশ একটু ভয় পাইয়াছে। তাহাদের মুখটি চুন এবং প্রত্যেকের চক্ষেই একটা আতঙ্কের চিহ্ন বিদ্যমান দেখিলাম। এই দৃশ্য নবাগত নির্ভীক ঐ যুবার চক্ষু এড়াইল না। আরও দেখিলাম সে উহাদের ভাবটা লক্ষ্য করিল এবং তাহাদের মধ্যে

আলোচনা মনোযোগ-পূর্ব্বক শুনিতে লাগিল। উহারা যে কেন ভয় পাইয়াছে তাহা সে ঠিক ধরিতে পারে নাই, অথচ অন্তরে সে যে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছে তাহাও বুঝা গেল তখনই, যখন সে ঐ ভৈরবের পানে চাহিয়া অতি মধুর ভদ্র ও বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি কিছু ক্ষতি করেছি আমি, কোন অসুবিধা হয়েছে কি আমাদের এখানে বসাতে?

কোন উত্তর নাই।

সেই দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট এবং ততোধিক দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ নিম্নদৃষ্টিই তাহার উত্তর। যুবা যে কি ভাবিল তা সে ই জানে। জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না পাইয়া সে তাহার বাক্সের ভিতর হইতে একখানি ইংরাজী পুস্তক বাহির করিল এবং দরজার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। আর এদিকে একদল, যোগীর জিনিসপত্র অপর একজনের দ্বারা নাড়ানাড়ি হওয়ায়, তাঁহার কোপে কি সর্ব্বনাশই বা হয়,—অস্বাভাবিক ব্যাপার অথবা অমঙ্গলজনক কিছু ঘটিয়া যায়, প্রতিক্ষণেই এইরূপ আশঙ্কা সবাই করিতে লাগিল। তখন তাহাদের মুখ-চোখের ভাবগুলি দেখিবার মত।

অস্বাভাবিক তখনই কিছু ঘটিল না বটে, কিন্তু ঐ কম্পার্টমেণ্টের হাওয়ার মধ্যে বিষম ভাবের একটা কিছু তালগোল পাকাইতেছে,--কেবলই আমার ইহা মনে হইতে লাগিল। তারপর এইবার ট্রেন ছাড়িবার আগে পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি স্ত্রী ও পুরুষ কিছু জিনিসপত্র কুলির মাথায় লইয়া আমাদেরই কক্ষে তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়িল। বলিয়াছি প্রায় সব জায়গাই ভরিয়া ছিল,—কেবল ঐ ভৈরবের বাঁদিকে দুই-তিনজনের স্থান তখনও ছিল; তাহারা সঙ্কুচিতভাবেই দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছে না দেখিয়া ঐ যুবা তাহাদের আহ্বান করিল,—আপনারা আসুন না, এখানে জায়গা ত রয়েচে, বলিয়া সেই দিকেই দেখাইয়া দিল। তাহারাও প্রসন্ন মনে আসিয়া ঐ স্থানে বসিল। আগে ভদ্রলোকটি আসিয়া বসিলে পিছনে পিছনে নারী তাহার পাশে বসিল। এ পর্য্যন্ত বেশ সহজভাবেই সব কিছু হইল।

আমাদের ঐ জটাজূট সমাযুক্ত সাধু ভৈরবেরও কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। এই যে যাত্রীগণের ওঠা-বসা, জায়গা সকল পূর্ণ হওয়া, এ সকল যে তাঁহার গোচর হইয়াছে, বাহ্যে তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তাঁহার পাশেই

একজন ভদ্র পুরুষ ; অবশ্য গায়ে গা ঠেকে নাই যথেষ্ট ফাঁক ছিল, তার পাশে একটি মেয়ে বসিয়া, এ সকল তাঁহার লক্ষ্যই নাই। মেয়েটির অল্প বয়স, বোধ হয় আঠার বা কুড়ি হইবে। সুন্দরী, গৌরী কিন্তু হিন্দুঘরের বিবাহিতাদের যেরূপ মাথায় কাপড় অথবা সীমন্তে সিন্দুর থাকে সে সব তাহার কিছুই নাই, অবশ্য নারী-মর্য্যাদার কোন অভাবও নাই। পুরুষটির চেহারা বড়ই কঠোর, কাপড়ের উপর সিল্ক কোট, বুকে সোনার চেন ঝুলিতেছে, গোঁফ আছে দাড়ি নাই, দৃষ্টি তাহার তীক্ষ্ণ, স্থূল শরীর, বয়স প্রায় চল্লিশ হইবে। উভয়ের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ হইতে পারে, মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম ঐ নারী, নিজ স্থান হইতেই স্থির, অবাক্ বিস্ময়ে একদৃষ্টে ঐ কঠোর ভৈরব-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আছে। এইবার গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা, সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের বাঁশীও বাজিল। ক্রমে গাড়ীখানি একটু দোলা দিয়া নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ঠিক ঐ সময় প্রথমে মেয়েটি তাহার হাতখানি ধীরে ধীরে বুকের উপর রাখিল, —তখনও ঐ ভৈরবের দিকে দৃষ্টি তাহার নিবদ্ধ, তারপর—'উঃ, বাবা গো, বলিয়া একেবারেই সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। গাড়ী তখন বেশ জোরেই চলিতেছে।

'কি হলো, কি হলো' বলিয়া তাহার সঙ্গী পুরুষটি তখনই ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিল, এবং এক হাতে তাহার মাথাটি পিছন হইতে ধরিয়া অপর হাতে তাহাকে আধ-শোয়া ভাবেই নিজের কোলে তুলিয়া লইল। এবং তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কেন এমনটি হইল, ইহা লইয়াই গাড়ীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এবং নানা মন্তব্য, নানা প্রকারের গোলমাল চলিল কতক্ষণ। ভৈরব কিন্তু তাহার মধ্যে যোগযুক্ত অবস্থায় দৃঢ়ই রহিলেন —তাঁহার সে অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

আমার পাশেই পূর্ব্ববঙ্গের একটি কৃষক দম্পতী। পুরুষটি প্রৌঢ়, নারীটি ঠিক তা নয়, কিছু কম হইবে তাহার বয়স। উভয়েই যে ভাষায় কথা বলিতেছিল, 'বয্যা বয্যা আর ত পারা যায় না,—একবার জিগাও না উয়ারে, গাড়ি কখন ছাড়বে?' তাহাতেই অনুমান করিলাম উহারা বরিশালের। তাহারা যে অবস্থাপন্ন তা তাহাদের পোশাক দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ক্রেপ শাড়ী কাপড় ও ভিক্টোরিয়া আমলের জ্যাকেট পরা দেখিয়া সকলেই বুঝিবে উহার কোনটিই পুরানো নয়। কামাখ্যা দেবী দর্শনেই যাইতেছে, পাণ্ডু ষ্টেশন হইতেই তাহারা একজন পাণ্ডা পাইয়াছিল এবং সে পাণ্ডাটি উহাদের বেশ হস্তগতও করিয়াছিল। পাণ্ডাটি পাশেই বসিয়া আছে। উভয়েই

অর্থাৎ যাত্রী-পুরুষ ও পাণ্ডা ঘন ঘন বিড়ি পুড়াইয়া বিকট গন্ধে ছোট ঘরটা তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কর্ত্তার সঙ্গে পাণ্ডাঠাকুর কামাখ্যার মাহাত্ম্য এবং ওখানকার যা কিছু কথা এবং কয়দিন থাকিয়া কি কি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে সেই সকল আলোচনা করিতেছিল, অন্যদিকে কিছুই লক্ষ্য করে নাই। এখন গিন্নী কর্ত্তাকে গা ঠেলিয়া ঐ দিকে লক্ষ্য করিতে ইঙ্গিত করিলেন,—দেখ দেখ ম্যায়াটি বুঝি মারা যায়, ঐ ভৈরব বুঝি মেরে দিল।

—হুঁ মেরে দিব বল্‌লেই মেরে দেয়ান যায় না কি? ওর নিশ্চয় মূর্চ্ছনা রোগ আছে—এইভাবে তাহাদের সবার দৃষ্টি যখন ঐদিকে পড়িয়াছে, তখন গৃহিণী অর্থাৎ ঐ কৃষক-গৃহিণী বলিল, কামাখ্যা যেতে না যেতে পথ্ থেকেই মারণ শুরু হোল, কেন মরতে তুমি আমারে এমন তিথিথানে লইয়া আইলে। আমি যামুনা, গাড়ি ইষ্টিশানে আইলে চলো আমরা ফির‍্যা যাই। কর্ত্তা বড়ই ফাঁপরে পড়িল, পাণ্ডাব পানে চাহিয়া বলিল,—এ কয় কি? ও ঠাকুর বাবা, এতদূর আইস্যা ফিরে যেতে হবে? মা জগদম্বা কখনও কি কারোর মন্দ করেন?

গিন্নী বলিল,—মা করবে ক্যান্? ঐসব ভৈরবগুষ্টি, তারাই যে মানুষেব সর্ব্বনাশ করে। ঐ মেয়েটি আর বাঁচবে কি? জিগাও ওনারে?

কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, ঠাকুর বাবা নিজেই বলিলেন,—এমন অথয়ম্ভব (অসম্ভব) কথা কেন বলেন বাবারা,—মারণ উচ্চাটন্ আর কোম্পানীর রাজ্যে হবার যো নাই। সেদিন এখন আর আইব না। কার সাইধ্য কাআরে মাবে, -তবে মা,-- এই পর্য্যন্ত বলিয়া চক্ষু বুজিয়া জোড়হাত মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম পূর্ব্বক মনে মনে একবার যেন মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া লইয়া আবার বলিলেন, চিন্তা নাই, মা আপনাদের উপর সদয় আছেন,- চলুন এই ত এলো।

১১

মেয়েটি অচৈতন্য, তাহার উপর দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ এমনই বিবর্ণ হইয়া গেল দেখিয়া অনেকেরই ভয় হইল, হয়ত বা দেহে প্রাণ নাই। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঐ মুখে কতকটা যন্ত্রণার আভাস ফুটিয়া উঠিল, দেখিয়া বুঝা গেল যে, প্রাণত্যাগ ঘটে নাই,—জীবন আছে তাহার মধ্যে। গাড়ী হু-হু শব্দে পূর্ণ শক্তিতেই চলিতেছিল।

এক ব্যক্তির ঘটিতে জল ছিল, সেই লোকটি ব্যস্ত হইয়া চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল ও 'দেখি' বলিয়া আগাইয়া দিল জলপূর্ণ ঘটটা। তারপর শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। অবশ্য ইহার মধ্যেও যোগারূঢ় অবস্থায় আমাদের ঐ ভৈরব,—তাহার নিজ আসনে স্থির অচল, অটল ভাবেই অনমনীয় দার্ঢ্য লইয়া সেই কক্ষের মধ্যে সকলকার চক্ষে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর বস্তু হইয়া রহিল। একজন সেই দুঃস্থা নারীর সঙ্গের বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনারা কোথায় যাবেন? বাবুটি বলিল,—গৌহাটি যাব আজ, কাল শিলং যাবো আমরা। এবার প্রথমাগত সেই সুট্-পরা যুবক জিজ্ঞাসা করিল, এ রকম মূর্চ্ছা ওঁর মাঝে মাঝে হয় নাকি? বাবুটি বলিল,—না মশাই এ রকম কখনও হয়নি। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আমি ত ওঁর অসুখ-বিসুখ কখনও দেখিনি, তবে ওঁর রোবাস্ট হেল্‌থ অবশ্য কোনোদিনই নয়।

পাণ্ডু স্টেশন হইতে কামরূপ কামাখ্যা মোটে দু' মাইল। ট্রেন পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, যাহারা এখানে নামিবে, সবাই প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে আমাদের বেঞ্চির একজনের যে মন্তব্য আমার কানে গেল, তাহা এইরূপ—ভৈরবের কোপ পড়েছে, আমি আগেই জানতুম একটা কিছু হবে, এইরকমই একটা দুর্ঘটনার আশঙ্কা আমার আগে থেকেই ভিতরে হচ্ছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—বোধ হয় উনি মেয়েটিকে মেরেই ফেলবেন। এখনও ওঁর হাতে পায়ে ধরে তুষ্ট করলে বোধ হয় বাঁচতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—আর সময় কোথায়? এই ত কামাখ্যা এসে পড়লো। আর এক মিনিট।

এই সকল কথা শুধু আমি নয়, সেই সুট্-পরা যুবা ভদ্রলোকটিও শুনিয়াছিল,—সে ঘাড় তুলিয়া সবিস্ময়ে বক্তাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও বেচারার অপরাধটা কি শুনি? ওঁর জিনিসপত্র যা কিছু সব আমি একাই সরিয়েছি, ওঁদের বসবার জন্য ডেকেছি, সেও ত আমি,—নিজে,—আমারই ত কোপে পড়বার কথা, যদি কোপে পড়বার যথার্থই কোন কারণ হয়ে থাকে?

অপরাধ মেয়েটির যে কি, অথবা কতটুকু আর যথার্থ কিছু আছে কিনা একথা ত তাহাদের বিচারের বিষয় নয়,—তাহাদের আসল বিষয় হইল ঐ জটাধারী শিবের অবতার মহাশক্তিশালী তান্ত্রিকের জিনিসপত্র, যাহার প্রত্যেকটাই তাহারা দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া হয়ত মনে করে, উহা সরাইয়া রাখা, আবার তাঁহারই পাশে বসিয়া রেলগাড়ীতে ভ্রমণ,—এ সকল কর্ম্ম

গুরুতর অন্যায়। ওঁরা কি না করিতে পারেন? একজনকে মন্ত্রবলে প্রাণে মারা ত ওঁদের কাছে কিছু শক্ত নয় বরং কত সহজ। ওঁদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল সাধারণ লোকের। এ সকল সিদ্ধান্ত ঐ সরলপ্রাণ সুকুমার যুবার মাথায় কখনও ঢুকে না। সে কোন উত্তর না পাইয়া শুষ্কমুখে নিজ স্থানেই বসিয়া সব দেখিতে এবং শুনিতে লাগিল। এদিকে ট্রেন তখন আসিয়া ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া গেল। তখন নামিবার ধুম পড়িয়া গেল। তখনও মেয়েটি সেইরকম অচৈতন্য অবস্থায় রহিয়াছে।

আমি একটু দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। গাড়িটা এখানে একটু বেশীক্ষণই দাঁড়ায় বহু যাত্রী এখানে ওঠা-নামা করার জন্য। ট্রেনখানা থামিতেই—ভৈরব উঠিল, ধীরে ধীরে আপন মনেই বেঞ্চের নীচে এবং উপরের বাক্সের জিনিসপত্র নামাইয়া পুটলি ঝাঁপি প্রভৃতি দুই হাতে জুৎমত ধরিয়া অচৈতন্য বালিকার সুমুখে দাঁড়াইল এবং দ্বারপথে অগ্রসর হইবার পুর্ব্বে একবার তীব্র দৃষ্টিতে পার্শ্বস্থ ঐ বিব্রত ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া—আমি উপরে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের অতিথিশালায় আছি; যদি দরকার হয় খবর দিবেন। এই কথা কয়টি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ভৈরব লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

তাঁহার কথাগুলি যেন তড়িতের কাজ করিল। যাহাকে বলা হইল সে ব্যক্তি যেন সম্মোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই প্রথমাগত যুবকটি বাধা দিয়া বলিল,—এত তাড়াতাড়ি উঠছেন কেন? কি হয়েচে আপনার? ওঁকে এখানে একলা ফেলে রেখে যাওয়া কি উচিত?

এই কথায় লোকটি চম্‌কাইয়া উঠিল এবং নিশ্চেষ্ট ভাবেই বসিয়া পড়িল। তারপর বলিল,—কিন্তু উনি যে যেতে বললেন?

এই পর্য্যন্ত আমি দেখিলাম এবং শুনিলাম, তারপর আমি নামিয়া পড়িলাম। আমায় যে এইখানেই নাম্বিতে হইবে।

মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ সারাক্ষণই রহিয়াছে, স্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়া এবং উপরে কামাখ্যা মন্দির লক্ষ্য করিয়া যখন চড়াইয়ের ধাপ উঠিতে লাগিলাম, তখনও মন স্থির হয় নাই। পাদমূল হইতে উঠিতেছি; দূর হইতে পাহাড়ের উপরে যে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী দেখা যায় উহা দেখিতে আশ্চর্য্য লাগে, কেমন করিয়া পর্ব্বতশীর্ষে নারিকেল গাছ উঠিল, এ বৈচিত্র্য বোধ হয় আর কোথাও নাই—তাহাও ভাবিতেছি, আবার গাড়ীতে সেই ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, রহস্যময় ঐ যোগীর কথাও ভাবিতেছি,—এইরূপে অবসন্নপ্রায় শরীরে প্রায়

সন্ধ্যার সময়ে মন্দিরতোরণে পৌঁছিলাম। পার্শ্বেই দেখিলাম ঐ নারিকেল বিক্রয় হইতেছে, উহা দেখিয়া আমার তৃষ্ণা প্রবল হওয়া কিছুই বিচিত্র নয় কিন্তু পয়সা ছিল না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উঠিয়া দেবীদর্শনের জন্য তোরণ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের চারিদিকেই প্রদক্ষিণ পথ। সেই পথের একদিকে সারি সারি অন্ধকার, অপরিষ্কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষশ্রেণী
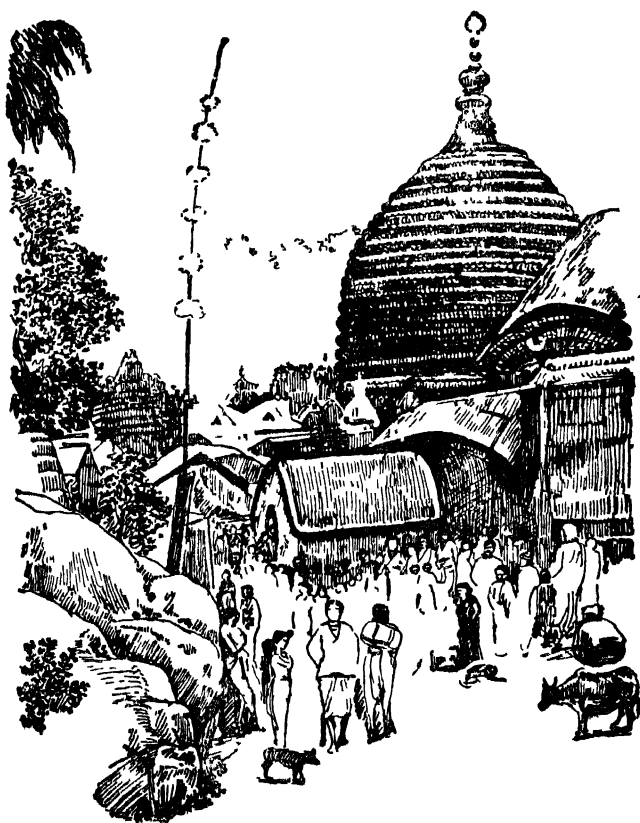
পড়িয়া আছে। উহার মধ্যে দু'একখানি একটু ব্যবহারোপযোগী, একটু সাফ। সুতরাং তাহাতে দুই একজন অত্যন্ত শ্রীহীন বুভুক্ষু সাধুমূর্তি আসনে বসিযা আছেন, তাহাও দেখিলাম, আরও বুঝিলাম তাহাদের অন্তরেও শান্তি নাই,—তাহাদের দেখিয়া আমার অশান্ত প্রাণে শান্তি আসিবে কোথা হইতে!

সন্ধ্যার সময় দর্শনার্থী যাত্রী সংখ্যা নিতান্তই কম। সুতরাং দীপালোকে উজ্জল গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ এবং ধাতু আবরণে ঢাকা একটি প্রস্তরখণ্ডকে দেবীজ্ঞানে প্রণাম-পূর্ব্বক বাহিরে আসিলাম। এখন ঐ ঢাকা দেওয়া যা দেখিলাম তাহার কথাই চিন্তার মধ্যে ক্রিয়া করিতে লাগিল; পাণ্ডা বলিল, অম্বুবাচীর সময়ে মায়ের রজঃস্রাব হয়। মায়ের ত মূর্ত্তি নাই,—তাহাতে আবার স্রাব,—ঐ কথাটায় অন্তরক্ষেত্র বিজ্ঞানমুখী হইয়া ঐ তত্ত্বেই আবদ্ধ রহিল,—আর সব ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু মীমাংসা বা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলাম না। হায় আমাদের অধীত বিদ্যা!

যে কথাটি আমার মনের মধ্যে ফুটিতে লাগিল তাহা এই যে, দেবী চিরজাগ্রতা, সৃষ্টিস্থিতি-নিধনকারিণী, অনন্ত শক্তিরূপিণী,—তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই, সর্ব্বঘটে শক্তিরূপে জ্ঞানরূপে বিদ্যমানা, ব্যক্ত অব্যক্ত মূলা প্রকৃতি সেই দেবী যে জাগ্রত তাহার প্রমাণ কিনা অম্বুবাচীতে রজঃস্রাব এই তত্ত্ব প্রচার পাণ্ডাদের এক অক্ষয়কীর্ত্তি। বিশ্বাস যাহার হয়, ভাল, অথবা যাহারা শুনিবামাত্র বিশ্বাস করিয়াই নিশ্চিন্ত এবং কৃতার্থ তাহাদের কথাও ধরি না, কিন্তু যে হতভাগ্য উহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বাস করিয়াছে এই ভাব দেখায় তাহাদের কথাই বলিতেছি। সে আর কেহ নয়, আমারই আশ্রয়দাতা বিপিন পাণ্ডা। তাহার আশ্রয়ে আমার সেদিন রাত্রে ভোজন এবং রাত্রিযাপন সম্ভব হইয়াছিল। নিতান্তই সরলপ্রাণ মানুষটি, মনে কোন গোল নাই,—অকপট সাধু গৃহস্থ। সাধু এইজন্য বলিতেছি—শুধু কথায় নয় তাহার প্রকৃতির মধ্যে তাহার উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মেও সে সাধু, যতদিন কামাখ্যায় ছিলাম তাহার পরিচয় প্রায় নিত্যই পাইয়াছি। প্রথম প্রমাণ তাহার আমার নিকট কিছুতেই লাভের আশা নাই, অথচ অনির্দ্দিষ্টকাল আমায় প্রত্যহ মধ্যাহ্নে অন্নদানে বাঁচাইয়া রাখা। আর দেখিয়াছি তাহার যাত্রী-সংখ্যা কম নয়, কিন্তু তাহাতে যাহা পাওয়া যায়,—বোধ হয় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ ব্যতীত কিছুই উদ্‌বৃত্ত হয় না। প্রত্যেক যাত্রীদলকে খাওয়াইয়া দু'তিন দিন নিজ গৃহে স্থান দিয়া রাখিতেই প্রাপ্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়,—তাহাতেই আনন্দ।

কামাখ্যার প্রাচীন তীর্থ ইতিহাস বা মহাপীঠের যে কথা তাহা কে না জানে? সুতরাং কাজ নাই সে কথায়, অতীতের কথা না বলিয়া বর্ত্তমানে আমার সঙ্গে যেভাবে এই পীঠস্থানের পরিচয় হইয়াছিল সেই কথাই বলিব। তার প্রথম হইল কুমারী বিদায়—এ তীর্থে কুমারীদের বড়ই প্রতাপ, তাহারা

সব কিছুই করিতে পারে। কলিকাতার কালীঘাটে প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপই ছিল।

আট বৎসরের গৌরী হইতে ষোড়শী সপ্তদশী অথবা অষ্টাদশী পর্য্যন্ত পয়সার জন্য আমায় যেভাবে আক্রমণ করিল, সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যাহাকে ঐ অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে সে-ই জানে। আগে পাছে কাপড় ধরিয়া এক দল, দু'দিকে দুই হাত ধরিয়া দুই দল এমন ছাঁকিয়া ধরিয়াছে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়িতেছি,—ঠিক সেই বিষম দুর্য্যোগের সময়েই পাণ্ডা বিপিন ঠাকুর এক দল যজমানের অগ্রে অগ্রে মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়াই আমার দুর্গতি দেখিলেন এবং ঝড়োন্মত্ত কুমারী দলকে লক্ষ্য করিয়া—এই তোরা কি করছিস, সাধু দেখে চিনিস না, ওঁর কাছে কি পয়সা আছে?—যাঃ, ঘরে যা। বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। আমি সকৃতজ্ঞ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনই তিনি আমায় পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি নিকটে আসিয়া যেভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন এবং আমার সকল কথা শুনিলেন, তাহাতে চমৎকৃত হইলাম। শুধু সে রাত্রের জন্য নয়—যতদিন ওখানে থাকিব ততদিন মধ্যাহ্নে আহারের ব্যবস্থা তাঁর সংসারেই করিলেন। এইভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদ্যতা ঘনীভূত হইবার যোগাযোগ ঘটিল।

এখন আমায় বলিলেন, শিবসাগর থেকে আমার একঘর যজমান এসেছেন, আপনি এখানে একটু থাকুন তারপর একসঙ্গে ঘরে যাব—বলিয়া মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ যজমান দল সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আগে আগে একটি গৌরাঙ্গী কিশোরী, তারপর রোগা-শরীর, লম্বা, সার্ট পরা এক যুবক তাহার পিছনে, তাহার পশ্চাতে প্রায়-বৃদ্ধ, দীর্ঘশরীর কর্ত্তা, পার্শ্বে প্রৌঢ়া গৌরাঙ্গী গৃহিণী তাঁর—সর্ব্বপশ্চাতে পাণ্ডাঠাকুর, বিপিনচন্দ্র হাতে প্রসাদীনির্ম্মাল্য লইয়া আসিতেছেন। সবার কপালে সিন্দূরের ফোঁটা, গলায় জবার মালা।

কথা কহিতে কহিতে যজমান সঙ্গে পাণ্ডাঠাকুর বাসায় পৌঁছিয়া আমায় বাহিরের একখানি ছোট ঘরে বসাইয়া যজমানদের লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তক্তা একখানা পাতা ছিল—তাহার উপর বসিয়া চিন্তায় ডুবিয়া গেলাম। সেই ট্রেন হইতে সকল কিছুই মনে হইতে লাগিল।

—বাবা আপনারে ভিতরে ডাকেন, বড়ুয়া মহাশয় আলাপ করবেন। প্রায় বারো বৎসরের একটি ছেলে আসিয়া যখন ডাকিল তখন আমার চমক

ভাঙিল, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বড়ুয়া মশায়ের নিকট ভিতর-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি ভদ্রতাপূর্ব্বক উঠিয়া, প্রবীণ কোন ব্যক্তিকে যেভাবে সাদর অভ্যর্থনা করে সেইভাবেই আমায় গ্রহণ করিলেন। নমস্কারান্তে উভয়ে বসিবার পর তিনি আমার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রশ্নগুলি সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা-মূলক, এমনই কঠিন যে উত্তর দেওয়া মুশকিল। বিবাহ করিয়াছি কিনা, এবং স্ত্রীকে ফেলিয়া আসিয়াছি কেন? সন্তানাদি হইয়াছে কিনা? পিতা, মাতা, ঠাকুমা, পিসি, খুড়া, জেঠা ইত্যাদি জমজমাট সংসার ছাড়িয়া আসা আমার ধর্ম্মানুমোদিত হয় নাই ইত্যাদি। আমি যতই কেন বুঝাইতে চেষ্টা করি না যে আমি সংসারাশ্রম ত্যাগ করি নাই, তিনি উহাতে কান দিলেন না দেখিয়া আমি মুখটি বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আর কিছু না হোক এটা লক্ষ্য করিলাম, তিনি অত্যন্ত মায়ায় জড়িত সংসারী। তিনি নিজ পরিচয়ও দিলেন। তিনটি চা-বাগানের মালিক, সংসার ত্যাগ করিয়া এই কামাখ্যা দেবীর আশ্রয়ে বাস করিতে আসিয়াছেন। এইখানেই দেহত্যাগ করিবেন, যেমন আমাদের বাঙলার লোকে দেহত্যাগ করিতে সংকল্প লইয়া কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থধামে বাস করেন,—সেইরূপ। তবে সঙ্গে আছেন একটি নাতনী এবং ভাগিনেয় শ্রীমান জনকলাল, আর পতিব্রতা স্ত্রী —তিনিই সরলভাবে যেন বিচারে তাঁহার কিছুই ভুল হয় নাই এরূপভাবেই আমায় বলিলেন, স্ত্রী আমার যখন পতিব্রতা তখন তাকে কোনমতে, কোন অবস্থায়ই ছেড়ে আসা যায় না।

যাই হোক রাত্রের মত একটি আশ্রয় পাওয়া গেল। এইটিই আজ শেষের কথা।

কামরূপ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম ভুবনেশ্বরী। কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে প্রায় দেড়পোয়া পথ চড়াই উঠিয়া ভুবনেশ্বরী শৃঙ্গে পৌঁছাইতে হয়। পীঠস্থান প্রাচীন, শৃঙ্গের উপরে অনতিপ্রশস্ত ক্ষেত্রে মন্দিরটি অবস্থিত দেখিলাম, মন্দিরের দেয়াল পাকা, উপরে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চূড়া বা ছাদ নাই, কোন রকমে একটি চৌকা খিলানের উপর কতকটা আচ্ছাদন মাত্র। নাটমন্দিরের দেয়াল পাকা বটে কিন্তু টিনের চাল দিয়া ঢাকা, তবে সম্মুখেই কতকটা ফাঁকা। এখানে সর্ব্বত্রই ঐ টিনের ব্যবহার। মন্দিরের ধারে একখানা পাথরের উপর পুরাতন কষ্টিপাথরের খোদাই একটি মূর্ত্তি। তার কোন পরিচয় নাই।

নাটমন্দিরের একধারে এক বিহারী যুবা সাধু আড্ডা গাড়িয়াছে। দেখি

আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে অপরদিকে প্রায় সামনাসামনি আসন বিছাইলাম। মধ্যে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ পথ,--বেশ প্রশস্ত কতকটা স্থান রহিল। সে বেচারা আমায় পাইয়া যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। ছাপরা জেলায় তার ঘর, ঘর ছাড়িয়া দশ-বারো বৎসর গুরুর কাছে কাছে ছিল, এখন গুরু বলিয়াছেন যে, তু যা, আপনা দেখ্‌লে। ঘুম ঘুমকে সমঝ্‌লে। তাই এখন পর্য্যটনের পালা চলিতেছে,—উত্তর ভারতের বড় বড় তীর্থ শেষ করিয়া এখন বাংলায় প্রবেশ এবং কালী মায়ীজী দর্শন করিয়া কামাখ্যায় শুভাগমন হইয়াছে। এই বর্ষায় চার মাস থাকিবেন এই সংকল্প। বাবাজী নাথ সম্প্রদায়ের সাধু, নামটি তাঁর ধীরনাথ।

তাহার কাছেই উমাপতি সিদ্ধ ভৈরবের বার্ত্তা পাইলাম, শুনিলাম তিনি এই ভুবনেশ্বরীর নীচেই থাকেন,—তাঁর স্থানটি সুন্দর, সেদিকে কেউ যায় না, শান্তিপূর্ণ স্থান। শুনিলাম তিনি সন্ধ্যায় এই ভুবনেশ্বরীর মন্দিরেই মধ্যে মধ্যে চক্র করেন। এখন বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়াছেন, কয়েক দিন পরে আসিবেন।

যাহা হোক, এখন আসনখানি বিছাইয়া কম্বল ও কমণ্ডলুটি রাখিয়া নাটমন্দির হইতে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে বাহির হইলাম।

১২

দেবীর মন্দির একেবারেই শীর্ষদেশে অবস্থিত। সুতরাং মন্দিরের চারিদিকে আর প্রশস্ত সমতল জমি নাই, সবদিকেই ঢালু প্রস্তরখণ্ড-সমাকুল জমি নামিয়াছে। মন্দিরের ঠিক পিছনে যাইতে হইলে পার্শ্বে সরু অপরিসর রাস্তা আছে। সেই অসমতল সরু গলিপথে আসিয়া মন্দিরের পিছন দিকেই দাঁড়াইলাম। সামনেই অনন্তবিস্তৃত আকাশ—আর নীচে, একেবারে যেন মুক্ত পাতালক্ষেত্রে নদনদী খর্ব্বাকৃতি পর্ব্বত মিলিয়া এক একাকার—ভুবনেশ্বরী হইতে যে দৃশ্য আজ দেখিলাম জীবনে তাহা ভুলিব না। একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মগ্ন হইলাম,—সেই রূপময়ের প্রাকৃত রূপের মধ্যে।

দূরে একদিকে খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো পাহাড়ের শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে, চারিদিকেই পর্ব্বতমালা অতীব মনোরম, গাঢ় শ্যামল মূর্ত্তি। ডানদিকে শিলং যাইবার রাস্তা। বিন্দু বিন্দু কত গাড়ী যাইতেছে, গাছের আড়াল হইতে দেখা যাইতেছিল। উপরদিকে পাহাড়ের শ্রেণী। সম্মুখেই গৌহাটি, ঐ যে তাহার

নীচে সেই বিশালকায় ব্রহ্মপুত্র নদ যেন এতটুকু চওড়া একফালি রঙিন কাপড় আর তাহার মাঝে একটু বাঁদিক ঘেঁষিয়া উমানন্দ শৈল। চারিদিক সবুজের ঘন আবরণে মনোহর, এ সবুজের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। কামরূপের ঠিক নিচেই পর্ব্বত-পাদমূলে ঘন জঙ্গল দেখা যাইতেছে। সেখান হইতে ব্রহ্মপুত্রের উপর স্টীমার চলিতেছে, যেন একটি নারিকেলী কুলের শুষ্ক আঁঠিটি। কি উদার মুক্ত ক্ষেত্র আমার সম্মুখে। দূর, কতদূর শেষে গাঢ় নীলাভ ধূসর-বর্ণের পর্ব্বতমালা, একটা মোহ আসিয়া যায় এ সকল দেখিতে দেখিতে। নাম

ধাম গাঁই গোত্র কিছুই মনে থাকে না—অল্প-ক্ষণেই আপন অস্তিত্ব হারাইতে হয়। কোথায় রহিল এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার সঙ্কল্প, দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কোথাও নড়িতেও প্রবৃত্তিই হইল না। ইহার কাছে আর কিছুই বড় নহে, চাওয়া-পাওয়া সব নিঃশেষে মুছিয়া গেল। কামরূপের এই ভুবনেশ্বরী শৃঙ্গের উপর আসিয়া এইস্থানে যিনি একবার নয়ন মেলিয়া চারি-দিকের এ দৃশ্য দেখিয়াছেন জীবনে তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। দ্বিপ্রহর নাগাদ নবীন ছাপরা-জেলা-নিবাসী সেই সাধুটি পিছন হইতে হাঁক দিয়া আমার তত্ত্ব করিল। তাহার দিকে ফিরিয়া দেখিতেই, হাতের আঙুল কয়টি যুক্ত করিয়া নিজ মুখের দিকে তুলিয়া ভোজনের ইঙ্গিত জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ক্যা ভোজন কা প্রবন্ধ নহি বা? আমি তখন উঠিলাম।

নীচে নামিয়া পাণ্ডা ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দশ-বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে গৌরী, তার নামটি যাহাই হোক তাকে গৌরীই বলিব। আসিয়া বলিল,—বাবা, আপনার খাবার কথা বলে গিয়েছেন, আপনি বসুন। অল্পক্ষণেই বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল, সম্মুখেই অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত; অবিলম্বেই আমি বসিয়া গেলাম। এই গৌরী কন্যাটি আমাকে নিত্যই খাওয়াইত এইভাবে, সে-ই ছিল আমার অন্নদাত্রী—যতদিন সেখানে ছিলাম, একদিনও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

সেদিন বৈকালে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে আবার সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া আছি আর সন্ধ্যা-দৃশ্য উপভোগ করিতেছি। মনের মধ্যে অশেষ চিন্তাপ্রবাহ যেন নিঃশব্দে ভাবিয়া চলিয়াছে—যতদিন ছিলাম এই স্থানই ছিল আমার আসন, সর্ব্বদুঃখ-চিন্তাহর ও সর্ব্বানন্দকর আসন, সেখানে প্রতিদিনই বসিতাম। এখন হঠাৎ পিছনে কথাবার্ত্তার আওয়াজে ফিরিয়া দেখি বিপিন ঠাকুরের সেই শিবসাগরের যজ্‌মানটি,—বড়ুয়া মহাশয় আর তাঁহার সঙ্গে সেই কিশোরী নাতনী, পশ্চাতে ভাগিনেয় জনকলাল বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। আমার নিকটে আসিয়া সম্ভাষণ করিলেন,—কি বাবা, এইখানেই এখন রইলে না কি? আমি বলিলাম,—নাটমন্দিরেই আশ্রয় নিয়েচি। বেশ বেশ। বলিয়া তিনি মেয়েটির দিকে চাহিলেন, বলিলেন, দেখেচ দিদি, কি সুন্দর স্থান? আমি তাঁহাদের দেখিয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—চলো দিদি, আমাদের কাজের সময় হয়ে এলো, এবার যেতে হবে। তারপর আচ্ছা, -বলিয়া আমার দিকে লক্ষ্য এবং দুটি হাত কপালে তুলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখানে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পূজারী, তাঁর নাম দিগম্বর, ডাকনাম দিগু ঠাকুর, তাহার সহিত আজ আমার আলাপ হইয়াছিল। তাহাকে এখানকার গেজেট বলিলেই হয়, তুমি জিজ্ঞাসা করো বা না করো সে উপযাচক হইয়া নিজেই এখানকার যাহা কিছু সংবাদ তোমায় জানাইয়া দিবে। তাহার কথা পরে বলিব। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধারে সব দিক ঢাকিয়া গেল। দূরে পর্ব্বত, নীচে নদী, নিকটে বনানী, ক্রমে ঝাপ্‌সা হইয়া এক অখণ্ড কৃষ্ণধূসরে পরিণত হইল। তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল সম্মুখে গৌহাটির গায়ে খণ্ড খণ্ড দীপের মালা। ঘন কুয়াশার আঁধারের মাঝে খানিক অল্প ব্যবধানে মাঝে মাঝে ঐ আলোর বিন্দু পাহাড়ময় ছড়ানো রহিয়াছে।

অন্ধকারে বাগানে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে আলোর ফুল ফুটিয়াছে। নিস্তব্ধ চারিদিক, কোনদিকেই সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না, বেশীক্ষণ আর এখানে থাকা ভালো নয়। আমার বান্ধব ধীরনাথের মুখে শুনিয়াছিলাম জায়গাটায় সাপের ভয়ও আছে; এইসব ভাবিতে ভাবিতে নাটমন্দিরে ঢুকিলাম এবং আপন আসনে বসিয়া পড়িলাম। গর্ভগৃহের পানে চাহিয়া দেখি আমাদের বড়ুয়া মহাশয় ইতিমধ্যে একখানি লাল চেলি পরিয়া, স্কন্ধে উত্তরীয়,—ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আর পার্শ্বের দিকে অপর আসনে পূজার উপকরণ

সাজানো, তাহার মধ্যে একটি কালো বোতলও আছে। বড়ুয়া-গিন্নী একখানি কস্তা-পেড়ে গরদ পরিয়া বাম পার্শ্বে আসনে উপবিষ্টা, নাতনীটি তাঁহাদেরই পাশে বসিয়া আছে। ভাগিনেয় মামার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

আমাকে দেখিয়া বড়ুয়া মহাশয় বলিলেন,—কি বাবা, আমাদের চক্রে আসবে নাকি? আমি বলিলাম,—চক্রে বসার যোগ্যতা আমার নাই, তা ছাড়া আমার সাধনপথ পৃথক। শুনিয়া তিনি যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং বলিলেন,—আমার যেন ধারণা ছিল তুমিও একজন তান্ত্রিক, আর দীক্ষিত তান্ত্রিক।

ইহার পর ঘরের কপাট পড়িয়া গেল। যেখানে আমি থাকি, ঐ নাটমন্দিরের কাছেই পশ্চিম পাশের দিকে অল্প একটু নিচের দিকে নামিয়া আসিলে একখানি টিনের চালওয়ালা বড় ঘড দেখা যায়। চারিদিকেই বারান্দা আছে। ঐ আশ্রমটির কথা পরে শুনিয়াছিলাম যে উহা ভুবনেশ্বরীর যাত্রীদের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন দেখিলাম আমাদের বড়ুয়া মহাশয় সপরিবারে ঐ আশ্রমটি দখল করিয়াছেন। বিপিন পাণ্ডাকে ধরিয়াই ইহা সহজ হইয়াছে। অবশ্য এখন তেমন যাত্রী আসে না তাই,—এখানে ত বসবাস নাই, রাত্রে ত কেহ থাকেই না, কেহ কোন খবর রাখে না—কাজেই সাধারণে কেহ কোন আপত্তি করে নাই। সাধারণতঃ যাত্রীরা ঐ কামাখ্যা দেবী দেখিয়াই নামিয়া যায়, অতটা উপরে কেহ উঠিতে চায় না, রাত্রিবাস ত দূরের কথা।

ক্রমে ক্রমে বড়ুয়া মহাশয়ের সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, সেটি স্বামী স্ত্রী উভয়েরই আকর্ষণে ঘটিয়াছিল যাহা আমি এড়াইতে পারি নাই। দিনমানে পাণ্ডার ওখানে খাইতাম, রাত্রে উপবাস করিতাম জানিতে পারিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রে কোনদিন একটু হালুয়া, কোনদিন বা ফলমূল অনুরোধ-পূর্ব্বক খাওয়াইতেন এবং বলিতেন,—রাত্রে নিরম্বু উপবাস তোমাদের মত জোয়ানের পক্ষে মারাত্মক।

বড়ুয়া মহাশয়ের শরীর দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার কোন ব্যাধি আছে। অবশ্য ঠিক বলা কঠিন, মনে হইয়াছিল তাঁর হাঁপানী আছে; তাহার লক্ষণ মধ্যে মধ্যে কাশির সাঁই সাঁই আওয়াজে পাইতাম।

এইভাবেই কয়েকদিন কাটিয়া গেল, প্রত্যহই খবর লইতেছি দিগু ঠাকুরের কাছে উমাপতি ভৈরব এখনও বশিষ্ঠাশ্রম হইতে ফিরেন নাই। ইতিমধ্যে

যাইয়া কৌলবাবার আশ্রমটি দেখিয়া আসিয়াছি। উহা ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের নিকটেই, বেশী দূর নয়। উপর হইতে নীচে আসিতে প্রায় মধ্যপথে পড়ে, তবে একটু ঘুরিয়া পশ্চাদ্দিকে যাইতে হয়। তাঁহার আশ্রম হইতে ব্রহ্মপুত্রের এবং গৌহাটির দৃশ্য অতীব সুন্দর দেখা যায়। বোধ হয় আমরা আসিবার দুই সপ্তাহ পরে তাঁহার দেখা পাইয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে আর এক নাটকীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

এই কয়দিন হইতে দেখিতেছি, বড়ুয়া মহাশয়ের জামাই প্রভৃতি নিকট সম্বন্ধীয় কেহ কেহ তাঁহার কাছে আসা-যাওয়া করিতেছেন। তাঁহাকে প্রত্যহই সকালে-বিকালে আশেপাশের কোন স্থানে, নিকট-ভূমিতেই বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন দেখা যাইত। সঙ্গে নাতনীটিও থাকিত আর ভাগিনেয়ও থাকিত। জনকলাল ভাগিনেয়টি তাঁহার আশ্রিত এবং অনুগত। তাহাকে সহায় করিয়াই বড়ুয়া মহাশয় কামাখ্যা বাস করিতেছেন একথা মধ্যে মধ্যে বলিতেন। হাট-বাজার যা-কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ জনকলালই করিত এবং বাহির হইলেই সঙ্গে থাকিত। লেখাপড়া বিশেষ কিছুই হয় নাই, ভবিষ্যতে মামার অনুগ্রহের উপর তাহাব নির্ভর।

সেদিন প্রায় সারাদিনই বর্ষা, মাঝে মাঝে একটু ধরণ কবিলেও প্রায় সারা দিনই জল হইয়াছিল। বৈকালেও আমি আজ বাহির হয় নাই, আপন আসনেই রহিয়াছি—সারা ক্ষেত্র ভিজিয়া উঠিয়াছে,—আমাদের শয্যার নীচে একটা চেটাই, তার উপর কম্বল, উহাও যেন ভিজিয়া উঠিয়াছে। বড়ুয়া মশাই সন্ধ্যার পর যথানিয়মে যেমন অমাবস্যার রাত্রে চক্র করিয়া উপাসনা করেন, তাহা করিয়া গেলেন দেখিলাম। শনি মঙ্গলবারে এবং অমাবস্যার রাত্রে মাসের মধ্যে এই কয়দিন পারিবারিক চক্র করিয়া উপাসনা করিতেন; না হইলে অন্যদিন সন্ধ্যার পর নিজ গৃহেই সপরিবারে নিত্য সাধন-কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ—এটা ছিল তাঁর মূল কথা।

একটি কেরোসিনের লম্প কোথা হইতে আমার বান্ধব ধীরনাথ যোগাড় করিয়াছিল, নিচে কোন গৃহস্থের নিকট হইতে একটু তেলও সংগ্রহ করিয়া সে প্রত্যহ শয়নের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আলোটা জ্বালাইয়া রাখিত, তাহাতে আমারও কাজ হইত– সেজন্য তাহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ ছিলাম। আমার সঙ্গে পেন্সিল ও খাতা বরাবরই আছে; দিনে আঁকা, রাত্রে লেখা—তাহারই আলোর সাহায্যে। কর্ত্তাদের বন্দোবস্ত মত নাটমন্দিরে একটা আলো আছে; কিন্তু

তাহা একটি লণ্ঠন। সন্ধ্যারতির পর দিগু ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আলোও চলিয়া যাইত। সেটা তাঁর ঘরের আলো হইয়া গিয়াছে।

ছাপরা জেলার বান্ধব আমার বড়ই সঙ্গীতপ্রিয়, যতক্ষণ না গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িত ততক্ষণ তাহার গান চলিত। এক-একটা গান তার বেশ ভাল, মৈথিলী ভজন,—অতি মধুর। সে রাত্রে বর্ষা নামিয়াছিল, কাজেই সকাল সকাল তাহার ভজন শুনিতে শুনিতেই ঘুমাইয়াছিলাম,—নিশ্চিন্ত মনে গাঢ় নিদ্রায় তখন আমরা সুপ্ত, গভীর রাত্রে নাটমন্দিরের দরজায় ধাক্কা,—টিনের দরজায় ধাক্কা, সুতরাং আওয়াজটা বড় শ্রুতিসুখকর নয়। ঘুম ভাঙিয়া গেল—আর বুকটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল একটা দুঃস্বপ্নের মত, ততক্ষণে ধীরনাথজী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াছে,—সম্মুখে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে বড়ুয়া মহাশয়ের নাতনী, পিছনে ছাতা লইয়া জনকলাল। ভিতরে আসিয়া সে বলিল,—একবার চলুন, মামার অবস্থা ভাল নয়, তিনি আপনাকে ডাকচেন। শুনিয়া উঠিতে উঠিতেই বলিলাম,—নীচে কোন ডাক্তার নাই কি? সে বলিল,--এখন আপনাকেই তিনি ডাকচেন, আসুন আপনি একটু তাড়াতাড়ি। আমি একটা বিস্ময় উদ্বেগ এবং একটা আকস্মিক ভয়েও বটে—নির্ব্বাক, দ্রুতগতি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মেয়েটি আগে আলো লইয়া।

চার-পাঁচটি বালিশ উপর উপর রাখিয়া তার উপরে মুখ গুঁজিয়া হাঁপাইতেছেন, বুড়ী পাখা হাতে বাতাস করিতেছে আর বোধ হয় কাঁদিতেছে। আগে ছিল জনকলাল,—কৈ সেই কলকাতার ছেলেটি কৈ,- এই যে এসেছেন, বলিয়া সে আমায় দেখাইয়া দিল। আমি যাইতেই বড়ুয়া মশায় ধীরে ধীরে মাথাটি তুলিয়া হাতের ইশারায় আমায় তাহার নিকট আসিতে বলিল,—তাঁহার নিকটে গেলাম—হাঁপের কষ্ট সত্ত্বেও ভাঙা ভাঙা আওয়াজে তিনি বলিলেন,—ঐখানে কাগজ কলম দোয়াত সবই আছে, নাও বাবা, যা বলি লিখতে আরম্ভ করো। একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে বাবা, আমার সময় বুঝি আর বেশী নেই। একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—ইংরাজীতেই তুমি লিখবে আমি ভাষায় যা বলচি। তিনি চুপ করিলেন। আমি কোন কথা না কহিয়া তাহাই করিতে প্রস্তুত হইলাম। বিস্ময় ও ভয় যুগপৎ আমায় স্তম্ভিত করিয়াছিল।

ব্যাপারটি যা শুনিলাম ও লিখিলাম তাহা এই,—তিনি সজ্ঞানে এই উইল করিতেছেন, শিবসাগর-নিবাসী ভৈরবচন্দ্র বড়ুয়া, বয়স চৌষট্টি বৎসর—

তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা, কোন পুত্র নাই, একটি ভাইপো, একটি ভাগিনেয় ও একটি নাতনী সুধামুখী ছাড়া আর কেহ নাই। তাঁর মৃত্যুর পর এদের মধ্যেই তাঁর সকল কিছুই ভাগ করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা। সম্পত্তির তালিকা এইরূপ,— (১) ডিব্রুগড়ের দুখানি বড় চা-বাগান। (২) শিবসাগরে প্রকাণ্ড বসত-বাড়ি, (৩) দুখানি ফল শাকসব্জীর বাগান, (৪) গৌহাটিতে দুখানা বাড়ি, সারা বছর ভাড়া চলে, (৫) নিলফামারীতে একখানা বড় বাংলা যা রোল্যাণ্ড সেপার নামে সাহেবকে ভাড়া দেওয়া আছে, আর (৬) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে আঠারো হাজার টাকা পাঁচ বছরের স্থায়ী আমানতে দেওয়া আছে, (৭) আর সাড়ে ছয় হাজার আন্দাজ চলতি আমানতে আছে। এইসব সম্পত্তি তাঁর স্বকৃত উপার্জন, কেবল শিবসাগরের দুখানি ফলবাগান আর শিবসাগরের বসতবাড়ি পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবেই পেয়েছিলেন। সম্পত্তিগুলি তাঁর জীবিত আত্মীয়গণের মধ্যেই ভাগ করে দিতে চান, যথা, দুই মেয়ে কিরণময়ী আর চিন্ময়ীকে ডিব্রুগড়ের দুখানি চা-বাগান, ভাইপো অজিত বড়ুয়াকে শিবসাগরের বসতবাড়ী ও তৎসংলগ্ন বাগান, নিলফামারীর বাংলাখানি নাতনী সুধাকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ সকল অধিকাব সমেত দান করিলেন। গৌহাটির একখানা বাড়ি আর চলতি আমানতের সব টাকাই ভাগিনেয় জনক-লালকে দিলেন। বাকি সকল কিছুই স্ত্রী শ্রীমতী হেমলতাকে সকল অধিকার অর্থাৎ দান-বিক্রয়ের অধিকার সমেত দিলেন। বড় জামাই শ্রীযুক্ত, তিনি একসিকিউটর, ইত্যাদি ইত্যাদি। ধীরে ধীরে এই পর্য্যন্ত বলিয়া যেন একটু সুস্থ হইলেন। তারপর আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—যেন কিছু বলিবেন। এমনভাবে কিছুক্ষণ গেল, তখন আমি বলিলাম,—আমায় কিছু বলবেন? ধীরে ধীরে বলিলেন,—হ্যাঁ, বলবো বাবা, তোমায় বলবো। কিন্তু তুমি কি আমার কথা রাখবে? আমায় ভাবাইয়া তুলিল,—এ কি ফ্যাসাদ! তিনি নিরস্ত হইলেন না, বলিয়া চলিলেন,—তোমারই মত আমার একটি ছেলে ছিল, বাইশ বছর বয়সে সে আমায় পাগল করে চলে গেছে, সেজন্য,—বলিয়া চুপ করিলেন। তারপর আবার,—তোমায় দেখে অবধি আমার বড় মমতা হয়েচে, আমার সেই মমতার দাবীতেই আমি তোমার কাছ থেকে একটা কথা চাই, বল বাবা রাখবে আমার কথা?

আমি বলিব কি, শুনিয়াই আমার ধুকধুকি কাজ বন্ধ করিবার উপক্রম করিল। এ কি ভয়ঙ্কর! বিদায়বেলা বৃদ্ধ আমায় লইয়া করিবে কি? আমায়

নিরুত্তর দেখিয়া তিনি অবশেষে বলিলেন,—একখানি ছোট বাড়ি আমার গৌহাটিতে আছে, তার সঙ্গে বিঘা দশেক জমি আমি তোমায় দিতে চাই, তুমি সেটা গ্রহণ করো,—তাহলে আমি শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। বল বাবা, বলিতে বলিতে যেন ক্লান্ত হইয়া বালিশে মাথাটি রাখিলেন এবং কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। এমনই সময় গৌহাটি হইতে তাঁহার জামাই ডাক্তার লইয়া আসিয়া পৌছিলেন।

আমাকে এভাবে সামনে কালিকলম, লেখা কাগজ দেখিয়া হয়তো ব্যাপারটা অনুমান করিয়াও ফেলিলেন, তখন আমি বলিলাম,—তা হ'লে আসি। জামাই মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন,—হ্যা হ্যা আপনি যান, আমরা সবাই আছি দেখবো—আমরা থাকতে ওঁর কিছু কষ্ট হতে পারে না, যান আপনি—

আমি উঠিয়া যখন দ্বারপ্রান্তে পৌছিলাম, বাইরে অন্ধকার—ভিতরে জামাই আসিয়া সব কিছু কাজই হাতে লইয়াছেন, তিনি বলিতেছেন শুনিলাম,—আমরা থাকিতে অপর কেউ এস্যা কাজ বাগায়া লবেন, এডা অথয়ম্ভব—

ভোর হইয়াছে, আমি অন্ধকার নাটমন্দিরে পৌছিলাম। পরদিন শুনিলাম জামাই বাবাজী সবাইকে লইয়া গৌহাটি চলিয়া গিয়াছেন। শ্বশুরকে কামাখ্যায় এরূপ অসহায় ভাবে থাকিতে দিবেন না। আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম। ইহার দুই-তিনদিন পর কৌল বাবা উমাপতি,—বশিষ্ঠাশ্রম হইতে এখানে পৌছিলেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন পাইতে আমার কিছু বিলম্ব ঘটিয়া গেল।

১৩

বড়ুয়া মহাশয়ের কি হইল শেষ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিলাম না। সেজন্য অবশ্য কোন আক্ষেপ ছিল না। তবে একটা কৌতূহল ছিল মাত্র।

সাধারণতঃ সন্ধ্যার পরই নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়া আপন আসনেই থাকি। দিণ্ড ঠাকুর মন্দিরের পূজাপাঠ আরতি শেষ করিয়া চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত শান্তিতে কিছুই করিবার যো থাকে না, তাই প্রথম রাত্রিটা বিহারী বান্ধবের সঙ্গে নানা কথায় কাটাইয়া দিতাম। যে রাত্রে বাহিরের কোন সাধক,—অর্থাৎ কামাখ্যা হইতে তন্ত্রমন্ত্রের কেহ চক্র অনুষ্ঠান অথবা অন্যবিধ ক্রিয়াকর্ম্মের

ব্যাপার করিতে আসেন সে রাত্রে আমাদের বড়ই অশান্তিতে কাটাইতে হয়। যতক্ষণ না তাঁহারা বিদায় হন ততক্ষণ শান্তি থাকে না।

আজ এক বিচিত্র ব্যাপার। প্রাতে যখন দিগু ঠাকুরের সঙ্গে আমার দেখা হইল, খবর পাইলাম বশিষ্ঠাশ্রম হইতে কৌল বাবা ফিরিয়াছেন। সঙ্গে আরও একজন নূতন ভৈরব আসিয়াছে।

যে ব্যক্তি আসিয়াছে সে কিন্তু তাঁহার আশ্রমে থাকে না, তাহাকে তিনি কামাখ্যা মন্দিরের আশেপাশে যে যাত্রী-শালা আছে সেইখানেই রাখিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সঙ্গে এনেছেন অথচ আশ্রমে আনেননি কেন? তাহাতে সে বলিল,—বাবা আশ্রমে যাকে-তাকে তো থাকতে দেন না। কারণ,—বাবার সঙ্গে একজন ভৈরবী মা আছেন কিনা, সেই জন্যই নূতন কেউ এলে ওখানে থাকতে পায় না। তারপর, আমি আজই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব শুনিয়া সে বলিল,—আপনিও যাবেন,—আজ একটু ভিড় আছে কিনা?

সারাদিনই আজ কামাখ্যা মন্দিরের আশেপাশে কাটাইলাম উমাপতির যদি নাগাল পাই, কিন্তু তা হইল না। আমাদের উভয়ের অর্থাৎ ধীরনাথ ও আমার মিলনটি সন্ধ্যার পরেই ঘটে, কারণ ঐ সময়েই দুজনে আপনাপন আসনে বসিয়া নিত্যকর্ম সাধন করি। আমার আসন হইতেই গর্ভগৃহস্থ যন্ত্র,—যেথায় সিন্দূর-রঞ্জিত পাষাণ-প্রতীক, যাহা বহু প্রাচীন কাল হইতেই স্থাপিত আছে সেই ভুবনেশ্বরী প্রতিমার উর্দ্ধাংশ দেখা যায়, আরও যাঁরা পূজা করিতে ওখানে আসেন, বসেন—তাঁদেরও কতকটা দেখা যায়।

ওখানে সন্ধ্যার পর আমি নিজ স্থানটিতে আসনে বসিয়া ভিতর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। প্রথমেই যেন অন্ধকার-ঢাকা কোন রক্তবর্ণ পদার্থ চক্ষে পড়িল ;—তাহার আকার সুনির্দ্দিষ্ট নয়, যেন ক্ষুদ্র একটি স্তূপ। ক্রমে দেখিতে দেখিতে চক্ষু কতকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিলে দেখিলাম একটি প্রস্তর মূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গ সিন্দূর প্রলেপে লাল হইয়া দূর হইতে ঐ প্রকার দেখাইতেছে।

আগে এতটা ছিল না, আগাগোড়া সিন্দূর প্রলেপ আজই পড়িয়াছে। সম্মুখে পূজার আসনে তখন কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না,—কিন্তু সেই সিন্দূর রঞ্জিত মূর্ত্তির বামপার্শ্বে দীর্ঘশরীর জটাজূট-সমাযুক্ত এক মূর্ত্তি আসনে বসিয়া নিঃশব্দে কিছু করিতেছিলেন। ঐ মূর্ত্তিই আমায় প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অন্য কোনদিকেই আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। অতীব বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম।

ধীরনাথও ছিল আমার সম্মুখের আসনে,—সে ছিল আমার দিকে পিছন করিয়া, দেয়ালের দিকেই তাহার মুখ। সে বলিল,—আজ ত মিল গহেল হো! তুমারা বো কৌল বাবা? বলিয়া আমার দিকে ফিরিয়া গর্ভগৃহ দেখাইয়া দিল। ঐ ভিতরের জটাধারীই তাহা হইলে ভৈরব উমাপতি! কি আশ্চর্য্য, আজ সারাদিন নীচে কাটাইলাম তাঁহারই দর্শনের জন্য—কেহ তাঁহার পাত্তা দিতে পারিল না! আনন্দে আমার প্রাণ দীপ্ত হইয়া উঠিল যে আজই এইখানেই আপন আসনে বসিয়া,—তাঁহার দেখা পাইলাম, অদ্ভুত। তবে যতক্ষণ ক্রিয়াকর্ম্মে রত আছেন, ততক্ষণ সম্মুখে যাইয়া হাজির হওয়া অন্যায়। সেই কারণে এখন উঠিলাম না। সুযোগ আজ আর আসিল না। এখন তারপর যাহা হইল তাহা বলিতেছি।

ক্রমে একটা সুর, একতান সুরে ও ছন্দে কোন মন্ত্র উচ্চারণের মতই ধ্বনি, মধ্যে মধ্যে তাহার ছেদ আছে, কানে আসিতে লাগিল;—কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। পরে অনুরূপ স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ শুনিতে শুনিতে আমার মধ্যে একটা গভীর তন্ময়তা আসিল, দেশ কাল পাত্র সকল কিছু বোধ যেন একাকার, এক সমাহিত সুধাময় ভাব আমায় উহাতেই ডুবাইয়া দিল।

বাহিরের দিকে খড়মের শব্দে যখন বাধা পাইয়া আমার মন সেইদিকে ফিরিয়া আসিল দেখিলাম একটি লোক খড়ম পায়ে সশব্দে আসিয়া নাট-মন্দিরে প্রবেশ করিল। হাতে তাহার অনেক কিছু উপকরণ,—ফুল বিল্ব-পত্রাদি শুধু নয়, একটি বারকোশে উপর্য্যুপরি রাখা নানা প্রকার দ্রব্য যাহা আমি ভালো দেখিতে বা বুঝিতে পারিলাম না। আমার সম্মুখ দিয়া সে চলিয়া গিয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পরই অত্যন্ত ধীরে,—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হেঁটমুখে আর এক মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার হাতে একটি হারিকেন লণ্ঠন। তখন সন্ধ্যা ঘোর হইয়া রাত্রি আসিয়াছে। যে মূর্ত্তি আলো হাতে আনিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল সে নারী বোধ হয় ভৈরবীই হইবে। বোধ

হয় এই জন্য বলিতেছি, তাহার পরনে রক্তবস্ত্র নয়, লাল কস্তাপাড়ের সাদা শাড়ী, যুবতী অথবা প্রৌঢ়বয়স্কাও হইতে পারে, কোনটি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। সাধারণ নারীর তুলনায় তাহার শরীর দীর্ঘ কিন্তু স্থূল নয়; সহজ ধীর প্রতিমার মতই তাহার গাম্ভীর্য্য,—কপালে বড় সিন্দূর ফোঁটা, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, তাহাতে নিম্নদৃষ্টি—মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই আবার যিনি আসিলেন তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ইনি সেই ট্রেনের যোগী ভৈরব, কামাখ্যা আসিবার কালে পাণ্ডু হইতে একই গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তিনি এখানে উমাপতির কাছে আসিয়া জুটিয়াছেন। আমার কৌতুহল প্রবল হইল, চিত্তে এই কথাই তোলাপাড়া চলিতে লাগিল যে ভিতরের উমাপতি ভৈরবের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি?

ভিতরে বন ধূপ-ধূনার ধোঁয়া,—উৎকট অবস্থা করিয়া তুলিল। বুঝিলাম, এখন তো ভিতরে চক্রানুষ্ঠান চলিবে, আমাদের সঙ্গে ত কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। তাছাড়া এখনই দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে, কাজেই আজ আর কোনমতে দেখাশুনা হইবার সম্ভাবনা নাই;—সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া আমরা নিজ নিজ ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করিলাম। তারপর শয্যাগ্রহণ ও এক ঘুমে সুষুপ্তির কোলে রাত্রি প্রভাত করিয়া উঠিলাম।

প্রাতঃকৃত্য শেষে আজ আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া উমাপতির আশ্রমের পানে নামিয়া গেলাম। আগেই দেখিয়া গিয়াছিলাম; আমি আজ আর নিরাশ হইলাম না। দেখিলাম,—এক ভৈরব যুবা,—আশ্রমের দাওয়ায় একখানি মাদুর পাতিতেছিল। বোধ হয় এখানেই দেখাশুনা হইবে ভাবিয়া নিকটেই দাঁড়াইলাম। সে আমায় কোন কথাই বলিল না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—উমাপতি বাবা কি এখন বাইরে আসিবেন?

হ্যাঁ, এখনই আসবেন বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং একখানি তোশক ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম আনিয়া সযত্নে পাতিয়া দিল, তারপর একটি রক্তবর্ণ বস্ত্রের তাকিয়া দিয়া গেল। আমি সেই পাতা মাদুরের শেষ দিকে বসিলাম। অল্পক্ষণেই উমাপতি বাবা আসিলেন।

সত্যই যেন মহাদেব। তাঁর গায়ের রং রক্তবর্ণ, দাড়ি পাকিয়াছে, গোঁফও অনেকটা পাকিয়াছে কিন্তু মাথার চুল বা জটা ও ভ্রূদ্বয় ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। কোমরে একখণ্ড লাল কৌপিন মাত্র বাঁধা, সম্মুখে ঝুলিতেছে। ঠিক দিগম্বর।

সহাস্যবদন। দেখিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমায় বসিতে বলিলেন,—এবং ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে পরিচয়-কথা আরম্ভ করিলেন। কি মধুর কণ্ঠস্বর, পূর্ব্বে এমন স্বর শুনি নাই। এই পরিচয়-কথার মধ্যে কিছুই বিশেষ কথা নাই, কেন আসিয়াছি, জীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি কোন কথাই নয়। মোটের উপর প্রায় এক ঘণ্টার উপর ছিলাম। আমি কি করিতাম, কখন কোথায় ঘুরিয়াছি মাত্র এইসব কথাই হইল। তবে তাঁহার স্নেহ পাইলাম, যখন ইচ্ছা তখনই আসিব—অনুমতি পাইলাম। তারপর নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। মন্দিরে তখন দিগু ঠাকুর আসিয়াছে। গত রাত্রের কথা তাহার গোচর করিলাম। ঐ ভৈরবীর কথা সে যাহা বলিল তাহা এই যে,—উমাপতির শিষ্যা তিনি,—মধ্যে ছিলেন না, আজ দুই তিন মাস যাবৎ এখানে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন ও আশ্রমেই আছেন।—আশ্রমের সকল কিছুই, নিত্য এবং নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের ভার তাঁহার উপর। উচ্চ স্তরের ভৈরবী এবং উত্তর-সাধিকা হইয়া অনেকেরই সাধনের ও সিদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাকে ধরিয়া অনেকে নাকি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তবে এখানে কারো সঙ্গে মেলা-মেশা করেন না। এমন কি, বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না। দিগু বলিল যে, আমাদের সঙ্গে নিত্যই দেখাশোনা, পূজা-সম্পর্কে ভুবনেশ্বরী মন্দিরে নিত্য ঘন ঘন যাতায়াত,—পূজার্চ্চনার সম্বন্ধে এতটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও একসঙ্গে তাঁর মুখে দশটি কথা শুনি নাই। যোগিনী-তন্ত্রের সাধিকা। আমি পূর্ব্বে শুনিয়া-ছিলাম যে, যাহারা ডাকিনী বা যোগিনী-তন্ত্রমতে সাধন করে, তাহাদের প্রথম ও প্রধান তপস্যা বাক্‌সিদ্ধির,—তাহাতে সিদ্ধ হইলে তবে অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় স্তরে পাদক্ষেপ সম্ভব হয়।

যাহা হউক, দিগু ঠাকুরের কাছে ইহাপেক্ষা বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। লোকটা ন্যাকা-হাবা গোছের, ভাল মানুষও বটে। নিতান্তই সরল;—কৌতূহল তাহার একটা কোন বিষয়েই নাই, কিছু জানিবার বা জ্ঞানলাভ করিবার কোন আগ্রহও নাই। তার ভাবটা এই যে,—কি হইবে অতশত কথায়? সাধুসন্ত লোকের বিষয়ে কৌতূহলী হওয়া ভাল নয়;—পাছে কোন রকমে তাঁহাদের কোপে পড়িতে হয়, আর মনে করিলে তাঁহারা মারণ উচাটন প্রভৃতি অনেক কিছুই করিতে পারেন। এই সকল স্থানে সাধারণের মনে এই প্রকার ভৈরব বা সিদ্ধ তান্ত্রিকদের উপর একটা ভয়ের ভাব আছে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি

আমাদের কলিকাতা অঞ্চল হইতে তীর্থ করিতে যাঁহারা কামরূপ যাতায়াত করেন, দিনমানেই তাঁহাদের যা কিছু কাজ শেষ হয়—বড়জোর রাত্রে তাঁহারা দেবীর মন্দির হইতে আরতি দেখিয়া যে যাঁর নিজ নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আহারাদির পর শুইয়া পড়েন, আর কোথাও বাহির হন না। তাহাতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য-বস্তু হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এই ভুবনেশ্বরী শৃঙ্গ হইতে রাত্রে অসংখ্য আলোকবিন্দু চারিদিকে ঘন বিক্ষিপ্ত—সারি সারি শ্রেণী-বদ্ধ দীপমালা-অলঙ্কৃত গৌহাটির শোভা বর্ণনাতীত। একবার যাইয়া দেখিতে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না। রাত্রে সম্মুখে গৌহাটি নগরে আলোকমালা আর দিনমানে ঐ স্থান হইতেই ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য,—তার পর দূরে দূরে চারিদিকেই ঘনশ্যামল পর্ব্বতমালা, গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের স্তর, উপরে মেঘমালা শিরে ধরিয়া দিগন্তে চলিয়া গিয়াছে। এই ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পিছনে একখানা পাথরের উপর আসন করিয়া বসিলে সারাদিন ঐ সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায় বলিয়াছি। নীচে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল স্রোত, তাহার উপরে বড় বড় ফ্ল্যাট প্যাসেঞ্জার স্টীমার চলিতেছে। গতি তাহাদের ত ধরিবার উপায় নাই—অনেকক্ষণ দেখিতে দেখিতে তবে তাহাদের গতি লক্ষ্য হয়। কতটা নীচে—প্রায় সহস্র ফিট হইবে ঐ নদীগর্ভ,—বড় বড় পাট, চা, প্রভৃতি বোঝাই স্টীমার, এমন কি কাছাড়ের বড় বড় স্টীমারগুলি যেন খুব ছোট ছোট দিয়াশলাই-এর বাক্স অথবা ঘন একটু রেখার মত। নৌকাগুলি ত অনেক সময় চক্ষেই ধরা যায় না। ওখান হইতে উমানন্দ পাহাড় ও তদুপরি মন্দির চমৎকার দেখা যায়। পরে উমানন্দ গিয়াছিলাম। এখানে ভুবনেশ্বরীর শৃঙ্গ হইতে দেখিলে মনে হয় যেন চারিদিকে ঘন জঙ্গলজালে ঘেরা কতকটা জমি নদীর মাঝে চরের উপর পড়িয়া আছে। তীর্থহিসাবে উমানন্দ শৈলের বড় মাহাত্ম্য।

১৪

এখন কামাখ্যার বিপিনঠাকুর পাণ্ডার ঘরে যখন স্নানাদি শেষ করিয়া আহার করিতে গেলাম, কাল সন্ধ্যায় যে ভৈরবীকে ভুবনেশ্বরীতে দেখিয়াছিলাম দেখি আজ সে পাণ্ডার কন্যা গৌরীর সঙ্গে ঘরের মধ্যে তক্তার উপর বসিয়া কথা কহিতেছে। গৌরী মেয়েটি অতীব শান্তস্বভাবা।—আমি খাইতে বসিলে সে ঘরের বাহিরে দ্বারের নিকটেই আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে, মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া দেখিয়া লয় আমায় আর কিছু দিতে হইবে কিনা। একে ত অন্ন বেশী পরিমাণে

দেওয়া থাকে—তা আমার মত দু'জনের পক্ষেও বেশী—কাজেই আমার আর কিছুই দরকার হয় না। প্রথম দিন আহার দেখিয়া পরদিন হইতে প্রায় পরিমিত অন্ন আসে; তবুও শেষে জিজ্ঞাসা করে আমার পেট ভরিয়াছে কিনা। তাঁহার ধারণা কলিকাতার লোকেরা বড় কম খায়।

যাহা হউক, আমি এখন আসিয়া দেখিলাম, আমার ঠাঁইটা করাই আছে, জলের ঘটিটা বাঁদিকে যেমন থাকে তেমনি; পদ্মপাতা একখানি পাতা আছে, একটা কাঁচা লঙ্কা ও নুন তাহার এক কোণে। আমার আবির্ভাবে দুজনেই বাহিরে গেল। কাজেই আমি তক্তার উপর বসিয়া অন্নের অপেক্ষায় রহিলাম। ভৈরবীর হাতে একখানা পত্র ছিল, যেন ঐ পত্র লইয়াই তাহাদের মধ্যে কথা হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম আবার দুইজনেই আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল।

গৌরী,—এখন এক পা আসিয়া বলিল,—ইনি আপনারে কিছু বলবেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি বলবেন? ভৈরবী একটু আগাইয়া আসিল এবং হাতের পত্রখানা তক্তার উপর, যাহাতে সহজেই আমি লইতে পারি এমন স্থানে রাখিয়া বলিল,—এখানা পড়ে দেখেন।

খামের মধ্যে পত্র ছিল, বাহির করিয়া পড়িলাম,—

কামেগ্রাম, কাঁটালিপাড়া পোঃ আঃ (হুগলি)

এলোকেশী,—আমি অনেক সন্ধান করিয়া শেষে জানিতে পারিলাম যে তুমি কামাখ্যায় গিয়াছ ও সেই বুড়ো ভৈরবের দাসী হইয়া আছ। আজ প্রায় এক বৎসর পর তোমার খোঁজ পাইলাম। কিন্তু আমি যে সেখানে গিয়া পৌছিব তাহার সামর্থ্য নাই,—গত দুই বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মরিতেছি তাহার উপর হাতে একটিও পয়সা নাই। পথ্য জুটিতেছে না। আমি এখনও মরিতে চাই না, এখনও বাঁচিয়া থাকিব আর তোমার শাস্তি দেখিব। তোমার

দুর্গতি না দেখিয়া আমি কিছুতেই মরিতে পারিব না। মনে করিও না যে আমি অশক্ত বলিয়া তোমাদের কাছে যাইতে পারি নাই কিম্বা পারিব না—আমি এখন দৈবের সাহায্য লইয়াছি,—এইবার তোমার সর্ব্বনাশ করিব, তুমি আমার হাতে কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। এখনও বলি তুমি আমার কাছে ফিরিয়া এস, তাহা হইলে এখনও ক্ষমা করিতে পারি। জানি না তোমার এ শুভমতি হইবে কিনা। উপরের ঠিকানায় পত্র দিবে এবং তোমার অভিপ্রায় জানাইবে। আর যদি পনেরো কি কুড়িটা টাকা পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে আমার ঔষধপত্র চলে, এখানে কিছু ধার হইয়াছে, তাহারা বড়ই জ্বালাতন করিতেছে। তুমি যেমন করিয়া পার টাকা নিশ্চয় পাঠাইবে। ইতি—শ্রীঅঘোরনাথ ব্রহ্মচারী।

জিজ্ঞাসার কথা অনেক; এই অদ্ভুত পত্র সম্বন্ধে আমার বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক হয় নাই, কারণ এ ধরনের ভৈরব ও ভৈরবী-জীবনের কথা অনেক জানিতাম। শুনিয়াছিলাম কত, চাক্ষুষ দেখিয়াছি ত অনেক। ইহাদের উপর অসাধারণ ঘৃণা ছিল আমার। আমার মনে হইল দুজনেই সমান পাপিষ্ঠ,—সমাজের জঞ্জাল। তবে ইহার শক্তি সম্বন্ধে দিগুঠাকুরের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে একটু বিশেষ কৌতূহল ছিল। এখন এই পত্র পড়িয়া,—একটা এমন গ্লানি আমার মনোমধ্যে উপস্থিত হইল যে, কথা কহিতে প্রবৃত্তি হইল না। যাহা হউক, এখন পত্রখানা যেখান হইতে লইয়াছিলাম সেখানেই রাখিয়া বলিলাম,—আমি কি করিতে পারি?

ভৈরবী এলোকেশী নামেই পরিচিত।

এলোকেশী পত্রখানা হাতে তুলিয়া লইল, তারপর বলিল যে, আপনি যদি আমার হইয়া একখানি পত্র লিখিয়া দেন তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ত এখানে অনেকের পরিচিত, আর কাকে দিয়েও লেখাতে পারেন, আর নিজেও ত লিখতে পারেন? শুনিয়া সে বলিল, কাকেও কোন প্রকার পত্র লিখতে আমার নিষেধ আছে। আমি বলিলাম,—পত্র ব্যবহারই যদি করতে পারেন তবে শুধু লেখার নিষেধটুকু মানা কি ভণ্ডামী নয়? এ ভাবের কাজ আমার ভাল লাগে না। আমার কথা শুনিয়া তাহার মুখে যে ভাব প্রকটিত হইল দেখিয়া আমার অন্তরে অনুশোচনার সীমা রহিল না, এতটা কঠোর বাক্য আমার মুখ হইতে কেমন করিয়া বাহির

হইল ভাবিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলাম। এতটা তুচ্ছভাবে যাহাকে আজ এই কথা বলিলাম, যদি ঘুণাক্ষরে এই নারীর প্রকৃত পরিচয় জানিতাম তাহা হইলে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতাম। বিধাতার বিধানে এমন ভাবে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। শেষে বুঝিয়াছিলাম যন্ত্রবৎ কাজ করিয়াছি প্রকৃতি বা বিধাতার হাতে। আজ আমার সারাদিনের শান্তিটা নষ্ট হইল। অন্তঃকরণ আমার অত্যন্ত দুর্ব্বল—সহজে কিছু ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না।

তাহার সহজ প্রফুল্ল মুখের উপর বিষাদের কালি তখনও লাগিয়া আছে,—তাহার উপর এখন একটু সপ্রতিভ ভাব চেষ্টা করিয়া টানিয়া আনিল, তারপর মাথা নত করিয়া বলিল,—আচ্ছা তাহলে থাক, আমি অন্য কাকেও দিয়েই এটা লেখাবার চেষ্টা করব। বলিয়া একেবারে বাহিরে চলিয়া গেল। এখন গৌরীব মুখের দিকে দেখিলাম। আগে তাহার প্রসন্ন মুখই দেখিয়াছি,—এখন দেখিলাম, তাহার মুখে একটা চাপা ঘৃণা, বিদ্বেষ, ও উপেক্ষা—আর ঐ তিনটি ভাবের উপরে ঢাকা একটা কর্ত্তব্যবোধের সূক্ষ্ম আবরণ। দেখিলাম, আজ আমার ব্যবহারে দুইজনই আহত হয়েছে। অতঃপর সে অন্ন লইয়া আসিল।

যখন খাইতেছিলাম গৌরী আর দাঁড়ায় নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিতে ইচ্ছা হইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, খাওয়া শেষ হইবামাত্র চলিয়া গেলাম না। আমি চলিয়া গিযাছি মনে করিয়াই সে যখন আসিল তখন তাহাকে বলিলাম—আমার একটু অন্যায় হয়ে গেছে। শুনিয়া সে উপেক্ষার ভাবেই বলিল,--কি বলচেন? আমি বলিলাম, এখানে এত লোক থাকতে আমায় দিয়ে লেখাবার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি তাই হয়ত একটু কঠোর ভাবেই—

সে বলিল, এখানে অনেক লোকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় একথা কে আপনাকে বললে?

বললাম, উনি যখন এতদিন এখানে রয়েচেন।

বাধা দিয়া গৌরী সতেজে বলিল, প্রায় আড়াই মাস এসেছেন,—কিন্তু ওঁর মধ্যে কি আছে তা জানেন কি? কারো সঙ্গে মেলামেশা চুলোয় যাক, বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন না। মাটির দিকে চেয়ে চলেন দেখেন নি? কেবলমাত্র আমাদের বাড়িতেই ওঁর যাওয়া-আসা আছে,—আর কোথাও তো যান না।

সত্য বটে, গৌরীর আজ অন্যমূর্ত্তি দেখিলাম। যাহা হউক একথা সত্যই, তাঁহাকে যতটুকু দেখিয়াছি, মাথা তুলিয়া চলিতে দেখি নাই।

আমরা যখন কোন শক্তিশালী নরনারীর কথা শুনি তখন অনুমানকে আশ্রয় করিয়া প্রায়ই তাহাকে নিজ মনোমত করিয়া লই ; তাহাতে আসল বস্তুটি যে কতটা বিকৃত হয় তাহা আমাদের কল্পনাতেও আসে না। দিগুঠাকুরের মুখে যখন শুনিয়াছিলাম যে ঐ ভৈরবী সাধারণ নয়, মহাশক্তিশালিনী একজন উত্তর-সাধিকা,—তখন কল্পনায় যাহা গড়িয়াছিলাম আজ তাহার ঐ পত্র পড়িয়া কি জানি কি-ভাবে সব ওলট-পালট হইয়া গেল। তারপর আবার ভাবিতেছি কি তুচ্ছ আমাদের লোকচরিত্র-জ্ঞান। এতদিনের অভিজ্ঞতায় এ সংযম আমার মধ্যে জন্মায় নাই যাহাতে একজনকে সমগ্রভাবে আমার কল্পিত সদসৎ-ভাবের উপরে যাইয়া তাহার প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্য দিয়া সহজভাবেই দেখিতে পারি। নিজ অভিজ্ঞতার অহঙ্কারই আমায় এইভাবে অন্ধ এবং ধৈর্য্যহীন করিয়া তুলিয়াছে। এ গলদ আমার মনের মধ্যে আর চাপা রহিল না।

আমি গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ঐ অঘোরনাথ ব্রহ্মচারীকে যদি আমি এলোকেশী ভৈরবীর কথামত পত্র দি তাহাতে কিছু ভাল ফল হবে মনে কর ?

গৌরী বলিল, ভালমন্দ জানি না। তবে এলোকেশীর ঠিকানা যখন সে পেয়েছে, তখন কেবলই পত্র লিখবে, শাপ গালাগাল দেবে, আর টাকা চাইবে। সেই জন্য আপনাকে দিয়ে এমন-ভাবে ও একখানি পত্র দিতে চাইছিল যাতে আর এইভাবে জ্বালাতন না করে।

শুনিয়া বলিলাম,—আচ্ছা তুমি ওকে বল আমি পত্র লিখে দেবো।

গৌরী বলিল, উনি আর কাউকে দিয়েই কোন পত্র লেখাবেন না ; চলে গেছেন উপরে ভুবনেশ্বরীতে ওঁর গুরু উমাপতি বাবা ভৈরবের কাছে সব কথা বলতে। তিনি যা বলবেন এখন উনি তাই করবেন।

আমি এই বলিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, এই কাজটি আগে করলেই ত ঠিক হতো !

গৌরী বলিল, এসব অশান্তিকর ব্যাপার গুরুর কাছে বলতে চাননি, বরং যাতে না বলতে হয় সেই চেষ্টাই ত করছিলেন কিন্তু আপনি যখন এ কথা বললেন যে 'এ সব ভণ্ডামী' তখনই ওখানে চলে গেলেন।

আজ প্রাতে আমি উমাপতি ভৈরবের কাছে গিয়াছিলাম। বিশেষ কোন কথা হয় নাই বটে তবে পরিচয় হইয়াছে। বড়ই স্নেহের সঙ্গে আমায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছি আমার স্থান তাঁহার নিকটেই, অতি অল্প ব্যবধানে

জানিয়াই 'যখন খুশী আসবে', এ হুকুম যখন দিয়েছেন তখন আমি একেবারেই কৌলবাবার কাছে গিয়া এখন উপস্থিত হইলাম।

গিয়া দেখিলাম, উমাপতি যথার্থই শিবের মত প্রসন্ন বদনে নিজ আসনেই বসিয়া আছেন। জটাজুট দুই পাশে ও মাথার পিছনে ছড়ানো, হাতে একখানা পাখা। এলোকেশীও ঐখানে আছে। পাখাখানি সে চাহিতেছে, কিন্তু উনি নিজেই নাড়িতেছেন, দিতেছেন না। সেখানে দিগুঠাকুরও ছিল। আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন, মনে মনে। মুখে বলিলেন, এই আমাদের নূতন কুটুম্ব। ভৈরব এলোকেশীকে বলিলেন, তুমি এ কে দিয়েই পত্র লিখিয়ে নিতে চেয়েছিলে?

সে বলিল, হ্যাঁ বাবা।

বুঝিলাম ইতিমধ্যে সে সকল কথাই ইঁহাকে বলিয়াছে।

ভৈরব তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ওকে বেশ কথাটা বোলেচ তুমি। এড়াবার যো নাই।

এলোকেশী উমাপতি বাবার পায়ের উপর মাথাটি রাখিয়া পড়িয়া ছিল। এবার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অনেক ত দেখলাম, তোমার মত উত্তর-সাধিকার শক্তি পেয়ে যে কিছু করতে পারলে না, তার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

এলোকেশী মাথা নিচু করিয়া বলিল,—দণ্ড ত পাচ্চেন, আজ দু'বৎসর রোগে ভুগচেন, শরীর ত ক্ষয় হয়ে আসছে, অন্য সাধারণ মানুষ হলে কখনও এতটা সহ্য করতে পারতো না।

দিগুঠাকুর এইবার প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। রহিলাম আমরা তিনজন। এখন উমাপতি এলোকেশীকে বলিলেন,—তোমার ঐ অঘোর ব্রহ্মচারী ত দূরের শত্রু, নিকটেই একটি প্রবল শত্রু সেটা লক্ষ্য করেচ কি? একটা বিজাতীয় ক্রোধ এলোকেশীর মুখে প্রকট হইল, চুপ করিয়া নখ দিয়া মাদুরের উপর খুঁটিতে লাগিল,—দেখিতে দেখিতে বোধ হইল যেন তার চক্ষু হইতে টপ টপ শব্দ করিয়া দু' ফোঁটা জল মাদুরের উপর পড়িল। গুরু বলিলেন,—এ কি আশ্চর্য্য, কাঁদচো? এলোকেশী সেইভাবে নতমুখে বলিল, আপনি কান্না দেখলেন? পরে যাহা দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম; সে চক্ষে এক জ্বালা,—যখন মুখ তুলিয়া বলিলেন,—মেয়েদের শরীরটা নিয়ে শিয়াল কুকুরের মত ছেঁড়া-ছিঁড়ি করতেই কি ঐ সব পশুদের তন্ত্রমতের সাধনা? তারপর, অনুযোগের

স্বরে সতেজে বলিলেন, আপনি কেন ওকে প্রশ্রয় দিলেন? দেখিলাম ভিতরের আগুনটা বাষ্পের মধ্যে দিয়া জল হইয়া বাহির হইয়াছিল।

উমাপতি বলিলেন,—এসব পরীক্ষার অবস্থা যারা পার হতে পারে না তারা পশ্বাচার ছাড়ে কি বোলে। ঐ শিক্ষাটা দেবার জন্যই ওকে তাড়াইনি. তা ছাড়া ও যখন এখানে এসেছে তখন মায়ের একটা উদ্দেশ্য আছে আর তা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্চি, তাই ওকে প্রশ্রয় দিয়েচি। তুমি তো জানো, তোমার উপর ওর কোন প্রভাব খাটবে না,—তোমার জন্য নয়, অবলা সরলা বাইরের কোন কোন মেয়ের উপর যথেচ্ছা শক্তি প্রয়োগ ক'রে তাদের মধ্যে অশান্তির গ্লানি সৃষ্টি করবে এ কি ক'রে সহ্য করা যায়? প্রতিকারের জন্যই ওকে একটু আমল

দিয়েছি। ওর সেদিকে চক্ষু খুলে দেবো বোলেই অপেক্ষা করচি, মা! তান্ত্রিকমতে সাধনের নাম করে, কাঁচা বয়সের মেয়েদের পিছনে আর ওকে ছুটতে হবে না। শুনলাম ইতিমধ্যেই পাণ্ডার এক মেয়েকে ও অভিচার করেছিল, মেয়েটি নাকি পাগলের মত হয়ে গেছে—আজই আমি দিগুর কাছে শুনলাম। আর শুনলাম, রেলেও একটি ভদ্রলোকের মেয়েকে প্রাণে মারবার যোগাড় করেছিল। এই পর্য্যন্ত বলিয়া উমাপতি আমার দিকে চাহিলেন। এমনই সময়ে সেই ভৈরব আসিয়া দ্বারপথে দেখা দিল,—সেই রেলের ভৈরব।

উমাপতি, ভৈরবের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—এসো তোমার কথাই ত হচ্ছিল এখন। ভৈরব আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। সঙ্গে সঙ্গেই

এলোকেশী উঠিয়া বাহিরে গেলেন। তখন উমাপতি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—তুমিও এখন একটু বাইরে সিনারী দেখগে যাও বাবা। তিনি আজ সকালে পরিচয়কালে এখানকার দিব্য দৃশ্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমায় শিল্পী বলিয়া জানিয়াছিলেন।

১৫

দেবী মন্দিরের পিছনে, সেই নির্জন স্থানটি—যেখানে বসিয়া নিত্য আমি ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্যাদি উপভোগ করিতাম, বরাবর সেদিকে যাইতে একস্থানে দেখিলাম, এলোকেশী বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন। একটু কথা কহিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, কৌতুহলও ছিল, তাই একটু দূরে দাঁড়াইলাম। তাঁহার মধ্যে প্রথমে একটা সঙ্কোচের ভাব ছিল,—তারপর যখন তাহা সহজ হইয়া আসিল তখন এই বলিয়া আমি আরম্ভ করিলাম,—আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন বোধ হয়?

প্রথমে এই কথাটাই মুখে আসিল।

ভৈরবী বলিল,—এই বাঙলার মধ্যেই সামান্য কয়েকটা জায়গায় গিয়েছি মাত্র,—তাছাড়া আর বড় একটা কোথাও যাইনি।

শুনিয়া আমি বলিলাম,—আপনি ত অনেক রকম সাধু দেখেছেন, এই যে ভৈরবটি, কেমন মানুষ বলুন ত?

ঐ ত বাবার কাছে শুনলেন,—একটা পশুবিশেষ। ধর্ম্মরাজ্যে সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, কুমীর, শেয়াল, ছাগল প্রভৃতি জঙ্গলের মতই নানারকম পশু আছে ত?

আমার একটি কৌতুহল অত্যন্ত প্রবল, এমন কি অদম্য হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম,—অঘোর ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে কিছু জানতে কৌতুহল হয়,—তিনি কেমন লোক?

শুনিয়া এলোকেশী যেন চমকিয়া উঠিল,—কিন্তু অল্পক্ষণেই স্থিরভাবে বলিল,—পত্রের মধ্যেই কি তার পাগলস্বভাবের পরিচয় নেই? তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন চলিয়া যাইবে। তাহা দেখিয়া মনে এই দুঃখ উপস্থিত হইল যে, আমার কথায় আবার তাহার মধ্যে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল। আমার এ-ভাবে কৌতুহল প্রকাশ করাটা ভাল হয় নাই।

আমার মুখের দিকে দেখিয়া এলোকেশী আবার বসিল। বসিয়া বলিল,—

কিছু মনে করবেন না, আমি অত্যন্ত সংক্ষেপেই বলছি। যে অঘোরনাথের পত্র আপনি দেখেছেন, এক সময় উনি একজন কঠোর বীরাচারী ভৈরব ছিলেন, ঐ সময়ে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই ইনিই (উমাপতি) আমার গুরু। ইনি যখন চন্দ্রনাথে ছিলেন, অঘোরনাথ সেখানে আসেন। সেইখানেই আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। কোথা থেকে জানি না তাঁর মাথায় ডাকিনীসিদ্ধির কথা ঢুকেছিল, বীরাচারের সঙ্গে উনি ডাকিনীসিদ্ধির চেষ্টা করছিলেন; তা গুরুদেবকেও বলেন নি। গোপনে আমায় তাঁর উত্তর সাধিকা হবার জন্য এমন প্রবলভাবে সাধ্য-সাধনা আরম্ভ করলেন, আমি গুরুর পরামর্শ না নিয়েই তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই রাজী হয়ে এক সময়ে গোপনে তাঁর সঙ্গে ওখান থেকে চলে আসি। আসামের পরশুরামকুণ্ডের কাছে একটা স্থান অঘোরনাথ সাধন ও সিদ্ধির জন্য ঠিক করেছিলেন। সেখানে গিয়ে অল্পদিনেই সেই আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। আমি এ সব কাজে পটু ছিলাম;—আর অঘোরনাথ তখনও অবধি নিষ্কলঙ্ক, তেজস্বী, বীরাচারের উপযুক্ত সাধক ছিলেন। কিন্তু বীরাচার-সিদ্ধির পূর্বেই যে এই কাজে লেগে গেলেন সেইটিই ভুল করলেন। কারণ বীরাচারে সিদ্ধি না থাকলে ওপথে যাবার যো নেই। কিন্তু ওঁর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর সিদ্ধি নিশ্চয় হবে। আমার দিক থেকেও কিছু দোষ ছিল না,—আমি তাঁকে প্রথমেই বলেছিলাম বীরাচারসিদ্ধ না হয়ে ও সব করতে নেই। কিন্তু অঘোরনাথ চট্টগ্রামে গুরু তিলোপার কথা শুনেছিলেন—যিনি বীরাচার সাধন না করেই ডাকিনীসিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর তিব্বতী গুরু যে পিছনে ছিলেন, আর তিলোপা যে আকুমার ব্রহ্মচারী একথা অঘোরনাথ মনেই আনলেন না। যাই হোক, তাঁর সাধন আরম্ভ হোলো।

মাত্র তিনটি দিন আসনে স্থির থাকতে পেরেছিলেন, তার পরই তাঁর পতন হোলো। প্রথম বিভীষিকা দেখতে লাগলেন, সেই সময় উত্তর-সাধিকার যা করণীয় তা আমি ঠিক মত করলাম—তার ফলে সে অবস্থা অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্র অসংলগ্ন উচ্চারণের ফলে আর নিজ শক্তির অহঙ্কারে তাঁর মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল। তাতেই তিনি পতিত হলেন। প্রবল উত্তেজনার বশে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হয়ে আমারও সিদ্ধির পথে যে বিঘ্ন উপস্থিত করলেন এ জীবনে আমার আর কোন সিদ্ধির আশা আছে কিনা জানি না। নিজেরও সর্ব্বনাশ, আর বোধ হয় আমারও সাধন ও সিদ্ধির জীবন নষ্ট করে দেবার মতই করে এনেছিলেন। তারপর পতিত অবস্থায় অর্দ্ধেক পাগলের

মত চলে এলেন ওখান থেকে। ক্রমে আমার উপর তাঁর বিদ্বেষ, শত্রুতা, হিংসাবৃত্তি এমনই প্রবল হয়ে উঠলো যে যাকে সামনে দেখতেন তাকে ডেকে নিয়ে এসে আমায় দেখিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন,—এই রাক্ষসী পিশাচী সর্ব্বনাশীই আমার সর্ব্বনাশ করেচে। মাঝে মাঝে প্রহার করতেন, তারপর আবার কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইতেন। এমন ভাবে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাছাড়া এতটা সহ্য করেও আমি তাঁর কোন কল্যাণ করতে পারব না এ কথা যখন আমার দৃঢ় প্রত্যয় হোলো আমি তখন সেখান থেকে পালিয়ে আসি,—অনেক দিন, অনেক কষ্টের পর মাত্র এই কয় মাস আগে এখানে এসেছি—সেই অবধি এইখানেই আছি। এখন তিনি আশা দিয়েছেন যে, তাঁর প্রবর্ত্তিত নিয়মে থাকলে আবার আমার সিদ্ধির জীবন পাবার নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রায় পূর্ণভাবেই আছে। তবে মনে কোন সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। কিন্তু অঘোরনাথের আর কল্যাণ নেই; উনি বলেন ওর দম্ভ ও অহঙ্কার যত, লোভও তত। ওরকম লোক কখনও কোন দিন সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। ডাকিনীসিদ্ধি অত্যন্ত ভয়ানক, এখন ওসব চেষ্টা করাও নিষেধ; কারণ ঐদিকের সাধনায় সিদ্ধ গুরু পাওয়া যায় না। গুরু নিজে উত্তরসাধক না হোলে ওতে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। উনি বলেন, ও সবল এখনকার দিনে লুপ্তপ্রায়। এই পর্য্যন্তই আমার কথা।

এলোকেশী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

আমি কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তারপর ভাবিলাম এবার হয়তো ভৈরব চলিয়া গিয়াছেন, এখন বাবাকে প্রণাম করিয়া নিজ আসনেই যাইব। যখন বাবার ঘরের পাশের দরজার কাছাকাছি গিয়াছি তখন ভৈরবের আওয়াজ পাইলাম। এখনও লোকটা যায় নাই, অথবা কথা শেষ হয় নাই। আমি দাঁড়াইয়া গেলাম, শুনিবার ইচ্ছা হইল। শুনিলাম, ভৈরব বিরক্ত ভাবেই বলিল, আপনি আমার পতনেরই কল্পনা করছেন, কেন আমার পতন আসবে? আমার মনমতো একটি ভৈরবী শক্তি লাভ হলেই তো তাকে নিয়ে আমি এক জায়গায় বসে যাবো, তখন বীরাচারের সিদ্ধি থেকে আমায় নামাতে পারে কে?

উমাপতি—নামাবে তোমার প্রকৃতি, তোমার ভোগ-প্রবৃত্তি, আবার কে নামাতে পারে? যে সাধক বীরাচারী হবে সে কি ঐরকম পশুভাবের গণ্ডীর ভিতর থেকে সুশ্রী যুবতী মেয়েমানুষ দেখলেই তাকে টানতে যেখানে সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করে বসে?

তৎক্ষণাৎ ভৈরব বলিল—কেন? কোথায় আমি যেখানে সেখানে তা করেছি।

উমাপতি বলিলেন—কেন, আমি শুনেছি সেদিন এখানে আসার পথেই, রেলে বোসে বোসে একটি ভদ্রঘরের মেয়েকে মরণ-দশায় ফেলেছিলে তার উপর শক্তিপ্রয়োগ করে? প্রতিবাদে ভৈরব বলিল—সে মেয়েটি দুর্ব্বল ছিল তাই সে অচৈতন্য হয়ে পড়লো, তাতে আমার দোষটা কোথায়?

উমা,—কেন তুমি ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীর উপর শক্তি প্রয়োগ করতে গেলে? করবার আগে ভেবে দেখনি কেন যে, সে কুমারী না বিবাহিতা, সঙ্গে যখন তার অভিভাবক ছিল? ভৈরব বলিল,—তার বিবাহিতার কোন লক্ষণই দেখিনি, কপালে বা সিঁথিতে সিন্দূর-চিহ্নমাত্র ছিল না।

শুনিয়া উমাপতি বাবা বলিলেন,—যখনই সে অচৈতন্য হোল তখনই তো বুঝেছিলে যে ব্যাপারটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে,—তখনই কেন সামলাওনি? উত্তর নাই। উমাপতি আবার বলিলেন,—বল না, যখনই তুমি বুঝলে যে তার প্রকৃতির সঙ্গে তোমার বিরুদ্ধ সম্পর্ক, সে তোমার শক্তি প্রতিহত করতে গিয়ে একটা সাময়িক দুর্ব্বলতার জন্যই অচৈতন্য হয়েছিল, তখন পারলে না তাকে আকৃষ্ট করতে, তখন তার চৈতন্য সম্পাদন না করে, তার স্বামীকে তোমার কাছে আসবার জন্য ঠিকানা দিয়ে এলে কেন? আরো একবার শক্তি প্রয়োগ করবার মতলব নয় কি?

আশ্চর্য্য! তিনি কেমন করে এত খুঁটিনাটি জানতে পারলেন;—নিশ্চয় কোন প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টার কাছে শুনেছেন। ভৈরবের মুখে কথা নেই, রেলে যেমন ঘাড় হেঁট করে নিম্নদৃষ্টি দেখেছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া রহিল।

উমাপতি আবার বলিলেন,—তারপর এখানে এসে কৈলাস পাণ্ডার মেয়েকে,—

বাধা দিয়া ভৈরব বলিল, সে তো কুমারীই ছিল। বাবা উমাপতি বলিলেন, —তা থাকলেই বা, তোমার মত একজন পশু, এই মহাপীঠের মায়ের গৃহস্থ-সেবকের কুমারীকে ভৈরবী করবার আশা করলে কি কোরে? তার প্রতিবাদ ও উপেক্ষা সত্বেও তাকে স্পর্শ করতে গেলে কোন্ অধিকারে? তোমায় মতিচ্ছন্ন বোলব না তো কি বলব? এখন তুমি আবার এলোকেশীকে ধরবার চেষ্টায় এখানে আনাগোনা আরম্ভ করেছ। তার আসল রূপটি দেখনি,—তাই

সাবধান করে দিচ্ছি,—ওর কাছে যেও না। একজন মরতে বসেছে, তুমিও মরবে? ওকে তুমি চেনো না, আমি চিনি, তাই এত করে সাবধান করা।

তারপর চুপচাপ,—ঘরে যেন কেউ নাই। কতক্ষণ পর উমাপতি বলিলেন, এতটা জেনে, এতটা শুনেও তোমার মধ্যে চৈতন্য এলো না,—কোন্ পথে এই সব তুচ্ছ তোমার স্বভাবগত মনের দুষ্প্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্ত হয়ে শক্তি-সাধনে যথার্থ উন্নত হতে পারবে, তন্ত্রধর্মের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে, সে অনুসন্ধিৎসা এলো না, কি করে তোমার ভাল হবে? আশ্চর্য্য!

এইবার মুখ তুলিয়া সে বলিল, আপনি বিশ্বাস করবেন? উমাপতি ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন,—অবিশ্বাস আসবে কেন তোমার কথা সত্য হলে?

আমি এতক্ষণ ঐ কথাই চিন্তা করছিলাম, সত্যই, বড় করুণস্বরে সে বলিল, —আমার যেটা গলদ আপনি আমার চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনি আমার গুরু। এর পরও যদি আমি সংশোধনের পথে না যাই তাহলে আমার সর্বনাশের দেরি নাই। এখন থেকে আমি আপনার অনুগত হলাম, আপনি আমায় উপদেশ দিন কেমন করে সাধন-পথে যাবো?

এখন দেখিলাম যেন মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত, তাহার মধ্যে রূঢ়ভাব আর তিলমাত্র নাই। দেখ, বাবা বলিলেন, ভৈরব ধরে একটা মন্ত্র নিয়ে কিছু দিন জপ-তপ করে নিজেকে খুব শক্তিমান মনে করেছিলে। শক্তি গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে সুশ্রী বা যুবতী মেয়ের পিছনে পিছনে ঘুরে তাকে অধিকার করবার চেষ্টাই যে তোমাকে অধঃপতনে নিয়ে চলেছে তা তুমি বুঝতে পারনি। এইভাবে কি শক্তি গ্রহণ করতে হয়? যার কাছে দীক্ষা নিয়েছ তিনি কি কিছু বলে দেননি? কতকটা যেন চিন্তিত ভাবে ভৈরব বলিল, তিনি তো ঐ রকমই বলেছিলেন, ঘুরতে ঘুরতে তোমার শক্তি খুঁজে পাবে। তাকেই উত্তরসাধিকা করে নিয়ে সাধন করবে।

উমাপতি বলিলেন,—না না, ও নিয়ম নয়—বাজারের শক্তি নিয়ে কাজ হবে না, জীবনটা মাটি।—তোমার যদি এ পথে আসতেই মন্ত্র ছিল,—নিশ্চয় তুমি কোন ভদ্রঘরের গৃহস্থের ছেলে, তোমার উচিত ছিল স্বসম্প্রদায়ের ভেতর থেকে বিবাহ করে ভালোবাসায় তাকে বেঁধে শিক্ষা দিয়ে শক্তিতে পরিণত করা, তাহলে এইসব পাতকের মধ্যে পড়তে হোত না। এই উপায়টাই সহজ, নিরাপদ, তাতে সাধনের সব সুবিধা হোত। তন্ত্রের উপদেশও তাই। সাধারণের কাছে তোমার মত লোকের পাতকের সীমা নেই—তন্ত্রধর্মের নাম

তোমরাই ডুবিয়েছ। তা নয়ত বাজারের ভৈরবী ধরে কি শক্তি সাধন হয়? বাজারের ভৈরবী ত বেশ্যার সামিল, কত পশুর পরিত্যক্তা হয়ে আর একটা পশু খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার এই উন্মার্গগামী মনই তোমায় ডোবাবে দেখছি।

ভৈরব বলিল,—আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি, এখন আমায় ক্ষমা করুন।

উমাপতি বলিলেন, যদি সত্যি সুপথে যেতে চাও, তাহলে ঘরে ফিরে যাও, গিয়ে বিবাহ করো। তারপর দুজনে একসঙ্গে আমার কাছে এসো তখন বোলে দেবো। রাজী আছ?

নিশ্চয়। তাহলে আমায় গৃহী হতে বলছেন?

বাবা বলিলেন,—তাই ত বলছি।

ভৈরব বলিল,—তাহলে ছেলেমেয়ে হবে, তাদের পিছনেই তো দিন কেটে যাবে, অর্থ উপার্জ্জন করতে হবে চেষ্টা করে।

কেন, ঐখানেই তো সংযমের পরীক্ষা তোমার হয়ে যাবে। ব্রহ্মচর্য্য করবে, সন্তান কেন হবে? প্রাথমিক ইন্দ্রিয় সংযম। প্রবৃত্তিকে সংযম করবে, ঐ শক্তি মন্ত্রজপ, ধ্যানে লাগাবে, যেটা ভাল হবে তা সংযমের দিকে লাগাবে, তাতে আরও শক্তি বাড়বে, এইভাবেই তো চালিয়ে যেতে হবে। বলিয়া কি ভাবে উদ্দাম প্রবৃত্তির স্রোতে না ভাসিয়া সংযত উপায়ে সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে তাহাই অতীব মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, গলার আওয়াজ আর শুনা গেল না।

আমি ফিরিয়া আবার নিজ আসনে আসিব বলিয়া কতকটা আসিলাম। মনে এতটা আনন্দ হইয়াছিল, বাবা ঐ মূঢ়চিত্ত লোকটিকে ফিরাইয়া দিলেন এই ভাবিয়া। আসিয়া কিন্তু সেইখানে আবার বসিলাম, শ্রদ্ধা জানাইয়া এবং প্রণাম না করিয়া ফিরিব না।

আশ্চর্য্য, উমাপতি বাবার শক্তি, ভাবিতে ভাবিতে যেন নিজ স্বার্থের কথায় আসিয়া পড়িলাম। তারপর, এতক্ষণে বোধ হয় ভৈরবের কাজ চুকিয়া গিয়া থাকিবে, তারপর কি হইল জানিতেও একটা কৌতুহল যে ছিল না এমন নয়,—চলিলাম গুটি গুটি ঐ দিকে। কয়েক পা চলিতেই দেখি দুই মূর্ত্তিই পায়ে পায়ে আশ্রমের বাহিরে আসিয়া একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন!

একটু দাঁড়াইয়া গেলাম। শুনিলাম উমাপতি বলিলেন, তোমার ভাগ্য

ভাল তাই ওর সঙ্গে প্রথমেই কথা কইতে যাওনি, আমার কাছেই এসেছিল। এখন নিজের কল্যাণ চাও ত যা বললাম তাই করোগে; আর এক দিনও

এখানে থেকো না, এটা দেবী কামাখ্যার নিজ প্রভাবাধীন প্রিয় স্থান, এখানে তোমার মত ছাগল জাতীয় পশুর স্থান নেই। ছাগলের সঙ্গে তন্ত্রোক্ত দেবী উপাসনার সম্বন্ধটা জানো তো? উত্তরে সে বলিল, কে না জানে ও কথা? উমাপতি বলিলেন,—জানো যদি তবে ঐ সব কুকর্ম্মে লেগেছিলে কেন? এ কামাখ্যায় ছাগল এলেই মায়ের কাছে বলি হয়ে যায়—এটা কত বড় জাগ্রত পীঠস্থান তা তোমার জানা নেই? এটা বীরের স্থান, বীর হয়ে তবে এসো, দিব্য অধিকারী হতে পারবে।

তারপর প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া সে চলিয়া গেল। দেখিলাম আর যেন সে-মানুষ নয়।

* * * *

পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া আমার সেই শিলাসনে বসিলাম। কি গুণে জানি না ঐ শিলাসনেই আমার ধ্যান জমে ভালো। সর্ব্বদুঃখহর এই আসনটি আমার, চক্ষু চাহিয়াই আমি ডুবিয়া যাই। অন্য স্থানে আসন করিয়া বসিবার পর চিত্ত স্থির করিতে অনেকক্ষণ যায়,—তবে জপ আরম্ভ করিতে হয়। তারপর কোনদিন বা ধ্যান আসে, কোনদিন বা আসেই না। কিন্তু এখানে বসিলেই ধ্যান সহজভাবেই আসিয়া আমাকে আনন্দে ভাসায়,—কোন চেষ্টায়

অপেক্ষাই রাখে না। এই ধ্যানের অবস্থা পরম লোভনীয়, বিশেষতঃ আমার বর্ত্তমান চঞ্চল মতি এবং সময় সময় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এই ধ্যান আমাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইয়া আমি ধীরে ধীরে উঠিলাম এবং উমাপতি বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

এখানে আরও একটু ধ্যানের কথা আছে। ধ্যানাবস্থার শেষদিকে যখন আসন ত্যাগ করা যায়, তখন স্পষ্ট ধ্যানাবস্থা থাকে না বটে কিন্তু ধ্যানের রেশ থাকে। একটা নেশার মত অবস্থা। অন্তর ক্ষেত্র আনন্দে ভরপুর,—আর স্থূল অহঙ্কার, তুষারপ্রভাবে নির্জ্জীব সাপের মত এমনই নিস্তেজ অবস্থায় থাকে তখন এই দৃশ্য-জগতের রূপ, যত কিছু বর্ণ ও আকারের সমাবেশ এই চক্ষু গ্রহণ করে—সেই সৌন্দর্য্যের রস অন্তরে এক অপূর্ব্ব সত্তার আভাস ওতপ্রোত অনুভূতির মধ্যে ধরা দেয়। অপূর্ব্ব এই শান্ত, সুখকর অবস্থাটি। মনের সংকল্প বিকল্পও মধ্যে মধ্যে থাকে, কিন্তু সেটা দ্বন্দ্বময় নয়, আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাইরে, মধ্যে একটা স্বচ্ছ ক্ষীণ আবরণের অন্তরালে ঘটিতেছে। এভাবে মনের কাজ মধ্যে মধ্যে আমি লক্ষ্য করিতেছি বটে কিন্তু তাহাতে আমার বুদ্ধির সহযোগিতা নাই, বুদ্ধি তখন তৎগত, প্রাণ চৈতন্যেই মিলিত আছে। বুদ্ধি বা বোধ স্বভাবতঃ আত্মচৈতন্য হইতেই তাহার উৎপত্তি সুতরাং তাহার প্রবণতা ঐ মুখেই, ঐদিকেই তাহার সহজ গতি, যার ফলে তত্ত্বজ্ঞান ও আনন্দময় অবস্থা আমাদের বোধের মধ্যে আসে।

অত্যন্ত জড়ের প্রতি আসক্তি বশতই মানুষসাধারণ,—মনের ধর্ম্মকে সার করিয়া জগতে বাস করিতেছে, ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে, তাই না আজ মানব-সমাজের এই বিক্ষিপ্ত দশা, পরম সুখে বঞ্চিত হইয়া স্থূল সর্ব্বস্ব লইয়াই ধনের পিছনে সুখ খুঁজিতেছে। সহজেই এই জড়ের রহস্য ধরা পড়ে এই অবস্থায়, এই ধ্যান-সাহায্যে মানুষ সকল তত্ত্বই আবিষ্কার করিতে পারে। পার্থিব অপার্থিব সবই।

যাহা হউক, এই অবস্থায় যখন বাবা উমাপতির আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, ভৈরবী তখন ঘরের মধ্যে কোন কাজে ছিলেন—বারান্দা হইতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া আছি, তিনি আমায় দেখেন নাই। হয়তো ঘরের মধ্যেই ঢুকিতাম যদি আশ্রমের স্বামীকে আসনে দেখিতাম। এলোকেশীর নাম ধরিয়া ভিতর হইতে কেহ ডাকিতেই ভৈরবী চলিয়া গেলেন। আমি দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছি, এখন ঘরের মধ্যে যাইব কিনা ভাবিতেছি, দেখিলাম ভৈরবী আবার

একেবারে বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া বলিলেন, বাবা ঠিক বোলেছেন,—শিল্পী এসেছেন, তাঁকে বসাও। ভিতরে এসে বসুন, উনি একটু কাজে আছেন, শেষ হলেই আসচেন। আমায় ভিতরে বসাইয়া আবার চলিয়া গেলেন নিজ কর্ম্মে। আমার আগমন তিনি ভিতরে থাকিয়াও জানিয়াছেন।

প্রথম লক্ষ্য আমার গেল এক কোণে পোঁতা দীর্ঘ এক ত্রিশূল। উমাপতি বাবার আসন ঐ ত্রিশূলের পাশে, বেশ পুরু গদির উপর প্রকাণ্ড একখানি বাঘছাল বিছানো। সেই আসনের পাশেই বড় চৌকি, তার উপর রক্তবর্ণ বস্ত্র আচ্ছাদিত, এদিকে কতকগুলি পুঁথি লাল কাপড় জড়ানো লাল ডোর দিয়া বাঁধা, অন্যদিকে জবাকুসুম, রক্তচন্দন ও সিন্দূরে লিপ্ত এক নরকপাল। একদিকে পুঁথি এবং অপর দিকে ঐ নরকপাল এই দুইয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র এক কপাল পাত্র, তার পাশেই একটি কৃষ্ণবর্ণ যন্ত্র রাখা আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। মেঝেতে খুব পুরু মাদুর পাতা আমাদের সাধারণের জন্য। বুঝিলাম বাবার কর্ম্মস্থানটি ভিতরে,—সেইখানেই যথার্থ আসন।

বড় আনন্দেই বসিয়া আছি, ঘরে আর কেহ নাই, ঐ ত্রিশূলের দিকে আমার লক্ষ্য পড়িল। এমন ত্রিশূল পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ছোট বড় নানা আকারের ত্রিশূল বাল্যাবধিই দেখিতেছি, সে জন্য নয়, এই শৈব অস্ত্রটির আকর্ষণ অন্যদিকে—ইহা অতি প্রাচীন; মনে হয় না এখানকার দিনে প্রস্তুত,—অথবা এখানকার কোনো দেশীয় কামারশালাতে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে—এমনই ইহার আকার ও গঠন-পারিপাট্য যাহা সত্য-সত্যই অপরূপ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। দণ্ড এবং তাহার উপরে তিনটি শূল, উহার সংযোগ স্থল সুদৃঢ় এবং সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট, সাধারণত এমন হয় না,—মনে হয় দণ্ড ও শূলত্রয় প্রয়োজন-মত পৃথক করা যায়। প্রাচীন কালের কোন অস্ত্রই এরূপ বিচ্ছিন্ন অথবা বিভাজ্য আকারে দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় অস্ত্রশিল্পের ইহা একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দণ্ডটি ষট্‌পলা অর্থাৎ গোলাকার বা চতুষ্কোণ নয়,—ছ'কোণা, মধ্যস্থলে মুষ্টিস্থলও বিচিত্রভাবে নির্ম্মিত। প্রায় পাঁচ ফুট দীর্ঘ দণ্ডটি তাহার উপর শূলত্রয়ের মধ্যম শূল প্রায় এক ফুট হইবে,- তিনটি ফলাই তীরের মত তীক্ষ্ণাগ্র, উহা লক্ষ্যভেদ করিয়া ক্ষেত্রকে ছিন্নভিন্ন না করিয়া সহজে বাহির হইবার নয়। অতি যত্নে রক্ষিত, বোধ হয় নিত্যই পরিষ্কৃত হয় এমনই ইহা উজ্জ্বল, আদ্যন্ত ঝক ঝক করিতেছে কেবল উপরদিকের কতকাংশ সিন্দূরলিপ্ত। বিশুদ্ধ লৌহে প্রস্তুত যাহা প্রাচীন ভারতীয় ধাতুশিল্পের বৈশিষ্ট্য, ইহা না বলিলেও চলে। মনে হইল ইহা দিব্যাস্ত্র। নিকট-

ব্যবধানে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল, উঠিলাম। কাছে গিয়া দেখি মাটিতে পোঁতা নয়, মেঝেতে উপযুক্ত আয়তনে একটি গর্ত্ত, গোড়ার দিকে প্রায় এক-চতুর্থাংশ শূলটি তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট, তাহাতেই ঠিক ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এতাবৎ যত ত্রিশূল দেখিয়াছি, আশ্রমের মধ্যে পোঁতা, না হয় দেয়ালে ঠেকানো,—ইহার ব্যবস্থাই পৃথক, প্রয়োজনমত সহজেই গ্রহণ করা যায় সুতরাং ইহা প্রতীক মাত্র নয় অথবা সাজানো জিনিস, যাহা লোক দেখাইতেই ভৈরব ভৈরবীর স্থানে রাখা থাকে, তাহা নয়। অবশ্য পূজাবিধি সর্ব্বত্রই আছে। আয়ুব-পূজা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, এখনকার দিনে সম্প্রদায় বিশেষ ব্যতীত বাঙ্গালায় সাধারণ ভাবেই উহা অপ্রচলিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে উহা এখনও প্রচলিত আছে। মুগ্ধ হইয়াই দেখিতেছিলাম,—আর কত কি ভাবিতেছি। যাত্রা-থিয়েটারে শিবের বা দুর্গার হাতে ত্রিশূল দেখি,—কিন্তু যথার্থ ব্যবহারে এখনকার দিনে আমরা কোথাও দেখি না। উহা সাজানো একটা কিছু অথবা ধ্বংসকারী শক্তির প্রতীক হিসাবেই এখন চলিতেছে। ইতি-মধ্যে এলোকেশী কখন নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখি নাই।

দেখবেন স্পর্শ করবেন না যেন,—বলিয়া একটু নিকটে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এত করে কি দেখছেন? মনে যাহা উদয় হইয়াছিল তাহা বলিলাম।

আগে এমন ত্রিশূলও কোথাও দেখেছিলেন?

দেখিনি বোলেই এত কাছে এসে দেখছি!

শুনিয়া ভৈরবী বলিলেন, বাবা এখনই আসছেন, -তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন ঐ ত্রিশূলের কথা, তা হলে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। উমাপতি আসিলে তাঁহার হাতে একটি বস্তু দেখা গেল,—তিনি উহা পাশের চৌকির উপরে রাখিয়া আসনে বসিলেন। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,-কেমন ত্রিশূল? অপূর্ব্ব,—বলিয়া আমি উঠিয়া প্রণাম করিলাম,—প্রতি নমস্কার করিয়া তিনি বোধ হয় প্রসন্ন হইয়াই মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন কারণ দেখিলাম অল্পক্ষণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে কর ধারণ করিয়া রহিলেন। তারপর তাঁহার ইঙ্গিতেই আমি বসিলাম,—এলোকেশী ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমার কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু অন্তরে প্রেরণা পাইলাম না। সিদ্ধ মহাযোগীর এমনই ব্যক্তিত্ব যে এখানে আসিয়া প্রথমেই কাহারও পক্ষে ইচ্ছামত কথা আরম্ভ করা সহজ নয়। আর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা

হইতে ইহাও জানিতাম যে যথার্থ পিপাসুকে তাঁহারা কথা কহিবার অধিকার বা অবসর দেন, যখন দেন, তখন নিজেই আরম্ভ করিয়া সহজ করিয়া দেন। তখনই কথা কহিতে হয়।

এলোকেশী মাতা একখানি পাতায়, কিছু জলখাবারই হইবে এবং শ্বেত পাথরের গ্লাসে পীতবর্ণের পানীয় আনিয়া পাশের চৌকির উপর রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জন্য কিছু আনবো কি ?

ব্যস্তভাবেই আমি বলিলাম যে, আমি সকালের দিকে কিছু খাই না—এমন সময় কিছু খাব না। কৌলবাবা উমাপতি সহাস্যে বলিলেন,—ও আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হলে এখানে কিছু খাবে না। শুনিয়া আমি তো মহা অপ্রতিভ। গোপন মনের একটা সত্য, এমন করিয়াও বলে ? কিন্তু আমায় তিনিই আবার এই বলিয়া তুষ্ট করিলেন,—কি জানো, মেয়েমানুষ কিনা, তোমার সামনে বসে খাব আর অতিথি তুমি বসে দেখবে ? অথচ ওর মনেও এটা জানা ছিল যে তুমি খাবে না, তাই ও না কিছু এনে আগে জিজ্ঞাসা করলে। তাতে দায় থেকে খালাস, ভব্যতাও রক্ষা হল। এই আর কি !

ও সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া, বলিয়া ফেলিলাম, ঐ ত্রিশূলের কথা—যদি বলেন ! তিনি খাইতে খাইতে বলিলেন, দাঁড়াও এ কাজটা শেষ করি, দুটো কাজ একসঙ্গে সুবিধে নয়।

ইহার মধ্যে—যে সংযম ছিল,—আমাদের পক্ষে তা আদর্শ,—আমাদের আচারে ব্যবহারে কোন আদর্শের বালাই নাই।

১৬

জলযোগ শেষ করিয়া তিনি সেই পীত ও লোহিতাভ পানীয় গ্রহণ করিলেন। বাম নাকটি চাপিয়া ধরিয়া সহজেই চক্ষু দুটি বুজিয়া, উহা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। তারপর পরিষ্কার জলে আচমন করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন— পরে বলিলেন, এইবার তামাক ;—ও জিনিসটির সঙ্গে সঙ্গে কথা চলতে পারে, —কি বল ? আমায় কিছুই বলিতে হইল না তিনি আপনি বলিলেন, এটা সূক্ষ্ম আহার,—বায়ুপথের বিঘ্ন উৎপাদন করে না, তাই তামাক খেতে খেতে কথা কওয়া যায়। তামাক আসিল, গুড়গুড়িতে লম্বা কাঠের নলে একটি রূপার মুখনল লাগানো, টানা চলিতে লাগিল আর কথাও আরম্ভ হইল। ত্রিশূলের দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ত্রিশূলটি কার জানো ? আমি বলিলাম,

আপনার আশ্রমে, আপনার আসনের পাশে আছে যখন, তখন ওটি অন্য কারো মনে করা যায় কি? তিনি বলিলেন,—তা হলে জেনে রেখো, একমাত্র এলোকেশী মা-ই ঐটির অধিকারিণী, যিনি তোমায় এ সম্বন্ধে কিছু শুনবার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বোলেচেন। এ পর্য্যন্ত ঐ মেয়েটিই ত্রিশূলটি যথা-যোগ্য ব্যবহার করেছেন, অসাধারণ দক্ষতা তাঁর ঐ অস্ত্রটি চালনায়। বলিয়া একটু থামিলেন এবং তামাক খাইতে লাগিলেন।—আমার মনে হইল, ত্রিশূল চালনায় আবার দক্ষতার প্রয়োজন কি, আসলে খোঁচা মারার ব্যাপার তো —কিছুই বলি নাই। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা এলোকেশীকে দেখে কি রকম ঘরের অথবা কি প্রকৃতির মেয়ে তোমার মনে হয়, বল দিকি?

কি রকম ঘরের অর্থে বংশের কথাই বলছেন হয় তো; আমি কিন্তু সে দিক দিয়ে কিছুই অনুমান করতে চেষ্টা করিনি তবে আমার কাছে ওঁর ব্যক্তিত্বই প্রধান আকর্ষণ; তার উপর স্বাস্থ্য ও শ্রী একাধারে থাকায়, আর ওঁর সাধন-জীবনের স্বাভাবিক একটা গাম্ভীর্য্য তার সঙ্গে মিশে যেন দৈবশক্তিসম্পন্ন বোলেই মনে হয়। যদিও সম্প্রতি ওঁকে যে দু'তিনবার আমি দেখেছি, তাঁর মধ্যে অন্তরে যেন একটা দ্বন্দ্ব য় অবস্থাই,—আমার চক্ষে পড়েছে। অবশ্য তার সাময়িক কিছু কারণও হয়তো ছিল। কিন্তু আজ এসে এখানে আবার যে মূর্ত্তি দেখলাম তা এমনই সহজ এবং নিঃসঙ্কোচ যার সঙ্গে পূর্ব্বে দেখা মূর্ত্তির কোন সম্বন্ধই নেই। এ যেন আর এক মানুষ।

উমাপতি বলিলেন,—আগেকার কথা একটু শোনো;—পূর্ব্ববঙ্গের এক নমঃশূদ্র পরিবারের মেয়ে; ওদের অবস্থা ভালো, ওর বাবাও শিক্ষিত ও বিলিতি মনোভাবাপন্ন, ধর্ম্মকর্ম্মে আস্থাহীন, সরকারী বড় চাকুরে। বিদ্যাশিক্ষা ওকেও দিয়েছিলেন কতকটা;—কিন্তু ও এতই চঞ্চল আর স্বাধীনপ্রকৃতির যে এ দেশের মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক বোলেই মনে হয়, যেমন ধরো নির্ভীক চলা-ফেরা, বয়স্ক পুরুষদের কাছেও নিঃসঙ্কোচ, গ্রাম্যের মধ্যে বাপের বয়সী কারো কোন দোষের কথা স্পষ্ট ভাষায় তার মুখের উপর বে'লে দেওয়াই ওর স্বভাব। সমবয়সী ছেলেদের তো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতো না, বরং কোনো অন্যায় দেখলে কান ধরে গালে চড় বসাতেও ওর সঙ্কোচ ছিল না। এই ভাবে চলছিল তারপর এক সময় ও স্পষ্ট করেই ওর বাপ-মাকে জানিয়ে দিলে যে ও বিবাহ ত করবেই না আর তাদের সংসারে কারো সঙ্গে ও থাকবে না। তখনই ওর বাপ-মা ভয় পেয়ে গেলেন। যোলো বছরের ঐ ধিঙ্গি মেয়ে কোন্ দিন কি করে বসে,—

এই তাঁদের ভাবনা। একমাত্র ওর শ্রদ্ধা বলতে যা কিছু আমারই উপর ছিল, তাই তাঁরা আমার শরণাপন্ন হলেন। যখনই ওদের গ্রামে যেতাম বিনা আহ্বানে আমার কাছে আসতো যেতো। কোনো কথা হতো না। প্রথম থেকেই ওর ধারণা ছিল যে তন্ত্রধর্ম্মের সাধনে মহাশক্তি লাভ করা যায়,—জানি না কোন্ সংস্কার থেকে ওর এই মনোভাবটি এসেছিল। তাতেই আমার কাছে ও দীক্ষিত হবে, জেদ করলে। দীক্ষা পাবার পর তবে ও কতক শান্ত হল। সেই অবধি প্রায় চার বছর ও আমার সঙ্গেই আছে,—যেখানে যেখানে আমি থাকি সেইখানে ও থাকে, আপন সাধন নিয়ে। ভয় ওর কিছুতেই নেই, আমার এই বাষট্টি বৎসরের জীবনে এমন একটি নির্ভীক নারী-প্রকৃতি দেখিনি। কাজেই আমার নিজের দিক থেকেই এমন একটি অপূর্ব্ব জীবনের পরিণতি, আরও কিছু বিশেষ প্রকৃতির গুহ্য ব্যাপার আছে যা পরীক্ষার জন্যই ওকে আমি আপন করে নিতে চেয়েছি। ওর যে ভাবটি আমার কাছে সব চেয়ে বড় বোলে মনে হয়েছে, সেটি ওর জাতিবোধহীন প্রকৃতি, তন্ত্রধর্ম্মের সারকথা। বন্ধুবান্ধব পরিচিত যারা ওর পরিবারের মধ্যে, তারা কেউ এ পর্য্যন্ত ওকে বুঝিয়ে দিতে বা ওর মনে এ বিশ্বাস আনতে পারেনি যে ওরা জাতে ছোট, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতের লোকেরাই বড়। ব্রাহ্মণদের মুখের উপর ও এমন কথা বোলেচে যার ঠিক উত্তর তাঁরা দিতে পারেননি। যাই হোক, ওর মত একটি জীবনে তন্ত্রের সাধনা যে একটি বিশেষ শুভ ফল দেবে তার পরিচয়ও আমি পেয়েছি, তুমি বোধ হয় মনে করলে আমি ওকে আমার মনোমত গড়বার চেষ্টাই করচি।

হয়তো তাই করতাম অন্য কেউ হলে,—কিন্তু আপনি এই যে বললেন, ওঁর স্বাভাবিক জীবন-পরিণতি লক্ষ্য করবার জন্যই ওকে আপন আশ্রয়ে নিয়েচেন!

আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—বিশ্ব প্রকৃতির কর্ম্ম-রহস্য আমি অনেক ক্ষেত্রেই সহজে ধরতে পেরেছি ওর কাজের ফলাফল দেখে। এক বীজমন্ত্রটি দেওয়া আর জপ-প্রণালী বুঝিয়ে দেওয়া ছাড়া কখনও আমি ওকে কোনো কর্ম্মনির্দ্দেশ দিই নি। ও কারো নির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখে না। ওকে ওর প্রকৃতি কি ভাবে পরিচালিত করচে ওর জীবনের দু-একটি ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া কিছুক্ষণ তামাকে মনোযোগী হইলেন।

তামাক যাঁরা খান, হুঁকা বা নল ছাড়িবার আগে তাঁহাদের সুখটান বলিয়া আরামের একটি টান আছে, এইবার তিনি তাহাই করিলেন;—মুদিত নেত্রে

বেশ দীর্ঘকাল একটি টান দিয়া নলটি সরাইয়া রাখিলেন। তারপর বলিলেন, —এইবার শোনো।

প্রায় এক বৎসর কাটাবার পর, তখনও এলোকেশীর সম্পূর্ণ স্থিরভাব আসে নি তবে ও নিজের সাধন-পথ ঠিক করে নিয়েচে;—এমন সময় আমার গুরুদেব হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন বরিশালের আশ্রমে; চট্টগ্রামের তিলোপার শিষ্য-পরম্পরা মহাকৌশলসর্ব্বেশ্বর, যিনি কৈলাসে সিদ্ধাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দীর্ঘকাল পরে সিদ্ধিলাভ করে চট্টল ফিরে আসেন, তাঁর অনেক রকম যোগ-বিভূতির কথা লোকের মুখে শুনে আমি তাঁর কাছে যাই। তিনি বলেন, ও সব বিশ্বাস কোরো না, ওর মধ্যে কিছু নাই—কারো যথার্থ শক্তির পরিচয় ভেল্কিবাজিতে নয়। আমায় দীক্ষা দিয়ে ছয়টি মাস সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিলেন। তারপর বলে দিলেন, আর নয় এবার নিজে করে নিতে হবে নিজের পথ;—তবে সময়ে দেখা হবে,—খুঁজতে হবে না, আপনিই যাবো তোমার কাছে। তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কি আরও বেশী হবে দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না,—অথচ প্রত্যেক দিনটি আমার মনে হতো তিনি আমার সঙ্গেই আছেন, কোন দিনই তাঁকে বিস্মৃত হইনি। এখন এলেন এক অদ্ভুত ভাবে। আমার সঙ্গে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। তখন তাঁর খুব উচ্চ অবস্থা। পরমহংস ভাব, যেন বালকের স্বভাব হয়েছিল তাঁর; যে সময়টুকু ছিলেন বাইরে কোথাও গেলে কৌপীন, না হলে সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকতেন। তবে তখনও ত্রিশূলটি সঙ্গে ছিল। একদিন ভোরবেলা, আশ্রমে, আসনেই আমি ছিলাম আপন ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে, একহাতে তাঁর ত্রিশূল, প্রথমে এসে সামনে দাঁড়ালেন যেন আমার ইষ্ট; তারপর হিড় হিড় করে আমার হাত ধরে সবলে টেনে আনলেন ঘরের বাইরে ফাঁকায়,—আর মুখপানে চেয়ে রইলেন। তাঁর স্পর্শেই আমি তাকে চিনলাম। কোনো কথা নয়; আবার আমায় জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে এনে ফেললেন—যেখানে এলোকেশী ছিল। তাঁকে দেখে এলোকেশী যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো। ও কখনও কাকেও সেবা করেনি, আর তখনও ওর মধ্যে একটা উদ্ধত ভাব ছিল বোলে আমিও কখনো তার সেবা চাইনি, নিইনি, নিতেও পারিনি, কারণ সেদিকে ওর প্রবৃত্তিরও অভাব ছিল। এইবার কিন্তু ওর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল, ও তাঁর সেবায় লাগলো আপনিই, তিনিও সেবা গ্রহণ করলেন। অথচ ওর সম্বন্ধে কোন কথাই, আমাকে ত নয়ই, ওকেও জিজ্ঞাসা করেননি। তবে ওর ব্যবহারে তিনি যে প্রসন্ন হয়েচেন, তার প্রমাণ পেতে

দেখি হলো না। তিনটি দিন তিনি ছিলেন। শেষে যাবার বেলা ত্রিশূলটি ওকে দিয়ে বলে যান, এই ত্রিশূল এখন তোর; অনেক শত্রু হবে তোর আপন-পথে চলতে আর এই ত্রিশূলই তোকে রক্ষা করবে তোর সিদ্ধির পথে, সকল আপদ-বিপদে সর্ব্বদা এটি সঙ্গে রাখবি। আর আমি যেমন তোকে উপযুক্ত জেনে এটি দিলাম, তুই যাকে উপযুক্ত মনে করবি তাকে দিয়ে যাবি। যখন হঠাৎ চলে গেলেন, আমাদের সব কিছু বদলে দিয়ে গেলেন।

তিনি চলে যাবার পর আমি ভেবে দেখেছি, হঠাৎ এভাবে তাঁর আসবার কারণ কি হতে পারে। ওঁদের মতো মহাপুরুষ, যাঁরা ভাগবতীশক্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, তাঁদের কোন কাজ কখনও বৃথা হয় না। সময় সময় অন্যান্য কারণের মধ্যে আমার মনে হয় ওর প্রতি কৃপা করতেই তিনি এসেছিলেন। কারণ তারপর থেকেই ওর পরিবর্ত্তন; ওর সাধনে দ্রুত উন্নতি আমাদের সবার চক্ষেই পড়লো। ওর উজ্জ্বল শ্রী, স্বাস্থ্যবতী বরাবরই তার উপর ওর মধ্যে সাধনলব্ধ শক্তির আবেশ মিলিয়ে যেন অগ্নিশিখার মতই ও দীপ্তি সাধারণের মধ্যে একটি প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি করেছিল। সে সময়টা আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম ওঁর জন্যে। বুদ্ধিমতী এলোকেশীও এটা বুঝেছিল ওর প্রকৃতিও তখন অনেক শান্ত হয়ে এসেছে—ও নিজেই তখন থেকে দিনমানে আশ্রমের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলে, কেবল একবার ভোরে নদীতে যেতো স্নানে আর গভীর রাত্রে ও একলা নদীতীরে শ্মশানে যেতো; তখনও পাশমুক্তির সাধনা করছিল ও।

ও অঞ্চলে মুসলমানদের একটা বড় দল আছে, হিন্দুর ঘরের মেয়ে ধরে নিয়ে যায়, পাশবিক অত্যাচার করে,—বাধা পেলে খুন-জখমও হয়ে যায়। তা ছাড়া হিন্দুদের ধন-সম্পত্তি, গয়নাগাঁটি লুঠ করে, চুরি-ডাকাতির জন্যই প্রসিদ্ধ তারা। নমঃশূদ্রদের ওপর ওদের বিশেষ নজর,—তাদের মেয়ে-পুরুষ সুশ্রী বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ হয়ে থাকে বলেই হোক বা যে কারণেই হোক হিঁদুদের মেয়ে ধরা ওদের যেন বংশজাত পেশায় দাঁড়িয়েছে। ঐ সময়, অল্প দিনের ব্যবধানে দু-তিনটি মেয়েকে রাত্রে দল-বল নিয়ে এসে তাদের ঘর থেকে ধরে নিয়ে যায়, সে খবর আমরা পেলাম। একটি মেয়ে আট দশজনের অত্যাচারে মারা যায় আর দুটিকে গ্রামের মধ্যে প্রতিবেশীদের ঘরে লুকিয়ে রাখে, এর কোন প্রতিকারই হয়নি। ওদের সাহস খুব বেড়ে গিয়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকজন মুসলমানের নজর পড়লো ওর উপরে, কিছুদিন থেকেই ওর পিছনে লেগে রইল তারা। ভোরে নদীতে ওর স্নানে যাওয়া আর

অমাবস্যা, শনি ও মঙ্গলবারের গভীর রাত্রে শ্মশানে যাওয়া এসব সন্ধানও তারা রাখলে। অমাবস্যার গভীর রাত্রে, ও যখন শ্মশানে যাবে, পথেই ওকে আক্রমণ করবার মতলব করেছিল, আর সে রাত্রে তিনজন ছিল তারা। ওদের একটা কৌশল আছে, যখন হিন্দুর ঘরের মেয়েদের ধরতে আসে একেবারে সবাই একসঙ্গে আসে না। কয়েকজন চৌকি দিতে পথের মাঝে থাকে, আর দুজনে আগে ঠিক সময়মত গিয়ে ঘরের আনাচে-কানাচে ওৎ পেতে থাকে। রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার আগে মেয়েরা সাধারণত একবার বাইরে পুকুরঘাটে আসে, সেই সময়টিই তাকে ধরবার সময়। তা ছাড়া হিঁদুর মেয়েদের দুর্ব্বলতা ওরা ভালই জানে, মুসলমান ছুঁয়ে ফেললেই ওরা মনে করে ধর্ম্ম নষ্ট হয়ে গেছে;—আর বাঁচবার চেষ্টাও করে না তারা। ভয়েতেই আধমরা হয়ে যায়, তাতে কাজ ওদের খুব সহজ হয়। আচম্বিতে একজন এসে জড়িয়ে ধরে, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন এসে মুখে কাপড় গুঁজে মুখটা বেঁধে দেয়, তারপর দুজনে তাকে নিয়ে দ্রুত চলে যায়। যদি পথে কোন রকম বাধা পায় ত পথে চৌকিতে যারা থাকে তারাই সামলায়, ততক্ষণে মেয়েটিকে নিয়ে অনেকটা দূরে চলে যেতে পারে। সে যাই হোক, সেই অমাবস্যার রাত্রে নির্ভীক এলোকেশী, পথে যেমন যায়, এই ভাবেই চলেছিল, যে দুজনে তাদের মধ্যে বলবান তারাই ওকে ধরতে এসেছিল আর একজন একটু তফাতে ছিল। ওর হাতের ত্রিশূলটি যে কত বড় শক্তি তা ঐ নরপশুদের জানবার সম্ভাবনাই ছিল না, হয়তো তারা আগে ভৈরবীদের হাতে ত্রিশূল দেখেছে, কিন্তু সে সব তাদের রামদা, ভোজালি প্রভৃতি অস্ত্রের তুলনায় তো খেলাঘরের ব্যাপার, ওদের কাছে হাসির কথা। সুতরাং যেমন গৃহস্থের বৌ-ঝি ধরে নিয়ে যায় বিনা প্রতিবাদে সেই ভাবেই ধরে নিয়ে যেতে পারবে সে বিষয়ে নিঃসংশয় ছিল তারা। কিন্তু ফলে হলো কি? ওর অঙ্গ স্পর্শ করবার আগেই একজনকে তার নাক আর কপালের মাঝবরাবর এমন একটা আঘাত করলে যে, মাঝের শূলটিই একেবারে মাথার ভিতরে ঢুকে গেল, দ্বিতীয় জনকে বাঁ দিকেতে কাঁধ আর বুকের মাঝামাঝি ত্রিশূলের খোঁচায় যেভাবে কাবু করলে, এ জীবনে সে আর সুস্থ হতে পারেনি। তৃতীয় ব্যক্তি এইসব দেখে পালালো আর সেই রাত্রে গিয়ে পুলিসে খবর দিলে। কাকেও কিছু না বলে এলোকেশী সোজা শ্মশানে গিয়ে নিজ কাজে মন দিল, তারপর যেমন আসে ভোরে আশ্রমে এলো। আমরা তখনও কিছুই জানি না।

পরদিন সকালে দারোগা মিঞা সাহেব দলবল নিয়ে আশ্রমে এসে মহা তম্বি লাগালেন;—ও খুন করে পালিয়ে এসেছে। তখনই দেখা গেল এলোকেশীকে, ঐ ত্রিশূলটি হাতে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বোললে,—এখানে এস, আশ্রমের বাইরে এসে কথা কও। তারা যখন বেরিয়ে এলো তখন,—সাবধান, আমায় স্পর্শ করবার চেষ্টা কোর না,—আমি নিজেই যাচ্ছি, বোলে এগিয়ে গেল, তারা পিছনে পিছনে চলল, হাত বাঁধলে না।

হাজতে ও দু'তিনদিন ছিল, কারো সঙ্গে কোন কথা কয়নি; দারোগারও কোন কথার উত্তর দেয়নি। ঐ তিনটি দিন তিনটি রাত এক বিন্দুও জলস্পর্শ করেনি, নিরম্বু উপবাসী ছিল। ওর অবস্থা দেখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উদ্বিগ্ন হলেন। অনেক ভদ্রলোক, তা ছাড়া প্রবীণ উকিলেরা ওর পক্ষে দাঁড়াতে চাইলেন। ও বললে, আমার কথা আমিই বোলব, মধ্যে উকিল কেন? ওব বিচার হোলো; সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার।

আগাগোড়া পুলিস দারোগার সাজানো বিবরণ শুনে পর, যখন জেলা জজ ওকে বলতে দিলেন, ও সকল ব্যাপার এমনই সুন্দর, অল্প কথায় সত্য ঘটনাটা বোলে গেল যে তা শুনে আদালতসুদ্ধ সবাই স্তম্ভিত। দায়রা জজ ওকে বেকসুর খালাস দিলেন। আর একথা স্পষ্টই বললেন,—এই মেয়েটির আদর্শ অন্যান্য হিন্দু ঘরের মেয়েরা যদি অনুসরণ করে তাহলে এ জেলায় ঐ নারীহরণের অপরাধমূলক ঘটনা অনেক কমে যাবে।

ঐ ঘটনার পর ও বাড়ী বাড়ী গিয়ে হিন্দু পল্লীর মেয়েদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা আরম্ভ করলে, কেমন করে ত্রিশূল ব্যবহার করতে হয় শেখাতো, তা ছাড়া তাদের বলেছিল যে তোমাদের পতিদেবতার সাহস যদি না থাকে, তোমাদের রক্ষা করবার মত বল না থাকে, তাহলে তাদের সঙ্গে ব্যবহার ত্যাগ করো, মনে কয়ো তোমরা বিধবা, তাদের নিয়ে ঘর করলে তোমাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট হবে। একেবারে যেন আগুন; ওর রকম দেখে আমি ওকে আমার চন্দ্রনাথ আশ্রমে নিয়ে এলাম, কারণ ওর উপর একদল মুসলমান প্রতিশোধ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিল।

এখান থেকেই অঘোরনাথের সঙ্গে দেখাশুনা হয়। ক্রমে ক্রমে দেখলাম ও যেন কেমন একটু গুণমুগ্ধ হয়েছিল। অঘোরনাথের তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি, বীরাচার সাধনের প্রবল নিষ্ঠা দেখেই উত্তরসাধিকা হতেও রাজী হয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে নায়িকা-সিদ্ধির প্রবৃত্তি অঘোরনাথের মাথায় ঢুকলো, তাইতেই সব নষ্ট হল। ওরা আমার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই গোপনে চলে গেল। তারপর সব কথা ত এলোকেশীর কাছেই শুনেছো!

সেই ডাকিনী সিদ্ধিতে পতনের ব্যাপার নিয়ে ওদের দুজনেরই অতিরিক্ত আত্মশক্তির দম্ভ অহঙ্কার যেভাবে আঘাত পেলে, তাইতেই এলোকেশীর চৈতন্য হোলো, কিন্তু অঘোরনাথের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, সামলাতে পারচে না। মোটামুটি এই হল ত্রিশূল সম্বন্ধে যা কিছু কথা। এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাবা চুপ করিলেন।

অবশ্য এলোকেশীর মধ্যে যে পদার্থ আছে, আজ যদি সুযোগ পায় তাহা হইলে তাঁহার কাছে সারা বাংলার নারী-সমাজ উন্নত হইতে পারে। একবার তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে—তাঁর অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু জানিতে লোভ হয়। কিন্তু আজ বেলা হইয়াছে, উমাপতি বাবার আপত্তি থাকে সেইজন্য আর কিছু না বলিয়াই যখন উঠিলাম, তখন উমাপতি আপনিই বলিলেন,--তোমার যখন ইচ্ছা আসবে আর এলোকেশীর সঙ্গে যদি কোন বিষয় নিয়ে ইচ্ছে হয় নিঃসঙ্কোচে আলাপ আলোচনা কোরবে। তোমাদের ছাঁচ আলাদা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তবে একালের ধর্ম্ম যেটা সেদিকে সজাগ থাকলে আর তুচ্ছ প্রবৃত্তির লোভে পড়বার ভয় থাকে না। শেষে একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, মেয়ে-মানুষের দেহ ছাড়া কত উচ্চস্তরের ভাব, প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে আছে এ নিয়ে একটু মাথা ঘামাবার প্রবৃত্তি খুব কম লোকেরই হয়। জানবার প্রবৃত্তি,—এখানে এসে জ্ঞানটুকুই সবার বড় কথা।

প্রণামান্তর চলিয়া আসিলাম।

১৭

পরদিন সুযোগমত আবার গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে যখন এতটা অধিকার দিয়াছেন, সেই অধিকারের লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে দায় হইল।

আমার কয়েকটা বিষয়ে একটু সংশয় আছে, খোলাখুলি জিজ্ঞাসার

অভয় দেন তো সাহস পাই। শুনিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—ঐ এলোকেশীর কথা তো? বল না।

তখন আমি প্রথম দিন তাঁর যে প্রকৃতি, যে মনোভাব দেখিয়াছিলাম, বিপিন পাণ্ডার বাড়িতে অমরনাথের পত্র সম্পর্কে তাঁর মধ্যে যে দুর্ব্বল ভাব ছিল, তার সঙ্গে তাঁহার এই ত্রিশূলধারিণীর যে পরিচয় পাইলাম তার যেন ঠিক মিল নেই, আজ আবার যে মূর্ত্তি দেখিলাম তাহাতে তাঁহার আর এক রকম ভাব,—অদ্ভুত বৈচিত্র্যই দেখিলাম, তাঁর প্রকৃতির ইতি করিতে পারিলাম না, এই কথাই বলিলাম।

উমাপতি বলিলেন,—আমিও ওর প্রথমকার সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখেছিলাম যখন ও অঘোরনাথের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফিরে এলো। ঘনিষ্ঠ পরিচয় তখনই ঘটলো ওর প্রকৃতির সঙ্গে আমার। ওর মধ্যে নারী-প্রকৃতির একটা পরিণতি ঐ অঘোরনাথের সঙ্গগুণে ঘটেছিল। হয়তো তাকেই ঠিক ওর উপযুক্ত সঙ্গী ধারণা করে নারীজীবনের উদ্দীপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ বা সাফল্যের প্রশ্রয় দিয়ে থাকবে মনের মধ্যে

. এইটুকু বলিয়া যখন তিনি একটু স্থির হইয়া আমার দিকে দেখিলেন তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় বললেন কেন? উপযুক্ত বয়সে যৌবন-ধর্ম্মের গুণেই তো নরনারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ ও মিলন ঘটে, এই তো প্রকৃতির নিয়ম, নয় কি?

উমাপতি বলিলেন- সাধারণতঃ তাই তো বটে, কিন্তু ও যে একটা ব্যতিক্রম অবশ্য সেটাও ঐ প্রকৃতির বৈচিত্র্য বোলেই বুঝতে হবে। তাই অল্পকালের জন্য ওর ঐ ভাবান্তর, নারীসুলভ কোমল বৃত্তির বিকাশফলে পুরুষের সঙ্গ-স্পৃহার দিকে যে মনের গতি তা স্বাভাবিক হলেও—এই জন্যে ওর পক্ষে সেটা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় বলেছি যে সাধারণ নারীর মত কোন পুরুষ-আশ্রয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ বা মাতৃত্বের টানে গর্ভে সন্তানধারণ এমন কি দুঃখ দারিদ্র্য স্বীকার করেও সাংসারিক জীবন সার্থক করবার জন্য তো ও জন্মায়নি। তা ছাড়া ওর সাময়িক পতনের যেটি দ্বিতীয় কারণ তা হোল অঘোরনাথ, ওকে এমনই একটা মহাশক্তির লোভ দেখিয়েছিল, যেজন্য তার কথায় পূর্ণ বিশ্বাস কোরে আমার অগোচরে তার সঙ্গে যেতে ও তিলমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেনি। অঘোরনাথ ওকে এই কথাটা বুঝিয়েছিল যে, ওর সাহায্যে যদি সিদ্ধিলাভ হয় তাহলে এমনই এক ঐশ্বরিক শক্তিলাভ হবে যার ফলে অসাধ্যসাধন সম্ভব হবে,

জনসমাজের মধ্যে যা কিছু বিধি, ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করা যাবে। যা কিছু করার ইচ্ছা তা সফল হবে, সাধারণ মানুষ কারো সে শক্তির কল্পনাই নেই। ঐ শক্তিলাভের লোভেই ও অতটা করেছিল। তার মত কল্পনাচালিত একজনের পক্ষে যা কখনও সম্ভব হতে পারে না, অঘোরনাথ যে এমনই এক অসম্ভবের পিছনে ছুটেছে,—এটাও বুঝতে পারেনি। কেমন করে বুঝবে বলো? ওর সাধন কতটুকু? কাজেই ও সরল ভাবেই বিশ্বাস করেছিল তার সকল কথা। ফলে মন বা প্রকৃতি অনুসারে দুজনের দুই রকম পরিণতিই হোল। সে ধ্বংসের পথেই গেল, আরও কঠিন আঘাত পেয়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলো আমার কাছে। তবে এখনও তার প্রতি একটা অনুকম্পার ভাব ওর মধ্যে আছে; অঘোরনাথের এতটা অধঃপতন ও কল্পনাই করেনি, আর আমার মনে হয় ও তা এখনও চায় না।

আচ্ছা গতানুগতিক সাধারণ নারী-প্রকৃতি থেকে কিছু পৃথকভাবাপন্ন এবং মহাতেজস্বিনী হলেও উপযুক্ত পুরুষ স্বামী পেলে যে উনি তার সঙ্গে মিলে সংসার-ধর্ম্ম করবেন না এমন কিছু বাধা আছে কি?

তিনি বলিলেন,—ওর মধ্যে স্নেহ ভালবাসা প্রেম এসব নেই, আছে মাত্র ইষ্টবোধের একটা আকর্ষণ, অঘোরনাথের উপর সেই আকর্ষণই এসেছিল, প্রেম নয়; ওর শরীর নিয়ে কেউ ভোগ করবে এ সংস্কার ওর নেই। অঘোরনাথের পত্রেই দেখেছো বোধ হয় তার একটা ভয়ানক আক্রোশ, যেন প্রতিহিংসার ভাব আছে ওর উপর? উন্মাদের মতই ওর সর্ব্বনাশের প্রবল আকাঙ্ক্ষা কেন, জান?

বলিলাম,—আমার মনে হয়, উদ্দেশ্য বিফল হওয়ায় নৈরাশ্যের ফলে ঐ ভাবে একটা মনের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, বুদ্ধির বিকৃতিও ধরা যায়—

না না, ঠিক তা নয়। পতনটা তার হোল—নিজের মধ্যে ইন্দ্রিয় মোহ প্রবল, দুর্ব্বার ছিল বোলে। তার ফলে ওর উপর আকর্ষণ ছিল গভীর, অথচ সেটা ঐ বিশিষ্ট সিদ্ধির প্রবল অন্তরায়,—সেই কারণে পতনের পর তার সেই দুরন্ত ইন্দ্রিয়ভোগটা ওকে দিয়ে, ওকে সহায় করে তৃপ্ত হতে চাইলে। সেটা তৃপ্ত হলে অঘোরনাথ হয়তো বেঁচে যেতো। কিন্তু তাকে ও কখনও অঙ্গ স্পর্শ করতে দেয়নি, তাইতেই সে পাগল হোল। সে বলপ্রয়োগের চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু সর্ব্বদা ত্রিশূল ওর কাছে থাকায় উদ্দেশ্যসিদ্ধি হোল না,—অথচ তার প্রতি ওর অনুকম্পা এতদূর ছিল, যাতে সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে সেজন্য

তাকে ত্যাগ না করে খানিক অত্যাচার সহ্য করেও তার সঙ্গে ছিল বেশ কিছু দিন। ফল হোল বিপরীত। বাইরের কেউ ঘৃণা কোরবে এসব গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি। আমার গুরু-সঙ্গ লাভ যখন ওর হয়েছিল, যাবার সময় তিনি আমায় বোলেছিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ও কখনও কোন পুরুষের স্পর্শ সহ্য করতে পারবে না।

আমার মনে হয়, ওর সূক্ষ্ম শরীর-যন্ত্রে হয়তো বা নারভাস্ সিষ্টেমে কোনো গলদ আছে—

তা নয়, নিখুঁত শরীর ওর, তাতে প্রাক্ সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। তবে যে ভাবে বেড়ে উঠেছে সেটা, সেটাও বিপরীত। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের ওপর ওর যে প্রবল বিতৃষ্ণা, সমাজের বিধান অত্যন্ত ঘৃণ্য,- এভাবের কথাও বালিকা-অবস্থায় ওদের সমাজে অনেকবারই শুনেছি। একবার কালাপাহাড়ের কথায় ও বলেছিল, এইবার একটা কালাপাহাড়ের দরকার,—হিন্দুদের সমাজ ভেঙে মুসলমানদের মত এক জাতের সমাজ গড়তে' জাতের বড়াই না গেলে, ব্রাহ্মণদের আধিপত্য না গেলে আর ভদ্রস্থ নেই।

তন্ত্রমতের শক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে উনি যে সিদ্ধির জন্য এখনও সাধনা কচ্ছেন তাতে উনি কি সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন?

আসলে তন্ত্রধর্ম্মের মূলে নরনারী যুক্তভাবে যে সাধন, তাইতেই উপাসনা বা সাধনার সার্থকতা—তা ওর হবে না। প্রাণে প্রাণে সহজ প্রেম-ধর্ম্মের যে মূল পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, সেদিক দিয়ে ওর পথ নেই। ওর পথ কোন বিশেষ এক সিদ্ধির জন্য, বড় কঠিন। তবে যদি আবার কোন বাধার সৃষ্টি না করে বসে, তাহলে ওকে আর দুঃখ পেতে হবে না। শেষ উত্তরসাধক হয়ে আমাকই সাহায্য করতে হবে। তারপর আর কারো সাহায্যের দরকার হবে না।

আমি বলিলাম,—অদ্ভুত এক নারীপ্রকৃতি, এমন কখনও আগে কোথাও দেখিনি।

আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—আমাদের সমাজে একরকম পুরুষ আছে যাদের পোটেন্সি যথেষ্ট থাকতেও নারীবিদ্বেষ প্রবল, নারীদেরও তো সেই রকম থাকতে পারে?

আমি বলিলাম,—নিশ্চয়ই পারে, কিন্তু পুরুষের প্রজনন-শক্তি থাকতেও কি নারীসঙ্গের উপর প্রবল বিতৃষ্ণা থাকতে পারে?

তিনি তিলমাত্র চিন্তা না করিয়াই বলিলেন,—কোন বিশেষ সংস্কারের

প্রাবল্যে ধাতুস্খলনের নাড়ি-পথ বন্ধ থাকতে পারে। আবার এমনও হয় আমাদের যোগমার্গের বা অধ্যাত্মসিদ্ধির জন্য সাবধানের পথে সিদ্ধির সহায় হবে বলে উর্দ্ধেরেতা হয়ে সাধকের তৈরী হওয়া, এসব আছে জানো তো ?

আমাদের ভারতের ধর্ম্মমার্গে সংযমের কত শক্তি জান তো? শরীর থেকে আরম্ভ কোরে সূক্ষ্মতম মনের স্তর পর্য্যন্ত বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে,—যোগমার্গে যাকে উর্দ্ধরেতা বলে শুনেছো তো? সে সব ক্রিয়া চেষ্টাসাধ্য, বালক অবস্থা থেকেই এর আরম্ভ। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় এক-একটি জীবের পক্ষে ওটা সহজ। একে প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম বলো আর যাই বলো, এমন কারো কারো পক্ষে হয় তো? তোমাদের পরমহংস দেবের প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথের কথা জানো তো? আচ্ছা, ভারতের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, অন্য সকল দেশেও ভিন্ন সমাজের মানুষ যারা তাদের মধ্যেও তো ওভাবের পুরুষ হতে পারে, যাদের ইন্দ্রিয় বা যৌন-সম্বন্ধীয় বোধ, বা ইন্দ্রিয়ভোগ-স্পৃহা অত্যন্ত কম, এমন কি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থেকেও তারা প্রজনন সম্বন্ধে সজাগ নয়। আসলে সেটা অন্য কোন বিপরীত বিষয়ে তীব্র অধ্যাসের ফলেও সম্ভব।

আমি বলিলাম,—আমার ধারণা সকল সমাজেই ঐ ধরনের পুরুষ জন্মায় বটে—সেটা সাধারণ নিয়মের এক ব্যতিক্রম নয় কি ? তারা মহৎ কর্ম্মী হলেও সংসার অথবা প্রজাবৃদ্ধির দিকে একান্তই বিমুখ।

শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন,—নিশ্চয়ই, তাই তো। প্রকৃতির নিয়মে সকল দেশেই ওইরকম পুরুষ আছে। এই তো আমাদের—বৃটিশ জেনারেল, লর্ড কিচেনার, যিনি আমাদের ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, নারী সম্পর্কে তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণার কথা সভ্য জগতে কে না জানে।

আমি আশ্চর্য হইলাম,—আপনি কি করে জানলেন? স্বতঃই কথাটা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেন? তিনি—বলিলেন, আমরা কি পৃথিবীর মানুষ নয়, আমরা কি পৃথিবীর কোন খবর রাখি না মনে করো?

আমরা মনে করি আপনারা দিনরাত আপনাদের সাধন বা সিদ্ধি নিয়েই থাকেন; জগতের অন্য কোনোদিকে কি হচ্চে না হচ্চে, অন্যান্য সমাজের লোকের প্রকৃতি-বৈচিত্র্য এসব খবর রাখেন কেমন করে, তার ইতি পাই না যে ?

১৮

গুরু-সেবা, যা দেখলাম, জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। জানকীনাথ বরদলই মহাশয় উকিল ;—তাঁর স্ত্রী, যেন নিখুঁত আর্য্য মহিলা ; দুজনে আসিয়া যখন দাঁড়াইলেন,—অপূর্ব্ব মিলন, দেখিয়া আনন্দ হয়। কথা না কহিলে অথবা বেশভূষার ধরন লক্ষ্য না করিলে তাঁহাকে পাঞ্জাব বা রাজপুতানার অধিবাসিনী বলিয়া সহজেই ধরিয়া লওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলিয়া প্রথমে গুরুচরণ বন্দনা করিলেন, তারপর স্বামী ও সহধর্ম্মিণী, গুরুকে সামনে চৌকিতে বসাইলেন। দুজনেই গরুড়াসনে বসিয়া,—স্ত্রী কলস হইতে জল ঢালিয়া দিতে থাকিলে স্বামী পরিপাটিরূপে চরণ দুখানি ধোয়াইয়া দিলেন। তারপর স্বামী জল ঢালিতে থাকিলেন, স্ত্রী করাঙ্গুলি চালনা করিয়া পায়ের প্রত্যেক অঙ্গুলী এবং পদতলের প্রত্যেক অংশ অতীব যত্নের সহিত ধোয়া শেষ করিলেন। অতঃপর যাহা হইল জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। সহধর্ম্মিণী তাঁহার অলুলায়িত কেশগুচ্ছ বাহির করিয়া চরণ দুখানি পরিপাটি করিয়া মুছাইয়া দিলেন। নেহাৎ নিয়মরক্ষার মত কোন কাজই হইল না, আন্তরিক ভক্তি থাকিলে, প্রতিটি কর্ম্মে যত্নের যে প্রত্যক্ষ রূপ এবং আন্তরিক ভক্তির প্রকাশ—আজ স্বচক্ষে তাহাই দেখিলাম। যাহা আজ আসামে দেখিলাম, আর্য্য সভ্যতার অন্তর্গত ধর্ম্ম-গৌরবে গর্ব্বিত দাম্ভিক বাংলায় কোথাও তাহা দেখি নাই।

পা ধোয়ানো, তারপর রুক্ষ কেশ দ্বারা মোছানো হইয়া গেলে গুরুকে গৃহমধ্যে লইয়া পিঁড়ার উপর দাঁড় করানো হইল, তারপর হইল বরণ। সে বরণ, বিবাহ-রাত্রে বরকে স্ত্রী-আচারের সময় যেমন করিয়া বরণ করা হয় ঠিক সেই প্রকার। গরদের নববস্ত্র উত্তরীয়, নূতন পাদুকা, ছত্র, সকল কিছুই চরণে উৎসর্গ করা হইলে পর তাঁহাকে বসানো হইল। প্রকাণ্ড রজতপাত্রে পরিপূর্ণ ফলমূলাদি এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রৌপ্যের বাটীতে পানা ও অন্যান্য বহুপ্রকার পানীয় এবং স্তূপাকার উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন আয়োজন ছিল, গুরু উহার অতীব সামান্য অংশ কোন কোন পাত্র হইতে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পাত্রগুলি স্পর্শ করিয়া আচমনান্তে জলযোগ শেষ করিলেন। তারপর প্রসাদ পাইবার পালা,—সে প্রসাদে কেহই বঞ্চিত হইল না।

এইবার স্বামী-স্ত্রী দুজনে গুরুকে একান্তে, একখানি গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন ; আমি বাহিরের একটি ঘরে যাইয়া বসিলাম। এখানে গুরু-আবাহন

যাহা দেখিলাম তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। যাহা দেখিয়াছি, আমাদের বাড়ীতে অনেকবারই ভাটপাড়ার গুরু আগমন, মধ্যে মধ্যে মাসে দু'মাসে একবার আসা,—অনেকগুলি শিষ্যার মাঝে। পা ধোবার জল দিলে তিনি আপনিই পা ধুইলেন, তারপর গামছা কোথায়, ওরে একটা গামছা দিয়ে যা না। গামছা আসিলে নিজেই পা মুছিয়া দাঁড়াইলে একজন পিঁড়া পাতিয়া দিলে তিনি বসিলেন। প্রবীণারা টাকা হাতে আসিয়া প্রণাম আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য শিষ্যারা টাকার যোগাড়ে গেলেন, কারো হাতে আছে কারো নাই, তাহাকে ধারকর্জ্জ করিতে হইল। শেষের দিকে বাড়ীখানা নিলামে চড়িয়া, সংসারটি ছন্নছাড়া হইবার পূর্ব্বে বাড়ির কাহারও নিকট আটআনা ধার পাওয়া মুশকিল। গুরুর জলখাবার

আসিল দু আনা, বড়জোর চার আনার মিষ্ট, চারিদিকে প্রকাণ্ড একপাল ছেলে-মেয়ে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে, তাহার মধ্যে গুরু নত-মস্তকে জলযোগ করিতেছেন। আমাদের কেহ বলিল না যে গুরুঠাকুরকে প্রণাম করো। এ সকল দৃশ্যও দেখিয়াছি। ভাবিতেছিলাম,—কি অদ্ভুত পরিষ্কার সমাজ আমাদের, এ অচল সামাজিক অবস্থার শেষ কতদিনে হইবে ভগবানই জানেন।

এইখানে আর একটি বস্তু দেখিলাম।

বরদলই উকিলের বাড়িতে তাঁর গুরু আসিয়াছেন, গৌহাটিময় রাষ্ট্র হইয়া গেল,—দুপুরে, বৈকালে, সন্ধ্যায় তাঁর বাহির ঘর প্রাঙ্গণ দরদালান ভরা লোক। আমি আর সবার কথা বলিব না, কেবল একজনের কথাই বলিব। বৈকালে অনেক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সম্মুখে ঘেরিয়া আর প্রায় অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া স্থানীয় প্রৌঢ়া বৃদ্ধা যুবতী আসিয়া বসিয়াছেন; অন্দরের দরজা জুড়িয়া ভিতরদিকের বারান্দা

পর্য্যন্ত তাঁহাদের অভিযান। বয়স্ক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ গৃহীর দল কত রকমের কত প্রশ্নই না করিতেছে, উমাপতি বাবা অন্তরে অন্তরে একটা পীড়া অনুভব করিতেছিলেন। বিশেষতঃ এক ব্যক্তির কথা শুনিয়া। সে লোকটা একজন ব্যবসায়ী, বেশ জোয়ান চেহারা, মুখে তাহার দম্ভ, কথায় খুব জোর আছে। তার কথা ছিল এই যে, আমরা ওসব মানি না বুঝি না, বসে বসে জপ করা গীতা চণ্ডী পড়া ধর্ম্ম-চর্চ্চার এসব সহজ উপদেশ সবাই দিতে পারে, এর জন্য আপনার কাছে আসবো কেন? কিছু প্রত্যক্ষ শক্তির ক্রিয়া যদি দেখাতে পারেন তবেই বুঝি, না হলে বাজে কথায় ভুলি না। বাবা হাসিয়া উঠিলেন, তাহাতে সে চটিয়া গেল, তখন তিনি বলিলেন,—কি রকম শক্তি-ক্রিয়া বলুন তো?

তিলোপা-টিলোপা যেমন মরা মানুষ বাঁচাতে পারতেন, কত কত অসাধারণ কাজ করতেন, সেইরকম সব; বলিয়া সে লোকটা সবাইকে যেন চ্যালেঞ্জ করিতেছে এমনভাবে একবার তাহার সামনে পাশে যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের দিকে চাহিল।

বাবা বলিলেন,—ওসব কি আমরা পারি? ও-সব সিদ্ধি মহাশক্তির সাধনা দরকার, আমরা ত তা করিনি, চাইওনি।

হুঁ, তবে তান্ত্রিক-সাধনা কি হয়েছে আপনার? তাহার কথা শুনিয়া কয়েকজন, নির্লজ্জ কোথাকার, উঠে যাও এখান থেকে, মূর্খ,—বলিয়া সম্ভাষণ করিল। কেহ কেহ বা, মহেশ টাকার গরমে মাথা-পাগল হয়ে গিয়েচে ইত্যাদি গোলমাল করিতেই লোকটা দেখিলাম চোরের মত সুড়-সুড় করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। তার এতটা তেজ কিছুমাত্র দেখা গেল না। এমন সময় কয়েকজন যুবা আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল—মনে হইল যেন কলেজের ছাত্র তারা। উমাপতি তাহাদের একজনকে দেখিয়া, এই যে আমাদের জ্যোতিষচন্দ্র, এসো এসো বাবারা বলিয়া, অত্যন্ত খুশী হইয়াই তাহাদের নিকট আহ্বান করিলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক বসাইলেন। তাহারাও মহা আনন্দে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিতেই বাবা একজনের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাবা বলিলেন, এরা সব কলেজের ছাত্র, বড় ভাল ছেলে। দেখ আমায় ভালবাসে কেমন, আমি এসেছি শুনেই এসেছে; কেমন? কালীকিঙ্কর তোমার সায়েন্স চলছে কি রকম? বলো, আমাকে শোনাও কি রকম সব হচ্চে তোমাদের কাজকর্ম্ম? দেশের হাল-চাল সব বলো, অনেক কথা শুনবো আজ তোমাদের কাছ থেকে।

এই ছাত্রদের আগমন আর একদলের বড় মনরোচক হইল না; অবশ্য তাঁহারা কেন্দ্র হইতে অনেকটা দূরে ছিলেন।--চলেন, আজ আমাদের কথা কিছুই হবে না; পোলারাই থাকবে এখন, কাজ আছে কিছু—বলিয়া দূর হইতে প্রণাম করিয়াই উঠিলেন। বাবার দৃষ্টি পড়িল সেদিকে, কিছুই বলিলেন না, শুধু প্রতি-নমস্কারটুকুই করিলেন।

কালীকিঙ্কর ছেলেটি ভারি সুন্দর, শুধু সুপুরুষ নয়, সুগঠিত শরীর শ্যামবর্ণ বটে কিন্তু এমনই নম্র প্রকৃতি দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এখন সে ধীরে ধীরে বলিল,—এখানে যেভাবে আমাদের বিজ্ঞান-চর্চ্চা হওয়া উচিত সেভাবে হচ্ছে না, যদিও আমার পড়াশুনা এক রকম চলছে। এখনও আমরা ভয়ানক ব্যাকোয়ার্ড দেখুন না যে পরিমাণে ছেলেদের সায়েন্সে যাওয়া দরকার তা যাচ্ছে না আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। যেমন তেমন করে বি এ. পাসটা, তারপর চাকরির চেষ্টা, মোট কথা --এই স্ট্যাণ্ডার্ড দাঁড়িয়েছে ভদ্রঘরের ছেলেদের। এরা বাংলার ছেলেদের পিছনে পিছনে ঠিক যাচ্ছে।

উমাপতি বাবা সোজা হইয়া বসিলেন তারপর যেন একটু ভাবিয়াই বলিলেন, কি বলব, আমি যা বলব তা তোমাদের মনঃপূত হবে না। এখন তোমাদের লক্ষ্যই দাঁড়িয়েছে সায়ান্স আর ডিসকাভারী, ইন্‌ডাসট্রিয়ালাই-জেসান, মেটেরিয়াল প্রস্পারিটি,—ওদেরই আদর্শে। যেন ও ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

জ্যোতিষচন্দ্র বলিলেন,—এখনকার জগতে বাঁচতে গেলে ও ছাড়া আর পথই বা কি? আর আমাদের আছেই বা কি, যা নিয়ে আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি?

আমি আর কী বলব তোমাদের বলো, তোমরা যা বুঝেছ, যেভাবে দেখছ বর্তমান জগতে মানুষ সমাজের গতি, ভেবে-চিন্তে যেটা ভাল বলে মনে করেচ তাই তো করবে?

না না, আমরা অতটা ভেবেচিন্তে, উদ্দেশ্য স্থির করে কোন কাজই করছি না, গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি বললেই ঠিক হয়। তা ছাড়া কিই-বা ভাবব বলুন, ভাববার কি আছে?

আছে বইকি, ধরো না কেন, ইউরোপ আমেরিকার প্রগতি পদার্থ-বিজ্ঞানচর্চ্চা—ওদের আবিষ্কারের মধ্যে কি পদার্থ আছে তোমাদের জাতিগত

সংস্কৃতির আলোয় বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছ কি ? ভাল হোক মন্দ হোক ভেবে কিম্বা বিচার করে দেখতে দোষটা কি ?

দোষ কিছুই নেই, কালীকিঙ্কর বলিল,—দেখতে গেলে উৎসাহ পাই না, অবসাদ আসে। ভারতীয় জাতিগত সংস্কৃতির যে কিছুই ধারণা নেই আমাদের —আগাগোড়া শুনে আসছি আমরা গোলামের জাত, কুনো ব্যাঙ, বর্ত্তমান জগতে উঁচু উঁচু সামাজিক আদর্শ, সায়ান্স ডিসকাভারী, ইনডাষ্ট্রি, কালচার আর্ট, ইম্যানসিপেশানের বিষয় কিছুই জানি না, সেকালের কতকগুলি অচল পুরাণ মহাভারতের কথা যা যাত্রার দলেরই খোরাক, তা ছাড়া আমাদের তো কিছুই নেই, আর যা দিয়ে আমাদের জাতিগত সংস্কৃতি কিছু ছিল বুঝতে পারি।

একবার করুণ নয়নে যুবকের দিকে চাহিয়া উমাপতি বাবা বলিলেন,— তুমি যে আজ এই কথা বলবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, কারণ বিজাতীয় শক্তির চাপে, অধীনতার চাপে তোমাদের শিক্ষার গোড়াটা ভুয়ো হয়েই আছে যে--জাতীয় সংস্কৃতি, চিন্তাধারা শিক্ষার মূল উপাদান ছেড়ে একেবারেই সম্পূর্ণ বিজাতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষারম্ভ করার এই শোচনীয় পরিণাম। তোমাদের শিক্ষার আদর্শ ঠিক না হলেও তবুও তোমরা যে কত বড় সংস্কৃতিবান, কত উচ্চস্তরের সভ্যতার ফল তার প্রমাণ দেখ,- পরাধীনতা সত্বেও জাতীয় শিক্ষার আদর্শে তোমাদের গড়ে উঠবার স্থযোগ-স্থবিধা না হলেও ভিন্ন জাতীয় সমাজের আদর্শ সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা যে এত অল্প সময়ের মধ্যে আজ সেই সমাজের সঙ্গে শিক্ষা,-দীক্ষায় প্রতি কর্ম্মে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে সাহস করতে পারো, সকলকাম হতে পারো, এটাই কি তোমাদের মহান সংস্কৃতি বা শক্তিশালী জাতীয় অদর্শের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয় ? শুধু ছাত্র জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার কথা বলছি না, আজ জগতের যারা শ্রেষ্ঠ জাতীয়তার দম্ভে এদেশের সভ্য সমাজকে এতদিন হেয়জ্ঞান করে এসেছেন, দেড়শো বছর ধরে দাবিয়ে রেখে এমন কি আজও তোমাদের কোণঠাসা করে রাখলেও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির রাষ্ট্র পরিচালনা, ও সকল বিভাগেই এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারায় তোমরা কতটা উন্নত, কতটা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এমন কি জ্ঞানবুদ্ধিতে তাদেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত একথা আজ জগৎ-সভায় নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত। এ প্রতিভা শুধু শিক্ষার গুণেই বিকশিত হয় না, তোমাদের পিছনেতে সভ্যতার কত গভীর ক্ষেত্র ব্যাক-গ্রাউণ্ড বর্ত্তমান—একথা কি বেশী করে বলা দরকার হবে ? তোমরা

কোন্ সভ্যতা-শক্তির উত্তরাধিকারী এইটুকুই কেবল জানতে দেওয়া হয়নি। সংস্কৃতির জননী সংস্কৃত-ভাষাভাষী যে জাতির সন্তান তোমরা, তোমাদের কী আছে আর কী নেই তা জানতে বেশী সময় লাগবে না, একবার যদি ওদিকে লক্ষ্য আসে। মোট কথা তোমরা যে কতটা শক্তিমান তা বুঝে নেওয়ার ভার আজ তোমাদেরই উপর, নয় কি ?

কালীকিঙ্কর হাত বাড়াইয়া বাবা উমাপতির পদধূলি লইয়া মাথায় দিল, কি যে নির্ম্মল আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল সকল ছাত্রের মুখে, উহা ঘরসুদ্ধ সবাই লক্ষ্য করিল। ঘরের অন্য সবাইও অমনোযোগী ছিলেন না। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল যাঁরা ছিলেন সবাই একটা আনন্দের আস্বাদ পাইলেন তাঁর কথায়। কালীকিঙ্কর বিনয়গদগদ কণ্ঠে বলিল,—যেভাবে কথাগুলি আজ আমাদের আপনি বলিলেন, এমন সত্য, এত সহজ ভাষায় এর আগে কেউ আমাদের শোনায়নি। প্রোফেসারেরা তো এই ধারণাই আমাদের মাথায় ঢুকিয়েছেন যে ঐ বিশ্বজয়ী পাশ্চাত্ত্য জাতিই এ-যুগের দেবতা ঃ সেকালের যা কিছু হিন্দু সভ্যতার গৌরব একালে অচল।

শুনিয়া বাবা উমাপতি বলিলেন,—যার দেশের যে রকম সংস্কৃতি তা দিয়ে সে দেশের মানুষেই গর্ব্ব করে থাকে, তা নিয়ে আমাদের অতটা গৌরবের ডঙ্কা বাজিয়ে নিজেদের অন্তঃসারশূন্য মনে করবার দরকার নেই। হয়ত এমন সময়ও আসবে যখন ওদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় ভারতসন্তানও বিজয়ী হতে পারে। কিন্তু ঐ প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাটাই ভারতের সংস্কৃতির নীতিবিরুদ্ধ—কে বড় হতে পারে এ রেসের ফল নিয়ে একজনের বা এক সমাজের মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব বিচার করা চলে না ; জাতীয় সভ্যতার সকল বিভাগই তো ঘোড়দৌড়ের ক্ষেত্র নয়।

আমাদের সায়ান্সের প্রফেসাররাই বেশী বেশী ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত নিয়ে ব্যঙ্গ করেন, বিশ্বের উপাদান নিয়ে সেকালের ভারতের ন্যাভেজ টিকিধারীরা নূতন তথ্য কিছুই আবিষ্কার করতে পারেননি।—বলিয়া কালীকিঙ্কর একটু হাসিল।

আরে বাবা, সৃষ্টির মৌলিক উপাদান নিয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও কম মাথা ঘামানান। স্থূল সৃষ্টির উপাদান জড়ের প্রসার তাঁরা দেহ ছাড়িয়ে মন পর্য্যন্ত ধরেচেন, তারপর চৈতন্য, যার চরম হোল বেদান্তের অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। থাক সে কথা, ওরা এখনও তো জড় নিয়েই ঘাঁটছে।

ওদের সায়ান্সে প্রকৃতি জড় অন্ধ, ওরাও তাই জড়মুখী এবং চৈতন্যের দিকে অন্ধ হয়েই চলেছে গতির বেগ বাড়াবার প্রতিযোগিতায়। একটা গোড়ার কথা তোমরা ভেবে দেখলেই সহজে বুঝবে, জড় নিয়ে ঘাঁটলে তা স্থূল হোকে বা সূক্ষ্মই হোক তোমার বুদ্ধিকে জড়ীভূত করবেই,—প্রকৃতির নিয়ম, সংসর্গজ গুণের কথা জান তো? তা থেকে এড়াবার যো নেই! মনের উচ্চগতি হতেই পারবে না জড়পদার্থ ধরে থাকলে। পদার্থ নিয়ে ঘাঁটো তোমরা—এটা তা সহজেই বুঝতে পারো যে, ভারী জিনিস মাধ্যাকর্ষণের বড় আসামী? হাল্কা হলে তার গতি বিপরীত, উর্দ্ধমুখী? জড়পদার্থ নিয়ে আলোচনা বা অনুশীলনের ফলে মন তোমার নীচের দিকেই নিয়ে যাবে, কারণ এটা জড়েরই ধর্ম্ম। আমি বলছি কি, তোমাদের বুদ্ধি কেন চৈতন্যমুখী হোক না, সেটা তোমাদের মনোবৃত্তির সহজ পরিণতি জাতীয় সভ্যতার অনুকূল, তাতে তোমাদের অনেক উন্নত করবে। তোমরা ওদের পেছনে পেছনে দৌড়বে কেন? পদার্থ-বিজ্ঞানের অনুশীলনে কি সারবস্তু লাভ হবে তোমাদের, ধন মান সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা, বাড়ীঘর সম্পত্তি ভোগ আর বিলাসের চরমোৎকর্ষই না হয় হোল। ততঃ কিম্?

মাধ্যাকর্ষণের বা জড় পৃথিবীর পানে টান তো স্থূল বস্তুর পক্ষে, মন তো সূক্ষ্ম বস্তু, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পদার্থ তত্ত্ব নিয়ে গভীর চিন্তা বা অনুশীলন করলে মনও জড়ীভূত হবে কেন এটা তা বুঝলাম না।—এই কথাগুলি যেন এক নিশ্বাসে বলিয়া কালীকিঙ্কর বাবার মুখপানে চাহিল।

তখন উমাপতি বলিলেন,—চিন্তাটা বড় জিনিস কিন্তু চিন্তার বিষয় তো জড়, সেই জড়ের গুণ মনে বর্ত্তাবে না? বুঝে দেখ না, স্থূল ভারী ওজনের জিনিস যেমন তার অনিবার্য্য নিচের দিকে গতি প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে থাকে, সূক্ষ্ম হলেও সূক্ষ্মভাবের জড়ীয় পদার্থ নিয়ে আলোচনা বা অভ্যাসের ফলে সূক্ষ্মভাবেই যে মনেরও ভার বাড়ে তাতে অধোগতি অনিবার্য্য নয় কি? জড়ের ধ্যানে মনেও জড়তা আসবে এটা প্রকৃতিরই নিয়ম।

কালীকিঙ্কর বলিল,—মনের ভারী হওয়ার ফলে অধোগতিটা ঠিক ধরতে পাচ্ছি না,—মনের ভার কি?

মনের ভার হোল বস্তুর সঙ্গে জড়ানো, তার স্থূল অভিব্যক্তি হোল অধিকার-স্পৃহা,—স্বার্থপরতা, লোভ, বস্তু অধিকারের আকাঙ্ক্ষাই কি সকল সমস্যার মূলে নেই? তারপর অধিকারের ফলে দম্ভ, কৃতিত্বের অহঙ্কার, গর্ব্ববোধ এই সব-

গুলিই তো মনের ভার বা জড়তা। তাতেই ত মনকে নামিয়ে রাখে জড় পদার্থের দিকে। বুঝেছ?

শুনিয়া কালীকিঙ্কর বলিল,—এক-একটা ডিসকাভারীতে কিন্তু জগতের কত কত উপকার হচ্ছে—সায়েণ্টিস্টরাই তো সেই আবিষ্কারের হেতু, তার ফলে সে জাতের প্রতিষ্ঠা গৌরব- সে তো কম কথা নয়?

এই যুক্তিটাই তোমার বর্ত্তমান পরসভ্যতা আশ্রয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল। আচ্ছা বিচার করেই দেখ না কেন। একটা পদার্থ তত্ত্ব নিয়ে আবিষ্কারের ব্যাপারটা কী? ধরো কোন বিশেষ পদার্থ নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে নাড়াচাড়া করতে করতে—

কালীকিঙ্কর বলিল,—নাড়াচাড়া কী রকম?

উমাপতি বলিলেন,—অনুশীলন বা অনুসন্ধান বা রিসার্চ্চ যাই বল তোমরা। স্বাধীন দেশের কোন বৈজ্ঞানিক ধীমান প্রকৃতির অধিকারে এক শক্তিশালী পদার্থের তত্ত্ব বা পরিচয় পেয়ে গেলেন—যা আগে কারো জানা ছিল না। তারপর পরীক্ষার পর পরীক্ষার সাহায্যে—সফলকাম হয়ে ঐ তত্ত্বটি যথাসময়ে যথা সমাজে প্রকাশ করলে; এইটিই হোল তাঁর আবিষ্কার, কেমন? গভীর ধ্যান অনুশীলনের ফলেই ঐ সম্পদটি তিনি লাভ কোরেছেন সুতরাং মুখ্য ফল তাঁর আনন্দ,- তা লাভ হোল প্রচুর। কিন্তু তাছাড়াও তাঁর প্রতিষ্ঠার পূর্ণ লোভ রয়েছে, তাঁর পর-ধন-লোভের কথা। এইগুলি লাভ যতক্ষণ না ঘটছে ততক্ষণ তাঁর শান্তি নেই। তাঁর সমাজে আবার ঐ আবিষ্কৃত তত্ত্ব নিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে একচেটে লাভের অধিকারী হবার কাজ আরম্ভ হোল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জটিল যন্ত্রনির্ম্মাণ-কার্য্যও আরম্ভ হোল। তারপরই আরম্ভ হোল ব্যাপকভাবে কর্ম্ম ও ধন-উপার্জনের প্রসার। জগৎসমাজে এক শ্রেণীর মধ্যে এক চঞ্চল কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে উঠলো। তাহলে দেখা গেল, জড় বা পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কারক প্রথমে পেলেন একটি গূঢ় পদার্থ তত্ত্ব। তারপর দ্বিতীয় ফল পেলেন আনন্দ, তৃতীয়ত পেলেন ধন, চতুর্থ দফায় পেলেন প্রসিদ্ধি বা ধন্য ধন্য রব, এবং তাইতেই তাঁর জীবন সার্থক হয়ে গেল। তারপর তার ফলে সমাজে হোল কী, এক স্তরে সুখ-সমৃদ্ধির কারণরূপে প্রসারিত হোল এক প্রকাণ্ড ব্যবসায়, আর জগতে অন্যান্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে এক বিরাট প্রতিযোগিতা। একটি স্বাধীন জাতি অপর স্বাধীন জাতির একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মনোপলি দেখতে পারে না, তার ফলে খুব অল্প সময়েই ঘোরতর যুদ্ধ,

পৃথিবীর ছোট বড় কোন জাতিই তার ফলভোগে বঞ্চিত হবে না। আর সে ফল অমৃত নয় নিশ্চয়ই। তা হলে প্রত্যেক সায়ান্টিফিক্ ডিস্কাভারীর ফলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে কি দেখা যাবে? ভেবে দেখতে বলি।

প্রজা বেড়ে যাচ্ছে, ইণ্ডাসট্রিয়ালাইজেসন না করলে জাতির বাঁচবার উপায় কি? কালীকিঙ্কর বলিল,—খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে ত?

একটা জাতির বেশী খেয়ে-পরে বাঁচার অর্থ কি অপর জাতির সমরসজ্জা এবং মরণপথের যাত্রা নয়?

অনেকক্ষণ সভা নিস্তব্ধ, কারো কোনো কথা নেই—কালীকিঙ্করকে ভাবাইয়া তুলিল; কতক্ষণ পরে উমাপতি বাবা বলিলেন,—কি বাবা, ওয়ার্লড মার্কেট্ ক্যাপচার করবার ঘোড়দৌড়ের কথা ভাবচ?

ঠিক বলেচেন, আচ্ছা আপনি বলুন ত, যার যেটুকু আছে তাই নিয়ে তারি মধ্যে সুস্থ হয়ে থাকতে পারবে না কেন?

ঐ যে সায়ান্স আর ডিসকাভারী যার ফলে মনোধর্ম্মের কাছে আত্মসমর্পণ। তার ফলে পশুবলের প্রয়োগে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা—ডিমোক্রাসীর অজস্র দৃষ্টান্ত যা আজ চারিদিকে ছড়াচ্চে, পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে ইউরোপ-আমেরিকার জগতে শান্তি স্থাপনের কি অপূর্ব্ব কৌশল? তোমায় হত্যা করে ভয় দেখিয়ে এমন কি ধ্বংস করেও বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমার শ্রেষ্ঠ অধিকার স্বীকার করা ছাড়া তোমার বাঁচবার পথ নেই। এক্কেই জগতের অগ্রগতি বলবে।

তাহলে আমরা কি করবো, কোন্ পথে যাবো এই প্রশ্নই ত আসে!

আমি তাই ত বলছিলাম, পঁয়ষট্টিতলা বাড়ি, মোটরগাড়ি, ইলেকট্রিক, রেল, পাঁচশো মাইল গতিবেগের এরোপ্লেন, ইউ বোট, টরপেডো, এককালে অল্পসময়ের মধ্যে শতসহস্র লোক হত্যার সহজ উপায়, সায়ান্স, আবিষ্কারাদির প্রতিযোগিতা ওসব ওরাই করুক না, তোমরা ঐ স্রোতে ঝাঁপিয়ে নাই বা পড়লে, তোমরা সবাই ঐ পদার্থবিজ্ঞানের দিকে নাই বা গেলে? তোমরা সবাই না হোক কেউ কেউ উপযুক্ত অধিকারী বুঝলে চৈতন্যের ক্ষেত্রে নামো না, তাই হবে তোমাদের স্বক্ষেত্র,—জড়াতিরিক্ত চেতনা, প্রাণ, এই পথে ভাবতে থাক, তাই নিয়ে যেসব আবিষ্কার হবে তাতে পদার্থবিজ্ঞানের পাশবিকতার স্থান নেই, জগতে কখনও কারো কোন অকল্যাণের সম্ভাবনা নেই; বরং সেই অমৃতফলে জগৎবাসী ধন্য হবে। ছাড়ো পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কার মোহ,

এসো চৈতন্যরাজ্যে, ধন্য কর ভারতের হিন্দু-সংস্কৃতি—এর বড় উপদেশ আমার আর নেই।

১৭

কালীকিঙ্কর বলিল,—তাহা ঠিক, এইভাবেই তো হওয়া উচিত, কিন্তু সুখী হওয়ার পথ তো রাখতে হবে?

উমাপতি বলিলেন,—এই সুখী হওয়ার আসল স্বরূপটা বিশ্লেষণ করে দেখ দেখি, কী দেখবে? জড়পদার্থেরই বাড়াবাড়ি, তারই মহিমায় যন্ত্রসৃষ্টির ধারা ও ব্যবসার প্রাধান্য। সেই অপূর্ব্ব ফলের স্বরূপ সমাজের ঐশ্বর্য্য বাড়ালেও সেই সমাজের মানুষ-বুদ্ধিকে বহুভাবে জড়মুখী করতেই সাহায্য করলে। একেই তো একদিকে জড়ের প্রভাবে, অপরদিকে জড়ের আকর্ষণে মানুষবুদ্ধি স্থূল অহরহ বিপথগামী হচ্ছে, শক্তি ও স্বস্তির থেই হারিয়ে ফেলছে অভাবের পর অভাব সৃষ্টি কোরে, অভাব বোধটা যেন চিরস্থায়ী ধর্ম্মের মতো দৃঢ় করে তুলেছে। তারি ফলে অস্থির, ব্যাকুল, অজ্ঞান জনসমাজ ধনের পিছনে উন্মাদগতিতে ছুটে চলেছে স্থির পথে কাঁটা দিয়ে। এই আবিষ্কারের ফলেই প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড় আরম্ভ হয়ে গেল। জড়শক্তির উপাসনা আজ কোথায় নিয়ে চলেছে মানুষ সমাজকে, তোমার বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ-আমেরিকার সভ্য মানুষ-সমাজের সেকথা ভেবে দেখবার মত ধৈর্য্য আছে কি কারো? কে বলবে কোথায় এর শেষ?

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল সভায়, অর্থাৎ পিনড্রপ্ সাইলেন্স যাকে বলে তাই, সবাইকে অন্তর্মুখী করিয়া তুলিল বাবার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। কতক্ষণ পরে উমাপতি প্রসন্ন মুখে শুধাইলেন,—কি ভাবচো বল ত?

তখন কালীকিঙ্কর বলিল, এই কথাই তো ভাবছিলাম, যে ঐ পাশ্চাত্ত্যেরাই কী যথার্থ শক্তিমান নয়? ওদের সায়ান্স ওদের বুদ্ধি, এখনকার জগতে—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন,—তোমাদের অভ্যাসগত লক্ষ্যই হয়ে গেছে ওদের ওই মেটিরিয়্যাল সায়ান্স আর ডিসকাভারীর গৌরবের দিকটা,—ঐ দুটিতেই মুগ্ধ হয়ে আছ। তোমরা ধরে নিয়েছ যেন এ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে ঐটিই পঞ্চম পুরুষার্থ।

কালীকিঙ্কর বলিল, আচ্ছা,—পঞ্চম পুরুষার্থটি কি? শুনে এসেছি অনেকবার কিন্তু জানি না জিনিসটি কি বস্তু?

বাবা বলিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি হোল পুরুষার্থ অর্থাৎ নবজন্ম নিয়ে এই সংসারে চেষ্টা দ্বারা লভ্য আর তাইতেই মানুষের জন্ম জীবন হয় সার্থক। আর ঈশ্বরলাভ এই চারিটি পুরুষার্থের বাইরের কথা, তাই তাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বোলেছে বৈষ্ণবশাস্ত্রে।

কালী বলিল,—কি সুন্দর আমাদের শাস্ত্রের বিচাব-প্রণালী, আমরা এসব দিকে চিরকাল অন্ধকারেই রইলাম।

বাবা বলিলেন,—সময় আছে, ইচ্ছা করলে সবই জানতে পারবে, এখন যা বলছিলাম,—ভারতবাসী হিন্দু তোমরা, আজ তোমাদের ঘটে এ বুদ্ধি নেই যে জড়পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হলে মানুষের বুদ্ধিও জড়ীভূত হয়, জড়ধর্ম্মী হয়, উচ্চগতি কখনও লাভ হয় না, হতে পারে না। ভারতের আবিষ্কার যে বৈজ্ঞানিক পন্থায় চলেছিল তাতে, জড় ও চৈতন্য দুটি পৃথক সত্তা,—গুণে ও ধর্ম্মে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীত ফলপ্রসবকারী বোলেই প্রমাণিত; আর ঐ বুদ্ধিই যে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সমাজের মজ্জাগত। তোমাদের বুদ্ধি জড়বিজ্ঞানের দিকে না গিয়ে কেন চৈতন্যমুখীই হোক না, সেইটিই তো তোমাদের সত্তার অনুকূল, তাতেই তোমাদের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। পুনঃ পুনঃ এই কামনাই ত করি। ধনসম্পদ বৃদ্ধি, ভোগ, সুখ এসব হতে পারে, সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতেও পারে স্বীকার করি, কিন্তু সেইটিই সবার বড কথা কি? তাছাড়া দম্ভের পর্য্যায়ে পড়েছে ওদের ঐ সায়ান্স আর ডিস্‌কাভারী। তার ফলে মানুষসমাজ থেকে অশান্তি উঠে গেছে কি,—মানুষে মানুষে আপনবোধ জেগেছে কি? সমাজে যথার্থ শান্তিপ্রতিষ্ঠা আর বর্ব্বরতার উচ্ছেদ হয়েছে কি? আমায় বুঝিয়ে দাও না?

কালীকিঙ্কর বলিল,--তাহলে আপনি কি এই কথাই বলেন যে আমরা জগতের এই অগ্রগতির সঙ্গে সমানতালে না চলে পিছনে পড়ে থাকি?

উমাপতি,—জগতের অগ্রগতি কাকে বোলচো? ঐ পঁয়ষট্টিতলা বাড়ি, ইলেকট্রিক রেল, এরোপ্লেন, টর্‌পেডো, ইউবোট, জলস্থল অন্তরীক্ষে উদ্দাম দৌড়ের পাল্লা, এইসব? আমি বলি কি, ওসব ওরা করুক না। সায়ান্স আর ডিস্‌কাভারী বলতে রাশি রাশি জটিল কলকব্জার সৃষ্টি ত? ধাতুর ব্যবহার আর লার্জ্জস্কেলে নরহত্যা মহাযন্ত্র সৃষ্টির কাজ—তা ওরাই করুক না, তোমরা কারবার হিসাবে যেটুকু সমাজের কল্যাণের জন্য মাত্র সেইটুকু ব্যবহার করো না কেন; কমপিটিশানে গিয়ে কাজ কি? লাঠালাঠি, জাতীয় স্বার্থে নরহত্যার

ষড়যন্ত্র—ও কারবার ওদেরই থাকুক; তোমরা তোমাদের মাথা অন্যদিকে যেদিকটায় ওদের জড়বুদ্ধি যায় না, সেইদিকেই চালাও না? ভারতের নিজস্ব যে আবিষ্কার তাইতেই মাথা ঘামাও না?

কালীকিঙ্কর তবুও বলিল,—খেয়ে-পরে জীবনদ্বন্দ্বে বাঁচতে হবে ত? প্রতিযোগিতার মধ্যে না গেলে কোন বিষয়েই উন্নতি হয় না। সেই প্রতি-যোগিতার জন্য জগতের এত উন্নতি সুতরাং আমাদেরও তার মধ্যে গিয়ে পড়তেই হবে। জগৎময় রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনই করে এনেছে আলাদা থাকবার যে কোন যো নেই। ইণ্টারন্যাশনাল সিচুয়েশানই এমন,—আপনি তা ঠিক বুঝবেন না।

যোটি নেই। তিনি বলিলেন,—এইখানেই ত মাংসখেকো আর শাকসব্জী ডাল-ভাত-খেকো বুদ্ধির তফাৎ। আমি বলি কি, ওদের অনুসরণ বা অনুকরণ, সায়ান্স, কেমেষ্ট্রি নিয়ে জীবনদ্বন্দ্বে প্রতিযোগিতার প্রসার, জাতীয় উন্নতির নামে ঐসব যা কিছু নিয়ে একটা জাতির বা দেশের বৃহত্তর অংশই থাকুক না কেন, তারা ইনডাসট্রিয়ালাইজ করুক না কেন দেশকে? আমাদের সমাজে শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক নিয়ে আর একদল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী এবং জ্ঞানপিপাসু যারা, তারাই জীবচৈতন্য নিয়ে, জড়াতিরিক্ত চৈতন্যসত্তার পিছনে মাথা ঘামাক না; তাদের সকল কিছু শক্তি ধ্যানধারণা নিয়োগ করুক না কেন? সেই শ্রেষ্ঠ যথার্থ জ্ঞান ও পরা-বিদ্যার্থীর দল চলুক না অনন্ত চৈতন্যশক্তির ভাণ্ডার এক্সপ্লোর করতে? তোমরা সবাই মিলে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নামে ওদের জড়শক্তি, গতি ও যন্ত্রতান্ত্রিক জটিল উন্নতির পিছনে মার্চ্চ করবে কেন? সেটা কোনক্রমেই তোমাদের জাতিধর্ম্মের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হতে পারে না,—তাই বলি নিজের পথে চলো, তাইতেই যথার্থ কল্যাণ তোমাদেরও হবে আবার জগতেরও হবে অশেষ কল্যাণ। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি যে, ভারতের হিন্দু সংস্কৃতিকে এইজন্যই জগদম্বা, পরমাপ্রকৃতি-সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী এতটা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীইয়ে রেখে দিয়েছেন জগতের মহাদুর্দিনে সকল পীড়িত পথহারা সমাজের একমাত্র শান্তির উপায় বোলে; ভারতের এই হিন্দু মহাজাতিই জগৎ-সমাজে ঐ চরম সত্য প্রকাশ করবে—এটা তাঁরই অবশেষ বিধান। এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানই জগতের কল্যাণ আনতে পারবে। তাঁর কাজে ভুল হয় না, ভুল হয় আমাদের কাজে। জেনে রেখো জগৎ সমস্যা সমাধানের কাজ এবার হিন্দু-জাতির উপরেই পড়চে।

এ কথা শুনে কালীকিঙ্কর হাসতে হাসতে বললে,—তাহলে আমাদের সন্ন্যাস নিয়ে সব ছেড়েছুড়ে বনে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে বলুন ?

তিনি বলিলেন,—না না, কিছুই ছাড়তে হবে না তোমাদের, মডার্ণ সব কিছু—লাইট, ফ্যান, সিগার, বাথরুম, লাইব্রেরী, চেয়ার টেবিল সোফা যা কিছু দরকার তাই নিয়েই শহরের কোলাহল থেকে কেবল একটু তফাতে গিয়ে কাজ করবে। নির্জ্জনতার মূল্যই সব চেয়ে বেশী সর্ব্ববিধ চিন্তা ও ধ্যানের ব্যাপারে নয় কি? সেটা তোমাদের পাশ্চাত্ত্য সায়ান্স গুরুরাও ত স্বীকার করে থাকেন। এতে অপমান বোধ কেন হবে ?

আপনার কথায় এইটাই বুঝায় নাকি যে আমরা যেন সব কিছু শিক্ষায় ওদেরই অনুকরণ করতে চাইছি? তাই কি ঠিক ?

তিনি,—তাই ত চেয়ে আসচো,—প্রথম যেদিন থেকে তোমাদের জাতীয় শিক্ষার বদলে সরকারী ফরমূলায় স্কুল-কলেজে শিক্ষা আরম্ভ করেছ। ওরা যেভাবে যেদিকে নিয়ে যাচ্চে তোমরাও মেটেরিয়্যাল প্রস্পারিটির জন্য ঠিক ঠিক ওদের চিহ্নিত পথেই তো চলেছ আর তাতেই ইহ-জীবন সার্থক করতে বদ্ধপরিকর হয়েচ। - নয় কি ?

শুনিয়া যুবা চুপ করিয়া রহিল।

উমাপতি বাবা পুনরায় বলিলেন,—ভেবে দেখো এখন সবাই মিলে, ঐভাবে সায়ান্স আর ডিস্‌কাভারীতে ডুবে গেলে কি ফল? যে মনোবৃত্তিতে ওরা শক্তিতে সবার বড় হবার চেষ্টা,—মারাত্মক অস্ত্রবল, সৈন্যবল, জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে অপ্রতিদ্বন্দী হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে আর নিজ সমাজেও যেমন পর সমাজেও তেমনি শান্তি নষ্ট করতে বসেছে তোমাদেরও তো এইসব করতে হবে, যখন ওদের শিক্ষার ফাঁদে পা দিয়েচ? না, তোমার বেলা অন্য ফল হবে?—তাই তো বলছি তোমাদের যেটার সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক তাই নিয়ে মার্চ্চ করো তোমরা।

সভা কিন্তু ভঙ্গ হইয়া গেল এই কথার পর,—কারণ বাবা এইবার ভিতরে যাইবার অনুরোধ পাইলেন। বরদলৈ-এর ফুটফুটে পাঁচ-ছয় বৎসরের সুন্দর কন্যাটি আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—এখন চলুন ভেতরে আপনাকে দিদিমা আসতে বললেন, জলখাবার তৈরী হয়েছে যে। শুনিয়া হাসিতে হাসিতেই তিনি উঠিলেন কিন্তু কালীকিঙ্করকে বলিলেন,—আমার কাছে ভুবনেশ্বরীতে একবার যেও—কেমন যাবে তো? সে রাজী হইল। তারপর প্রণামের ধুম পড়িয়া গেল।

ওখানে পরদিন উমানন্দ দেখিলাম। তবে উমানন্দ শৈলে যেসব ব্যাপার দেখিলাম, উহা কামাক্ষ্যার মতই, কিছু বৈচিত্র্য নাই। সাধারণ যাত্রীরা যা দেখিয়া থাকেন সেই সবই দেখিলাম। উপরন্তু নৈসর্গিক দৃশ্যই আমায় সম্মোহিত করিয়াছিল। উমানন্দের বৈশিষ্ট্য জঙ্গলময় ঐ দ্বীপটি, মনে হয় ঐ জঙ্গলমধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা দিনমানের তীর্থযাত্রীরা দেখিতে পান না। গৌহাটির উপর হইতে উমানন্দ দেখিতে আমার চক্ষে অধিক রহস্যময় ছিল। যতটি সময় বরদলৈ উকীলের বাড়িতে ছিলাম, কোন সময়েই উমাপতি বাবার বিশ্রাম ছিল না, তবে আমি ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিয়াছিলাম অনেক কিছুই।

যাহা হউক আমরা তৃতীয় দিনে সন্ধ্যায় আবার কামাখ্যায় ভুবনেশ্বরীতে ফিরিলাম। উমাপতি বাবা তাঁহার আশ্রমে গেলেন, আমি নাটমন্দিরের চালায় আমার আসনেই ফিরিয়া গেলাম। কথা রহিল পরদিন প্রাতে বাবার আশ্রমে যাইব।

বিহারীনাথজীব সঙ্গে দেখা হইতেই এই তিন দিনের গৌহাটি বাসের সকল কিছু খবরই দাবী করিলেন। সব কিছুই বলিতে হইল , বিশেষতঃ খাওয়া-দাওয়ার কথাটা,—তাঁহার ভাষায় যাহাকে 'ভিচ্ছা' বলে তাহা কেমন হইয়াছিল ; দুইবেলা না একবেলা, এই খবরটাই তাঁব পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ছিল। কাজেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বেশী করিয়া বলিতে হইল। উমানন্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার সূচনাতেই, ওসব হাম জানতা হায় বলিয়া উড়াইয়া দিল।

কম্বলে শয়ন করিয়া ভাবিতেছিলাম, যে সংসারটি সম্প্রতি দেখিয় আসিয়াছিলাম,—জীবনে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াই রহিল। এমন গৃহস্থ ক'টা হয়। সুন্দর শ্রী ঐ সংসারে ; সব কিছুই যেন মাধুর্য্যে উপচিয়া পড়িতেছে , কি অপূর্ব্ব শান্তিময় এ সংসারটি। এই কথাই একজন সংসার-ত্যাগীর মনে আঘাত করে। বিশেষতঃ বাবার আগমনে প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া যেন সর্ব্বার্থসিদ্ধি পাইয়াছিল। কলিকাতায় আমাদের বাড়িতে যে গুরুভক্তি দেখিয়াছি তাহার পর এই দৃশ্য, অন্তরক্ষেত্রে যে একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিবে তাহাতে বিচিত্র কি ? কলিকাতার দরিদ্র সংসারের সাধারণ গৃহস্থ যেভাবে গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে দেখিয়া, এখনকার দিনে ধর্ম্ম-সংস্কার বিশেষতঃ আমাদের মত যারা বিকৃত-ভাবাপন্ন সংসারী তাহাদের পক্ষে এ প্রথা উঠিয়া যাওয়াই ভাল মনে হইল।

২০

পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়াই উমাপতি বাবার আশ্রমে ছুটিলাম। একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম। দাওয়ায় ছিলেন এলোকেশী মাতা। শুনিলাম জোরে জোরে একজনকে কি যেন একটা কাজের দোষ দেখাইয়া শাসন করিতেছেন মনে মনে স্মরণ ও মুখে নারায়ণ বলিয়া আমি তো গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আমাকে দেখিবামাত্রই যেন ভৈরবীর মুখে একটু বিরক্তিভাব প্রকাশিত হইল। তবে তৎক্ষণাৎ উহা সামলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—গৌহাটিতে কি কাজ কোরলেন? মেজাজ খোশ নয় প্রশ্ন শুনিয়াই বুঝিলাম। তারপর আমি অবশ্য বলিলাম যে,—কোন কাজ করতে তো যাই নি, বাবার সঙ্গেই গিয়েছিলাম দেখতে ও শুনতে।

যাহাকে ধমক দেওয়া হইতেছিল তাহার নাম গিরিধারী। সে ব্যক্তি মহাবলবান, আধাবয়সী, নিতান্তই ভালমানুষ গোবেচারা যাহাকে বলে তাহা। আশ্রমের ভৃত্য, সুতরাং লাল কাপড় পরিত। যেন সে একজন ভৈরব। এখানকার কর্ম্ম তাহার আশ্রমের কাঠ কাটা জল আনা ইত্যাদি। এখন তাহার দিকে ফিরিয়া,—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখিস কি! চলে যা তুই এখান থেকে। শুনিয়া ধীরে ধীরে সে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, যেতে কইলে তো যাই, না কইলে আগাম যাব কেমন করিয়া। তাহার কথাগুলি মনোমত হইল না তো বটেই—মেজাজটাও একটু গরম হইল। সেক্ষেত্রে আমার উপরেই তার ঝাঁজটা পড়া স্বাভাবিক। হইলেও তাই। একেবারেই আমার উপর প্রশ্ন হইল,— অকর্ম্মা যতো সব, দেশ-গাঁয়ের মুখ্য মরদদের নিয়ে কি করা যায় বলুন তো? জানেন তো গাঁয়ের কুঁড়ে হয় যে, বৈরাগী হয়ে বেড়ায় সে—আপনাকেই বলচি, এ দেশ সে দেশ ঘুরে ঘুরে করছেনই বা কি? তারপর সুরটা একটু নরম করিয়া—আপনাকে মুখ্যু বলচি মনে করে চটে যাবেন না, হয়ত আপনি মুখ্যু নন, কিন্তু—

বাধা দিয়া আমি বলিলাম,—যে অর্থে অকর্ম্মা মূর্খের দলে আমাকে টেনেছেন তা সত্য-সত্যই, সেটা আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়নি, কারণ মনে মনে তো জানি যথার্থ দেশের কোন কাজেই আমি আসিনি, অন্ততঃ এখনও পর্য্যন্ত তো নয়ই। কিন্তু কি করি বলুন তো, আমার মন কিছুতেই ঘরে অথবা কোন একটা জায়গায় কিছুতেই দীর্ঘকাল বসে না যে।

অকপট এই সত্য কথাটার প্রভাবে এলোকেশী তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন,

প্রসন্ন বদনে বলিলেন,—আমি গো আর আপনার উপদেষ্টা হতে পারি না,—কি করবেন তা আপনিই জানেন। তবে আপনি যেভাবে ভবঘুরের মত চলেছেন, আমার মনে হয়, আপনার মত লোকের বিবাহিত হয়ে গৃহস্থ জীবনের ভিতর দিয়ে কোন কাজে লেগে যাওয়াই ভাল। দেশের কাজ বলতে মহৎ,—যাকে বড় কাজ বলে সে তো কিছু হবে না আপনাদের মত মানুষের দ্বারা। তারপর একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন, -তা আপনি তো ছবি আঁকেন, বেশ তো শিখেছিলেন একটা কাজ। তাইতেই তো রোজগার করতে পারতেন, ছেলেপুলেদের খাওয়াতেন আর সুখে-দুঃখে ঘরকন্না কোরতেন। ব্যাস্ মানুষজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যেতো. নয় কি!

আমি বলিব বলিয়া মুখ খুলিয়াছি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া এলোকেশী বলিলেন,—থাক্ আর দরকার নেই। আমার কথাটা অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে, আপনি আঘাত পেয়েছেন, বাবা আমায় বারণ করেছিলেন,—

কি বারণ করেছিলেন? জিজ্ঞাসা করিলাম।

এলোকেশী বলিলেন,—আমার স্বভাবই ঐ রকম। কাকেও আঘাত না করে কথা কইতে পারি না, বিশেষতঃ এ দেশের মরদের উপর আমার একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে। উদ্দেশ্যহীন বাঙ্গালী ছেলেদের দেখলেই আমার গা জ্বলে যায়। বাবা তা ভালই জানেন, তাই আমায় সংযত হয়ে কথা কইতে বলে দিয়েছিলেন।—সবাই ঘৃণার পাত্র নয়, বিশেষতঃ সৎ ভাবের লোক, সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা কাজ করে যায় অথবা এখানে আসে,—তাদের উপর কখনও যেন শ্লেষ-ব্যঙ্গ না করি। আপনার আনাগোনা আরম্ভ হবার পরেই যখন ঘনিষ্ঠভাবে যাতায়াত আরম্ভ করলেন, বাবার স্নেহ পড়লো আপনার উপর, তখনই একদিন তিনি বিশেষ সংযত হোতে বলে দিয়েছিলেন। এটাও জেনে রাখুন, এবার আমায় গৌহাটিতে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না এই কারণেই। সেখানে পাঁচজন আসবেন যদি কিছু অসঙ্গত কথা বোলে ফেলি বা কাকেও আঘাত করি বাক্যবাণে—যেমন এখনি করলাম আপনাকে!

আমি বলিলাম,—আঘাত হয়তো একটু লেগেছে, আমার নিজের দোষের কথা একজনের মুখে স্পষ্ট খোলাখুলিভাবে শুনলে সাধারণতঃ আত্মাভিমানে ঘা একটু সবারই তো লাগে,- সেই হিসাবেই আঘাত, নাহলে মিথ্যা তো আপনি একটুও বলেননি, তাতে আপনার উপর শ্রদ্ধা তিলমাত্র ম্লান হয়নি।

আমার উপর আবার কারো শ্রদ্ধা তিলমাত্র আছে নাকি? চণ্ডাল কন্যা, নীচ

জাতি যে—

আমি বলিলাম,—এ আক্ষেপ আপনার কেন হবে? আর জাতি মানলেও আমি আপনাকে যখন শ্রদ্ধা করি বলেছি, তখন আমায় ওসব কথা কেন বলেন? আমি তো আপনাকে চণ্ডাল বোলে হেয়ভাবে বা হীনচক্ষে দেখিনি,—তা তো আপনি ভালই জানেন।

শুনিয়া এলোকেশী বলিলেন,—বাবার মুখেই শুনেছি জ্ঞানমার্গের লোক, খোলাখুলি কথাই তো আপনি চান—তাইই ভালোবাসেন আর সেই উদ্দেশ্যেই এসেছেন; তা যদি একটু খোলাখুলি কথা কই, কিছু মনে কোরবেন না তো?

কথাটা শুনিয়া আমার মধ্যে একটু অজ্ঞাত ভয়ের উদ্রেক করিল। আবার একটা আঘাত কোন্ দিক হইতে আসে,—সঙ্কোচ বলিয়া কোন ভাবের বালাই এ নারীর মধ্যে তো নাই, তাহা আগেই জানিতাম এখন আরও ভালই জানিলাম—অথচ দেখিলাম এক্ষেত্রে চেষ্টা করিয়া কথাটা আর অন্য দিকে ফেরানোও চলে না। কাজেই বলিলাম,—বলুন—

আপনি শ্রদ্ধা করেন বললেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি- শ্রদ্ধাটা কিসের? আমার দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই তো?

এ যে একেবারেই বজ্র! শুনিয়া আমি অবাক, স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার মনে আসিল, এ কথাটা বলি যে আপনি বোধ হয় জানেন না আমি বিবাহিত, ঘরে আমার যিনি আছেন রূপ-যৌবনে তিনি আপনার তুলনায় কিছু কম নন, তাঁর প্রতি প্রীতি এবং ভালবাসাও কম নেই। আর আমি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েও ঘুরচি না—আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে মনুষ্যত্বের পথ খোলাই আছে, ইত্যাদি। কিন্তু উহা বলিলাম না। চুপ করিয়াই রহিলাম।

বলিতে যাওয়া অথচ না বলাটা লক্ষ্য করিয়া এলোকেশী বলিল,- এক্ষেত্রে এটা সহজ, স্বাভাবিক—তাই না আপনাকে জিজ্ঞাসা কোরছি। আপনার বয়স তো বেশী নয়, আপনার পক্ষে ত্রুটি হওয়া ভয়ানক অন্যায়, অথবা এটা অস্বাভাবিকও নয়, অঘটনও নয়, অথবা বিচিত্রও নয়– এটা তো স্বীকার করেন? ইহারও কোন প্রতিবাদ করিলাম না দেখিয়া এলোকেশী আবার বলিল,—পঁয়তাল্লিশ, আটচল্লিশ, বাহান্ন, পঞ্চান্ন বছরের মান্যগণ্য ধার্ম্মিক প্রৌঢ় গৃহী লোকের আমার শরীরের উপর যদি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা থাকে অথচ এদিকে যদি তিনি আবার আমায় মা বোলে সম্বোধনও করেন,—তাকে কি বলবেন?

আমি বলিলাম,—আমার ধারণা, ইন্দ্রিয়েরই রাজ্যে মানুষে আর পশুতে

একটা মাত্র ব্যবধান আছে—সেটা সংযম।

শুনিয়া এলোকেশী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—এত বড় একটা জাতির সর্ব্ব স্তরে সেটা আমরা আশা করতেই পারি না।

আমি বলিলাম,—ভৈরবী নারীকে মা বলে ডাকা, আবার অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহারে তার সঙ্গে রমণী সম্বন্ধ, এ অদ্ভুত ব্যবহার তো আপনাদের তন্ত্রধর্ম্মের মধ্যেই প্রচলিত নীতি, আমিও সেটা অনেক-ক্ষেত্রে দেখেছি যে।

শুনিয়া এলোকেশী বলিল, - তাহলে আপনার জেনে রাখা ভাল আমার সঙ্গে সে ক্ষেত্রের কোন সম্বন্ধই নেই।

বলিলাম,—তা জানি আর সেইজন্যই আপনার সঙ্গে এ কথা কইতে সাহস করেছি। দেখুন বাইরের প্রভাব আমরা এড়াতে পারি না, আপনার গুণের সঙ্গে রূপকে আলাদা ভাবতে পারি না,- আপনার গুণের সঙ্গে রূপকে আলাদা করে দেখাও স্বাভাবিক নয়—কারণ তারও একটা প্রভাব আছে তো? গুণগ্রাহী কোন মানুষের দৃষ্টিতে একজনের রূপ তার গুণকে উজ্জ্বল করে দেখায়—একজনের মনে আবার এমনও দেখেছি গুণবান ব্যক্তির গুণের প্রভাবে তার কুশ্রীটাও অনেক সময় সুশ্রীতে দাঁড়ায়। আসলে আমাদের দেখাশুনা, ব্যবহার সব কাজেই অনেকখানি মনের পক্ষপাত অথবা কল্পনা থাকেই—মানুষসাধারণের প্রকৃতিই এমন, এ তো আপনিও স্বীকার করেন?

হ্যাঁ, স্বীকার করি। আচ্ছা বলুন তো এবার, আপনি আমার কাছে কি জানতে চান?

আমি বলিলাম,—সত্য যেটা জানতে চাই তার আগে আজ এখনই আবার প্রশ্ন উঠছে একটা, সেইটিই প্রথমে জিজ্ঞাসা করছি,—বলুন তো আপনি আমাদের দেশের পুরুষদের এত ঘৃণা করেন কেন?

প্রথমে এতটা ছিল না, আমাদের গ্রামে মুসলমানেরা হিন্দুর ঘরের মেয়েদের জোর করেই ধরে নিয়ে যেভাবে অত্যাচার করে তা আপনাদের কলকাতার বাবু-ভায়াদের জানা নেই। কলকাতার বাবুরা কেউ, বিশেষতঃ ওখানকার সমাজপতি যাঁরা গ্রামের ঐসব অত্যাচারের কথা খবরের কাগজে পড়েন,—অনেকেই পড়েন না আমি জানি, ওসব তাঁরা জানতেও চান না। কাজেই আপনাদের কোন ধারণাই নেই যে আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে ওরা দলে বেশী,—হিন্দু সমাজের মেয়েদের উপর তাদের সমাজের কী অদ্ভুত অত্যাচার। এ পর্য্যন্ত হিন্দুরা তার কোন প্রতিকার করতে সমবেতভাবে

চেষ্টাও করেনি। আরও আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে যায় যখন কাপুরুষেরা এ নিয়ে আদালতে নালিশ-মোকদ্দমা করে। তার কোনটা বা ফেঁসে যায়, কোনটায় বা আসামী দু'একমাস জেল খাটে,—তারপর ফিরে এসে আবার তাদের ধর্ম্মে-কর্ম্মে মন দেয়। আর যে পোড়াকপালীকে একবার ঘর থেকে নিয়ে গেল তার আর ঘরে স্থান হবে না,—তাকে হয় মুসলমানদের ঘরে যেতে হবে, না হয় বেশ্যাবৃত্তি। ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের এ বিধান পারেন বরদাস্ত করতে? পৃথিবীর কোন্ সভ্য দেশে এ বিধান আছে বলতে পারেন?

আমি কিছুই বলিলাম না। জানিতাম এ সকল মর্ম্মস্থল-বিক্ষুব্ধ অনুভূতির খরস্রোত প্রবল ধারায় বাহির হইতেছে। আমায় নিরুত্তর দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন,—আমি পুলিস বা সরকারী আদালতের রক্ষাকবচ প্রতিকার চাই না, বুঝতেই পাচ্চেন। সত্যিই ঘৃণা করি আমি দেশের পুরুষদের। অতি বড় কাপুরুষ না হলে পরের মুখ চেয়ে থাকতে প্রবৃত্তি হবে কেন? আচ্ছা বলতে পারেন, এরা বিয়ে করে কেন? কোন্ লজ্জায় স্ত্রী গ্রহণ করে যাকে রক্ষা কর্ত্তে পারবে না? আমি নিরুত্তর। তিনি বলিয়া চলিলেন,—নারীকে অপমান থেকে বাঁচাতে গিয়ে মরে না কেন ওরা!

দেখিলাম ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন। আমি শান্ত ভাবেই বলিলাম,—আমি যখন এরকম দু'টি সমাজের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে কোন বিষয়ের মূল অনুসন্ধান করি,—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কথা বুঝেছি,—সভ্য জাতির সংস্কৃতির গরিমা আছে একটু কিনা আপনাদের মধ্যে, তাই এতটা উদার মনোভাব পোষণ করতে পেরেচেন। পশুসমাজ আর মানুষসমাজ যেখানে একসঙ্গে বাস করতে হয় সেখানে ও-রকম মনোভাব কখনও কাজের হতে পারে না।

আমি বলিলাম,—সেটাই তো আমি বুঝতে চাইছি আপনার কাছে, আপনিই তো ভাল জানেন এবং বলতেও পারবেন এটার প্রতিবিধানের কথা।

উত্তেজনা তাঁর কমিল না, বরং এক ডিগ্রী চড়িয়াই উঠিল, বলিলেন,—পশুদের রোগে মানুষ-রোগের ওষুধ দিলে চলে না, তাদের ওষুধ তাদের ধাতে গ্রাহ্য হওয়ার মত হওয়া চাই।

আপনার সেই প্রেসক্রিপসানটাই শুনবো বলে ধৈর্য্য ধরে আছি যে,—

টুথ ফর এ টুথ, নেল ফর এ নেল, বাইবেলের কথা জানেন না! এলোকেশী মিশনারীদের স্কুলে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন।

আমি বলিলাম,—বাইবেলেরই তত্ত্বদর্শী শ্রেণীর যাঁরা, তাঁরাই বা কী বলেন তাও তো জানেন। ওতে রোগের বিষ বা আগুন নেভাতে পারে না, জ্বালিয়ে রাখতেই সাহায্য করে, ফলে সমাজ অধঃস্তরে নেমে যায়। এটা নিশ্চয় আপনি কখনই প্রার্থনা করেন না ?

কথা আমার শেষ হইবামাত্র ভৈরবী মুখ ফিরাইয়া বিপরীত দিকে দেখিলেন, অশ্রদ্ধার ভাব ছাড়া আর কোন অর্থ হয় না ঐ ভাবের। তৎক্ষণাৎ কি ভাবিয়া আবার আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া তিরস্কারের ভাবেই বলিলেন,—করি করি—নিশ্চয়ই করি। জেনে রাখুন আপনি,—অন্ততঃ একবার আমি চাই এদেশের হিন্দুসমাজ অতটাই অধঃস্তরে নেমে আসুক। চাই না অত উচ্চ আদর্শের বড়াই ঐ সব নরপশুদের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায়। দেশের মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দেখিয়ে দিক ও-রোগের ওষুধ তাদের হাতেই আছে আর তা প্রয়োগ করতেও জানে তারা। কিন্তু আমি এটাও জানি তা ঘটতে দেবেন না আপনারা, মাত্র দুটি কারণে,—আপনারাই তাতে বাদ সেধে আছেন বরাবর।

আমি অবাক হইয়াই বলিলাম,—আমরাই বাদ সাধবো, মাত্র যে দুটি কারণে—তা জানতে আগ্রহ প্রকাশ না করে পারছি না।

এলোকেশী বলিলেন,—স্বীকার করতে পারবেন, যদি বলি ধর্ম্মের নামে প্রবল হিংসাপরায়ণতা, নারীধর্ষণ, হিন্দুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন, পৈশাচিক বর্ব্বরতার কাছে হিন্দুসমাজের পরাজয়, আর সেই গ্লানিই হিন্দুপ্রাণে একটা বিজাতীয় ঘৃণা সৃষ্টি কোরে ওদের অস্পৃশ্য থেকে অস্পৃশ্য কোরে রেখেছে হিন্দুসমাজে,—বলুন না ওদের উপর হিন্দুদের যে ঘৃণা তার তুলনা আছে ? আমি নিরুত্তর।

প্রমাণ চান ? আবার তিনি আপনিই বলিতে লাগিলেন,—সহজ প্রমাণ দিচ্ছি, ঘর জ্বালানো, ধন লুণ্ঠন, হিন্দুনারী ধর্ষণ তো ওদের ধর্ম্মের নাম ক'রে—একথা তো জানেন! আচ্ছা হিন্দুর তরফ থেকে মুসলমান হত্যা, মুসলমানের ঘরে অগ্নি-সংযোগ, লুণ্ঠন এসব হয়তো অনেক শুনেছেন—কিন্তু কোন হিন্দু ভদ্র-সমাজের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, নিম্নস্তরের হিন্দু কেউ কখনো কোনও মুসলমানের মেয়ে ধরে পশুবৃত্তির চরিতার্থতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন কি ? এত ঘৃণা যে, ওদের নারী পর্য্যন্ত নিম্নতম হিন্দুর কাছেও অস্পৃশ্য হয়ে আছে। বোধ হয় এক সমাজের সর্ব্ব উচ্চ স্তর থেকে সর্ব্ব নিম্ন স্তরে ভস্মা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর আর এক সমাজের উপর এতটা প্রবল ঘৃণার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। অবশ্য এর মধ্যে যাঁরা ভারতের বাইরে

স্বাধীন দেশ,—ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের কথা আলাদা। জাতির গোঁড়ামি হয়তো তাঁদের নেই।

আমি বলিলাম,—তাহলে আমাদের পাড়ার দুলাল মিঞা, যুধিষ্ঠির মিঞা—তাদের ছেলে কার্ত্তিক, মানিক এইসব ছোট ছোট মিঞারাও আমাদের ঘরের ছেলেপুলের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কোচ্ছে দেখতে পাই—

তারা যেভাবেই হোক মুসলমান হয়ে পরে হিন্দুসমাজের মোহ কাটিয়েছে, কিন্তু নামের মোহ কাটাতে পারেনি এইটিই বুঝতে হবে। ওকথা যাক্, এখন বলুন তো দেখি, এতটা ঘৃণা অস্পৃশ্যতার ফলে হিন্দুর কী লাভ হয়েচে? লাভটা এতদিনের একত্র বাসের পরও এই—অস্বাভাবিক জাতিবিদ্বেষের ভিত্তিতে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, দু'পক্ষের ভেদবুদ্ধিই দৃঢ় করে তৃতীয় পক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে রাজনীতির ক্ষেত্রে,—নয় কি?

উত্তরে আমার কিছু বলবার ছিল না, শুধু বলিলাম,—প্রথম কারণটি তো শুনলাম, এখন দ্বিতীয় কারণটি বলুন তো?

এবার এলোকেশী ভৈরবী আসন পরিবর্ত্তন করিলেন, গরুড়াসনে বসিয়া বাঁ হাতখানির উপর শরীরের ভার রাখিয়া, একাসনে অনেকক্ষণ পর ক্লান্ত হইয়া যেমনভাবে মেয়েরা বসে সেইভাবে বসিয়া বলিলেন,—আপনাদের হিন্দুসমাজ উচ্চ সভ্যতার জাতীয় পবিত্রতায় প্রবল বিশ্বাসী, আত্মধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকতার গরিমা এবং সেই হেতু একটা জাতিগত পবিত্রতার দম্ভ তার এত বেশি যে,—জগতের চক্ষে সেটা হৃদয়হীনতার পরিচয় হলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। হিন্দুসমাজের কোন মুসলমান কর্ত্তৃক ধর্ষিতা মেয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী, মনে মনে যতই নির্ম্মল হোক না কেন, সমাজে তার আর স্থান নেই। তার স্বামী ইচ্ছা করলেও তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারে না। একটি প্রাচীন জাতির এভাবের সামাজিক এবং পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার গরিমা,—বিশ্ব-জগতের সকল সমাজের পক্ষে অর্থহীন, দুর্ব্বিষহ হলেও হিন্দুসমাজে এ এখনও অবাধে চলছে। এতটা অন্তঃসারশূন্য দাম্ভিক সমাজ কোথাও দেখেছেন?

আমি বলিলাম,—দম্ভ!

এলোকেশী দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দম্ভই তো। বাইরের ভাবটা যেন পবিত্রতা রক্ষা, কিন্তু মূলে প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতির দম্ভ নয় তো কি? আসলে ওটা শক্তিহীনতার নিষ্ফল আক্রোশ মাত্র,—প্রাচীন জাতীয় গরিমার স্মৃতিমাত্র সার। অপর পক্ষের পশুদল প্রতিরোধে যা চরম দুর্ব্বলতার

নামান্তর, নৈতিক অধঃপতনের গ্লানি ছাড়া আর কিছুই নয়,—তার ভাব ও ভাষা এই যে, আনাদের হিন্দুসমাজ এতটাই উঁচু আর মুসলমানেরা এতটাই পাপী, এতটাই হীন এবং আমাদের কাছে এতটাই ঘৃণ্য যে আমাদের ধর্ষিতা মেয়ে নির্দ্দোষ, নিরপরাধিনী হলেও তাকে উদ্ধার এবং গ্রহণ করাও দরকার মনে করি না, সমাজে স্থান দিই না,—এমন কি কেউ তাকে উদ্ধার ক'রে যদি স্থান দেয়, তাকে পর্য্যন্ত আমাদের সমাজ থেকে বার করে পবিত্রতা রক্ষা করি। তাতে যদি তারা মুসলমান হয়ে যায় যাক্, হাজারে হাজারে তা আগে হয়ে গেছে আর এখনও হচ্ছে। তাতে পবিত্র হিন্দুসমাজ গ্রাহ্য করে না। প্রতিবিধানের কথা উপেক্ষণীয় অর্থাৎ ভবিষ্যতে ঐ ভাবের ঘটনা এ সমাজের নারীদের উপর যাতে আর না হয়—সে সম্বন্ধে আলোচনা করতেও ঘৃণা বোধ করি; ওসব কাজ দেশের শান্তিরক্ষকদের, তারা তাদের কর্ত্তব্য করুক না করুক, উচ্ছন্নয় যাক—আমরা কি জানি? এই তো ব্রাহ্মণসমাজের মনোভাব! এখন বলুন, এ মূঢ়তা জগতের কোনো মানুষসমাজ বরদাস্ত করতে পারে? নিরপরাধী মানুষের চেয়ে সামাজিক ধর্ম্ম বড়?

আমি আর কি বলিব, একথা তো আমার নিজেরই মনের কথা, তবুও একটু বলিলাম, আচ্ছা দাঁতের বদলে দাঁত ভাঙার কথাটা ছেড়ে দিন,—

এলোকেশী ও কথা আমায় বলিতেই দিবেন না, বাধা দিয়া বলিলেন,—না না, ওটা ছাড়া হবে না, ঐটাই ওষুধ,—ঘৃণায় অস্পৃশ্য বোধে দূরে রাখার চেয়ে ঢের ভাল।

এবার আমি জোর করিয়াই বলিলাম,—শুনুন আমার কথাটা একজনের দাঁতের বদলে শুধু অপরের দাঁত ভাঙলেই তো হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ঐ দাঁত ভাঙাভাঙির কাজটা যে হেয় অধঃপতনের পথ, কোন সমাজের পক্ষেই ওটা প্রশ্রয় দেবার মত নয়—এই বুদ্ধি জাগাবার ব্যবস্থাও তো করতে হবে। তা না হলে কি উপকারটা হবে সমাজের? চিরকাল ঐ দাত ভাঙাভাঙিই পাশাপাশি দুই সমাজে প্রতিবেশীদের মধ্যে চলবে—এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না? আবার এই কথাটাই বলিলাম।

আমায় কি মনে করেন, কিছুই বুঝি না আমি!

আপনি বোঝেন না তা নয়, নারীজাতির অপমান আর নিজ সমাজের পুরুষদের অক্ষমতার কথা ভেবেই খানিকটা পাগল, ক্ষিপ্ত করে তুলেছে আপনাকে,—তাই তো ঐ প্রতিশোধের কথাটা অত ক'রে বলচেন। কিন্তু এটাও

তো ঠিক, দেশের সমস্ত মুসলমানই তো এর জন্য দায়ী নয়। এ কাজ করে একদল লোক— তারা নিম্নস্তরের—

আবার রুষ্ট হইয়া এলোকেশী বলিলেন,—ও সব পুরনো ছেঁদো কথা রেখে দিন, শুনলে আমার গা জ্বলে যায়। ওদের সমাজের সমর্থন নেই, প্রশ্রয় নেই তো এ কাজ চলেছে কেমন করে? বন্ধ হয়েছে কী এতদিনে? ও সমাজের মোল্লারা কি দস্তুরমত শিক্ষা দেয় না ওদের—যে রকমেই হোক হিন্দুদের সর্ব্বনাশ করতে পারলেই ওদের ধর্ম্মে খুব উঁচু স্থান, স্বর্গে যাবে ওরা? যেমন হিন্দু গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজের জাতিগত পবিত্রতার দম্ভ,—তাদের সমাজের সমর্থন না থাকলে কি একজন স্ত্রী ত্যাগ করে? মুসলমান ধরেচে ছুঁয়েছে—তাতেই তার জাত গেছে চলে? আপনাদের মূঢ় ব্রাহ্মণসমাজ কি শেখায়নি, কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলমানে ধরলেই তার জাত যায় আর সে হিন্দুসমাজে থাকতে পারবে না? এ সমাজ এতই পবিত্র!

আমি বলিলাম,—ওদের সমাজের মধ্যে হিন্দুদের উপর শ্রদ্ধা, প্রীতি রাখে, কখনই বিরোধ করে না এমন দৃষ্টান্তও তো দেখা যায়—আমি তাই তো বলতে চাইছিলাম—

এলোকেশী একটু ব্যঙ্গ ভাবেই আমার সুর অনুকরণ করিয়া বলিলেন,— হিন্দুদের মধ্যেও তো সাম্যবাদী আধুনিক শিক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা মুসলমানদের ওপর তিলমাত্র ঘৃণার ভাব পোষণ করে না, কিন্তু তাতে ক'রে হিন্দুঘরের মেয়ে ধরারও কোন ব্যতিক্রম হয়নি এতাবৎকাল। আর ধর্ষিতা মেয়েরাও তাদের স্বামীঘরে অথবা সমাজে স্থানও পায়নি তো!

মনেপ্রাণে আমিও সেই কথাই জানিতাম। আমি নিরুত্তর। কিন্তু তিনি পুনরায় বলিলেন,—এখন কি বুঝলেন?

আমি চিন্তিত হইলাম, সত্যিই কিছু যে বুঝি নাই তাই বলিলাম,—আমি আপনার উপরের মতলবটুকু হয়তো ধরতে পেরেছি, কিন্তু তল পাইনি আপনার আসল উদ্দেশ্যের। একদিকে টুথ ফর টুথ, নেল ফর নেল বলছেন,— অপর দিকে হিন্দুসমাজের বিজাতীয় ঘৃণা, জাতীয় সংস্কৃতির দম্ভঘটিত উপেক্ষার ফলেই যেন এটা চলচে তাও বোলচেন, তাতে কি বুঝবো বলুন?

এই বুঝবেন যে আমি এক পক্ষে ব্রাহ্মণসমাজের বিজাতীয় ঐ ঘৃণা, অপর পক্ষে ওদের দলপতি ও মোল্লা প্রচারিত ঐ বিদ্বেষ—এই দুই বিষে বিষক্ষয় করে ওদের সমাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছি প্রাণ, মান, ধর্ম্মভয় ত্যাগ

করে, বুঝেচেন এবার? খানিকটা সবল সামাজিক দায়িত্ব ঘাড়ে নিতেই হবে, - দেশের যুবারাই তা পারবে, তবেই এ কলঙ্ক থেকে জাতির মুক্তি।

বলিলাম,—আরও একটু সোজা করে যদি বলেন,—

উত্তেজিত এলোকেশী বলিলেন,—আপনি হয় একটা মহা ভণ্ড, না হয় আকাট মুখ্যু দেখছি। আরও সোজা করে বলতে হবে? তাহলে শুনুন, তোমার পবিত্র সংস্কৃতির দেমাকে একজনকে ঘৃণাভরে অস্পৃশ্য করে দূরে সরিয়ে রাখবে আর সে জীবিত মানুষ হয়ে সেই অবজ্ঞা মেনে নেবে,—প্রকৃতির রাজ্যে তা সম্ভব নয়। যাকে তুমি ছুঁতে চাইবে না সে তোমার গায়ে পড়তে—গা ঘেঁষে চলতে চাইবে, এংটাই প্রকৃতির নিয়ম। ভেদটা মানুষের সৃষ্টি—মিলনটাই প্রকৃতির অনিবার্য্য বিধি।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—এ যুগে পাশাপাশি একটা ঘৃণা আর বিদ্বেষ রেখে, এক দেশেগাঁয়ে ঘর করা চলে না। জাতিগত পিওরিটি থাকবে মাত্র নিজ নিজ সমাজের মধ্যে, কালচারেব ক্ষেত্র হবে প্রীতির ভিত্তিতে, এক সমাজের সংস্কৃতি আব এক সমাজ গ্রহণ করবে যদি তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য, কল্যাণকর কিছু থাকে। শেষে সব কিছু জগৎময় ছড়িয়ে পড়বে, এইটিই জগদম্বার মূল নীতি বা সৃষ্টিরক্ষাপদ্ধতি।

তাহলে আসল কথাটা দাঁড়ালো কি!—সরলভাবেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি করতলে দুটি আঙ্গুলের আঘাত করিয়া বলিলেন,- এক পক্ষে তীব্র ঘৃণা পোষণের পরিণাম আত্মসংকোচ, তস্য ফল শক্তিহীনতা, অতঃপর ভয়াবহ অবসাদ —শেষে অস্তিত্বলোপ; অপর পক্ষে ঘোরতব বিদ্বেষ পোষণের পরিণাম হিংসাপ্রবৃত্তি, অতঃপর বুদ্ধিনাশ—যার শেষ পরিণতি অনিবার্য্য ধ্বংস। সুতরাং এই দুই ব্যাধি-বিষ যত সত্বর মানুষসমাজ থেকে লোপ পায়, সমাজের মানুষেরা বুদ্ধিপূর্ব্বক নিজেরাই তার ব্যবস্থা করবেন। আর আপনার বুঝে কাজ নেই;—মাথা খারাপ করে পাগল করবার যোগাড় করেছেন—

কিন্তু একটা কথা এখনও পরিষ্কার হয়নি, ঐ যে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া বললেন ওদের সমাজে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা মন্দের ভাল—ঘৃণা পোষণের চেয়ে অনেক ভাল, তাতে দুই সমাজই সামনা-সামনি দাঁড়াবে,– লেগে যাবে প্রত্যক্ষভাবে, তাইতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে পারবে। না হলে একজন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকবে আর অপরজন হিংসা, বিদ্বেষের বশে চূড়ান্ত ধর্ম্মসাধন করচি ভেবে পিছন থেকে

এসে আঘাত হানবে,—এটা আর এখনকার দিনে চলতে দেওয়া যায় না।

২১

দিগুঠাকুর আজ সকালে আসিয়া আর এক সাধুর পরিচয় দিল। তিনি নীচের দিকে থাকেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—তিনি কি তান্ত্রিক? দিগুঠাকুর বলিলেন, তা জানি না, তবে তাঁর কাপড় লাল নয়, সাদা। গলায় রুদ্রাক্ষ, তুলসী আর স্ফটিকের মালা। আরও আশ্চর্য্য করিল আমাকে এই বলিয়া যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চান, আগেই বিপিন পাণ্ডার কাছে নাকি আমার কথা শুনিয়াছেন। সে বলিল,—অনেক তীর্থ ঘুরেছেন, কামাখ্যায় ছয় মাস আর বৃন্দাবনে ছয় মাস এইভাবেই বহুকাল আছেন। তাঁর এখানকার স্থানটি ঠিক জানিয়া লইলাম। নীচের দিকে ব্রহ্মপুত্র দিয়া উঠিবার পথেই একটি কুটিরে একাই থাকেন, শিষ্যসেবক খুবই কম, নাই বলিলেই হয়। সাধক শ্রেণীর লোক, বেশ শৌখিনও বটে,—বোধ হয় সিদ্ধি এখনও হয়নি। দিগুঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি ক'রে জানলেন এখনও তিনি সিদ্ধিলাভ করেননি? তাই শুনিয়া সে বলিল,—এ আমার আন্দাজ, ভুল হতে পারে,—তিনি কাকেও আমল দেন না কিনা, তাই তো ভালো বুঝা যায় না। গেলে আপনি তাঁকে দেখে-শুনে হয়তো বুঝতে পারবেন।

ঐ সাধুর কথা কল্পনা-জল্পনায় সারাদিনটা বেশ কৌতূহলের মধ্যে কাটাইয়া, শেষে বৈকালের দিকে চলিলাম সাধু দর্শনাকাঙ্ক্ষায়।

মধ্যবয়সী, চকচক্ করিতেছে ঘোরতর কালো কোঁকড়া চুলের রাশ মাথায়, সোজা সিঁথি, ক্রীমকলার সিল্কের চাদর জড়িয়ে পরা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মূর্ত্তি, ঘন ভ্রূযুগের নীচে জলজল করিতেছে কতকটা ভাষা ভাষা চক্ষু, কামানো গোঁফ-দাড়ি, মনে হইল যেন বৈষ্ণব মূর্ত্তি। দুই হাত বুকের ওপর আবদ্ধ, কুটিরের সামনেই পায়চারি করিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই উৎসাহিত হইয়া,—আসুন, আপনার সঙ্গেই কথা কইতে চাইছিলাম,—বলিয়া তাড়াতাড়ি একখানা কম্বলের আসন দেখাইয়া দিলেন। আর একখানি আসনও পাতা ছিল—আমি বসিবার পর তিনি নিজ আসনে বসিলেন। তাঁর সহজ ভদ্রতা আমাকে প্রথমেই আকৃষ্ট করিল। মনে হইল, যেন তিনি আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

আমি একটু সংশয়াকুল মনে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার সঙ্গে কথা কইতে

চাইছিলেন? আজ প্রায় একমাসের উপর হয়েচে আমি এখানে,—আপনার কথা তো শুনিনি।

তিনি বলিলেন,—আরে বসুন, বসুন। তামুক-টামুক,—কিছু রঙ্গের অভ্যাস আছে নাকি? রঙ অর্থে নেশা। কথায় একটু পূর্ব্বাঙ্গের টান।

আমি বলিলাম,—না না, তামাক চুরুট চাই না; এখনও বঞ্চিত আছি ও রসে,—আপনি খান না, যদি অভ্যাস থাকে, তাতে শান্তির কোন ব্যাঘাত ঘটবে না আমার।

তিনি বলিলেন,—আমারও ওসব নেই, তবে এখনকার দিনে বিশেষতঃ তন্ত্রের ক্ষেত্রে ওগুলি অভ্যর্থনার অঙ্গ কিনা তাই,—যাক্, আপনার গৃহস্থাশ্রম কলকাতায় তো, ঐরকম যেন শুনেছিলাম বিপিন ঠাকুরের কাছে।

কলিকাতার বাড়ির ঠিকানা বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য হইয়াই দেখিলাম,—পকেট হইতে কালো মলাটের একখানি পুরু নোট-বুক বাহির করিয়া লিখিয়া লইলেন, বলিলেন,—কি জানেন, কখন কার দ্বারা কি কাজ হয় জানা তো যায় না,—হয়তো আপনাকে দিয়েই কোন বিশেষ কাজ হতে পারে,-কি বলেন?

সাধুজীকে তো বেশ ঘোরতর বিষয়ী মনে হইতেছে। এমন একজনের কথায় সায় দিতে মনে একটা প্রবল সঙ্কোচ অনুভব করিলাম। তাঁহার মনোমত উত্তরটা বাহির হইল না,—এমন কি আমার মুখে কোন উত্তর আসিল না। কেবলমাত্র চাহিয়াই রহিলাম তাঁহার মুখের পানে। কিন্তু তাঁর সঙ্কোচের কোন বালাই নাই, তিনি ছাড়িবার পাত্রও নহেন, এই বলিয়া

আমায় উত্তর দিতে বাধ্য করিলেন যে,—আমার কথাটা কি এমন অসঙ্গত ঠেকছে,—কখন কার দ্বারা কি কাজ হয় কে জানে,—একথা কি অস্বীকার করেন? অথবা এর মধ্যে কিছু মিথ্যে আছে নাকি?

নৈয়ায়িকের উত্তরে বলিতেই হইল, কথাটা যথার্থই, মিথ্যা নয়।

তাই বলুন। যাক্‌ আমরা সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, গৃহস্থ না হোলে আমাদের তো চলেই না,—তাই আমাদের অভাব-অভিযোগ তো তাঁদেরই দেখতে শুনতে হবে। কোলকাতার উপেন সাউ মশায়কে চেনেন? মস্ত বড়লোক, শ্যামবাজারে খুব বড় কারবারী. লোকের দায়-অদায়-এর দিকে মহা লক্ষ্য তাঁর; আর ধর্ম্ম-ভাবও তেমনি, জ্ঞানও অসাধারণ,—অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি।

আমি বলিলাম, —এখন আসল কথাটা যদি আমায় শুনিয়ে কৃতার্থ করেন—

শুনিবামাত্রই তিনি আবার আরম্ভ করিলেন,—হাঁ তা বলছি, আপনার পিতা আছেন শুনেছি—তিনি হাইকোর্টের উকীল না ব্যারিস্টার,—কি যেন?

আমি বলিলাম, না, তা নয়,—তিনি একজন কেরানী মাত্র।

আমার কথা শুনিয়া তিনি একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—তা হাইকোর্টের ক্লার্ক যাঁরা, মফঃস্বলের একজন বড় অফিসার-লোকের মতই ক্ষমতা তাঁদের; কে না জানে একথা!

দেখিলাম আজ আমার এই সুন্দর বৈকাল মাটি। আলাপের প্রথমেই একটা অপ্রীতির ছাপ পড়িয়া গেল মনের মধ্যে। এখন কেমন করিয়া অব্যাহতি পাইব? নির্ব্বাক রহিলাম। জানি না হয়তো মনের অগোচরেই,—হা ভগবান,—এই কথাটি আক্ষেপের মতই বাহির হইয়া গেল আমার মুখে।

তিনি—আপনি ভগবান মানেন? আমার ধারণা ছিল আপনারা জ্ঞান-মার্গের লোক, লেখাপড়া শিখেছেন—

আমার কোন যে দুর্ম্মতি হইল, তর্কে লাগিয়া গেলাম;—উপায়ও ছিল না, মনে হইল, ইঁহার কথা মানিয়া লইলে অন্যায় হইবে, তাই আমি বলিয়া ফেলিলাম, আপনি মানেন না—তবে আপনি কিসের সাধু, কোন্ উদ্দেশ্যে কি নিয়ে ভজন-সাধন করেন একবার বৃন্দাবন একবার কামাখ্যা আশ্রয় করে?

তিনি দৃঢ় উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া এবং বক্র হাসিয়া বলিলেন,—যে বস্তু নেই, যাকে মানাবার জন্য এতগুলো মিথ্যার অবতারণা করতে হয়, যে বস্তুর অস্তিত্বে সন্দেহ, এখনও পর্য্যন্ত প্রমাণ হোল না যার অস্তিত্ব,—নির্ব্বিবাদে তাকে মানাটা মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া নয় কি? কামাখ্যা ও বৃন্দাবনে থাকার কথা

বলচেন ? এই দুই জায়গায় আমার মন-শরীর ভাল থাকে।

আপনি শঙ্করাচার্য্যেরও ওপরে যান দেখছি। এত বড় বৈদান্তিক—তিনিও ভগবান, বিষ্ণু, শিব মানতেন,—নারায়ণও মানতেন। দেবদেবী সব মানতেন, আপনি মানেন না—সুতরাং ধন্য।

শুনিয়া তিনি বলিলেন,—পরিহাস করছেন দেখি,আপনি কলকাতার বাবু কিনা!

আমি বলিলাম,—সবাই সব কাজের উপযুক্ত নয়, জানেন তো? তর্ক সম্বন্ধে আমার ধারণা নেই আর আপনাকে পরাস্ত করবার কথা বোলে লজ্জা দেবেন না ; তা ছাড়া আমি জিজ্ঞাসু মাত্র,—যেটুকু বলে ফেলেছি সেটা আমার দুর্ব্বলতার ফলেই, একথা মনে করে লজ্জিত হচ্ছি, এখন আমায় অব্যাহতি দিতেই হবে। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

অতি অদ্ভুত সাধু—দেখি, এ একটা টাইপ,—এমন একজনের পাল্লায় আগে কখনও পড়ি নাই। খপ্ করিয়া আমার ডান হাতখানি ধরিয়া তিনি, বসুন, বলিয়া আবার বসাইলেন। যে কারণেই হোক ইহার পর জোর করিয়া চলিয়া যাওয়া আমার অভদ্রতা মনে হইল। ভাবিলাম, শেষটা কি হয় দেখাই যাক না কেন, সব কাজের সমস্তটাই যে মনোমত বা প্রীতিপদ হইবে এমন কি কথা আছে ? যাই হোক, এখন তিনি আবার আরম্ভ করিলেন।

আচ্ছা বলুন তো, ফুলচন্দন বিল্বপত্র, তুলসী দিয়ে বিগ্রহমূর্ত্তি, শালগ্রাম পূজা করা,— তারপর খাদ্যদ্রব্য দিয়ে শীতল দেওয়া, শেষে নিজেরাই প্রসাদ পাওয়ার নাম কোরে সেগুলি খাওয়া,—ভগবানের নামে ঐ ভাবের উপাসনায় আপনার জ্ঞানের উন্মেষ কখনও হতে পারে ? অথচ যাঁরা এইভাবে উপাসনা করচেন তাঁরা সংসারে যত রকমের স্বার্থপরতা হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এসব নীচ কাজে দিবারাত্র নিযুক্ত আর প্রত্যেক আচার-ব্যবহারে ভগবান ছাড়া কথাই নেই তাঁদের মুখে—এসব ভণ্ড আচার আপনি সমর্থন করেন ?

আমি বলিলাম,—ঐ সকল কর্ম্ম যদি আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পন্ন হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আপনার কি বলবার আছে ?

তিনি বলিলেন,—বেশ বলেছেন, তারপর ?

তারপর ? আমি বলিলাম,—যাঁরা বলেন, শিবোহম্—আমিই ব্রহ্ম, আমি আত্মা, আমি অদ্বিতীয়, অথচ তাঁরা যদি সর্ব্বক্ষণ আত্মসুখ-ভোগের জন্য অর্থের পিছনে দিবারাত্রি যাপন করেন,—স্বার্থ-বুদ্ধি ও বিষয়-কামনা যাদের এতটা প্রবল, তাদের আপনি সহ্য করতে পারেন ?

তিনি বলিলেন,—আমরা ব্যবহারে যা কেন করি না, ব্রহ্মতত্ত্ব বা অদ্বৈততত্ত্ব যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথবা চরম তত্ত্ব সে বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে? আদর্শ যে আদর্শই।

আমি—ভগবৎ-ভক্ত বা ঈশ্বরবাদীরাও তো ঐ কথাটা বলতে পারেন?

তিনি যেন একটু বিরক্তিপূর্ণ তাচ্ছিল্যের ভাবেই বলিলেন,—কি বলছেন আপনি? মানুষের মূর্ত্তিতে ঈশ্বর-কল্পনা, আর তত্ত্বজ্ঞানের চরম অদ্বৈততত্ত্ব একই কথা,—একথা আপনি বলেন, স্বীকার করেন?

আমি বলিলাম, এটি তো শেষ কথা, অদ্বৈতজ্ঞান চরম তত্ত্ব। আপনিই ভেবে দেখুন তাহলে—কথাটা সেই শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, উঁচু-নীচু বা ছোট-বড় নিয়েই তর্কে এসে দাঁড়াল! কিন্তু তার মীমাংসাও তো চৈতন্যদেব তাঁর ধর্ম্মে নিজ মুখের বাণীতে দিয়ে গেলেন; তিনি কি বলেননি যে, অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই তো ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন; আসল তত্ত্বই তো রূপকের মধ্যে ঢাকা, সাধক নিজের সাধনা দিয়ে নিজ নিজ অধিকার হিসাবে উপলব্ধি করে নেবে;—এখানে তর্কের অথবা নিজ মত প্রতিষ্ঠার অবসর কোথায়?

তিনি—আপনার যে দেখি নারদীয় ভক্তি!

আমি বলিলাম,—যথার্থই সে বস্তু পেলে জীবন সার্থক মনে করতাম।

তিনি—আসল কথা কি জানেন, ঐ ভাববাদীরাই ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করেছে, এসব নিয়ে অশিক্ষিত মূর্খ চাষা-ভূষোরাই চলবে, ভদ্র শিক্ষিত সমাজে ঐ সব এখনকার দিনে অচল। হরি-সংকীর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরলাভ হয় একথা শিক্ষিত লোক বলবে,—এঁ্যা! সে কেমন ঈশ্বর?

আমি—সর্ব্বাধিক সভ্যতার মুখোশ ঢাকা পাশবিক বা মানসিক দুর্ব্বলতার মূর্ত্তিমান প্রতীক যারা তারা শিবোঽহম বলে, এটাও কি অত্যন্ত অদ্ভুত নয়?

শুনিয়া তিনি উপেক্ষার ভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

আর আমার কিছু বলবার নাই, এখন আমায় বিদায় দিন, নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই।—বলিয়াই আবার আমি উঠিলাম।

তিনি—তা পারবো না; আমি আজ আপনাকে পেয়েছি, হয় প্রীতিতে বাঁধবো, না হয় একেবারে অশ্রদ্ধার আস্পদ হয়ে থাকবো। এখন বলুন, আপনার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আসল বক্তব্যটা কি?

আমি বলিলাম,—তা আপনার নাম শুনে জানতে তো এসেছিলাম আপনারই কাছে?

তিনি বলিলেন,—

আমার এতদিনের গভীর ধর্ম্ম-সাধনা, অভিজ্ঞতাই যখন আপনি নাকচ কোরে দিলেন তখন আপনি কি আর সহজে ধরা দেবেন? ঈশ্বর অবতার, নারদীয় ভক্তিতে আপনার বুঝি বিশ্বাস? হঠাৎ গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু মনে করবেন না যেন।

আমি—আপনার আত্মশক্তি যেমন সহজেই আপনাকে অদ্বৈত-তত্ত্বে গভীর ভাবে সমাহিত করেছে, আমার দুর্ব্বল অস্তিত্বে তা সম্ভব হয়নি, শ্রীগৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারকল্প পুরুষের জীবন এবং ধর্ম্মাচরণ গোড়া থেকেই প্রভাবিত করেছে আমাকে। একথা বলতে কোন সঙ্কোচ নেই আমার, প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতাই এখানে।

তিনি—দেশের এত বড় সর্ব্বনাশ বুদ্ধদেবের পর আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি; তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মবোধ, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বার্ত্তা সর্ব্ব প্রদেশের মধ্যেই সর্ব্বজনীন দুর্ব্বলতা এনেছে; হয়তো বা শেষদিকে একটু ধর্ম্মমোহ কাটাতে সহায়তা করছিল এই ইংরাজ-রাজত্বে ইউরোপীয় সভ্যতার শক্তিতে, কিন্তু রামকৃষ্ণ এসে সে পথটাও একেবারেই বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত করে গেলেন।

আমি—আচ্ছা এরপর ধর্ম্মের নামে সমাজনীতির চর্চ্চাটা বন্ধ করলে হয় না! এভাবে এ প্রাচীন কামরূপের মধ্যে আপনার মত একজন বৈদান্তিক মর্ডান সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়তে হবে এ কল্পনা আগে করিনি।

শুনিয়া তিনি যেন একটু গৌরববোধ করিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, —এখানে সাধু, ধর্ম্মপ্রাণ কাকেও পেয়েছেন? কাকেও পাবেন না, এখানে যা পাবেন সবই সেকেলে পচা তান্ত্রিক নর্দ্দমা-ঘাঁটা সাধু, গতানুগতিকতা ছাড়া আর কিছুই নেই এখানে। সাধু এখানে কাকে বলবেন?

তৎক্ষণাৎ বলিলাম,—কেন, আপনাকে?

তিনি—রহস্য করচেন দেখছি!

এবার তাঁর এইভাবের মন্তব্য শুনিয়া অন্তরে ব্যথিত হইলাম, কিন্তু তবুও আমি উমাপতি বাবার কথা বলিলাম। তাঁকে কি আপনি সাধু বলেন না?

ওহো, যার সঙ্গে ঐ এলোকেশী আছে তো? বুড়ো বয়সে মেয়েটাকে বেশ হাত করেছে। কি রকম মনে হোল দুজনকার সম্পর্ক?

সেটা আপনার কাছেই তো আমার জানবার কথা, আমি তো নতুন এসেছি এখানে, কেমন করেই বা জানবো?

মিস্টিরিয়াস ! সাধারণ লোকের সঙ্গে লোকটার ব্যবহার ভাল, মধ্যে মধ্যে এখান থেকে সরে যেতে হয় তাঁকে নিয়ে, তখনকার কথাই তো বিশেষ—

আমি উঠিয়া পড়িলাম,—আর বসিব না। এখন আমি যেতে পারি বোধ হয় ?

তিনি—দেখুন, আমি এখানে নতুন আসিনি, উমাপতি কৌল যতদিন এখানে আছেন আমি ঠিক ততদিন না হোক তার কাছাকাছি হব নিশ্চয়—এখানে আছি। আপনার চেয়ে বেশী জানি আমি তাঁকে, এটা স্বীকার করেন ?

আমি এই ধারণাই করিলাম যে, নিজ দম্ভ অহঙ্কারে রাঙানো মন লইয়া বাবাজী প্রথম হইতেই হয়তো সযত্নে উমাপতি বাবাকে তফাৎ করিয়া রাখিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটে নাই, কাজেই যথার্থ পরিচয় ঘটিবে কোন্ সূত্রে ? এক তীর্থে থাকিলে কি ফল ? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হইল, নিজের জ্ঞানবুদ্ধির দম্ভই এক্ষেত্রে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে এমন একজন মহাসাধুর সঙ্গ-সংযোগ। গৃহীলোকের এ ভুল মার্জ্জনীয় কিন্তু একজন সাধুরও ঐভাবের ভুল ?

আমি বলিলাম,—তাতে আমার বিশেষ কিছু লাভ বা লোকসান নেই, আপনার পায়ে ধরে বলছি আমার প্রতি কৃপা করে নেগেটিভ ভাবগুলো ছেড়ে যাতে আমি কিছু লিখতে পারি এমন কিছু বলুন, দোহাই আপনার !

এইবার তিনি আসনে স্থির হইয়া বসিলেন, তারপর বলিলেন,—দেখুন, ধর্ম্ম জিনিসটার মত জটিল বিষয় আর কিছুই নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ও জিনিসটাকে বুঝে থাকে। হয়তো আপনার সঙ্গে কোন কোন বিষয় আমার মত মিললো, সেই পয়েন্টেই দুজনে আমরা একমত, কিন্তু সকল পয়েন্টে কখনই এক হতে পারি না। যে বলে ধর্ম্মবস্তু সম্প্রদায়গত, তাকে ভূগোল পড়ানো উচিত আর দুনিয়াতে যত মানচিত্র আছে দেখানো উচিত।

মানচিত্র দেখানো উচিত কেন ?

এটা আর বুঝলেন না, তাদের ভগবান বা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা অনন্ত শক্তিমান জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর বলে মূলে একজন, যাকে আদর্শ বলছিলেন আগে, সেরকম একজন মূর্ত্তিমান দেবতা আছে তো ? তার মূর্ত্তির চেয়ে দেশের মানচিত্রগুলি অনেক বেশী প্রত্যক্ষ সত্য এইজন্য যে, যত দেশে যত মানুষ সমাজ আবার সংখ্যায় তত সংখ্যক ভগবান কল্পনা, বিপুল পৃথিবী দেখে ভুল ভাঙতে পারে ; নিজ দেশেও যেমন নরনারী, বাইরের সমাজও তেমনি বিপুল এই ধারণা স্থির হবার পর তাদের চৈতন্য হবে।

আমি সংকল্প করিলাম যতক্ষণ থাকিব আর কথা কহিব না। আমার গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—আপনি ভাবচেন বুঝি, কি আপদের ভোগেই পড়েছি, নয় কি?

কথা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না, বলিলাম,—সত্যই বলেছেন।

তিনি বলিলেন, আসুন এবার স্বরূপ কথা কওয়া যাক, কেমন? আপনি তো বুঝতেই পাচ্ছেন, আমার বৈদান্তিকতাটা আসলে ভণ্ডামো?

আমি তা ঠিক না হলেও এর মধ্যে আপনার অন্যান্য ধর্ম্মে বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিচয়টা আছে।

চমৎকার একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন,—যদি বলি আমি বৈষ্ণব?

তাহলে আমি বলব পরিহাস করছেন।

আর কোন কথা না কহিয়া তিনি ঘরের মধ্যে গেলেন। অল্পক্ষণেই একটি হার্ম্মোনিয়ম, নূতন, সযত্নরক্ষিত—ঝকঝকে সুন্দর যন্ত্রটি আনিয়া আপন আসনের সম্মুখে রাখিলেন। তারপর স্থিরাসনে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া রহিলেন, তারপর কিন্নরকণ্ঠে গান ধরিলেন। এমন এক সুন্দর বৈষ্ণব মূর্ত্তি তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল যাহা কথায় বলিবার নয়। অনেকটা কলিকাতায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বোধ হয় সর্ব্বজনপরিচিত সেই শচীনন্দনের মতই দেখিতে হইল। কলিকাতায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সভায় প্রায় অধিবেশনে তাঁর গান শুনিতাম, এবং বহুবারই শুনিয়াছিলাম এবং মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কলিকাতায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের উৎসবে বা ভাগবত পাঠের আসরে শচীনন্দনের মুখে যিনি কীর্ত্তন শুনেন নাই তিনি এক অপূর্ব্ব সুযোগে বঞ্চিত হইয়াছেন। যাহা হউক এখন তিনি গাহিলেন—

গোরা করুণাসিন্ধু অবতার,
নিজ নামে গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি,—ভক্তজনে বিলাইল হার।

এই গানই আমায় মুগ্ধ করিয়া রাখিল। শিশুকাল হইতেই গানের আকর্ষণ আমার মধ্যে সহজ এবং সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান; তা ছাড়া গান হইল আমার সাধনার অঙ্গ। এখানেও বেশীর ভাগ সময় একলা থাকিলে গানেই কাটিয়া যায়, আর অতীব আনন্দ এবং অবলীলাক্রমেই দিনগুলি আমার কাটে।

গানখানির পর আমার দিকে চাহিয়া তিনি আর কিছুই না বলিয়া আবার একখানি পদ আরম্ভ করিলেন,—

এমন সুধা-মাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছে,

ও নাম একবার শুনে আমার হৃদয়বীণে অমনি বেজে উঠেছে।
আমি কতবার তে শুনেছি ও নাম
(হরিবোল, হরিবোল) কখনো তো আমার এমন হয়নি পরাণ,—
এখন কি জানি কি এক দিব্য আলোকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

এ গান কাশীর দণ্ডীস্বামী প্রকাশানন্দের। শ্রীচৈতন্যে আত্মসমর্পণের পর তাঁহার তখনকার ভাব লইয়া রচিত। শুনিলে রোমাঞ্চিত হয় শরীর, আনন্দাশ্রুর কথায় কাজ নাই।

২২

এই গান দুখানির পর যন্ত্র রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন, এবার বিশ্বাস হয়েছে তো?

আমি বলিলাম,—একটা অদ্ভুত নাস্তিকের অভিনয় করলেন কেন প্রথম থেকে?

আমার আপন ধর্মের গুহ্য কথাটা কেন যাকে তাকে বলতে যাব? তাছাড়া, বেশ লাগে না কি, বিপরীত আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে একবার ঝালিয়ে নিতে? আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল—

আমি বলিলাম,—বোধ হয় ভগবানের অস্তিত্বে সন্দেহ আছে যার, তার সঙ্গে প্রাণ খুলে সব কথা তো চলবে না,—তাই প্রথমেই আমায় একটু পরীক্ষা, নয় কি?

তিনি বলিলেন,—ঠিক বলেচেন, গোড়াতেই একথা জানা দরকার যে, নিশ্চিন্তভাবে বা নিঃসংশয়ে যাঁর চিত্তে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণিত তার সঙ্গেই না এসব আলোচনা করতে পারে?

আমি বলিলাম,—বেশ হয়েছে, ভগবৎবিশ্বাসী হতে হবে এই তো আপনার কথা? তা বুঝেছি, এখন বলুন অনুগ্রহ করে, জীব ও ভগবানে আসল সম্বন্ধের কথা। যখন আমরা দুজনেই ভক্তিমার্গের কথাই কইচি আর যখন শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের উভয়েরই আদর্শ ধর্মোপদেষ্টা—তখন আর গোপন করবার কিছু নেই আশা করতে পারি।

তিনি—ওসব কথা তো তিনি পরিষ্কারই বলেছেন; জীবের সঙ্গে ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল,—জীব আর ঈশ্বরে নিত্য সম্বন্ধ বেদান্তেরও ঐ কথা তো।

আমি কহিলাম,—এমন নিত্য আনন্দময় সম্বন্ধ জীব ভুলে গেল কেমন করে? কি ভাবে কে তাকে ভুলিয়েছে? এই প্রশ্ন আমার মধ্যে সবার

বড় প্রশ্ন, আমায় বুঝিয়ে দিন, এই নিত্য সম্বন্ধের বিকৃতি হল কি করে যে জীব তাঁকে অস্বীকার পর্য্যন্ত করে বসলো ?

তিনি—এইখানেই মায়াবাদের কথা, মায়াতে পড়েই জীব ঈশ্বরবিমুখ হয়ে গেল।

আমি—ঐখানে তো কথা, মায়া আবার কে ? সে ছিল কোথা, এলো কোথা থেকে, কেন এলো ?

তিনি—মায়া তাঁরই প্রকৃতি, তাঁতেই ছিল, কেমন করে এবং কেন যে এলো এর মধ্যে হাজার মাথা খুঁড়লেও জীব তা ধরতে পারবে না। কেন ? বর্ত্তমান অবস্থায় জীবের মন স্থূল ভোগমুখী, পদার্থ-তান্ত্রিক বলে ? জ্ঞানের বিকাশ হলে বুদ্ধি যখন কারণমুখী হবে, তখনই আত্মানুভূতির সুযোগ আসবে। এসব সাধারণ বিকৃত অহংবুদ্ধিতে ধরবার ছোঁবার যো নেই যে দাদা! এটা তো বুঝতে পারেন ? ইচ্ছা ক'রে বোকা সাজবেন না যেন।

তা বুঝতে পারি, কিন্তু আমাদের মন-বুদ্ধি তো নিরস্ত হতে চায় না। এটাও স্বভাবের নিয়মেই ঘটে তো ? আমাদের অস্তিত্ব তো তিনি ছাড়া নয় ?

সত্য কথা। তাহ'লে এটাও বুঝতে হবে যে, যাদের বুদ্ধিতে সূক্ষ্মতত্ত্বসকল ধারণার অধিকার হয়েছে তাদেরই ঐ তত্ত্ব জানবার কৌতূহল অদম্য হয়ে থাকে। তবে এটুকু সাবধান হতেই হবে, যেন মস্তিষ্ক (ব্রেন) দিয়ে এসব তত্ত্ব বুঝতে যাবেন না। তাহলেই সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

কেন, বলুন তো খুলে!

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠসহায় দুটি বস্তু আছে, যারা আমাদের সংসার-জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মে গতি দিচ্চে। সে দুটির একটি মন, অপরটি বুদ্ধি। মূল কথায়, একটি মস্তিষ্ক, অপরটি হৃদয়। যা কিছু বাস্তব সম্বন্ধমূলক ব্যবহার স্থূল, সূক্ষ্ম, —সকল কিছুই মস্তিষ্ক বা মনধর্ম্মের অন্তর্গত, সেইজন্য দর্শনশাস্ত্রে মনকে জড়

বা বস্তুতান্ত্রিক বলা হয়েছে। কারণ জড় ছাড়িয়ে চৈতন্যের অধিকারে মনের গতি নেই। সে-রাজ্যে বুদ্ধি বা হৃদয়ের গতি। হৃদয় বলতে য়্যানাটমিক্যাল হার্ট বা হৃদ্‌পিণ্ড যেন বুঝবেন না বন্ধু। ওটা পার্থিব স্থূল, সূক্ষ্ম মন এবং অপার্থিব ভাবানুভূতির কেন্দ্র হোলো হৃদয়; জীবের এই হৃদয়ই তাঁর (অর্থাৎ ঈশ্বরের) লীলার আসন।

তাহলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যা কিছু তার সঙ্গে মনের সম্বন্ধই নেই ?

তাই ত, নিশ্চয়ই নেই। তত্ত্ব ত ধর্ম্মহৃদয় বা চৈতন্যরাজ্যের অধিকারের কথা, তাইতেই ত হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষম নিরীহম্‌ বলেছে। মনে করুন ঐ দুটি মোক্ষম মন্ত্র আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পেয়ে থাকি, তাই নিয়ে আমরা এ সংসারে বেসাতি করি। বাস্তব ভোগের প্রভাব তো মানব-মন থেকে সহজে যাবার নয়, বরং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে প্রত্যেক জীবের মধ্যে। মনপ্রধান মানবের মনের দাসত্ব কত জন্ম করতে হয় তার হিসাব কে করেচে ? প্রকৃতির রাজ্যে বিষয় ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনের প্রভাব ক্ষীণ, বিষয় ভোগে বিরাগ আন্তরিক হলে পর তখন বুদ্ধি বা চৈতন্যের রাজ্যে গতি পাওয়া যায়, উচ্চ উচ্চ তত্ত্বসমূহ হৃদয়ের ক্ষেত্রেই অনুভব হতে থাকে, তার চরম পরিণতি আত্মতত্ত্বে, তখনই জন্ম মরণ ভীতি ভ্রংশি সৎ চিৎ স্বরূপম্‌ সকল ভুবনবীজম্‌ ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে। তবে প্রত্যক্ষ এবং মানবজন্ম সফল হয়। এই আর কি, বুঝলেন তো ?

আমি—তা হলে এবার, যাদের বুদ্ধি চৈতন্যমুখী হয়েছে তাদের ভগবান লাভের পথ সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের স্থিরনির্দ্দেশ বলুন।

তিনি—যদি চৈতন্যদেবের নির্দ্দেশ জানতে চান তাহলে আপনাদের ঐ সংজ্ঞা (সর্ব্বময় ঈশ্বরনির্দ্দেশক শব্দটি) একটু বদলাতে হবে। ভগবান বা পরমেশ্বর না বলে ওখানে কৃষ্ণ বলতে হবে তাঁকে।

আমি—এই দেখুন এখানে একটা ধোঁকার সৃষ্টি হ'ল ; যদি কেউ ভগবান পরমেশ্বর বা রাম, শিব বলে—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন,—আপনি তো গুরু নানকের, রামানুজ শঙ্করাচার্য্যের মত বা তুলসীদাসের মত জানতে চাননি,—চেয়েছেন আমাদের চৈতন্যদেবের মত জানতে, কাজেই তাঁর আদর্শ সংজ্ঞা হোল কৃষ্ণ; তাঁর প্রচারিত ঐ বস্তুটির নির্দ্দেশ তাঁর মনোমত নামেই নিশ্চয় করতে হবে তো ? তিনি ঐ কৃষ্ণকেই জীবের পরমাশ্রয় বলে নির্দ্দেশ করেছেন আর একমাত্র সহজ প্রেমের উদ্ভব হলেই তাঁকে ধরা যায়, অন্য কোন সূত্র নেই তত্ত্বটি ধরবার।—

এই সত্য প্রকাশ করে আমাদের ধন্য করেছেন। তাঁর ধর্ম্মতত্ত্ব এইভাবেই বলতে হবে।

তাহলে দয়া করে আর একটু বলুন,—ঐ সহজ প্রেম কেমন করে জন্মাবে যাতে কৃষ্ণতত্ত্বপ্রাপ্তি বা লাভ ঘটবে? শুনিয়া তিনি হাসিতে আরম্ভ করিলেন। সে হাসি আর থামে না—চক্ষে জল আসিয়া গেল সেই হাসির ধমকে, আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। একটু থামিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এত হাসি কেন?

তিনি বলিলেন,—ও বস্তু জীবের সাধ্য নয় দাদা, -মাথা ঘামিয়ে, যোগ-জপ-তপ, যত রকমের যৌগিক ক্রিয়া-কৌশল মানুষের জানা আছে তা সব প্রয়োগ করলেও না, তাই কৃষ্ণ-কৃপালাভ সহজ প্রেমের সাধ্য এই কথাই বলছিলাম। আর হাসি এলো এই ভেবে—যারা মনে করে বুদ্ধিবলে বা কঠোর তপস্যায় তাঁকে মেরে দেবো, তাদের পক্ষে ও দরজা দৃঢ়বদ্ধ।

প্রেম বুঝতে পারি, কিন্তু সহজ প্রেম বলছেন কেন?

ওটা আপনিই উৎপন্ন হয় তাই সহজ, চেষ্টা করে করা যায় না তাই,—

অর্থাৎ আপনা থেকেই যার হ'ল তারই হবে কৃষ্ণ-কৃপালাভ, যার সেই প্রেম নাই সে বঞ্চিত থাকবে—এইটি বিধান?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তাই ত ঐ কারণেই বস্তুটি দুর্ল্লভ বলেছে। মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়।

তবে কি ঐ বস্তু গোসাঁই বাবাজীদের একচেটে সম্পত্তি হয়ে থাকবে, যাঁরা চৈতন্যদেবের কৃপা পেয়েছেন, সাঙ্গপাঙ্গো বলে প্রচারিত—তাঁদের বংশধরদের মধ্যে?

যদি ঐ প্রেম তাঁদের কারো জন্মে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা পাবেন, না হলে নয়।

কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে মন্ত্রদীক্ষার ব্যাপার আছে তো দেখেছি, গোসাঁই গুরুরা তো দীক্ষা দিয়ে থাকেন, গুরুর প্রাপ্য আদায় করেন তাও দেখেছি ও শুনেছি—তান্ত্রিক গুরুর মতই তাঁদের ব্যবহারক্রম।

তাঁদের ঐ সাধারণ ব্যবসায়ী গুরুর পর্য্যায়ে ফেলে বিচার করবেন। তবে বংশের একজন ভগবানের কৃপালাভ করার ফলে বংশ ধন্য হয়, সেই বংশের মধ্যে সততার প্রভাব অথবা উচ্চ ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ছাপ থাকে, এটা তো সর্ব্বত্রই আছে মানুষ-সমাজে। এক দরিদ্রবংশে কোন কৃতী, ধনবান জন্মালে অথবা

কোন সাধারণ গৃহস্থের সংসারে অসাধারণ ব্যক্তি জন্মালে বংশ উজ্জ্বল হয় আর তার বংশধরেরা সেই নাম ভাঙিয়ে খায়, এটা তো এখানকার সর্ব্বত্র সামাজিক বিধি—নয় কি? তাই যদি হয় তাহলে যে বংশে একজন ভগবৎ-ভক্ত বা তত্ত্বদর্শী জন্মালো তাঁর বংশধরগণ কি উন্নত হবে না, সমাজের একদল সেইভাবে ভাবিত লোকের চক্ষে? আর সেই সমাজেই কি তাদের প্রসিদ্ধি দেবে না? তাতেই তাদের সুখ যে। তারপর, এইখানেই একটি গুহ্য আছে, সেটি বলব কিনা আপনাকে,—একটা প্রশ্ন।

এই যে বলছিলেন—মাত্র প্রেম, সহজ প্রেমেরই অধিকার এই কৃষ্ণপ্রেম লাভের ব্যাপারে? তবে আবার গুহ্য কি?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে মন্ত্রশক্তি বলে একটা কথা আছে তা জানা আছে কি? না থাকে তো শুনুন বলি,—পূর্ব্বাপর গুরুপরম্পরায় মন্ত্র চৈতন্য, অর্থাৎ মন্ত্রকে আত্মশক্তিতে চৈতন্যময় করার প্রথা ভারতের ধর্ম্মমার্গের একটি পরম আবিষ্কার।

তাহলে আমাদের উপায়?

সেই কথাই বলুন,—পথে আসুন। এই কথাটিই যথার্থ রিয়ালিস্টিক। তিনি বলিলেন,—বেশ, এখন এটা তো অনুভব করছেন যে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত রাধাতত্ত্ব, অর্থাৎ রাধার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ—এ তত্ত্ব ধারণা বা অনুভূতি জীবের সাধ্য নয় অর্থাৎ অহংসর্ব্বস্ব জীবের চেষ্টার দ্বারা হবার নয়, তাহলে আমার কী হবে? এখন একটু ভেবে দেখুন আমি বলতে কি বুঝায়—এই যে আমি,—সে কে?

জীব তো নিশ্চয়ই; তবে হয়তো একটু উন্নত। কি হিসাবে, কতটা উন্নত? এই হিসাবে যে, হয়তো তার মুমুক্ষুত্ব এসেছে, সংসারের সুখ-দুঃখ আর ভালো লাগে না, বৈরাগ্য ভাব এসেছে তার, অর্থাৎ কিভাবে এই গতানুগতিক স্বার্থপর কামান্ধ জীবনধারা থেকে কেমন করে মুক্তি পাব—এই ইচ্ছা প্রবল হয়েচে। এই যখন কথা তখন তাদের জন্যই সখীভাবে সাধন, অথবা সখী-অনুগামী হওয়া। কারণ প্রথম অবস্থায় রাধার নিকট তুমি পৌছুতেই পার না, আর রাধার নাগাল না পেলে রাধানাথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। কারণ তুমি জীব অর্থাৎ যতক্ষণ তোমার জীবভাব আর জীবধর্ম্ম বর্ত্তমান, ততক্ষণ রাধাভাব বা রাধাতত্ত্ব বস্তুতঃ তোমার অগোচর, সুতরাং দুর্জ্ঞেয়। আবার রাধা হলেন কৃষ্ণময়, ভাষা বা শব্দগত অর্থ দিয়ে অথবা মস্তিষ্কের সাহায্যে তত্ত্ববোধ যেমন

অসম্ভব দুর্জ্ঞেয় জটিল হয়েই থাকে, তেমনি যতক্ষণ তোমার মধ্যে জীবভাব অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চন-মোহ বর্ত্তমান, রাধাতত্ত্ব তোমার বোধ-আয়ত্তের বাইরে। জোর করে বুঝতে গেলে নরনারী সম্ভোগের ভাব আরোপ, অন্য পরে কা কথা, এমন কি বৈষ্ণব সাধক সাধারণের পক্ষেও এই রাধাতত্ত্বের তুল্য বিপদ বা বিভ্রান্তিকর ব্যাপার, তথা অধঃপতনের পথ আর নাই। আর সেই কারণেই সহজিয়া ধর্ম্মের আজ এতটা অধঃপতন। রাধা কখনই একটি নারী নয় অথবা কৃষ্ণ তোমার মত একটি পুরুষ নয়। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত ব্যাপারে পরিণত করার বিপদ সাধারণ নয়, চিন্তাশীলতা থাকতেও সাধনরাজ্যের নিম্নস্তরের মানুষ তাই আজ বঞ্চিত হয়ে আছে এই মহান্ তত্ত্বানুভূতির ক্ষেত্রে।

তাহলে এ প্রশ্ন আসে, রাধা কি বস্তু, রাধা কে? কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য অবলম্বন নেই যার—কৃষ্ণ ব্যতীত তার অন্য বোধ নাই। সেইজন্য রাধা পরমতত্ত্ব কৃষ্ণের প্রকৃতি। আধার-তত্ত্বই রাধা, রাধাতেই কৃষ্ণের বিহার বা অধিষ্ঠান ভাষায় বলতে গেলে রাধা হলেন একটি আধার তাতে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কারো স্থান নেই। কৃষ্ণতেই পূর্ণ রাধা, একমাত্র রাধাতেই তিনি ঘনীভূত। তারপর অধিকারীর কথা, কারণমুখী বুদ্ধি হয়েছে যার—সত্ত্বগুণাশ্রয়ী যে বৈরাগ্যবান পুরুষের তুচ্ছভোগ্য বস্তুর অসারতা হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, কেমন করে এই সীমাবদ্ধ পদার্থ-তান্ত্রিক কর্ম্মজগতের প্রভাবমুক্ত হওয়া যায় এই ভাবের মুমুক্ষুত্ব এসেছে যাঁর, তিনিই অধিকারী।

জীবের প্রথম মানুষ হয়ে সমাজে আসার কথা জানেন তো? প্রথমে তো সে থাকে প্রায় পশু। মানুষ সমাজে, নানাস্তরের সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে ঘাত-প্রতিঘাত, জন্ম-মৃত্যু, নানা কর্ম্মফল ভোগের পথেই ক্রমে ক্রমে সোজা বা সরল হতে থাকে। কত জন্মের পরে সে স্থিতধী হয়ে সমাজের কল্যাণ-চিন্তার উপযুক্ত হয়।

আমি বলিলাম,—আপনার আসল বক্তব্য জীব প্রথমাবস্থায় বুদ্ধির দিক দিয়ে স্থূলবুদ্ধিই থাকে, এই তো?

তিনি বলিলেন,—শুধু বুদ্ধি নয় মনেও সে কম পশু থাকে না। আপনার সমাজের চারপাশেই অজস্র দেখতে পান না,—তাদের হিংস্র ব্যবহার, দুর্দ্দমনীয় পশুবৃত্তির দৌরাত্ম্যে আপনার সময় সময় শান্তি-স্বস্তিতে সমাজে জীবনযাপন তো প্রায় অসম্ভব করে তোলে? অথচ চেহারায় বা পোশাক-পরিচ্ছদে তারা

ঠিক মানুষ নয় কি ? এখন সাধারণতঃ জীব কৃষ্ণবিমুখ অর্থাৎ জীববুদ্ধি কারণমুখী হয় না। কারণমুখী বলতে, প্রথমে তার মাত্র নিজ ভোগ-সুখেতে কেন্দ্রস্থ থাকে স্থূল স্বার্থপর বুদ্ধি, তারপর ক্রমে মানুষ সমাজগত সূক্ষ্ম-বুদ্ধি তারপর এই যে বিশাল সৃষ্টি, দৃশ্য-অদৃশ্য পদার্থের সঙ্গে মানবের জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ অশান্তিকর উৎপত্তি বা কারণের দিকে যখন বুদ্ধি তার প্রসারিত হয় তখনই তাকে কারণমুখী বুদ্ধি বলে, যে বুদ্ধি কারণরূপে এক স্রষ্টাকে আশ্রয় করে সারা মানুষসমাজে প্রসারিত হতে থাকে। তাকেই বৈষ্ণব শাস্ত্রে ধর্ম্মবুদ্ধি বা কৃষ্ণে রতি বোলেছে। তাহলে প্রথমে কৃষ্ণবিমুখ, তারপর ক্রমে জন্ম-জন্মান্তরে তার ধর্মবুদ্ধি বা কৃষ্ণে রতি জেগে ওঠে এই কথাই শাস্ত্রে বলেছে। সেই ধর্ম্মের চরম বিকাশ প্রেমধর্ম্মে, সে অবস্থায় যে অনুভূতি বা চরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার তা হোল রাধাতত্ত্বে। এই হোল সার কথা।

আমি বলিলাম,—আপনি রাধার কথা একটু বিশেষ করে বলুন।

তিনি—রাধাকৃষ্ণের প্রিয়তমা পরমাপ্রকৃতি, তাঁরই হৃদয়-আধারে কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। তারই রূপক হইল বাসকসজ্জা, বিরহপীড়িত অবস্থায় আত্যন্তিক আকর্ষণ, যাতে কৃষ্ণ না মিলিত হয়ে পারেন না। রাধা-টান কৃষ্ণকে টানেন, যে টানে কৃষ্ণ যুক্ত না হয়ে পারেন না, অচ্ছেদ্য ভাগবতী নিয়মেই আধেয়কে আধারের ঐ টানেই এনে উপস্থিত করায়। মূলে কিন্তু আধেয় কখনই আধার-শূন্য হন না; মায়ার বশে কখনও কখনও আধারের মনে হয় যে আধেয় কৃষ্ণ বুঝি আপন আসনে নেই। আবার তাই বিরহ, অর্থাৎ কোথাও অনুসন্ধান, ফলে আবার মিলন। এইভাবে তাঁদের আত্মলীলা চলতে থাকে। এই যে একবার মিলন—পরক্ষণেই বিরহ, জীব কি করে ধারণা করবে সে মিলনে কি হয়? বিরহ-ব্যাকুলতাই বা কি? আসলে বিচ্ছেদই জানিয়ে দেয় যে মিলন কি বস্তু। মিলনতত্ত্ব নির্বাক তন্ময়তায় উপলব্ধি হয় মাত্র, তা হোলো অনুভূতির পরাকাষ্ঠা। জীব, রাধা, কৃষ্ণ এই তিনটি বস্তু বোধের মধ্যে যদি ধরা যায় তাহলে কি দাঁড়ায়? পৃথিবীর মানুষ, শক্তি বা প্রকৃতি আর ঈশ্বর,—এই ত্রিতত্ত্ব মূলে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ—স্থূল ভাষায় এইটুকু বলা যায়। মানুষ অরূপ ভাবতে পারে না, চায়ও না রূপ ছাড়িয়ে যেতে। তাই তার রূপ-কল্পনা।

অরূপের রাজ্য কল্পনায় অনুভব করতে পারেন? জ্যোতিও তো রূপ—জ্যোতির আকার, বিস্তার আছে তো? সেই জ্যোতি যদি নিরবচ্ছিন্ন হয় তাহলে আকার থাকবে কি আশ্রয় করে?

প্রথম প্রথম চক্ষু বুজিয়ে যে জ্যোতি দেখা যায় তা দিনমানে সূর্য্যের আলোর প্রতিক্রিয়া। সূর্য্যালোকের যে স্মৃতি আমাদের মধ্যে চিত্রিত থাকে অন্ধকারের মধ্যে তা নানা বর্ণের নানা আকারেই ফুটে ওঠে। ঐ সকল প্রকৃত বর্ণানুভূতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেটে গেলে, তখন ইষ্টে তন্ময়তা থেকে যে জ্যোতিদর্শন হয় তাই যোগীদের ব্রহ্মজ্যোতি।

আর বৈষ্ণবদের? সেই গোলক যেক্ষেত্রে হরি গোলকবিহারী। ঐভাবে সেখানে জ্যোতির্ম্ময় রূপ। রূপপিপাসুরা সেখানেও রূপ দেখেন। অবশ্য শেষে তা আর থাকে না, চৈতন্যে সব কিছু লয় হয়ে যায়। প্রবর্ত্তক অবস্থায় ঐকান্তিক সাধনের ফলে, সাধনে মগ্ন হয়ে অনেক কিছুই দর্শন হয়। সে দর্শনের বর্ণনা ভাষায় করতে গেলেই মিথ্যা হয়ে যাবে, ভুল হয়ে যাবে। কারণ প্রতিপাদ্য শব্দের অভাব আর ভক্তিশাস্ত্রে যে সকল শব্দ সাধক, ভক্ত বা যোগীদের মধ্যে প্রচলিত আছে তা নিয়ে সাধারণ সাহিত্যিক অথবা বহিরঙ্গ কাকেও বুঝিয়ে তদ্ভাবে ভাবিত করা যায় না।

একথা সত্য; পরমহংসদেবও নরেন্দ্র, রাখাল, রামচন্দ্র, বাবুরাম, প্রভৃতি প্রিয়তম ভক্তদেরও বলতে পারেননি। সবাই বসে বসে তাঁর সমাধি দেখেছে কিন্তু তিনি যে কি দেখচেন বা কি অনুভব করচেন তা চেষ্টা করেও বলতে পারেননি। শ্রীচৈতন্যদেবেরও তো ওই ভাব হতো!

রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখি মাইতি, মাধবী প্রভৃতি এদের নিয়ে গম্ভীরায় রাত্রে যখন তিনি রাধাভাবে কৃষ্ণ আবার কৃষ্ণভাবে রাধার রসাস্বাদন করতেন সে বিষয়টি লোকসমাজের ব্যাপার নয়। সাধারণতঃ একজন বৈরাগী, যতই বুদ্ধিমান, যতই বিষয়বিমুখ সৎভাবের মানুষ হোন না,—জপতপাদি বাহ্য সাধনের মধ্যে যতই অগ্রসর হোন না কেন, এমন কতকগুলি তত্ত্ব এবং অনুভূতির কথা আছে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার মধ্যে যা সর্ব্বসাধারণের কাছেও যেমন, ঐ শ্রেণীর সাধকগণের কাছেও তেমনি প্রচারের বিষয় নয়। প্রথমতঃ অনধিকারীরা তা কোনমতেই তৎ-তৎ-স্বরূপে নিতে পারবে না। তার অনুশীলন না হলে, নিজেদের সেভাবে প্রস্তুত করে না নিলে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা বৃথা। পিয়োরিট্যানিক স্পিরিট নিয়ে, সব কিছু অনুভূতি গোপন না রাখার যে ধারণা, সব কিছুই প্রচার বা হাজির করার য়ুরোপীয় নীতি, অনধিকারী অধিকারী ভেদ বিবর্জিত হয়ে সব কিছু প্রকাশিতব্য—এটা ভারতীয় ঈশ্বরবাদ বা ধর্ম্মতত্ত্ব বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বা রসতত্ত্বের বিষয় নয়। যেমন ধরুন, বেদান্তের প্রতিপাদ্য

বিষয় সাঙ্খ্য দর্শনের ভিত্তি থেকে শুরু ক'রে ক্রমে ক্রমে অদ্বৈত-তত্ত্ব বিবরণ—সাধারণ ভাষা দিয়ে যতটা সম্ভব প্রকাশ করা গেল, অধিকারী বিচারক্ষম পণ্ডিত যাঁরা উচ্চ তত্ত্বসকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণনিপুণ, নির্ম্মলচিত্ত, যাঁরা উপযুক্ত তাঁদের বুঝালেন, তাঁরাও যতটা সম্ভব বুঝলেন। তারপর অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু বা পরমাত্মার স্বরূপের কথা যখন এল তখন কি ভাষায় বুঝাবেন ? তখন চুপ করতেই হবে। যাকে বুঝতে হবে তাকে তৎতৎভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, সেইভাবে ব্যাকুল হয়ে মগ্ন হতে হবে তবেই বুঝবেন ঐ সত্য পরম অব্যক্ত, মানুষ ভাষায় কখনও তাকে প্রকাশ কর্ত্তে পারবে না। যিনি ডুববেন তিনি পাবেন।

২৩

আমি—তাহলে ধর্ম্মতত্ত্ব, জন্ম মরণশীল মানবের যেটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার—যতই আলোচনা করা যায়, যতদূর মানুষের জ্ঞানানুভূতির কথা চলে তাতে এই কথাই কি প্রমাণিত হয় না যে, আসলে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বা ঈশ্বর উপলব্ধি সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ব্যাপার ?

তিনি—এ বিষয়ে সংশয় কোথা ? আত্মা বা ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি—এই অসংখ্য জীব-সমাজে দল বেঁধে হবে কেমন করে যখন বর্ত্তমান কালে, জগতের সকল মানবসমাজ স্বার্থ, ভোগ আর সাম্যহীন ধনমদে অচৈতন্য ? অবশ্য মাত্রাভেদ আছে। এমন নির্ম্মল চরিত্র, নির্ম্মল মন, বুদ্ধি ভোগরতি ও স্বার্থপরতাশূন্য মহাপ্রাণ মানুষ কোথা ? তাই না কোনো সমাজে, কোনো কালে একজন যথার্থ সত্যসন্ধ, আপ্ত পুরুষ জন্মালে তাঁর জীবিতকালে কিছুটা, তারপর তাঁর তিরোভাবের পর বহুলাংশেই মানুষসমাজের টনক নড়ে ওঠে, হায় হায়, একজন দিব্যভাবের মানুষ এসেছিলেন আমাদের মধ্যে—আমরা এতটা স্থূল-বুদ্ধি যে তাকে বুঝতেই পারিনি ! তখন হায় হায় পড়ে যায়,—অতঃপর অনুসন্ধান চলে কি রেখে গেলেন তিনি ; কোন্ তত্ত্ব আবিষ্কার করে নিজ জীবনে আচরণে ও ব্যবহারে প্রকাশ বা প্রচার করে অপরিশোধনীয় ঋণে আমাদের আবদ্ধ করে গিয়েছেন। মানবসমাজের গতি কতক অংশে চিন্তা-শীলতার পথে তাঁর ক্রিয়া-কর্ম্ম ও উপদেশ বিশ্লেষণে মুখর হয়ে উঠলো। কিন্তু দেখা গেল ঐ মহাপুরুষের আবিষ্কৃত তত্ত্ব তাঁর ভক্ত বা শিষ্য একশ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হলেও তাদের মধ্যেও বিচার এবং অনুভূতির তারতম্য অগাধ ; শেষ পর্য্যন্ত তাঁরাই প্রকাশ বা প্রচার করলেন যে আমরাও সম্যক ধারণা করতে

পারিনি তাঁর উপলব্ধ সত্য। তবে আমরা তাঁর কৃপা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি, কেউ কেউ তাঁর ব্যবহার্য্য জিনিস পেয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সৃষ্টির ক্রম দেখলেই ত বুঝতে পারা যায়, প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন—মন, বুদ্ধি, ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি পর্য্যন্ত। তাই সব কাজ দল বেঁধে হতে পারে, চুরি ডাকাতি, ঘর জ্বালানো, নারীধর্ষণ হত্যাকাণ্ড স্বার্থগত যা কিছু,—রাজ্যজয়, রাজ-প্রতিষ্ঠা, সভা-সমিতি ব্যাঙ্ক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যা কিছু স্থূল বা সূক্ষ্ম প্রয়োজনবোধ থেকে উদ্ভূত, এসব দল বেঁধে হয়। মানুষের দল সকল সমাজেই বাঁধা—সৎভাবে সমাজনীতিতে বাঁধা, গার্হস্থ্যধর্ম্মের মূল কথা কেউ কারো ক্ষতি করবে না, সবারই সুখে থাকার ব্যবস্থা—এসব দল বেঁধে হয়। স্বার্থসম্পর্কীয় সব কিছুই এক নীতির অধিকার পর্য্যন্ত সম্প্রদায়গত হতে পারে,—কিন্তু যেখানে নরনারী : সম্পর্কের প্রীতি বা প্রেমের জন্ম—তা দলবদ্ধ বা সম্প্রদায়গত নয়, সেখানে ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর অধ্যাত্ম ধর্ম্মও ঠিক তাই। সৃষ্টি,—ঐকান্তিক প্রেমের ফল—সৃষ্টির মূল প্রেম,—কাম হোল প্রেমের বিকৃতি।

আমি—সত্য, এই প্রেমের ব্যাপার, মানুষ যৌবনে যে বস্তু প্রথম উপলব্ধি করে—সেই প্রেম কামজ হলেও—তার মধ্যেও কতটা ত্যাগ,—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন,—ওর মূল কিন্তু অধ্যাত্ম। সুস্থ যৌবনে পুরুষ মানবের যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম শক্তি ও স্বাস্থ্যপূর্ণ, মন ও বুদ্ধির সকল ক্রিয়া স্ফূর্তি-জনক হয়, তখনই নিজ সত্তার উপর প্রবল আস্থার ফলে জীবনের সার্থকতা অনুভব,—অপ্রতিহত সাফল্যের আশা—বীর্য্য ও মাধুর্য্যে চিত্তে তার স্বর্গের আস্বাদ কিন্তু সাধারণ মানুষ—প্রকৃতির গতিতে তার জীবনধারা যে বাঁধা—তার অধিকার অনুসারে ভোগ প্রবৃত্তির আকর্ষণে নারীসঙ্গিনীর প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ফলে ঘটে প্রায় মিলনের যোগাযোগ। স্থূল-বুদ্ধি যাদের তারা সৃষ্টি বৃদ্ধির পথেই চললো, কারো বা স্বার্থজড়িত কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হোলো ;—হয়তো মন থেকে অনেক কিছু আবর্ত্ত সৃষ্টি করলে কর্ম্ম উপলক্ষে, তারপর যার উচ্চ জন্ম, অভিজ্ঞতার অধিকারে মনের সীমা ছাড়িয়ে বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করে এই যৌবনের সূত্র ধরেই তার অধ্যাত্ম-চৈতন্যের স্ফুরণ হতে গেল—ফলে তার শক্তি তাকে জ্ঞান বা মুক্তির পথে নিয়ে গেল প্রকৃতির নিয়মেই ;—যার শেষ পরিণতি তত্ত্বজ্ঞানেতে বা ইষ্টলাভে।

জগতে এখনও ঐ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়নি। এই তত্ত্বের আলো ধর্ম্মজগতে একসময় প্রকাশিত হবেই। তাই না এই সকল অপার্থিব সম্পদ লুপ্ত হয়নি,

এখনও ভারতের ভাণ্ডারে ধরা আছে। অধ্যাত্ম বিদ্যা বা বিজ্ঞান গুরুমুখী। অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বা গুরু যাঁরা, নিজ ইষ্টলাভের পরে উপযুক্ত অধিকারী পেলে তাকে ঐ সিদ্ধমন্ত্র দিয়ে যেতে পারেন এবং তা দিয়েও থাকেন, যার ফলে অধিকারী সাধকের পক্ষেও সেই তত্ত্বলাভ সম্ভব হয়; এই ধারা আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনেও এর প্রমাণ আছে। ঈশ্বরপুরী গোসাঁইয়ের কাছ থেকে ঐ সিদ্ধমন্ত্র যখন তিনি পেলেন ঐ সিদ্ধমন্ত্র তাঁর ক্ষেত্রে পড়ে কি ভাবের ক্রিয়া উৎপন্ন করেছিল, তা তাঁর জীবন ইতিহাসের পাতায় ধরা আছে। সেই দাম্ভিক নিমাই পণ্ডিতের কি অদ্ভুত অবস্থান্তর ঘটলো, প্রেমের উন্মাদনায় তাঁর গার্হস্থ্যজীবন ওলটপালট করে তাঁকে জাতিকুলের মোহ কাটিয়ে পথে বার করে ছেড়েছিল। তারপর তাঁর জীবিতকালের মধ্যে কত শত সহস্র ব্যক্তি বা অধিকারী ভক্ত তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে ঐ মন্ত্র। শ্রীচৈতন্যের শক্তিসঞ্চার-তত্ত্ব এ জগতের কত বড় এক বিস্ময়, ভবিষ্যৎকালে বিজ্ঞানজগতের আলোচনার জন্য তোলা রইল। থাক সেকথা এখন, সেই মন্ত্রশক্তি তাঁর কাছ থেকে সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে—তারপর তাঁদের উপযুক্ত শিষ্য পরম্পরায় পেয়েছেন। এখন শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে, ঐ সিদ্ধমন্ত্র যাঁরা যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও সেই সেই ভাবের বিকাশ, সেই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি যে নিশ্চিত হয়েছিল সে বিষয়ে আর সংশয় কোথায়? এ সকলও প্রকৃতির সহজ নিয়মেই ঘটেছে, প্রকৃতির যে নিয়মে সৃষ্টির সকল কর্ম্ম চলছে,—জীবের ঈশ্বরানুরক্তিও প্রকৃতির সেই সহজ নিয়মেই ঘটে থাকে।

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার বলি অথবা স্বয়ং ভগবান যাই-ই বলি না কেন, আমাদের এই মানুষসমাজে সাধারণতঃ প্রকৃতির যে নিয়মে মানবচৈতন্যের মধ্যে ধর্ম্ম বিবর্ত্তন ঘটে তাঁদের মধ্যেও দেখতে পাই সেই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। অবতারকল্প সিদ্ধ মহাপুরুষ বা পরমহংস যাঁরা, সবার জীবন লক্ষ্য করে দেখবেন, লোকসমাজের গোচরে হোক বা অগোচরেই হোক, সাধনক্রম তাঁদের ঠিকই আছে—চিরদিনের ছক-বাঁধা প্রকৃতির নিয়মানুগ হয়েই তাঁদের প্রত্যেককে চলতে হয়েছে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা পরমার্থতত্ত্ব গুরুমুখী,—সুতরাং দেহধারী মাত্রেই ঐ নিয়মে তাদের অগ্রগতি। তাই আমরা এটা সর্ব্বত্রই দেখতে পাই যে, অন্তরের মধ্যে কোন জীবের গতানুগতিক এই মিথ্যাপূর্ণ সংসারে অরুচি; এবং সত্য-লাভের জন্য একটা ব্যাকুলতা এলে তখন কোন তত্ত্বজ্ঞ বা আপ্তপুরুষের সঙ্গে

তাঁর যোগাযোগ ঘটে। তারই ফলে, তার সত্য নির্ণয়ের পথে গতি নির্দ্ধারিত হয়, চিত্ত স্থির হয় এবং সিদ্ধিলাভের পথ সুগম করে।

আমি বলিলাম,—এই তথ্য আমি পূর্ব্বে কয়েকটি মহাত্মার কাছেও পেয়েছি, আর এ সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। এখন এইটুকু বুঝিয়ে দিন, সকল মন্ত্রই কি একই বস্তু নির্দ্দেশ করে?

তিনি বলিলেন,—তা কি করে হবে? প্রথম স্বরবর্ণ আকার থেকে ব্যঞ্জনবর্ণের হ কার পর্য্যন্ত বর্ণমালা সবই তো মন্ত্র, কেতাবে ছাপা হয়ে গেছে, কৈ আপনি তার মধ্যে থেকে ইচ্ছামত নিয়ে সাধন করে দেখুন না প্রত্যেকটি কি বস্তু নির্দ্দেশ করে?

শুনিয়া আমি বলিলাম,—কথাটা হয়তো আমার ঠিক বলা হয়নি, আমি এইটিই জানতে চেয়েছিলাম,—সকল বীজমন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু কি একই?

তিনি—তা কি করে হবে? গোড়ার কথাটা এখানে ভুললে চলবে না। ধরতে হবে, তা এই যে, মানুষ যা ভিন্ন ভিন্ন বীজও তাই। আর এটাও জানা উচিত যে বীজ হল শক্তি, বীজ কখনও ঈশ্বর বা ভগবান বা ব্রহ্মবস্তু নয়। সাধকের প্রকৃতি অনুসারে বীজের ক্রিয়া, যেমন ক্ষেত্র অনুসারে বীজের ক্রিয়া, যেমন ক্ষেত্র অনুসারে বীজের কাজ। বীজের শক্তি বলতে এখানে এই বুঝতে হবে যে, চৈতন্য সিদ্ধ বীজ অর্থাৎ যে বীজমন্ত্র পেয়ে সাধক নিজশক্তিতে চৈতন্য সঞ্চারিত করেছেন, তাইতেই সে বীজ শক্তিশালী এবং জাগ্রত হয়ে অভীষ্ট ফল দিতে পারে। প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটি যেমন বীজের মধ্যে সঙ্কুচিত থাকে এটা স্থূল পদার্থ পর্য্যায়ের দৃষ্টান্ত; যে শক্তিতে একজন অধিকারী বা সাধকের ইষ্টলাভ হবে জাগ্রত বীজমন্ত্রের মধ্যে সেই মহাশক্তি নিহিত আছে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়লেই আমরা তার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি। বীজমন্ত্রের সাধনফলে সাধক তাঁর ইষ্টমন্দির দ্বারে পৌঁছে যান,—ঐ দ্বার পর্য্যন্তই বীজমন্ত্রের গতি। তারপর সাধকের ইষ্টলাভ, তত্ত্বলাভ বা সত্যলাভ—তাকে যাই বলুন না কেন, দ্বার ভেদ করে মন্দির প্রবেশ ও ইষ্টের মিলন,—সে কথা সাধকের নিজের ব্যক্তিগত কথা, আমাদের পক্ষে তা একেবারেই অবান্তর। আমরা বাইরে থেকে আমাদের বর্ত্তমান ক্ষুদ্র, ভোগায়তন শরীর মন, স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি নিয়ে কিছুতেই সেই পরাবস্থার ইতি করতে পারবো না।

এতটা শুনিয়াও একটু আবদারের ভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম,—কেন আমরা বুঝতে পারবো না?

তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ কোনও কথাই কহিলেন না। ঠিক যেন আমায় এইটুকু বুঝিবার অবকাশ দিলেন যে আমি কতটা অসংযত-বাক, এবং আমি কি অসংগত প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছি। যখন সত্যিই তাঁর এই ইঙ্গিতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিলাম, ঠিক তখনই তিনি প্রসন্ন মনে বলিলেন,—এটি কি এখনও বুঝতে পারেননি যে,—যে মহাভাগ্যবান, শক্তিশালী আধার, ঈশ্বর-তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করতে চলেছেন যে সাধক—তাঁর শরীর, তাঁর মন, তাঁর সত্তার তখনকার চৈতন্যময় অবস্থা, তাঁর হৃদয়মন, তাঁর সাধনগতিতে ক্রমে ক্রমে কতটা উচ্চভূমিতে আরূঢ় অবস্থায় ইষ্টমন্দির দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছেচেন; আপনি আমি কি সে অবস্থা কল্পনা করতে পারি? তা যখন সম্ভব নয়—

বাধা দিয়া আমি বলিলাম,—আর বলবেন না, আমি অনুতপ্ত।

না, না, সে কথা নয়,—অনুতাপের কথা কেন এখানে? আসলে অধ্যাত্ম-বিদ্যার কতকগুলি প্রাথমিক তত্ত্বকথা বড় সহজেই শুনতে পেয়েছেন কিনা তাই আরও তারপর—তার শেষটা জানতেও কৌতূহল অদম্য হয়ে পড়েছিল, তাই না মুখে ঐ কথাটা আটকালো না, ফট্ করে ব্যক্ত করতে পারলেন? যদি কখনও সে সৌভাগ্য হয়, সিদ্ধমন্ত্র পেয়ে স্তরে স্তরে ঐ ভূমিতে উঠতে পারেন, তখনই ঠিক ঠিক বুঝবেন অবস্থাটি—সত্যিই অনির্ব্বচনীয়। এই জন্যই মহাপ্রভু ইষ্ট-গোষ্ঠীর কথা সমপর্য্যায়ের সাধক বা ভক্তদের মধ্যেই রাখতে উপদেশ করেছেন। না হলে ভাব নষ্ট হয়, বোঝেন তো?

আমি সসংকোচে বলিলাম,—তান্ত্রিকদের সাধন কিছু কিছু দেখেছি, সেই জন্য আমার মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের (তাঁর গম্ভীরার অন্তরঙ্গ স্বরূপ রামানন্দ বা শিখি মাইতি এঁদের কথা নয়) রূপ সনাতন, শ্রীজীব, প্রবোধানন্দ, লোকনাথ, ভূগর্ভ, রঘুনাথ প্রভৃতি যাঁরা যথার্থ তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত ও বৈষ্ণবভাবে উদ্বুদ্ধ এবং বৃন্দাবনের মোহান্ত বোলে পরিচিত তাঁদের সাধনপ্রণালী কি ভাবের জানতে একটা আন্তরিক প্রবল বাসনা বহুদিনই আছে,—আজ আপনাকে পেয়ে যেন বাধাহীন সহজ আকাঙ্ক্ষা ঠেলা দিচ্ছে, ফলে এতটা নিঃসঙ্কোচ হতে পেরেছি, তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন?

আমার কথা শুনিয়া সরল মৃদু হাসিতে আমার মনের সকল সঙ্কোচ, তখনকার সকল গ্লানি উড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—যখন নিশ্চয়ই বুঝেছেন বলে নিশ্চিত বুঝিয়ে দিলেন, তখন আর অনিশ্চিতের সম্ভাবনা কোথা?

গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রধান আমাদের মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গ বলে যে সব মহাত্মার নাম করলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ভুবনপাবন, মহাশক্তির আধার, তাঁরাই তো বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাঁদের বৈরাগ্য, ত্যাগ তিতিক্ষা ও সংযম—এক কথায় তাঁদের সাধনজীবন অসাধারণ, অভিনব—পূর্বাপর প্রচলিত সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য এবং সাধনপ্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য,—তাঁদের ইষ্টরতি, তাঁদের দৈনন্দিন সাধনাবস্থায় জীবনযাপনপ্রণালী এমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ রহস্যময়,...তারপরে সিদ্ধির পরবর্ত্তীকালে,—মনোহর প্রচার-পদ্ধতি আলোচনায় মন পবিত্র হয়। তাঁদের সকলকার জীবন-কাহিনী সংগৃহীত হলে অপর একখানি মহাভারতের মতই আশ্চর্য গভীর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হতে পারে। আধুনিক ধর্ম্মরাজ্যে তাঁদের সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল কিছুই মহাশক্তির উৎস। বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকেই উদ্ভাসিত একথা এখনকার পণ্ডিতবর্গ সবাই জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামীগণের গ্রন্থ-সকলের মধ্যে এমনই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, নাহলে ভগবতের তাৎপর্য্য গ্রহণ করাও সহজ হোত না, তারপর শ্রীচৈতন্যের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের গুহ্য তত্ত্বও বোধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরবর্ত্তী সাধক সমাজেরও অগোচরেই থেকে যেতো। তবে শ্রীমদ্ভাগবতের উপর ভিত্তি হলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বৈষ্ণব আচার্য্যদের গ্রন্থ, সাধারণ শিক্ষিত যারা, প্রেম ভক্তি বা হৃদয়ের উৎকর্ষহীন এখনকার বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতজনের জন্য নয়,—বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বপিপাসু উচ্চ হৃদয় না হলে কেমন করে সেই দুর্লভ তত্ত্বসকল একজনের বোধগম্য হতে পারে?

আমি মুগ্ধ হইয়াই শুনিতেছিলাম, আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের মধ্যে এত বড় একটি বিরাট ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়া গেল--মাত্র ছয় শত বৎসরের মধ্যেই বোধ হয় যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে,—এখনও আমাদের শিক্ষিত সমাজের এই মহান সাহিত্যসম্পদের উপর লক্ষ্যই পড়ে নাই।

তিনি বোধ হয় আমার মনের কথাটি বুঝিয়া বলিলেন,—একটা কথা জেনে রাখুন, এমন দিন শীঘ্রই আসচে যখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম ও তার সাধনপ্রণালী, প্রাচীন কালের এবং তখন থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পরিণতির ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অনুসন্ধানে তৎপর হবেন। তার ফলে সারা জগতের ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হবে। তার প্রমাণ আমরা এখনই পাচ্চি,—আপনি এটা

লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, বর্ত্তমান শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় ক্ষেত্রেই এদেশের বিশেষতঃ তন্ত্র এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধিৎসা অসাধারণ ভাবেই প্রকাশ পাচ্চে। এ দেশের শিক্ষিত যারা, আমাদের কি ছিল; এইটাই মূল প্রশ্ন তাঁদের। দুশো বছর ধরে—এই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রাণের তৃপ্তিকর কিছু না পেয়ে, তারপর বর্ত্তমান সভ্যতার নামে মহা-পাশবিক প্রজা ধ্বংসের আকার প্রকার দেখে এক গভীর নৈরাশ্যের ফলেই উদ্ভূত এই অনুসন্ধিৎসা, একথা আমার দৃঢ়মতেই ধারণা জন্মেছে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে। পাশ্চাত্ত্যেও মনীষীগণ তাঁদের নিজ দেশের সভ্যতার রূপ দেখে নিরাশ হয়ে—কোথা শান্তি কোথা প্রীতি বোলে ব্যাকুল প্রাণে চারিদিকেই লক্ষ্য করছেন। কোথা সেই সত্যের আলো যে আলো এই সভ্যতার ঘোরান্ধকার থেকে মানুষ-সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে,—এই তথ্যই এখনকার সকল সমাজের প্রজাবর্গের,—কেমন করে এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, সমাজনীতি তথা আত্মরক্ষার নামে পরপীড়ন নীতি থেকে বাঁচা যায়, এই হয়েছে সকল সমাজের আকাঙ্ক্ষা এবং অভীষ্ট বস্তু।

২৪

আমি বলিলাম,—এক কথায় জীব ও ঈশ্বর, ভক্ত ও ভগবান অথবা মানুষের সঙ্গে বিশ্বস্রষ্টার যা কিছু গভীর সম্বন্ধ থাকতে পারে তা ভগবত-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেই দেখিয়েছিলেন, শ্রীচৈতন্য তারই পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন মধুর অথবা কান্তভাবের মধ্যে। আবার তারই চরম অভিব্যক্তি হল রাধাভাবে;—কেমন এই তো শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মূলতত্ত্ব?

আমার কথা শুনিয়া তিনি কিছুই বলিলেন না। তাঁহার ঐ ভাব দেখিয়া আমি একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম, যেন দম্ভ প্রকাশ পাইয়াছে মনে হইল, তৎক্ষণাৎ সংশোধনের উদ্দেশ্যে বলিলাম,—অতীব গুহ্য ঐ পরম তত্ত্ব গভীরতম বস্তুর প্রতি লক্ষ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়,—শক্তি না থাকলেও মোটামুটি কথাটা জেনে রাখা ভালো, এই মনে করে বলেছিলাম।

এইবার অখিলবন্ধু বলিলেন,—মহাভারতের যুদ্ধ, তারপর বৌদ্ধ-ভারতের ইতিহাস, সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রধর্ম্মে প্রভাবিত ভারত,—তারপর তারই ব্যভিচারের মুখে শঙ্কর, রামানুজ মাধবাচার্য্য প্রভৃতি আবির্ভূত হয়ে ভারতের নানা শাস্ত্রের নানা ব্যাখ্যায় সমাজকে শান্ত রাখা- তার পরও কত কত ঐতিহাসিক রাজাধি-

রাজের অধিকার, এই দীর্ঘকালে ভারতভূমির সকল সমাজের মধ্যেই কত রকমের ওলটপালট হয়ে গেল,—বৈষ্ণবধর্ম্ম বেঁচেছিল রামায়ৎ সাধু উত্তর ভারতের ও গৌড়ীয় বিষ্ণু উপাসক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়টি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে। কিন্তু মহাভারতের কেশব অথবা ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীমৎভগবত-গীতার উপদেষ্টা পার্থসারথির কথা ভারতের হিন্দুরা প্রায় ভুলেই ছিলেন দীর্ঘকাল—কেবল তখন স্মৃতির মধ্যে মথুরায় কেশবজী, দ্বারকায় দ্বারকানাথ বিট্‌ঠল আর উড়িষ্যার জগন্নাথের মন্দির—এর মধ্যেই তাঁর অস্তিত্বটুকু কোনরকমে বজায় ছিল। সুতরাং ব্রজ বা বৃন্দাবন আর ব্রজেশ্বরকে মনে রাখতে পারেনি সাধারণ অসাধারণ ভারতের নানা ধর্ম্মমার্গের মানুষ, মধুর কৃষ্ণনামটি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিল। মন্দিরস্থ বিগ্রহের পূজাপাঠও গতানুগতিকভাবে চলছিল, তার মধ্যে প্রাণ ছিল না। তারপর বৌদ্ধ ভারতের শিল্প-গৌরবময় যুগের শেষদিকে উত্তরাখণ্ডের উপর সেই যে বর্ব্বরতা, বিজাতীয় বর্ব্বর দস্যুদলের চরম অত্যাচারে হিন্দুমন্দির লুণ্ঠন, ধ্বংসের উন্মাদনা, বিশেষত শিল্পমহিমায় উজ্জ্বল মথুরার কেশবমন্দির তৃতীয়বার ধ্বংসের পর আর নির্ম্মাণ হল না, বৃন্দাবনও তো অজগর বনের পর্য্যায়ে পড়েছিল। মথুরার সে রত্নমণ্ডিত কেশবমন্দিরের আর কোন চিহ্নই নাই। আসল কথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়টাই অত্যন্ত সঙ্কুচিত, আর ঐ প্রেমের ঠাকুরটি কয়েকটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ ঐকান্তিক ভাব ও ভক্তি-প্রবণ পুরী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যে ধুক-ধুক করছিলেন। এমনই অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। যথাসময়ে ঐ পুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে সিদ্ধ-মন্ত্র নিলেন। তারপর ঐ কৃষ্ণ নামটিতে এমনই চুম্বকশক্তি প্রয়োগ করলেন—যার ফলে বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে প্রাণের ক্রিয়া তরতর ধারায় আরম্ভ হয়ে গেল; নামের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ অধ্যাত্মশক্তির পরশে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো দেশের বৈষ্ণব সমাজ, চব্বিশ বৎসরের যুবা মূর্ত্তি,—তিনি এসে দাঁড়ালেন সবার সামনে, সারা ভারতের মুহ্যমান ধর্ম্মসমাজ তাঁকে প্রত্যক্ষ করলে। তখন তিনি করলেন কি, সবার দৃষ্টি সবলে আকর্ষণ করে ঐ প্রেমের ঠাকুর, জীবের পরম গতি পরমাশ্রয়, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় রূপের পাদে ফিরিয়ে দিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠলো ভারতের জনগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল মূর্ত্তি। তাঁর এই যে প্রভাব, দ্বিভুজ মুরলীধরের রূপ আর কৃষ্ণ নামটির প্রভাব এখনও কিছুমাত্র যে কমেনি তার প্রমাণ শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, এখন পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সমাজের দৃষ্টির সম্মুখে শিল্প, কাব্যসাহিত্য ও

সঙ্গীতে, হিন্দুজাতির সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্র পূর্ণ করে প্রধান পুরুষরূপে জ্বল জ্বল করছেন।

ঐ গেল একটা দিক,—

তারপর আর একটা দিক,—বৃন্দাবন আবিষ্কার, সে যে কি কঠিন কাজ, তার হিসাব এখনকার দিনে সম্ভব কি? শুধু এইটুকুই আমরা ধারণা করতে পারি যে ঐ কাজে গোড়া থেকেই তাঁর মনটি পড়ে ছিল। সে কর্ম্ম কি সহজ? তখন তিনি গার্হস্থ্য আশ্রমে.—প্রেমের প্রথম জোয়ার, নবদ্বীপের শ্রীবাসের আঙ্গিনায়, প্রেমের আলো জ্বালিয়ে নিত্য নিত্য বৈকুণ্ঠের ভাবে নাটের লীলা চলছে। এইবার পথে বার হবেন কাঁথা করঙ্ক নিয়ে ঐ প্রেমের দেবতাকে সবার গোচরে এনে দিতে প্রেম ধর্ম্মহীন ব্যভিচার-প্রবণ দেশের সমাজে,— ভিতরে ভিতরে তার আয়োজন চলচে। তখন সর্ব্বপ্রথমে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে পেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিঃসঙ্কোচ, ভবিষ্যৎ বৈষ্ণব মহাজনদের আশ্রয়,—ধ্যান ও সমাধির স্থান ব্রজভূমি আবিষ্কারের কাজে পাঠালেন। শক্তিসঞ্চার করে তাদের দৃঢ় অনন্যকর্ম্মা এবং উপযুক্ত করেই পাঠালেন। তারা চলে গেল—যেন চৌম্বকশক্তি লৌহকে টেনে নিয়ে গেল। তাঁদের বৃন্দাবনে উপস্থিতি এবং আমরণ প্রেমমার্গে সাধনের ইতিহাস সাধারণের মধ্যে অজ্ঞাত। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে সংসার ত্যাগ করে নীলাচলে কাটালেন কিছুকাল; তারপর বার হলেন দক্ষিণের পথে। দুই বৎসর ধরে সারা দক্ষিণ হয়ে পশ্চিম ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ, যার নাম যজানো। তীর্থভ্রমণের নাম করে সর্ব্বতীর্থের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে প্রেমধর্ম্মের সুধায় ভারতের মাটি ও মানুষকে সঞ্জীবিত করে আপনাকে বিলিয়ে এলেন ঐ দু বৎসর ধরে, কেউ বাদ গেল না। সে শক্তি সঞ্চয়ের ইতিহাস এখনকার কজনের জানা আছে? তারপরে আবার ফিরে এলেন নীলাচলে।

দুই বৎসর পরে যথাকালে স্বয়ং বৃন্দাবন যাত্রা করলেন বারাণসী হয়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পথে। বৃন্দাবন এসে যা করবার তা করলেন। কিসের টানে বৃন্দাবন থেকে যে ফিরে গেলেন তা তিনিই জানেন. আমরা কেবল এইটুকুই জানি যে মধ্যপথে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, প্রবোধানন্দ প্রভৃতি এঁদের পাঠালেন বৃন্দাবনে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ছাপ মেরে, তারপর ক্রমে ক্রমে রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি ভুবনপাবন মহাপুরুষগণের আগমন, বৃন্দাবনে নিজ নিজ স্থান নির্ব্বাচন ও গভীর ধ্যানে ডুবে যাবার পালা। তাঁদের সাধন ও সিদ্ধির

জীবন জগতের ধর্ম্ম ইতিহাসের মধ্যে অভিনব ও পরম বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। তারপর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বৃন্দাবনের সব কিছুই যেন জেগে উঠলো। দেখতে দেখতে লুপ্ত বৃন্দাবন সারা ভারতের প্রধান আকর্ষণের বস্তু হয়ে গেল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যবহারিক স্মৃতিশাস্ত্র, মহাকাব্য ও দার্শনিক অমূল্য তত্ত্বগ্রন্থসকল, বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পূর্ণ প্রণয়ন করা হলো ঐ শ্রীবৃন্দাবনের মাটিতেই,—শেষে গৌড়ের ধন গৌড়ে এসে পৌঁছে গেল অতীব রহস্যজনক অদ্ভুত নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। তারপর আর কি, বাঙ্গলায় তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে মহাকীর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে অমরার আবহাওয়ার সৃষ্টি। বাঙ্গলার সৌভাগ্যের সীমা কোথায়—শুধু বাঙ্গলার কেন, সমস্ত উত্তর ভারতভূমি শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে ভরে উঠলো, দেশের হৃদয়ে মনে এক শক্তিময় প্রেমশক্তির উৎস খুলে গেল। সে কথা যাক, এখন এইটুকুই দেখতে হবে যে ঐ আটচল্লিশ বছরের জীবনে মূলতঃ কি পেয়েছিলাম আমরা,—ধর্ম্মের গুহ্যতম আদর্শের কথা ছেড়ে দিয়ে যে অংশ থাকে তা সবাই কি ধরতে পারবে? বৃন্দাবন আবিষ্কার আর সেই তীর্থের মধ্যে ভুবনপাবন মহাপুরুষগণের যে আবির্ভাব তাঁদের দান সব কিছুই শ্রীচৈতন্যের নিজ দান। প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাসে তুলনাই নাই, সুতরাং দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝবার চেষ্টা না করে শুধুই একটু গভীরভাবে ভেবে দেখতেই বলব।

* * * *

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, কামাখ্যায় মহাতান্ত্রিকদের অভিচার এবং বীরাচারের আড্ডায় এমন একটি বৈষ্ণবের সঙ্গের আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিলাম যে বাবা উমাপতির আশ্রমে যাওয়া কয়দিনের জন্য আমার বন্ধই রহিল। আজ সকালে অর্থাৎ ভোজন-সময়ে নীচে কামাখ্যা মন্দির পার হইয়া পাণ্ডার ঘরে যাইব, মন্দিরের সামনেই উমাপতি বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি আনন্দে আমায় আলিঙ্গন করিলেন। পিছনে এলোকেশী মাতা ছিলেন। আমি যে কয়দিন যাইতে পারি নাই এ সম্বন্ধে বাবা কিছুই বলিলেন না—কিন্তু এলোকেশী ছাড়িলেন না, তিনি বলিলেন,—এবার খুব ভাল মনোমত সাধুই পেয়েছেন।—বুঝিলাম দিগু ঠাকুর সব ফাঁস করিয়াছেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—জানতেই তো পেরেছেন।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—উনি কার কাছে গিয়েছিলেন—তুমি জানলে কি করে?

জানি। উনি আজকাল অখিলবন্ধুর কাছেই যাওয়া-আসা করছেন।

বাবা বলিলেন,—বৈদান্তিক সাধু,—আমার সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছিল। বেশ সরল মানুষ, ওঁর বৃন্দাবনেও একটি আশ্রম আছে না?

বলিলাম,—হাঁ, আমিও শুনেছি।

বাবা বলিলেন,—তোমার শরীরের দিকে একটু নজর রেখো বাবা, যেন দুর্ব্বল দেখাচ্ছে।

আমি বলিলাম,—সত্যই মাথা, গা-গতর বড় ভার-ভার লাগে; যেন জ্বরভাব মনে হয় সকালের দিকে।

তিনি আর কিছু না বলিয়া চলিলেন মন্দিরের মধ্যে, প্রবেশের পূর্ব্বে কেবল আমায় বলিলেন,—সাবধান।

এলোকেশী বলিলেন,—সেটা ওঁর কুষ্টিতে লেখা নেই। বলিয়া বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিলেন। আমিও একটু চিন্তিত হইলাম, সত্যই শরীর আমার ভালো নয়। এখানে আবার অসুখে পড়িব নাকি?

যথাসময়ে পাণ্ডার বাড়ি গিয়া যথাস্থানে বসিলাম, গৌরী থালা হাতে অন্ন লইয়া আসিল। ভোজনে বসিয়া গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমায় কি খারাপ দেখাচ্ছে?

সে বলিল,—হাঁ, আপনি রোগা হয়ে গেছেন, কালো হয়ে গেছেন—এই কদিন ধরেই দেখছি। ভাল কথা, একখানা চিঠি এসেছে আপনার, বলিয়া চলিয়া গেল ও ভিতর হইতে একখানি খাম আনিয়া দিল। দেখিলাম বন্ধু মদনমোহনের লেখা।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলাম। চিঠি খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, বাবা মুক্তিনাথের কথা লিখিয়াছে, তিনি আমায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। আর যে সব কথা সে তো কেবলই বন্ধুত্বের অনুরোধ,—ঘরে এসে সংসারধর্ম্ম করো সহধর্ম্মিণী স্ত্রীকে লইয়া, তাহা হইলেই সবাই খুশি হইবে।

উপরে পৌছিলাম, দেখি দিগু ঠাকুর আজ বড়ই ব্যস্ত। তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে, বারকোশ পূর্ণ করিয়া নানাপ্রকার উপকরণ গর্ভগৃহে লইয়া যাওয়া হইতেছে, দুই তিনজন উট্‌কো ভৈরবমূর্ত্তি আমার আসনের উপর বসিয়া মহাস্ফূর্ত্তিতে নানা কথায় ব্যস্ত—দেখিয়া আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। দিগু ঠাকুর আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আমায় শুনেন—বলিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল মন্দিরের পিছনের দিকে। সে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলিল,—দেখেন বাবা, আজ এখানে অভিচার ক্রিয়া হবে, আপনাকে আগে জানায়ে

রাখি, অবশ্য রাত্রে আপন আসনই শুইবেন, আর ভিতরে ক্রিয়া-কর্ম্ম যা কিছু চলিবে—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—অভিচার-ক্রিয়া কি জন্য ?

দিগু বলিল,—আমি তো সব ঠিক জানি না ; তবে শুনচি যে নীচে একজন নাকি কঠিন বেরামে পড়েছে তাই—তার জন্যই ক্রিয়া হবে, তার ছেল্যাই সব কিছু খরচপত্র করচে।

আমি বলিলাম,—অসুখ আরোগ্যের জন্য অভিচার-ক্রিয়া,—এ তো কখনও শুনি নি।

দিগু ঠাকুর এবার যেন একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিল,—শুনেছি সে বুড়া মারা গেলে অনেক টাকার মালিক হবে যে—এই ক্রিয়া-কর্ম্ম করাচ্ছে তার সেই পুত্তুর। নীচে একথা আর কেউ জানে না, সেখানে বলা হয়েছে যে স্বস্ত্যয়ন-শান্তি হচ্চে।

বৃদ্ধ পিতাকে আপদ-জ্ঞানে লোকান্তরিত করবার ব্যবস্থা শক্তিশালী পুত্রের পক্ষে স্বাভাবিক, বোধ হয় এটা সর্ব্বদেশেই আছে। আমাদের দেশের ইতিহাসের পাতায় বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর আমল থেকে চলে আসচে। কিন্তু সে তো রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, ধনবান ঘর-গৃহস্থের মধ্যেও যে এদিকে এটা চলে, তা দেখে মনে হলো আর বেশী দিন এভাবের চোরা-গোপ্তা পিতৃহত্যার কাজ চলবে না, নাজী অথবা কম্যুনিস্টরা এসে পড়ল বোলে, এর মধ্যে কাপুরুষ পুত্রেরা আড়াল থেকে যেটুকু পারে করে নিক সমাজের মাতব্বরদের চোখে ধুলো দিয়ে। আমার কিন্তু এমনই একটা অস্বস্তি লাগল, একেবারে বাবা উমাপতির আশ্রমের পানেই চললাম তাঁকে জানাতে সকল কথা। গিয়ে দেখলাম তিনি মন্দির থেকে এখনও বার হননি কাজেই আমি অখিলবন্ধুর কাছে গেলাম আর যা কিছু শুনেছিলাম নিবেদন করে মনটাকে হালকা করে ফেললাম।

তিনি—বলেন কি ? ও কথায় আপনি এত ভাবচেন কেন, মনে বিশ্বাস করেন কি ঐ অভিচার ফলপ্রসূ হবে ? ওসব ক্রিয়া-কর্ম্ম ফলপ্রসূ হয় ?

আমি বলিলাম,—আমার বিশ্বাস হয়। কি জানি একটা সহজ বিশ্বাস আমার প্রথম থেকেই আছে।

শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তার সঙ্গে সঙ্গে এই সহজ বিশ্বাসটাও রাখুন যে, এই মেদিনী,—এই জীব-সমাজসৃষ্টিটা শয়তান বা দৈ•।

দানবের নয়, এটা ভগবানের জগৎ। তাঁর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কারো কাকেও হত্যা সম্ভব নয়। আদ্যশক্তি ভগবতীর সজাগ দৃষ্টি থাকে জন্ম মৃত্যু ও মিলনের ক্রিয়াগুলির উপর—তাতে আর কারো কর্ত্তৃত্ব নেই।

আশা হইল মনে, হয়তো ব্যর্থ হইবে অভিচারকবর্গের কাজ ঐ ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে। আমায় চিন্তিত দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন—এদের অর্থাৎ এখানকার এই ধরনের তান্ত্রিকদের অধঃপতনের চরম হয়ে এসেছে। কতটা অজ্ঞান এরা তাই ভাব; যে জগদম্বাকে অদ্বিতীয় সৃষ্টি-স্থিতি নিধনকারিণী বলে জানচে আবার তাঁকেই পূজায় প্রসন্ন করে নিজ স্বার্থে আর একজনের প্রাণ-হননের অঙ্গরোধ করচে,—ঘুষ দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির বুদ্ধি; একথা একবারও তার মনে হোলো না যে সে ব্যক্তিও ঐ মায়েরই রক্ষিত, সর্ব্বজীব রক্ষার দায় তাঁরই।

দিন তিনেক বাবা উমাপতির আশ্রমে আর যাই নাই, অখিলবন্ধুর সংসর্গেই মত্ত হইয়াছিলাম। বৃষ্টি-বাদল তো লাগিয়াই আছে। এই কামরূপে ভুবনেশ্বরীই উচ্চতম পর্ব্বত-শৃঙ্গ। এখন জলে জলে মাটি নরম হইয়া নাট-মন্দিরের মেঝে পর্য্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হইয়াছে, গা-গতর বেশ ভারী বোধ হয়, মাথাটাও ভার হইয়া থাকে আজ দুই-তিনদিনই অনুভব করিতেছি। আজ সকালেই মাথা ভারী, নাক বুজিয়া আছে, বেশ জ্বরভাববোধ হইল, হাত পায়ের প্রত্যেক গাঁটে বেদনা। মনে হইল আজ সারাদিন কিছু না খাইয়া লঙ্ঘন দিলেই সুস্থ হইব।

আমার বিহারী বান্ধব, প্রভাতে উঠিয়াই রাম রাম করিতে করিতে আমার সম্মুখে আসিয়া—খবরদারজী, বলিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, তারপর বিশেষ ভাবেই আমার মুখের পানে নিরীক্ষণ করিয়া একটু চিন্তিত মনেই বলিলেন, আঁখ তো বহোত লাল হুয়া, তবিয়ৎ কুছ সুস্ত মালুম হোতা কি নহি?

জিজ্ঞাসার ভাবটা সহানুভূতিপূর্ণ। বলিলাম,—জ্বর একটু হইয়াছে; মাথায় বেদনা ইত্যাদি।

সে বলিল,—বহোত বরখা, আজ বাহার মৎ যাও, ভোজনকা প্রবন্ধ হাম করেগা।

আমি উপবাস করিব বলায় সে বলিল,—নহি জী, পাহাড়দেশ মে উপবাস আচ্ছা নাহি, খানাই চাহিয়ে—সব বিলকুল ঠিক হো জায়গা, আপ চুপচাপ সোতে রহিয়ে; বলিয়া গাঁজা টিপিতে বসিয়া গেল। তারপর দলাইমালাই হইয়া

গেলে বেশ চিন্তিত মনেই টানিতে লাগিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া দেখিলাম।

বেলা দশটা নাগাদ জ্বরটা বেশ ঘটা করিয়া আসিয়া পড়িল। প্রবল শীতবোধ হওয়ায় পাতা কম্বল গায়ে ঢাকা দিলাম। তখন ধীরনাথ বাবা বলিলেন,—আরে আপকো ভি পাকড় লিয়া; অব দেখো। গেয়া বরষ হাম পাঁচ মাহিনা শো গিয়া থা। সুতরাং আমিও সারাদিন শুইয়াই রহিলাম। প্রবল জ্বর ছিল, কেমন আচ্ছন্নভাবেই কাটাইলাম। জ্বরে আচ্ছন্ন থাকার মধ্যে যেন সমাধির সুখ আছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজের রেশ কানে লইয়া জাগিয়া উঠিলাম: দেখি বাবা উমাপতি আমার মাথার শিহরে বসিয়া। বোধ হয় ইতিমধ্যে প্রবল বৃষ্টি হইয়া থাকিবে, পায়ের উপর কম্বল ভিজিয়াছে। বেশ ঠাণ্ডা।

বাবা আমার মাথায় হাতটি রাখিয়া বলিলেন,—আজ রাতটা কোন রকমে কাটাও, কাল সকালেই জ্বর একটু কম পড়লে আমার কাছে নিয়ে যাব। কি বল বাবা,—এখন জ্বরটা যেন বড্ড বেশীই মনে হচ্ছে।

এমন সময় দিগু ঠাকুর মন্দির হইতে নির্মাল্য লইয়া বাহির হইল এবং আমার মাথায় ঠেকাইয়া ওখানকার সবারই কপালে স্পর্শ করাইয়া কাঁকাল বাঁকাইয়া দাঁড়াইল, তারপর মহাবিজ্ঞের মত বলিল,—এটা কাংাজ্বর না কি তাই ভাবি।

উমাপতি বাবা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন,—তোমার ভাবনায় দরকার কি, নিজের কাজ শেষ করোগে যাও। আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—এখানে থাকা ঠিক নয়, সকালেই ওখানে নিয়ে যাবো, কেমন?

আমি বলিলাম,—এইখানেই থাকবো, কাজ কি নাড়ানাড়িতে?

না না, সেটা ঠিক হবে না—বৃষ্টির ছাট্ আসে ফুটো টিন দিয়ে জল পড়ে, অসুস্থ অবস্থায় এখানে থাকা মোটেই ভাল নয়।

জ্বরের ধমকে আমার মাথায় একটা রোখ চাপিয়া বসিল, বলিলাম,—না না, আপনার আশ্রমে আরামে আমার কাজ নেই, এইখানেই থাকবো।

তিনি যেন বুঝিতে পারিলেন আমার ঐ দুর্ব্বল মস্তিষ্কের কথা, তাই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—তুমি এখানেই থাকো কোথাও যেতে হবে না; বলিয়া আমার কপালে হাত দিয়া দুদিকের রগ টিপিয়া ধরিলেন। আমার এমনই আরাম বোধ হইল, চক্ষু বুজিয়া রহিলাম। একটা তন্দ্রার মতই অবস্থায় যেন এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম,—আজ রাত্রে এখানে আমাদের কিছু ক্রিয়া-কর্ম্ম আছে; আজ অমাবস্যা কিনা।

গভীর রাত্রে চারিদিক থম থম করিতেছে, বাহিরে অন্ধকার, কিন্তু গর্ভগৃহের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, ধূপ-ধুনার গন্ধে ভরপুর, ভুবনেশ্বরীর মন্দির-মধ্যে নানা প্রকার শব্দ শুনিতে শুনিতে জাগিয়া উঠিলাম, কিন্তু চক্ষু মেলিয়া বেশীক্ষণ চাহিতে পারিলাম না। অনেক লোক একত্র ধীর গম্ভীর উদাত্ত স্বরে পৃথক পৃথক মন্ত্র পাঠ করিলে যেমন শুনায় সেইরূপ নানা মন্ত্রের সুর একপ্রকার কানে আসিতে লাগিল। প্রত্যেকের স্বর বা সুর আলাদা বটে কিন্তু সবগুলি মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে, যখন চক্ষু এক-একবার মেলিতেছিলাম তখন ঐ সুরের অপরূপ স্বয়ং উজ্জ্বল বর্ণাভা লক্ষ্য করিতেছিলাম।

সুরের একটা বর্ণ, সংমিশ্রিত রূপ আছে শুনিয়াছিলাম—এখন তাহাই দেখিতে লাগিলাম। গোলাকার, ডিম্বাকৃত, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, ষটকোণ—নানা আকারের বর্ণচ্ছন্দ মিলিত সুরধ্বনি তরঙ্গকারে, শ্রেণীবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন, এক বিচিত্র ছন্দে বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিল শূন্যপথে। নানা বর্ণের উদ্ভাসিত সুরের স্রোত চলিতেছে, বিচিত্র ছন্দে উপরদিকেই তাহার গতি। অতীব নির্ম্মল ঐ শব্দময় বর্ণস্রোত দৃষ্টিমাত্রই আমার প্রাণের মধ্যেও যেন ঐ সুরের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া আমায় আনন্দসাগরে ভাসাইতে কোন এক পুণ্যভূমির পানে লইয়া চলিয়াছে। নানা বর্ণের—তাহার মধ্যে গোলাপী, নীল, হালকা ও গাঢ় সবুজ পীত, পিঙ্গল আবার কোন কোন অংশ শব্দময় গোলক ঘোর লাল, কত রঙ-এর মেশামেশি তা আর কি বলিব! ক্রমে ক্রমে আকারের পরিবর্ত্তন, আকার ও বর্ণের পরিবর্ত্তন এমন আশ্চর্য্য জীবনে কখনও দেখি নাই। তারপর শেষে একটি ভয়ঙ্কর হুঙ্কারের সঙ্গে যেই একটি মন্ত্র উচ্চারিত হইল অমনি বিদ্যুতের মত একটি সর্ব্বগ্রাসী আলোকতরঙ্গ আসিয়া পূর্ব্ব-উচ্চারিত আলোকাকৃতি শব্দসমষ্টিকে এক ঝাপটে উর্দ্ধমুখে উড়াইয়া লইয়া গেল। আমার আর সংজ্ঞা

রহিল না। নানা মন্ত্রের স্বরতরঙ্গ, তার সঙ্গে ঐ আলোকময় শব্দধারা দেখিতে ও শুনিতে শুনিতে যেন একটা নেশার ঘোরে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। অবস্থা আমার যেন নিত্যানন্দময়, আর বাবা উমাপতিকে স্বয়ং শিব মনে হইত লাগিল।

প্রভাতে উঠিয়া বসিলাম। একবার বাহিরে যাইব - আনন্দের রেশ তখনও যেন বেশ অনুভব করিতেছি। জ্বর তখনও রহিয়াছে—ভাবিতেছি। কি যে ভাবিতেছি জানি না, তাহার মধ্যে কত কি ভাব মনে উঠিতেছে, মিলাইতেছে। দিগু ঠাকুর আসিয়া বলিল, তাইতো আপনারে আবার জ্বরে ধরলো, এখানকার এ বড় বিশ্রী জ্বর—ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া মন্দিবের মধ্যে চালয়া গেল নিজ কাজে। তারপর আমাব সঙ্গী বিহারী সাধু নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং রামনাম করিতে করিতে হাই তুলিতে লাগলেন। মন্দিরের সম্মুখেই বাঁ দিক ঘেঁষিয়া কিছু দূবে একটা বাবার গাছ আছে, তাহার তলায় বসিয়াই নিত্য মুখ ধুইতাম। আজও সেখানে বসিয়া মুখটা ধুইয়া লইলাম।

আকাশে মেঘ ছিল, আজ আর সূর্য্যোদয় দেখা যাইবে না, বাহিরে যাইব কিনা ভাবিতেছি—সেই আনন্দের নেশাটা তখনও রহিয়াছে। ভাবিতেছি কি—রাত্রে মন্দিবমধ্যে কাহাদের মন্ত্রের শব্দ পাইতেছিলাম, ছবির মত শব্দের একটা রূপ, অপূর্ব্ব আকার বর্ণময় উর্দ্ধগতি দেখিতেছিলাম, কল্পনায় তাহা আবার দেখিবার জন্য চক্ষু বুজাইয়া রহিলাম। জ্বরের ধমকেই ঐ কাল্পনিক কত কি দেখিতেছিলাম, চঞ্চল খেয়ালী মনের ব্যাপার তো,— মনগড়া অনেক কিছুই দেখা যায়।

চক্ষু খুলিতে দেখি প্রতিমার মতই স্থির সেই চণ্ডালকন্যা এলোকেশী ভৈরবী, ডান হাতে একটা কিছু ধারণ করিযা ঠিক আমার সামনে চার-পাঁচ হাত তফাতে দাঁড়াইয়া। আমায় চক্ষু খুলিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—বাবা এই চরণামৃত পাঠিয়ে দিয়েছেন, খেয়ে নিন, অসুখ সেরে যাবে।

কি জানি কাল যখন জ্বরাবস্থায় উমাপতিকে দেখিলাম, তাঁহার কথা শুনিলাম, উত্তরে যে একটা অস্বাভাবিক জেদের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম—তাহাতে পরে আমি নিজেও কম অনুতপ্ত এবং সেই সঙ্গে কম আশ্চর্য্য হই নাই। এতটা শ্রদ্ধা গেল কোথায়? কেন আমার মনে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে প্রতিবাদেব ভাব আসিল,—ভাবিবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু মন স্থির ছিল না, পারি নাই। এখন আবার সেই জেদ, প্রতিবাদের মতই আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভৈরবীর কথা শুনিয়াই বলিলাম,—ও সবে আমার কোন দরকার নাই ; জর আপনিই ভাল হবে।

শুনিয়া ভৈরবী আমার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—না না, ও জর আপনি সারবে না।—দীর্ঘকাল ভোগ হবে, দিনে দিনে শরীর ক্ষয় আর নিস্তেজ করে দেবে আপনাকে,—এখানকার জর সহজ নয়, কি জানেন আপনি? বলিয়া, নিকটে আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়া অল্প জোরে ঘাড়সুদ্ধ মাথাটা পিছনদিকে বাঁকাইয়া বলিলেন,—হাঁ করুন দেখি। নির্ব্বিকারে সুবোধ বালকের মত হাঁ করিলাম; চরণামৃত ঢালিয়া দিলে গলাধঃকরণ করিলাম। উহা প্রসাদী উগ্র কারণবারি, যথার্থ সুরা,—জল নয়। যেই ওটি খাওয়ানো হইল, বিনা বাক্যব্যয়ে এলোকেশী চলিয়া গেলেন ;—ঠিক ঐটুকু মাত্র তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। ঔষধ খাইয়া প্রথমে আমার গা-টা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, তারপর অল্পক্ষণেই ঠিক হইয়া গেল। কতকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলাম। মনেও একটা বল আসিল, ভাবিলাম হয়তো বা এইবার জর ছাড়িয়া যাইবে। মনে আবার তাঁহার প্রতি শিবভাব আসিল। উমাপতি বাবার কৃপা হইয়াছে আমার উপর বুঝিয়া শান্ত হইলাম। তারপর কল্পনায় কত কি ভাবিতে ও দেখিতে লাগিলাম যে কথায় আর কাজ নাই। জর কিন্তু ছাড়িল না, অবিলম্বেই যেন আরও প্রবল হইল; মাথা যেন টলিতে লাগিল। তবুও শুইলাম না, মনে মনে সেই জেদ আবার চাপিয়া বসিল—কিছুতেই শুইব না। মনের কাজ চলিতে লাগিল অবিরাম—সঙ্কল্প ও বিকল্প।

অদ্ভুত ব্যাপার, এই যে এলোকেশী কোন্ অধিকারে আমার সঙ্গে এ প্রকার ব্যবহার করিলেন! আমি যে বালক, অসুখের বেলা ঔষধ খাইব না বলিয়া প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমার মা যেভাবে নিঃসঙ্কোচে ঘাড় ধরিয়া খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিজ কার্য্যে চলিয়া যান এ যেন সেইভাবেই আমায় খাওয়াইয়া গেলেন। ভাবিয়া অবাক্ বিস্ময়ে যেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম, তারপর কত কি ভাবিতে লাগিলাম। কেমন যেন একটা অপূর্ব্ব পরিচিত ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব এক অনুভূতি আমার চিত্তে ক্রিয়া করিতে লাগিল, তাহাতে যেন মধ্যে মধ্যে বিহ্বল হইতে লাগিলাম। এইভাবেই ক্রমে আমার ক্লান্তি এবং তাহা হইতে শয়নে প্রবৃত্তি হইল, যেন আর বসিতে পারিলাম না, শুইলাম—আবার সুপ্ত হইলাম।

উমাপতি বাবার সঙ্গে এখনও আমার সকল কথা হয় না, তাঁর কাছে আমার অনেক কিছু জানিবার আছে। এই কথা কয়টি মনে মনে পরিষ্কার ভাবিতে

ভাবিতে জাগরিত হইলাম,- বাহিরে দেখি,—আকাশ সেইরূপ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। উঠিয়া বসিলাম, মাথা ভার। এখন বোধহয় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবে।

আমার বিহারী সঙ্গীও আছেন তাঁর সামনে। শুনিলাম, আজ আর তিনি আসন ত্যাগ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভোজন বানায়া নেহি? সে বলিল যে, আজ ভোজনের নিমন্ত্রণ উমাপতি বাবার ঘরেই।

খবরটি শুনাইয়া মহা স্ফূর্তিতেই সে তাহার ছিলম লইয়া বসিল। আমি দেখিতে লাগিলাম আর যেন উপভোগ করিতে লাগিলাম। গাঁজার ধোঁয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বুঝিলাম আমার দেখাশুনা করিবার জন্যই বাবা ইহার মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা নিজ আশ্রমেই করিয়াছেন। আমার প্রতি কত অনুগ্রহ তাঁর! কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরিয়া উঠিল।

তারপর, এবারে দেখিলাম স্বয় উমাপতি, প্রসন্নবদনে আমায় লক্ষ্য করিতে করিতে সশব্দে, যেন কতকটা দ্রুতই আসিয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পিছনে এলোকেশী, তাঁর একদিকে বাবার জন্য আসন বাঘছালখানি গুটানো বাঁ-হাতে ধরা, অপর হাতে বৃহৎ ঝারিতে তাঁহার পূজার উপকরণ।

আসনটা এখানে পেতে দাও, আর ওসব ভিতরে রাখো- বলিয়া আমার কাছেই বসিবার জন্য দাঁড়াইলেন ও প্রসন্নবদনে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে আসনের উপর বসিয়া বলিলেন,—তোমার চক্ষু দুটি বেশ একটু লাল হয়েছে দেখছি, কেন বল তো? আমি কিছুই বলিলাম না, কারণ আমি জানি না। তাহাতে তিনি নিজেই আবার বলিলেন, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধকও আছে দেখছি—বায়ুর উর্দ্ধগতি, তাহাতেই ওরকম হয়েছে, চিন্তার চাপটা যেন বড় বেশী বোধ হচ্ছে বাবা?

আমি বলিলাম,—হয়তো তাই হবে।

তিনি বলিলেন, হুঁ-ম্, শরীরের রক্তগুলোকে মাথায় তুলে জমা করেছ দেখছি। তোমায় নিয়ে ভুগতে হবে নাকি? আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার এত কিসের চিন্তা?

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই এলোকেশী বলিলেন,—পিছনের টান, দেশে স্ত্রী আছেন, বাবা মা ভাই বোন, ঠাকুমা দিদিমা যাঁরা আছেন,—এখন অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের জন্য একটা ভাবনা আছে বৈকি।

কথাগুলি শুনিবামাত্রই আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া গেল,—বিজাতীয়

ঘৃণা, কেমন একটা প্রবল বিতৃষ্ণা আসিয়া সারা অন্তর-ক্ষেত্র যেন তিক্ত করিয়া দিল। বলিলাম,—এটা আপনার অনধিকারচর্চ্চা, বাচালতা মাত্র। আজ প্রায় এক মাস অথবা তার বেশী এখানে আছি বটে—কিন্তু আত্মীয়-কুটুম্ব বা পরিবারের কথা নিয়ে আমার চিন্তা কোনদিনই মনে ওঠেনি।

আমার কথা শুনিয়া উমাপতিবাবা এলোকেশীর মুখের দিকে চাহিলেন, সে দৃষ্টির মধ্যে একটা বিস্ময়ের ভাব ছিল—আরও একটা কি ছিল বুঝিলাম না।

এলোকেশী হয়তো বুঝিলেন, তাহাতে কিন্তু এলোকেশী অপ্রতিভ হইলেন না, যেন একটু উৎসাহিত হইয়াই বলিলেন,—আপনার কাছে উনি কি সব কথা বলতে সাহস করবেন? আমার তা মনে হয় না। বলিতে বলিতে নাটমন্দির হইতে বাহির হইয়া পায়ে পায়ে দ্বারদেশে পার হইয়া এমনভাবে গেলেন, যেন কতই দয়কারী একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। দু'চার পা গিয়া আবার সেইখান হইতেই তেমনিভাবে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন,—আপনার প্রতি ওঁর প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাব—তাই তো ভেতরের কথা জানাতে পারছেন না, তাই তো ভেতরে ভেতরে অতটা তাপ ভোগ করছেন।

কি সর্ব্বনাশ! গায়ে পড়িয়া এলোকেশীর অনর্থক আমার সম্বন্ধে এ কী ভাবের মন্তব্য? উমাপতি বাবার তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তরে আমায় কিছু বলিবার অবকাশমাত্র না দিয়া এতটা অপমানসূচক কথা বলিবার কি অধিকার আছে তাঁর? তাঁহার সঙ্গে পরিচয়ের মধ্যে প্রাথমিক সংকোচ পর্য্যন্ত বোধ হয় এখনও ভালরূপ কাটে নাই, তা সত্ত্বেও এতটা তীব্র আঘাত? সত্যই দুর্ম্মুখ—সংস্কৃতিশূন্য ছোট মন কিনা! আরও মনে হইল—আগে পরিচয় পাই নাই, এখন তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলাম। কিন্তু উমাপতি বাবার মনে অথবা আকারে প্রকারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। সেই প্রসন্ন বদন।

এই জ্বরভোগের মধ্যে দুইবার তাঁহাদের দুইজনের সঙ্গে দেখা হইল, দুই বারই মনোমধ্যে যে কারণেই হোক একটা বিরুদ্ধ ভাবের প্রবল আলোড়ন অনুভব করিলাম, বুঝিলাম যতক্ষণ ইহার কারণ জানা যাইবে না, ততক্ষণ মাথাটা আচ্ছন্ন হইয়াই রহিল। উমাপতি বলিলেন,—তোমার ভাবই আলাদা বাবা, উচ্ছ্বাসপ্রবণ মন তোমার, এলোকেশীর কথায় একটা আঘাত পেয়েছো দেখছি। কিন্তু ও তোমায় আঘাত করবে এটা যে কতটা অসম্ভব আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না; তুমি সুস্থ হোলে আপনিই তা বুঝতে পারবে। এখন আমি বলি কি আজ যেভাবে আকাশে ঘোর ঘনঘটা দেখছি, বৃষ্টি-বাদল খুব

বেশী নামবে বোলেই বোধ হয়,—তা আমাদের ওখানে এইবেলা গেলে ভালো হোত না কি? এখানে বড়ই কষ্ট - অস্থবিধাটাও কম নয়,—

বাধা দিয়া আমি যেন বিশেষ সংযত কণ্ঠেই বলিলাম,—ঐ যে বিহারী সাধুটি দেখছেন, ও একসময়ে এইভাবে এইখানেই অনেকদিন জ্বরভোগ করে কাটিয়েছে,— আমি পারব না?

একটা জেদ চেপেছে দেখছি, তাই বুঝতে দিচ্চে না তোমায়। ওদের শরীর, ওদের ধাত, ওদের তিতিক্ষা তোমাদের নেই, থাকবার কথা তো নয়,—ওদের সঙ্গে কত তফাৎ। তা ছাড়া ঐ বাবাজীই তো আমায় বেশী বেশী অনুরোধ করেছে তোমায় এখান থেকে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে।

এও একটি অদ্ভুত কথা, আমার নিত্যসঙ্গী, একসঙ্গে এতদিন কাটাইয়াছি, ও আমায় আজ এখান হইতে সরাইতে চাহিতেছে উমাপতি বাবার আশ্রমে? তবে কী আমার বড়ই বেশী রকম একটা কিছু হইয়াছে বলিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে? বলিলাম, কৈ আমায় তো কিছু বলেনি?

উমাপতি বলিলেন,—ঠাণ্ডা লাগাটা ভাল নয়, আর এ অঞ্চলের জ্বরটা সবাই জানে মোটেই সহজ নয়, রোগটা ভাল নয়, তাই বলা—নাহলে আর কি উদ্দেশ্য আমাদের থাকতে পারে তোমায় আমাদের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রূষা করবার!

আসলে একটি দৃশ্যপট চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া গেল,—আমাদের যেটা আসল গলদ প্রত্যক্ষ হইয়া গেল, এলোকেশীর ঐ মন্তব্যের কারণও বুঝিলাম। আমাদের মত গৃহী লোকের যে কামনা মজ্জাগত, শরীর একটু অসুস্থ হইল কি না হইল অমনি সেবাগ্রহণের লালসা,—আহা, তুতু ইত্যাদি দরদের দুটি কথা, সহানুভূতিমূলক অভিনয়ের প্রতি সহজ আকর্ষণ। বিদেশে প্রবল জ্বরভোগ,—আমার তো আত্মীয়-স্বজনের কথা, চিন্তা মনে আসাই স্বাভাবিক, এই কল্পনায় এলোকেশী এক ঘা দিয়াছে। আরও একটু বুঝিলাম, তাহার গভীর অন্তর্দৃষ্টিরও অভাব আছে। কিন্তু বাবা উমাপতির তো তাহা নাই। তিনি সাধারণভাবেই এই রোগের প্রভাব-কালটুকু যাহাতে সহজে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারি তাহার জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন আমায় নিজস্থানে রাখিয়া।

এই জ্বর উপলক্ষে প্রথম হইতেই অন্তরে অন্তরে কয়েকটি অপূর্ব্ব অনুভূতি আমার চিত্তকে নিবিষ্ট রাখিয়াছিল। তুচ্ছ আত্মীয়-স্বজনের কথা মনের মধ্যে স্থান পায় নাই, কারণ তাঁহাদের প্রতি আমার কোনপ্রকার আকর্ষণ তখন তো

ছিল না। বোধ হয় একথা অন্তর্যামী উমাপতি বাবা বুঝিয়াছিলেন। একথা তিনি যখন বুঝিয়াছেন তখনই আমি কৃতার্থ—ইহাই মনে করিয়া তখনকার মত স্থির হইলাম। কেবল বলিলাম,—আমায় এইখানেই থাকতে দিন, যা হয় এইখানেই হোক।

শুনিয়া বাবা উমাপতি বলিলেন,—তা যেন দিলাম, কিন্তু আবার বলি, এখানে জ্বর হলে দুই একদিনেই ছাড়ে না, দীর্ঘকাল ভোগায়, সেটা তো তুমি জান না?

আমি বলিলাম,—তা যেটুকু ভোগ আছে তা তো ভুগতেই হবে।

তাহলে তাই হোক, তুমি এখানেই থাক।—বলিয়া উমাপতি উঠিলেন এবং আপন ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনখানি গুটাইয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন।

স্বভাবতঃ আমি একগুঁয়ে নই, কিন্তু কেন যে আমি গোঁ-ভরে একটা কাজ করিলাম তা নিজেই বুঝিতে পারিলাম না। উমাপতি যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, আমিও চক্ষু বুজিয়া রহিলাম পড়িয়া। হঠাৎ সেই ট্রেনের ভৈরবমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। এ আবার কি হইল আমার? বিকারের ঘোর—দেখিতেছি ঠিক সেই দম্ভপূর্ণ মূর্ত্তি, সেইভাবে জালন্ধর বন্ধ অবস্থায় বসিয়া আছে, কিন্তু সেথায় আর কেহ নাই। হঠাৎ কতক্ষণ পরে মনে নাই একটা গর্জ্জন, তারপর আর কিছু নাই। তাহার অল্পক্ষণ পরেই এলোকেশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া নিকটেই একস্থানে বসিলেন। আমি আর তাঁহার দিকে না চাহিয়া আপন ভাবেই রহিলাম। জ্বর আমার তখনও বেশ প্রবল ছিল, মনে হয় একশো চারের উপর হইবে, দুদিকের রগের শিরাগুচ্ছ বেশ জোরে জোরেই দপ্ দপ্ করিতেছিল, মাথা ভার তো আছেই। হঠাৎ ভৈরবী আসিয়া ভাল মানুষের মত আমার কাছে বসিলেন এবং আমার তপ্ত কপালের উপর হাত রাখিয়া দুই রগের উপর বেশ জোরে দুটি আঙুলের টিপ দিয়া বলিলেন,—আপনার এই যে জেদ—সেটা রোগের মধ্যেই ধরতে হবে, তার প্রধান লক্ষণ হল রগ টিপটিপ করা আর মাথা ভার হওয়া আর দপ্ দপ্ করা, বুঝেছেন?

আমি কথা কিছুই বলিলাম না; তবে এইটুকু অনুভব করিলাম তাঁহার উপর আমার আক্রোশ আর তিলমাত্র নাই। কারণটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতেই মীমাংসা হইয়া গেল, নারী-স্নেহ-কামী নর-যুবার মন তো? কিন্তু তারপর

এলোকেশী আবার যে কথা বলিলেন, তাহাতে আবার আমার অন্তর তিক্ত করিয়া তুলিল। তিনি বলিলেন,—আপনি এখানে পড়ে থাকবেন আর অতটা নীচে আশ্রম থেকে আপনার পথ্য তৈরী করে নিয়ে আসতে হবে,—কখন কেমন থাকেন তত্ত্ব করতে হবে, এসব এত কে করে? আমার নিজের কাজ ফেলে এসব করতে ভাল লাগে না তা স্পষ্টই বলছি। বাবা আমাকেই সব করতে বলবেন, কারণ আর আশ্রমে এ কাজের মত কেউ নেই। কাজেই এ অবস্থায় যদি আমাদের আশ্রমে না যাওয়ার গোঁ ধরে থাকেন—তাহলে আপনি আমাদের একটা বিপদ হয়েই থাকবেন, এটা যেন মনে থাকে।

প্রথমে তাঁহার ব্যক্তিত্ব যেটুকু প্রভাবিত করিয়াছিল, এই কথায় তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল, আমি তাঁহার হাতটা সরাইয়া দিলাম, বলিলাম,—আপনার আশ্রমের কোন পথ্যই আমার দরকার হবে না জেনে রাখুন, আমি যে কদিন এখানে রোগভোগ করবো আপনাদের কাকেও দেখতে আসতে হবে না—আপনার এদিকে সময় নষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই। যদি সে রকম বুঝি এখান থেকে আমি চলে যাবো।

আশ্চর্য্য, কেন যে আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ একটা জেদ আসিয়া এ সময় আমায় এতটা বিপন্ন কবিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি আশ্রমেও গেলাম না। বিহারী সাধুব সাহায্যে একখানি পোস্টকার্ড আনাইয়া সেই দিনটি কাটাইয়া রাত্রি প্রভাত হইলে আমার একটি আত্মীয়কে পত্র দিলাম, সত্বর তারযোগে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিতে। ঠিক করিয়া ফেলিলাম,—এখানে থাকিব না, দেশেই যাইব। ভাবিলাম চার-পাঁচ-ছয়দিনেই টাকা আসিবে,—ইতিমধ্যে একটু রোগভোগ করিয়া দিন কাটাইয়া দিব।

সেইদিনই বৈকালে দিগু ঠাকুর আমার জ ন্য এক পাত্র দুধবার্লি লইয়া আসিল, জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিল,—বাবা পাঠিয়েছেন।

শুনিয়া আমি বলিলাম,—এ কেন? আমি তো লঙ্ঘন দেব সঙ্কল্প করেছি।

সে বলিল,—বাবা বলেছেন এখানকার জ্বরে উপবাস ভাল নয়, কিছু খেতে হয়। সহজেই আমার মনে হইল বীতশ্রদ্ধ এলোকেশী উহা প্রস্তুত করিয়াছে, না খাওয়াই ভাল।

আমায় চিন্তিত দেখিয়া দিগু বলিল,—এটা আমিই করে আনলাম; বাবা বল্লেন যে এলোকেশীর তৈরী করে কাজ নেই, ওটা তুমিই তৈরী করে নিয়ে যাও। বাবার কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলাম। যাহা হউক, খাইলাম এবং মনে মনে

যাহা বুঝিলাম তাহা আর এখন বলিয়া কাজ নাই। উমাপতি বাবার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া চক্ষে জল আসিল। উহা দিগুঠাকুর লক্ষ্য করিল।

বৈকাল একরকম কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার পর জ্বরটা যেন প্রবল হইল, সারা রাত্রই প্রবল জ্বরভোগ করিলাম,—ভোগ করিলাম না বলিয়া উপভোগ করিলাম বলিলেই ঠিক হয়। কারণ সেটা রোগ-যন্ত্রণা ভোগমাত্র নয়, তার মধ্যে মনকে লইয়া চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়-সুখকর উপভোগও আছে যথেষ্ট পরিমাণে। প্রথমে দেখিলাম, তারাপুর গ্রামের মধ্যে মন্দিরটি, চলিতে চলিতে মাঠ হইতে যেমন দেখিয়াছিলাম সেই দৃশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল ও অনেকক্ষণ রহিল— হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইল না। আজ জ্বরটা তৃতীয় দিন চলিতেছে, প্রথম রাত্রটা কতক আচ্ছন্নভাব, তারপর মাথার ভিতরে যন্ত্রণাটা প্রবল হইয়া উঠিল, অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া কত কি দেখিলাম, তারপর বোধ হয় শেষদিকে ঘুমাইয়াছিলাম। দেখিয়াছি মধ্যে মধ্যে যখন জ্বর হয়, প্রবল জ্বরের সময়েই একটা সুখকর অনুভূতি আমার অন্তরক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া রাখে। যেন আমার প্রিয়তম ইষ্টের পরশ পাই। আরও যেন মুক্তির অনুভূতি আমায় আনন্দে মাতাইয়া তোলে। অল্প জ্বরের সময় তাহা থাকে না। আজও মন্দিরমধ্যে কত কি দেখিলাম, শুনিলাম,—সে কথায় কাজ নাই।

পরদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যে আর উঠি নাই। যখন চৈতন্য হইল, চাহিয়া দেখিলাম,—উমাপতি বাবা। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। বাবা বলিলেন,—তোমায় সেরে উঠতেই হবে যে বাবা—এখনো আমার কথা শুনে কাজ করলে তোমার ভালই হবে। যা বলব তা শুনবে তো? এখন জ্বরটা বড্ড বেড়েছে।

বলিলাম,—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, এমন অনেক কিছুই দেখেছি কিনা এই কদিন জ্বরের মধ্যে—তাই,—

তিনি যেন ধমক দিয়া বলিলেন,- এখন কোন কথা চলবে না,—চুপচাপ পড়ে থাক তো বাবা।

আর তর্ক করতে প্রবৃত্ত হইল না; বলিলাম,—আচ্ছা, আমি তাই থাকবো; তবে তার আগে দেহত্যাগের পর জীব যায় কোথা, জন্মায় কি করে এইটে যদি আমায় শুনিয়ে দেন—তাহলে সুড়সুড় করে ঠিক লক্ষ্মী ছেলের মতই থাকবো। আপনি তো প্রতিশ্রুত আছেন।

এমন ভাবটি আমার হইয়াছে যেন উমাপতি বাবা ও আমি স্নেহের দাবীতে

একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি, জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা অথবা সাধনায় ক্রমে লঘু-গুরু কোন পার্থক্য নেই। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—শুনতে শুনতে যদি তোমার অচৈতন্য অবস্থা আসে?

বলিলাম,—তাহলে তখন বন্ধ করবেন, যখন জাগবো তখন আবার শুনবো।

উমাপতি বলিলেন,—এখন আমাব একটা কথা তো আগে তুমি শোনো; তারপর তোমার কথা শোনবার পালা আমার, কেমন?

মহা উৎসাহে পূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিলাম,- আচ্ছা কি কথা শুনতে হবে, আমি এখনই শুনবো,—বলুন, বলিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম।

তিনি ধীরে ধীরে আমার নিকটে আসিলেন এবং দক্ষিণ হাতটি বাড়াইয়া বলিলেন,—একটু চোখ বুজিয়ে থাক তো, বাবা; বলিয়া আমার ভ্রূযুগের মধ্যে তাঁর তর্জনীর টিপ দিলেন আর আমি ঠিক আবার তখনই ঘুমাই পড়িলাম।

এবার কিন্তু জাগিয়া দেখি, এক অদ্ভুত দৃশ্য পরিবর্ত্তন। এ কোথায় আমি? বাবার আশ্রমের সেই ঘরে, বেশ নরম শয্যায় শুইয়া,—আঃ কি আরাম! আমার সামনেই খানিকটা দূরে বাবা, তাঁর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া এলোকেশী মাতা। তিনি আমার মুখ দেখিবেন না, তাই যেন ঐ দিকে মুখ করিয়া। বাবা তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছেন। এখন আমায় জাগ্রত দেখিয়া বলিলেন,—যখন এসেছিলে তখন অনেক কম ছিল, এখন যেন একটু বেশী মনে হচ্ছে, না?

আমার অন্তরে কিন্তু অবাধ শান্তি ছিল।

তাঁর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম, যেন একটি গভীর রহস্যের সাগর, নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত গভীর, বলিলাম,—বেশ কাণ্ড করেছেন যা হোক। আমার মত অবাধ্যকে কেমন করে বাগ মানাতে হয়,—তা আর বলিতে ইচ্ছা হইল না, আপন অনুভূতির মধ্যেই ডুবিয়া যাইতে চাহিলাম।

যখন জাগিলাম তখন আবার দেখিলাম যে,—ঐ বাবার আশ্রমে তাঁহার বাঘছালওয়ালা আসন-পাতা সেই বসিলার ঘরে, সুকোমল শয্যায় শুইয়া, পাশে আপন আসনে উমাপতি বাবা বসিয়া। চারিদিকেই স্বর্গের তৃপ্তি- মহাপুণ্য-ফলেই যেন আসিয়াছি। বায়ুমণ্ডলে ধূপধুনা মিশ্রিত পুষ্প ও চন্দনের গন্ধ। আঃ, কি আনন্দ! বলিলাম,—কৈ বলুন তো—সেই দেহত্যাগের পর জন্মের কথাটা!

তিনি একটু হাসিয়া আমায় বলিলেন, দেহত্যাগের পর জীব জন্মায় কি করে এটা জেনে তোমার লাভ কি? সেটা আগে আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমি—লাভ-লোকসান ভেবে তো বলিনি, বিশেষ একটা কৌতূহল,—অনেক দিনই রয়েছে আমার মধ্যে।

তিনি বলিলেন,—কি আশ্চর্য্য, আসলে ওটা তো তোমার নিজের কি গতি হবে, জানবার এইটিই তো মূল উদ্দেশ্য ?

আমি—আমি শুনেছিলাম, আকাশ থেকে বৃষ্টির ধারা ঝরে শস্যের মধ্যে, তারপর শস্য থেকে মানুষের বীর্য হয়ে নর-নারীর মিলনের ফলে জন্ম হয়। শুনেছিলাম যখন একথা, অবিশ্বাসও হয়নি। এখন একবার আপনার মুখ থেকে,—

বাধা দিয়ে তিনি বলিলেন,—যদি আগাগোড়া সব জীবই ঐভাবে জন্মায় শুনে থাক তাহলে আমি বলবো এক শ্রেণীর জীব ঐ ধারায় জন্মালেও,—সবাই যারাই দেহত্যাগ করে পুনঃ তারা ঐভাবেই জন্মায়, তা তো ঠিক নয়। এখানে এমন ব্যাপার অনেক আছে যাতে ঐ একভাবে জন্মানো সম্ভব নয়। ধরো যাঁদের উন্নত জন্ম, আত্মার প্রকৃত আবরণ অনেক পরিমাণে খসে গিয়েছে, যাঁরা ব্যাপক কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করে অধ্যাত্ম-চৈতন্যের অধিকারী, যাঁদের দৃষ্টি বা লক্ষ্য আর ক্ষুদ্র নিজ পিতামাতা ভাই স্ত্রী পুত্র কন্যার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, এখানকার বিস্তৃত সমাজ নিয়ে যাঁদের আত্মশক্তি কাজ করেছে—তাঁরা ঐভাবে কেন জন্মগ্রহণ করতে যাবেন? মহামায়া প্রকৃতির নিয়মেই তাঁদের পুনর্জন্মবিধান অন্যপ্রকার।

আমি—চৌরাশী লক্ষ বার ভ্রমণ করে যে জন্ম, সে কি সত্য ?

শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন,—জীব-সৃষ্টি যে ক্রমে শুরু হয়েছে—সেই আদিকাল, মানুষ জন্মাবার কাল পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশের তো ঐ চৌরাশীর নিয়মে হিসাব চলে আসচে ; তা বলে বর্ত্তমানে মানুষের পুনর্জন্মে আবার চৌরাশী কেন ?

আমি—শুনেছি মানুষজীব অপকর্ম্মের ফলে পশুযোনিতেও জন্মায় ?

তিনি বলিলেন,—সেটা প্রাকৃত কোন নিয়মভঙ্গের বিশেষ একটা গুরুতর পাতকের ফলে দণ্ড হিসাবে হতে পারে,—মানুষ হয়ে মানুষ কত কত ভয়ঙ্কর কর্ম্মবিপাক সৃষ্টি করে, যার ফলে বিলোম গতিও সম্ভব হয়। তা বলে সবার তা হতে যাবে কেন? আসলে এইটুকু জেনে রাখো যে, কর্ম্মই তোমার গতি নিয়ন্ত্রিত করবে। তাঁর নিয়ম এমনই বিচিত্র যে আলাদা বিচারালয় দরকার নেই, বিচারক দরকার নেই ; তোমার মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার স্মৃতি আর বিবেক,—এরাই বিচার করে তোমার কর্ম্মানুসারে গতিপথে নিয়ে যাবে।

আমি—তা হলে এক নিয়মেই সব মানুষের পুনর্জন্ম হয় না ?

তিনি—নিশ্চয়ই নয়, যেমন মানুষ সবাই এক নয়, এক গোষ্ঠীও নয়, একই জাতি নয়, একই মতি নয়,—তেমনি গতিও এক নয়।

আমি—আচ্ছা ক্রীশ্চানদের পারগেটারী অথবা মুসলমানদের,—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন,—ওসবও ঐ যমালয়েরই নামান্তর অথবা যমের বাড়ীরই ব্যাপার, ওদের সমাজে লোক সমষ্টিবুদ্ধি দিয়ে ধরতে পারে, পাপের ফলাফল দেখে সৎভাবে আস্থাশীল হতে পারে এমনভাবে ফলিয়ে বলা। মোটের উপর ওদেরও ঐ কর্ম্মপ্রবৃত্তিই ওদের নিয়ে যায় পরলোকে। ক্রমবিকাশের কতটা উচ্চস্তরে উঠলে তবে প্রকৃতির পুনর্জন্মের নিয়মেতে অথবা জন্মান্তরের কথায় বিশ্বাস হয় ; এসব নিয়ে মাথা ঘামানো কেন তোমার এখন থেকে ? বিশেষতঃ এই প্রবল জরাবস্থায়,—আমি তোমায় এ নিয়ে আর অলোচনা করতে নিষেধ করি।

আমি—আচ্ছা সেরে উঠলে বুঝিয়ে দেবেন তো ?

আমার ঐ কথার উত্তরে কিছুই না বলিয়া আর এক কথা পাড়িলেন ;— তুমি তো জপ কর ? আমি স্বীকার করিলাম, তখন আবার বলিলেন,—জপের প্রতিপাদ্য কোনও মূর্ত্তি আছে তো ? বলিলাম, আছে। তখন তিনি বলিলেন,—ঐ মূর্ত্তিই তুমি এখন থেকে সকল সময় চক্ষের উপর রাখো ; পারবে কিনা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো না,—যতক্ষণ চেতনা আছে ততক্ষণ করে যাও, তবে জপের সঙ্গে প্রাণায়াম করো না, এখন সে সময় নয়। আর কাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না।

আমি ছটফট করিতেছিলাম, বলিলাম, যদি প্রশ্ন ওঠে ?

তিনি বলিলেন,—এ অবস্থায় সেটা বিক্ষেপ মনে করে উপেক্ষা করবে। আলগা মনকে অনেক দৃঢ়সংকল্প বা বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করে তাকে আয়ত্ত করতে হবে, তবে ফল ভাল হবে ; কোন অপব্যয় প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, বুঝেছ ?

আমি বলিমাম,—আপনার আশ্রমে এনে আমায় কঠিন নিয়মেই বাঁধছেন।

শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন,—এ অবস্থায় তুমি বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছ তাই একটু বাঁধলাম ; তারপর এলোকেশীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—তোমার তো অস্বাভাবিক অবস্থা, তোমার চেয়েও চঞ্চল প্রকৃতি একজনকে আমি বেঁধেছি, আর তাতে তার ভাল হয়েছে, একথা সে মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করে।

আমি আর কিছুই ভাবিলাম না, মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিতেছিল ;

একটু স্থির হইয়া ইষ্টে লক্ষ্য স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম। শুনিলাম, এলোকেশী বাবাকে বলিলেন, এখানে এসে জ্বরটা বেড়ে গেল কি? উত্তর শুনিতে গিয়া অল্পক্ষণেই অচৈতন্য হইলাম।

ভিতর দিকের ঘরে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া আমার জ্ঞান হইল। ধুনার গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। কোণে মিটমিটে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। ওঃ, কি তাপ, গায়ে বড় জ্বালা, সর্ব্বশরীর পুড়িতেছে, নিঃশ্বাসে আগুন,—মুখটা গলার ভিতরদিকে জিভ্ পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছিল। একটু জলের কথা মনে হইল, কিন্তু জল চাহিয়াছিলাম মনে হয় না। এলোকেশী ঘরের কোণে দীপ-ছায়ায় বসিয়াছিলেন, দেখিলাম উঠিয়া আমার বিছানার পাশেই রাখা ছিল মাজা চকচকে একটা ঘটিতে জল—একটা গ্লাসে ঢালিয়া দিলেন। উঠিয়া জল খাইলাম, তারপর যেই আবার শুইতে যাইতেছি তিনি বলিলেন,—উঠে যখন জল খেলেন তখন একটু বসে থাকুন না। দু-এক মিনিট, তারপর শোবেন। তাহাই করিলাম। তারপর কখন শুইয়াছিলাম মনে নাই।

রাত্রের অন্ধকার তখনও আছে, তবে কেবলমাত্র পূর্ব্বগগনে ঊষার জ্যোতি দেখা যাইতেছে। আকাশের বড় বড় তারাগুলি এখনও জ্বলজ্বল করিতেছে,—বাইরে কোন এক উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তরে আমি জুড়াইব বলিয়া বাহির হইয়াছি, ঘরের ভিতরে জ্বরের জ্বালায় ছট্‌ফট করিতেছিলাম। প্রত্যুষের ঐ শীতল পবনের সবটুকুই নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিয়া লইতেছি আর ভিতরটাও জুড়াইয়া যাইতেছে।

ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদিক বেশ ফরসা হইয়া আসিল। ঘুরিতে ঘুরিতে আমি একস্থানে আসিয়া পড়িলাম—গ্রাম সংলগ্ন বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে গাঢ় সবুজ ঘাসে ভরা স্থানটি। দেখিতেছি দিক্‌চক্রবাল যেন তখনও ঘন নীলাভ ধূমাচ্ছন্ন একটা গাঢ় রেখায় সমুদয় পূর্ব্ব দিকটি ব্যাপিয়া আছে। তাহার অনেক দূর ঊর্দ্ধে, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে যে বর্ণচ্ছটা দৃষ্টিমাত্রই প্রাণে নব জীবনের আনন্দ জাগায় তাহাই ফুটিয়াছে,—দেখিতে দেখিতে কোমল, লঘু, সিন্দুরবর্ণের প্রলেপ একখানি তাহার উপর আসিয়া পড়িল এবং ক্ষণে ক্ষণে উহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। তারপর পীতবর্ণে মিলিয়া ক্রম-ঊর্দ্ধে প্রসারিত হইতে লাগিল। উহা ক্রমে ক্রমে মাথার উপর নীলাকাশের সঙ্গে মিলিয়া গেল। অবাক্ হইয়া আমি দেখিতেছিলাম,—কত অল্পসময়ের মধ্যে উহা উজ্জ্বলতর হইয়া তরল হেম

সিন্দুরআভায় সারা পূর্ব্বগগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল; সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস লাগিয়া প্রথমে পুলকিতাঙ্গ তারপর এক শিহরণ আসিয়া তখন প্রাণ যাহা চাহিতেছিল—সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া দিল। আঃ আমি যেন সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করিলাম সেই শীতল-সমীরণ-স্নিগ্ধ অরুণোদয়ের পরশে।

ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, যেন আমার সম্মুখে ঘন সবুজের খুব পুরু গালিচার মতই ঘন তৃণময় হরিৎক্ষেত্রের প্রসার, তাহার উপর উপবিষ্ট অসংখ্য ভদ্র মূর্ত্তি,—জনসমুদ্র বলিলেই হয়। সবাই উজ্জ্বল সভ্য বেশভূষায় সজ্জিত,—তাঁহাদের মধ্যে আছেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, তবে প্রথমেই শ্রেণীবদ্ধ হিন্দু সমাজের উচ্চ-স্তরের ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী, প্রসন্নগম্ভীর মূর্ত্তি, তাঁহাদের দেখিয়া মনে হয় বিশেষ গুরুতর বিষয়েই তাঁহারা অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদের পশ্চাতে বহুতর সভ্য একের পর এক শ্রেণীবদ্ধ বসিয়া। ভদ্রসাধারণ, অসংখ্য জনসমাগম; আরও লক্ষ্য করিলাম যেন সবার দৃষ্টি তাঁহাদের সম্মুখস্থ উচ্চ বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান এক মূর্ত্তির পানেই নিবদ্ধ, এক অপূর্ব্ব ধীর স্থির নারীমূর্ত্তির উপর। সেই দ্বিধাবিভক্ত মূল শাখার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিটি তাঁহাদের সম্মুখে বটে, কিন্তু আমি পশ্চাৎ দিক হইতেই দেখিতেছি, সুতরাং মুখ দেখিতে পাইতেছি না। মস্তকে চূড়াবাঁধা জটা, পরনে রক্ত-গৈরিক, তাঁহার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত এবং দীর্ঘ, অপরূপ ঊর্দ্ধপ্রান্ত সিন্দুররঞ্জিত উজ্জ্বল ত্রিশূল মুষ্টিবদ্ধ রহিয়াছে। নিস্তব্ধ উপবিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে মাত্র তিনিই দাঁড়াইয়া এবং সকলকারই আকর্ষণের বস্তু। কারণ সবার লক্ষ্য তাঁহার দিকেই স্থির এবং একাগ্রচিত্ত,—প্রতীক্ষায় প্রতি মূহূর্ত্ত কাটাইতেছে। কতক বিস্ময়ে, কতকটা ভয়ে ভাবিতেছি, এখানে এ সময়ে এই যোগাযোগ, ব্যাপার কি হইতে পারে?

আমাকে যে কথা আজ আপনাদের বলতে হবে, তা শুধু আমার মনের কথা নয়,—তা আপনাদের দেশব্যাপী দুর্গতি, আপনাদের ভণ্ড, অভিশপ্ত জীবনের মিথ্যাশ্রয়ী সঙ্ঘবদ্ধ অপকর্ম্মের প্রতিকার, সে কথা শুনতেই আমায় আহ্বান করেছেন আর আমার বক্তব্য সম্বন্ধে অবহিতচিত্ত হবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই গুরুর আজ্ঞায় এ সময় আজ এখানে আসা।

এ যে এলোকেশী মাতা,—কি সুন্দর, নির্ঘাত তাঁহার কথাগুলি বলার ভঙ্গী,—দৃঢ়, গম্ভীর, অথচ কোমল সংযত কণ্ঠস্বর,—এটা তাঁর প্রকৃতিগত, তাঁর মধ্যে এমনই একটি শক্তির ক্রিয়া বর্ত্তমান যে কাহারও অপেক্ষা করিতে সাধ্য নাই।

আশ্চর্য্য এই ক্ষণ, আশ্চর্য্য এই জনসমাবেশ আর পরমাশ্চর্য্য এই বক্তা।

শুনিতে আমি আরও নিকটে গেলাম, কিন্তু বাধা আছে,—একটি তৃণপূর্ণ স্তূপ সম্মুখে আমার, তাহার উপরে নানা দ্রব্য সাজানো,—জানি না উহা কি এবং এই কার্য্যের সঙ্গেই বা সে সকলের সম্পর্ক কি। কাজেই সেই স্তূপের নিকটে কোমল বনবিস্তৃত দুর্ব্বাদলের উপর বসিয়া পড়িলাম;—শুনিতে লাগিলাম, গম্ভীর দৃঢ় ও কোমলকণ্ঠে এলোকেশী বলিতে লাগিলেন—

আপনাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে আজ, আমার স্বাধীন মন্তব্য, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ রক্ষার উপর সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত এবং অভিমত জানাতে এই সভায় উপস্থিতি যখন স্বীকার করি তখন আমি নিজেও কম আশ্চর্য্য হইনি। একে জাতিতে চণ্ডাল-কন্যা,—তারপর ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত গোঁড়া হিন্দু সমাজের উপর বালিকা অবস্থা থেকে গভীর ঘৃণাই পোষণ করে এসেছি,—আপনারা প্রবীণ, বিদ্বান, পণ্ডিত একথা জেনেও আমার বক্তব্য শোনবার জন্য শুধু শোনা নয়,—আমি যা বলবো, সমাজ-রক্ষার উপায় বলে যেসব নিয়ম এবং প্রস্তাব উত্থাপন করবো তা অকপটে দ্বিধাশূন্য অন্তরে আপনারা সম্পূর্ণ গ্রহণ করবেন এই প্রতিশ্রুতি কেমন করে দিলেন, যাতে আজ আমার এখানে আসা সম্ভব হোলো? এটাও কম আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। সত্যই কি আপনারা গতানুগতিকতার প্রভাব-মুক্ত হয়েছেন? তা যদি হয়ে থাকেন, আমার পরীক্ষা আছে, তা থেকেই আপনাদের আন্তরিকতা বুঝে নিতে পারবো।

প্রথমেই আমি এই কথা বলে নেবো যে,—সমবেত বিদ্বান, আমাদের হিন্দু-সমাজের দাম্ভিক-শিরোমণি পণ্ডিত মহোদয়গণের সামনে যদি এমন কিছু বলে ফেলি যেটা তাঁরা অপমান-সূচক মনে করেন, তাতে আমার অধিকার আছে বলেই বলব একথা যেন তাঁরা মনে রাখেন। আর সেজন্য সভ্য সমাজের ধারা অনুসারে মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনাটা অসঙ্গত এবং ভণ্ডামো হবে বলেই আমি মনে করি। আজ তাঁদেরই সামনে, তাঁদেরই মূঢ়-চিত্ত ও হৃদয়হীনতার ফলে, সমাজের সঙ্ঘশক্তি ক্ষীণ ও হীনতার ফলেই না সহায় থাকতেও অসহায়, তাঁদেরই ঘরের যে হতভাগিনী স্ত্রী, কন্যা ভগিনীরা, প্রতিবেশী এক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য দুর্ব্বৃত্ত পশুদলের হাতে নিগৃহীত, দলবদ্ধভাবে চরম পীড়নের লক্ষ্যবস্তু হয়ে আছে, আমি সেই অভিশপ্ত সমাজের মেয়েদের একজন—তাই আমার এ অধিকার, তাই আগেই এটা বলে রাখি। এ বিচিত্র দেশে, প্রতিবেশী এক দলের ধর্ম্মই হোলো অপর সমাজের নারীধর্ষণ, এটা তারা তাদের পক্ষে বড় গৌরবের কাজ মনে করে। তারা দলবদ্ধভাবে হিন্দুনারীর উপর পুরুষানুক্রমিক

পুণ্যকর্ম্মের হিসাবেই ঐ অত্যাচার চালিয়ে যাচ্চে—এ পর্য্যন্ত তার কোন প্রতিকার হোল না;—বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্যই হয়তো কিছুদিন বন্ধ আছে, কিন্তু আবার কোন্ সূত্রে আরম্ভ হবে তার কোন ঠিক নাই। আজ খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই, কেন আজ হিন্দু সমাজের এই দুর্গতি, অভিশপ্ত জীবন—তার অভ্যুদয়ের সকল পথই বন্ধ, অদ্ভুত নয় কি? হিন্দুর এই সঙ্ঘশক্তিহীনতার মূল কোথায়? উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তাঁদের সমাজ-ধর্ম্ম-আচরণে যাঁদের নিম্নশ্রেণী বলে অবহেলা করে এসেছেন এতদিন, এখনও তাদের কোলে

টেনে আনা তো দূরের কথা, তাদের গুণগত ঐক্য এবং মনুষ্যত্বের প্রেরণায় প্রীতিবশে কি নিকটে আনতে পেরেছেন? তারপর আজ দেশ জুড়ে নারীর অভিশাপ, দীর্ঘশ্বাসের আগুন সমাজের সকল শ্রেণীর পুরুষজাতির সকল কল্যাণ পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্চে না? আমি এই বাংলার কথাই বলচি,—অন্য কোন প্রদেশের কথায় আমার কাজ নাই, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাংলার নারীধর্ষণ সারা ভারতের নারী-সমাজের ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়েছে, কিন্তু বাংলার হিন্দু পুরুষ জাতির ধৈর্য্য বিচলিত হয়েচে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে কি? তাই না আজ এই অপরাধ অবাধে চলতে পেরেচে? তারপর আমাদের দেশের পুরুষদের—রাজশক্তির সহায়তায় এর প্রতিকারের আশার কথা আবার বিশেষ করে বলতে হবে? মূঢ়-চিত্ত হিন্দু বাঙ্গালী। এ মোহ তোমার কতদিনে ঘুচবে? এটা যে সমাজের সঙ্ঘশক্তির অধিকারের কথা, এ সত্যি কি দিয়ে চাপা দেবেন? আপনারা ঘুমোবেন আর রাজশক্তি এসে রক্ষা করবে সমাজের শত্রুদের হাত থেকে, এ কথা কি সুস্থ মন একজন ভাবতে পারে?

আমাদের হিন্দু সমাজে নারীর এতটা গুণ-বর্ণনা, এতটা সেবাপরায়ণতা,

ধর্ম্মবোধ, আদর্শ আত্মোৎসর্গ সত্ত্বেও স্বামীরা যে তাদের রক্ষা করতে পারে না,—তাই না এতটা লাঞ্ছনা তাদের? স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে এমন গোটাকতক খবর শুনলেও প্রাণে আশ্বাস জাগে। তাদের রক্ষকেরা এত নির্বীর্য্য কাপুরুষ বলেই না প্রতিবেশী এক-পল্লীভুক্ত নরপশুদের এতটা সাহস বেড়ে গিয়েচে? আমার প্রশ্ন এই,—যারা স্ত্রী রক্ষায় অক্ষম তারা কোন্ লজ্জায় স্ত্রী গ্রহণ করে? এতটা বিদ্যাবুদ্ধিহীন যে মন্ত্র পাঠ করে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে তার অর্থ বোঝে না?

তার পরেই এই প্রশ্ন আসে,- নারীপ্রকৃতিতে যে মহত্ত্ব, পবিত্রতা ও দৈব ঐশ্বর্য্য আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা দেখেছিলেন, যার ফলে তাঁরা সমাজে মহাশক্তিশালী হয়ে তাঁদের গার্হস্থ্যজীবন সফল করে গিয়েছেন, তাঁদের বংশধরেরা এই কয়েক পুরুষের মধ্যে সে দৃষ্টি কোথায় হারালো,—সেই দাম্পত্য জীবনের পবিত্র শক্তি এখন গেল কোথা? নারীর স্বভাব-পবিত্র যে প্রকৃতি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্পর্শে বা ধর্ষণে তার পবিত্রতা নষ্ট হয় না এই সহজ বুদ্ধি; পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজে বা জাতির ধর্ম্মনীতিতে আছে, কেবল এই অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ এখনকার হিন্দু বাঙ্গালী সমাজই তা থেকে বঞ্চিত। আমার একথা বিশ্বাস হয় না যে, যাদের নিজ ঘরের মেয়েদের রক্ষা করবার শক্তি নেই তারা ভারতের স্বাধীনতার পথে শক্তি যোগাতে পারবে? দেশের দুর্গতি তারা দূর করবে কি করে বা কোন্ শক্তির বলে! এ কথাই তাদের জিজ্ঞাসা করচি,—এই উত্তর দিতে হবে।

এলোকেশীর এই মর্ম্মভেদী কথাগুলিতে সভার মধ্যে একেবারে গভীর নিস্তব্ধতা, কাহারও মুখে বাক্য সরিল না কতক্ষণ তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আমি এখন আসল যে কথাটা সেটা স্পষ্ট করেই বলচি, আপনারা পণ্ডিত ব্যক্তি, শাস্ত্রে বিশ্বাসী,—এখন 'গতস্য শোচনা নাস্তি' এই মহাবাক্য অনুসরণ করে শান্তভাবে অবহিত হবেন আর তা আপনাদের বংশধরদের, দেশের, সমাজের, এমন কি প্রত্যেক পরিবারের কল্যাণার্থ নিয়োগ করুন এই নব সংস্কৃত সমাজে, এ আশা আমি করতে পারি কি? আর আপনাদের সাহায্য ও উৎসাহ পেলে এরাই এই মহান কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে, এই সত্য নিশ্চিত অবধারণ করে আপনাদের তাদের সহায়তা করবেন। আরও একটা সহজ কথা এই যে, কিছু বিশেষ শক্তিক্ষয় করে নিশ্চয়ই সহায়তা করতে হবে না তাদের, শুধু এইটুকু করবেন তাদের নিজ নিজ উদ্দিষ্ট পথে যেতে চাইলে বাধার

সৃষ্টি করবেন না, যদি তাদের সে কাজ আপনাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে, মতের সঙ্গে না মেলে। নবজাগ্রত যুব-শক্তি এখন এক মহাকল্যাণকর উদ্দেশ্যে অগ্রগতি চাইচে, আপনারা পুরাতন অসৎ অথবা বৃথা অচল সংস্কারগুলি ত্যাগ করে তাঁদের সঙ্গে মিলে যান,—না পারেন অন্ততঃ তাদের পথটা বাধাশূন্য করে দিন, আজ প্রথমে আমার এই মাত্র প্রার্থনা।

এখন প্রথমেই একটা গুরু বিষয় প্রস্তাবরূপে আপনাদের কাছে উপস্থিত করচি। বয়স আমার অল্প হলেও যথার্থ অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছি, বুঝেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস করেছি যে একদল যতই সোস্যালিজম, কমিউনিজম প্রভৃতি রাশিয়ার অনুকরণে অস্থির উপদ্রবই আরম্ভ করুক, দেশের বিশাল হিন্দু জনসমষ্টি এখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্র অন্তর্গত সংস্কার বৈশিষ্ট্য ছাড়তে পারবে না। এইটিই প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মের জাতিগত সংস্কৃতি, মূল জাতীয়জীবনে বড় গভীরে সঞ্চারিত হয়ে আছে আর তা থাকবেও দীর্ঘকাল। তাই এই সংস্কারের ভিতর দিয়েই সংস্কৃত করতে হবে হিন্দু সমাজকে। এখন বিশেষরূপে এর মূলে যে গুণকর্ম্ম বিভাগ রয়েচে, সেই গুণকর্ম্ম দিয়েই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্র এই বর্ণ চারিটিকে বর্ত্তমান যুগ-প্রয়োজনে আটটি বর্ণের সমাজে বাঁটতে হবে। পূর্ব্বের বর্ণ চারিটির মধ্যে তিনটির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই শব্দগুলির সঙ্গে এর গুণগুলির প্রভাব আজও এত গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে এ জাতির মূল ক্ষেত্রে—তাই এই তিনটিকে রেখে তার সঙ্গে আরও পাঁচটি বর্ণের যোগ—তাতে এই আটটি গুণকর্ম্মে বিভক্ত একটি পূর্ণ সর্ব্বজনীন সঙ্ঘবদ্ধ উদার হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সেই আটটি বর্ণ যথা,-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য, শিল্পী, নৈতিক, বিজ্ঞানী এবং কর্ম্মী এই আটটি বৃত্ত-গুণগত কর্ম্মে বিভক্ত হবে এই ভারতীয় হিন্দুজাতি। আর প্রথম থেকেই একেবারে হয়তো ভারতীয় হবে না, এখন বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ নামেই চলুক। আমার এই বিশ্বাস আছে যে, আজ এই সংস্কারের যথার্থ উপকারিতা এবং ব্যবহার বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হলেই কাল সারা ভারতবর্ষ নিজ নিজ প্রদেশের উপযোগিতা অনুসারে এই সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে—কারণ তাদেরও বাঁচতে হবে। আমি এবং আমার গুরু এই পথটি ধ্রুব পথ বলেই সিদ্ধান্ত করেছি। এইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহজ ও নিরাপদ সংস্কারের পথ। নব্য হিন্দুরা হবে পূর্ব্বে সমাজগত কুসংস্কার-মুক্ত নানা সৎভাবে অনুপ্রাণিত বিশাল বিশ্বজাতি সমুদ্রের পানে গতিশীল। নিঃসঙ্কোচ, বৈচিত্র্যপূর্ণ, সবল,

দৃঢ় সামাজিক ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত, নবীন এক নির্ভীক হিন্দু সমাজ; তার মধ্যে থাকবে গুণ ও কর্ম্মে বিভক্ত সমাজের অপূর্ব্ব পরিচয়,—বৃত্তিগত শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টবোধ ও দ্বিধাহীন অগ্রগতি। আমাদের এই হিন্দু সমাজে শূদ্র নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য, শিল্পী, নৈতিক, বিজ্ঞানী ও কর্ম্মী এই আটটি বা অষ্টবৃত্তিতে পরিপূর্ণ একটি আদর্শ সমাজ।

১। ব্রাহ্মণ থাকবেন তাঁরাই, বৃত্তিতে যাঁরা যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিতে জীবন উৎসর্গ করবেন, তাই-ই হবে তাঁদের উপজীবিকা, দশবিধ সংস্কারে দক্ষ অধীতবিদ্যা এবং স্বার্থ-নিরপেক্ষ বিচারপরায়ণ। সমাজের সকল শ্রেণীর কল্যাণকামী, সকল শ্রেণীরই পুরোহিত,—তিনি এই অষ্টবৃত্তিভুক্ত সকল সংসারই জাতিকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্রানুমোদিত সকল সংস্কারকর্ম্মই সম্পাদন করেন। এই ব্রাহ্মণ বংশগত নয়, বৃত্তিগত।

২। ক্ষত্রিয় থাকবেন তাঁরাই যাঁরা বাহুবলে নিজ দেশ ও সমাজ-রক্ষার জন্য রণনীতি বা যুদ্ধব্যবসায়ী। পৌর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এই সৈন্যবিভাগে অথবা বহিঃশত্রু থেকে দেশরক্ষার কাজেই আত্মনিয়োগ করবেন। তাঁরা জাতি ও সমাজ রক্ষা করবেন। দেশের বালকদের ভবিষ্যৎ দেশরক্ষক হিসাবেই প্রস্তুত করবেন। তাঁরাই উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষিত করবেন উপযুক্ত ছেলেদের এবং মেয়েদের।

৩। বৈশ্য,—বণিক, ব্যবসায়ী; সমাজের উৎপন্ন ধন-ধান্য, বস্ত্রাদি, যাবতীয় খাদ্যশস্যাদি ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, নানা স্থানে প্রেরণ, প্রয়োজনবোধে মন্ত্রণাসভার নির্দ্দেশে উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন।

৪। বৈদ্য,—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, রাসায়নিক; নানা রোগ ও ঔষধ নির্ব্বাচন, দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে গবেষণাদি করবেন।

৫। নৈতিক,—সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা, অপরাধের বিচার, আইন, প্রভৃতি সম্পর্কিত দেশের নৈতিক জীবনকে সবল করে তুলবেন।

৬। বিজ্ঞানী,—পদার্থ-বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান, শিক্ষাদান করবেন এবং উপদেষ্টা এই বিভাগে উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করে দেশের মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৭। শিল্পী,—কলাবিদ্, সাহিত্য, সঙ্গীত, কাব্য এবং যত প্রকারের কর্ম্ম শিল্প-অধিকারে আসে তাতে নিবিষ্ট থাকবেন।

৮। কর্ম্মী,—উক্ত সপ্তবর্ণের বৃত্তি তদতিরিক্ত যা কিছু চাকুরিজীবী, অর্থ

উপার্জ্জনের সৎবৃত্তির যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাই-ই অবলম্বন করে সমাজের পুষ্টি-সাধনই এই কর্ম্মীদের অধিকার। অর্থাৎ সকল বিভাগেই হিসাবরক্ষক প্রভৃতি যত প্রকার প্রয়োজনীয় কর্ম্ম তাতেই নিযুক্ত হবেন।

এই আটটি বৃত্তিতে অর্থাৎ অবলম্বন অথবা জীবিকা উপার্জ্জনের বৃত্তিতে,—অন্য কথায় বর্ণে হিন্দু সমাজ সম্পূর্ণ থাকুক। এরপর প্রধান কথা হল যেটা বর্ণ বা বৃত্তি বংশগত নয়, ব্যক্তিগত। কোন বৃত্তি ছোট নয়, তুলনায় শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্টের স্থান নেই। একটির অভাবে অপরাপর বৃত্তি অচল, কথামালার উদর ও অন্যান্য অবয়বের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। দেশ পরিচালনায় এই অষ্টবিভাগের আটটি মন্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব থাকবে। দেশের প্রত্যেকেই বিদ্যার ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিভাগেই অগ্রগতি অর্জ্জন করবেন। সকল বর্ণের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তা সম্পূর্ণ হবার পর তখন বৃত্তিগত শিক্ষারম্ভ করিতে হবে।

কোন বর্ণ বা বৃত্তি বংশগত নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম তা নয়। হতে পারে না। একটা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার বুঝা যাবে,—যেমন কোন এক ব্রাহ্মণ জাতকের অবস্থা, স্বভাব, প্রবৃত্তি ভাগ্যের এবং কর্ম্মক্ষেত্রের বা ভোগের যে সকল যোগাযোগ আছে,—এই ব্যক্তির পুত্রেরও কি ঐ সব প্রবৃত্তি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যোগাযোগ ঘটবে? এটা যেমন ঘটে না বা হয় না তেমনি ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্যই হবে এমন কোন কথা নেই। প্রকৃতির নিয়মও তা নয়। বৃত্তি এব সময় তো বংশগত ছিল, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় বলে সমাজে গণনীয় হোতো, সমাজ-গঠন তখন অন্যরকম ছিল, প্রত্যেক বর্ণের নিজ নিজ বৃত্তির উপর প্রবল নিষ্ঠা ছিল, সেইজন্য সমাজ শক্তিশালী ছিল। সেকাল এখন নেই—ব্রাহ্মণের উপজীবিকায় এখন কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান পৈতৃকবৃত্তি বলে নিষ্ঠাশীল নয়। সমাজ-শক্তির উৎস,—নিজ সমাজের উপর আস্থা, আর নিজ বৃত্তির উপর আস্থা। কাজেই সহজ বুদ্ধিতেই ধরা যায় বৃত্তি আর ধর্ম্ম ব্যক্তিগত, এইটিই প্রাকৃতিক নিয়ম। অভিজ্ঞতায় এটাও দেখা গিয়েছে যে একটি কোন বৃত্তি বিশেষের উপর নিষ্ঠা বংশগত বা চিরন্তর হতে পারে না। সৃষ্টিধরের সৃষ্টিকে ঐ রকম একঘেয়ে রাখার উদ্দেশ্য মোটেই নয়। বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্য একের সঙ্গে অপরের প্রাণের যোগ। তা যদি না হোতো তা হলে শুধু আজ বোলে নয়, প্রাচীনকাল থেকেই ব্রাহ্মণের ছেলে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করবে কেন? ব্রাহ্মণের পাঁচটি ছেলে যদি থাকে, দেখা যায় যে ঐ পাঁচটি কখনও এক বৃত্তি অবলম্বী নয়। না

হওয়াটাই স্বাভাবিক এ কথাটা যেন মনে থাকে। ব্রাহ্মণের ছেলে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি, বৈশ্যের বৃত্তি, বৈশ্যের বৃত্তি নিয়েচে, এমন কি মজুরের বৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছে,—কোন বিশেষ বৃত্তিসুলভ বিদ্যা বা গুণের অভাবে। এ তো সহজেই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এখানকার সমাজের দিকে চাইলে। তাহলে বর্ণ বা বৃত্তিকেই ব্যক্তিগত স্বাধীন অস্তিত্বের মূল কথা ধরে সমাজ বাঁধলে সেইটাই তো প্রাকৃত নিয়মে সৃষ্টির মধ্যে অভ্যুদয়ের পরিপোষক হয়।

তা ছাড়া বংশের মহিমাও এতে কমে না। সকল বড় বড় বংশেই বংশধরদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৃত্তি দেখা যায়, তাতে বংশগরিমা উজ্জ্বল হয়েই থাকে। এক সংসারে বা এক অন্নে সংসার বাঁধা সেটা ভিন্ন কথা, তার সঙ্গে বৃত্তির বা বর্ণের কথা নেই। সমাজ বাঁধবার মূলকথা সমাজের প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ সংস্কৃতি এবং সমাজ উপযোগী গুণগত বৈশিষ্ট্যে সচেতন থাকা। একত্ব অনুভূতিই সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি, তার সঙ্গে বর্ণ বা বৃত্তিগত কোন দ্বন্দ্ব নেই। সারা জগতের স্বাধীন সমাজের দিকে চাইলেই এ সত্য অনুভূত হবে।

আমাকে এতটা বলতে হোতো না যদি বৃত্তি ত্যাগ করেও ব্রাহ্মণরা বা ক্ষত্রিয়েরা নিজবংশগত শ্রেষ্ঠতার দাবী এবং অন্যান্য বৃত্তিকে ইতর নাম দিয়ে ধর্ম্মের নামে এক বিষম শ্রেষ্ঠত্বের জট না পাকাতো। ঐ ব্যবহারিক ধর্মের জট ছাড়াতে হবে। আর তার একমাত্র সত্য উপায় হলো অধ্যাত্মধর্ম্ম ব্যক্তিগত এই নিয়ম স্বীকার করা। তাতে সবার অধিকার আছে। ধর্ম্মে আমরা হিন্দু এই পর্য্যন্ত জাতি নিয়ে কথা। তারপর বৃত্তির কথা। কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। কারণ সকল বৃত্তিই মানুষ-সমাজ পুষ্টির জন্য। হিন্দু জাতি যদি শ্রেষ্ঠ হয় তা হলে এইজন্যই হবে যে, তারা সবার মধ্যে এক আত্মা দেখতে পায়—যা এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মারই অংশ। তারপর নিজ নিজ বৃত্তিতে নিষ্ঠা, যার ফলে সবল উন্নতিমুখী এক সমাজ। ব্যবহারিকভাবে প্রবৃত্তিও ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়, কিন্তু আসল অধ্যাত্ম প্রেরণাই হিন্দুজাতির ধর্ম্ম এবং তার যথার্থ সংজ্ঞা। তাকে কখনও সম্প্রদায়গত করা চলে না, কারণ অধিকারের তারতম্য চিরদিনই থাকবে। সুতরাং আচার ও ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত করে নিয়ে সমাজশৃঙ্খলা দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে। অধ্যাত্ম ধর্ম্ম যার নাম আত্মচৈতন্য বিকাশ তা জীবের উন্নত অবস্থায় হয়ে থাকে, তা কখনও দল বেঁধে হয় না; কারণ তা হবার নয়।

এখন এই যে আটটি বর্ণ বা বৃত্তিমূলক সংজ্ঞা নিয়ে সম্পূর্ণভাবেই হিন্দু

জাতিকে পুনর্গঠন করা হচ্ছে,—পরে যদি এমন দেখা যায় যে কোন নূতন কর্ম্মবৃত্তির আবির্ভাব ঘটেছে সমাজমধ্যে, যাতে কিছু তারতম্যের সৃষ্টি হয়েছে তখন সমাজপ্রধানেরা একত্র হয়ে ঐ বৃত্তিনির্দ্দেশক উপযুক্ত নামকরণ করে তাকে সমাজ-অঙ্গে যুক্ত করবেন। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় যে চারিটি বর্ণ নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, দেশকাল প্রভাবে সেই চার থেকে অনেকগুলি বর্ণের সৃষ্টি এবং তাতে সমাজবাহু বহুদূর প্রসারিত হয়েছে, আর সেই সূত্রেই আমরা বর্ত্তমানে অষ্টবর্ণে সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে নিয়ে নবযাত্রা আরম্ভ করছি, সেই রকম ভবিষ্যতে নবতম বৃত্তির পরিচয় পেলে তাকে যত্ন করেই সমাজভুক্ত করে সমাজশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আমার মনে হয় বর্ত্তমানে আমাদের এই আটটির মধ্যে সমাজস্থ সকল বৃত্তিরই স্থান সঙ্কুলান হবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আগে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে, এখনও তা স্পষ্টভাবেই বলতে চাই যে এ পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গত জাতি আছে, আবার দেশের নামে জাতিও আছে। দেশ ও সমাজ নিয়ে যে জাতিনির্দ্দেশ সেইটাই সমীচীন মনে হয়,—ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গত যে জাতির নির্দ্দেশ তার মধ্যে হিংসা, হত্যা ও ষড়যন্ত্র প্রধান বলেই তারা জগৎ-প্রসিদ্ধ এ কথা আপনারা জানেন। কারণ তাদের মধ্যে যে ধর্ম্ম, তা জীবনের উপলব্ধ বা প্রমাণিত সত্য নয়, সম্প্রদায়গত ব্যবহারিক প্রবৃত্তিমূলক আচার মাত্র। ভারতের মধ্যেও ধর্ম্ম নিয়ে হয়তো হিংসা প্রতি-হিংসামূলক কর্ম্ম ঘটে গিয়েছে,—সাধারণত ঐ ঐ সমাজের ধর্ম্মবস্তুর সঙ্গে যথার্থ পরিচয় ঘটেনি বলেই এ সকল অঘটন সম্ভব হয়েছে। ধর্ম্মের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় কোন সমাজের সর্ব্বস্তরের মধ্যে অনুভূত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; এ সত্য এখন সর্ব্বজগতের, সভ্য সকল সমাজের মধ্যে সহজভাবেই প্রমাণিত, তাই এখন আর কোন সভ্য জাতিকে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সভ্য জাতি হিসাবে গণ্য করা চলে না। কোন বর্ব্বর যুগের ইতিহাস যেমন বর্ত্তমানের এই বিশ শতকের মধ্যভাগে অচল, কারণ এ যুগে লোকাচারকে আর ধর্ম্মসংজ্ঞায় অভিহিত করা যাবে না, ধর্ম্মের সংজ্ঞা এবং বিশ্লেষণ সভ্যতার আলোয় অনেক উজ্জ্বল, অনেক উন্নত হয়েচে। যথার্থ ধর্ম্ম যে বস্তু তার স্থান ব্যবহারিকভাবে নির্দ্দেশ করা চলে না, সেইজন্যই তাকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়ীভূত বলে সিদ্ধান্ত করাই ঠিক। তা হলেই ধর্ম্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসন হবে। ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞব্যক্তি কখনও সংঘর্ষের মধ্যে যেতে পারেন না, তেমনি আমরাও সামাজিকভাবে জাতিতে হিন্দুই থাকবো, ধর্ম্মকে সম্প্রদায়বদ্ধ করে ভণ্ড মনোভাবের পরিচয়

দেবো না জগৎজোড়া প্রতিবেশীদের কাছে। সমাজেরও সদর ও অন্দর আছে, —ধর্ম্ম অতীব কোমল প্রেমময় সত্তা, তার স্থান সদরে নয়, সমাজ-অন্দরের অতি নিভৃত প্রদেশে তার স্থান; আর সেই জন্যই অতি প্রিয়জন বা আত্মীয় ব্যতীত প্রতিবেশী সাধারণের সেখানে প্রবেশ অধিকার নাই। প্রীতিবদ্ধ না হলে কেউ তার নির্দ্দেশ পায় না। কারণ ধর্ম্মের মূল প্রেম কেউ বা জ্ঞানকেই মূল মনে করেন। কাজেই জ্ঞানই হোক, বা প্রেমই হোক,—এই দুইয়ের অধিকারীর দ্বারা কখনও সমাজের অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই; ঈর্ষা, হিংসা, দম্ভ প্রভৃতির স্থানও নাই ধর্ম্মের মধ্যে। কাজই ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে দম্ভ করে ধর্ম্মাশ্রিত বলে জাতির পরিচয় দেবার মূঢ়তা যেন দেশস্থ কোন একটি নাগরিকের না আসে। অন্ততঃ ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দু জাতির অস্তিত্বের কথা আলোচনা বা জাগতিক প্রতিবেশীবর্গের সামনে সগর্ব্বে ঘোষণা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত। আমরা ভারতবাসী হিন্দুসমাজ—এইটুকুই আমাদের স্বাধীন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিচয়। যথার্থই ধর্ম্ম থাকবে আমাদের হৃদয়কন্দরে, নিভৃত আলোচনা অভ্যাস এবং সাধনার ধর্ম। রাজনীতি অথবা সম্প্রদায়গতভাবে তার শ্রেষ্ঠত্বের দাম্ভিক পরিচয় থাকবে না।

২৫

চণ্ডালকন্যার কথা শুনিয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ বিস্ময়ে স্তম্ভিত, সে বিস্ময়ের কূল নাই। কতক্ষণ সভা একেবারেই স্তব্ধ; সবাই যেন গভীর চিন্তামগ্ন; বক্তাও যেভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া যেন সমবেত জন-সমষ্টির মনোভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন; যাহারা সম্মুখে ছিল তাহারাই দেখিয়াছিল—আমি পিছনে থাকায় কেবল তাঁহার স্থির, দৃঢ়, ঋজু শরীর-রেখাই দেখিলাম। যেন একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াই এবার তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :

আজ আর বেশীক্ষণ আপনাদের আটকে রাখবো না,— অবশিষ্ট যে কয়েকটি বিষয় আছে সেগুলি সংক্ষেপে বলার আগে একটি গুরুতর বিষয়ে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এই জীর্ণ অসুস্থ, গতিহীন সমাজকে নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও প্রাণপূর্ণ করতে প্রধান অবলম্বনীয় যা কিছু আগেই বলেছি, সে সব ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে হলে যে ভাবের অনুষ্ঠান দরকার—আপনারা সমবেতভাবে আলোচনা দ্বারাই তা স্থির করে নেবেন; যেহেতু সকল বিষয়ে খুঁটিনাটি নিয়ম

বা নীতি যা দেশের বর্ত্তমান সমাজে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগে প্রযুক্ত হবে তা নির্দ্ধারণ এবং নির্দ্দেশ আমার একার দ্বারা কখনই সম্ভব না, সুতরাং সে সকল ভার আপনাদের সদ্ভাব এবং সুবুদ্ধির উপর ছেড়ে দিয়ে এখন আশু কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, আমার মতে বর্ত্তমানে যেগুলি নিতান্তই প্রয়োজন তার কথাই বলচি,আপনারা অবহিত হোন।

সামাজিক ব্যবহারে প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্যের কথা গুরুতর; তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই হোক আমি সহজ সামাজিক প্রয়োজনের কথাই বলব। আমাদের নিজ সমাজের কল্যাণের জন্যই সমবেত গণশক্তি প্রয়োগ করে, শিক্ষা ও সদিচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অশিক্ষিত প্রতিবেশী সমাজের হিংসা ও পশুবৃত্তির প্রভাব, ধর্ম্মের নামে অন্য সমাজের উপর যথেচ্ছাচারের প্রবৃত্তি এবং ধারণা লোপ করতে হবে। অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক নিয়মেই যারা আমাদের গা ঘেঁষে রয়েচে, তাদের উপেক্ষা বা অস্বীকার করা মূঢ়তা, আর অন্তরের ঘৃণা পোষণ ক'রে অথবা দগ্ধ যন্ত্রণা নিয়ে মৌখিক সদিচ্ছার প্রলেপ লাগানো ততোধিক মূঢ়তা। তাই মুখের কথায় বা বক্তৃতায় ঐ সম্প্রদায়ের যারা হিংস্রভাবাপন্ন তাদের ভাই বলে নম্র সম্বোধন আত্মপ্রবঞ্চনা, তাকে ভণ্ডামো ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ঐভাবের ভাই সম্বোধন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কারণ তোমার মৌখিক ভ্রাতৃ-সম্বোধনে তার অন্তরের মূঢ়তা, হিংসাপ্রবৃত্তি অথবা ঔদ্ধত্য কিছু-মাত্র কম হবে না বরং তোমাদের নম্রতাকে তারা দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা বলেই মনে ক'রে তোমার প্রতি অত্যাচার ক রেই যাবে। কারণ পশুবৃত্তির ধর্ম্মই হোলো দাঁত, নখ, কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্যবহার, তা ছাড়া আর কিছু তারা বোঝে না। কারণ তাই তাদের ধর্ম্ম। ভবিষ্যতে যখন সত্য-সত্যই পরস্পর প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত হবে, আর সেটা সহজ সত্য ব্যবহারের দ্বারাই হবে, তখন ঐভাবে ভাই, বন্ধু সম্বোধন সার্থক হবে, সত্য হবে, -তার আগে নয়। অনেকেই এমন আছেন যাঁরা মনে করেন, মনের মধ্যে যাই-ই থাক না কেন, মুখে ভাই-ভাই সম্বন্ধ প্রকাশ করা ভালো, কারণ ঐ শব্দটা তাদের এবং আমাদের দুই পক্ষের কানেই ভাল লাগবে আর তাতে বিরোধের সম্ভাবনা কমবে। শুনতে এটা যতই কর্ণ-রোচক হোক না কেন, বাস্তব ভাবে তা হবার নয়। সত্যের উপর মিথ্যার প্রলেপ স্থায়ী হয় না কখনই। মানুষের মনটা এতো সরল বা সহজ বস্তু নয়, তার পিছনে বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ক্রিয়া আছে। সামাজিক একতাহীনতা, দুর্ব্বল স্বভাব এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফলে হিন্দুরা যে নৃশংস অত্যাচার নরনারী-নির্ব্বিচারে

পেয়ে এসেছে, কালের প্রভাবে তা ভুলে সহজ প্রতিবেশী ভ্রাতৃভাব হয়ত জাগাতে সহায়তা করতে পারতো কিন্তু একটু বিচার করলেই এটা স্পষ্ট দেখা যায় তাদের ঐ হিংস্র কর্ম্মধারা, হিন্দু প্রতিবেশীর উপর তাদের আক্রমণের ধারা ঠিক অতীতের মতই বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত হচ্চে, তাদের প্রকৃতিগত হিংসানীতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নি। এ বিষয়ে তাদের অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ এবং এতে তাদের সমাজের সর্ব্বস্তরের না হলেও বেশ বড় রকম একটা সংখ্যার অনুমোদন, প্ররোচনা এবং নির্দ্দেশ আছে। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, মূঢ়তা ইত্যাদি সত্য এবং কল্পিত কারণগুলি যাই হোক না কেন- হিন্দুরা অন্তর থেকে মার্জ্জনা দ্বারা সহজ হতে না পারলে প্রীতির ভাব আসতেই পারবে না। মার্জ্জনা অর্থে ক্ষমা নয়, বিরোধের ফলে হিন্দুর মনেও যে মলিনতা এসেছে (ঘৃণা ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি)—সেই মলিনতার সম্পর্কে সর্ম্মার্জ্জনার কথাই বলছি। তারপর হিন্দু সমাজের পুরুষেরা যদিও বা তাদের দুর্ব্ব্যবহার কালক্রমে উপেক্ষার চক্ষে দেখতে এবং নানাভাবে কর্ম্ম সম্পর্কে আদান-প্রদানের ফলে ভুলতে পারে,—নারী, অন্তঃপুরস্থ নারীপক্ষ থেকে তাদের প্রতি যে বিজাতীয় ঘৃণা, সেটা যাবে কি ক'রে? অন্তরে ঘৃণা পোষণ শরীরের মধ্যে বিষ পোষণের মতই অস্বাস্থ্যকর, পরিণামে ক্ষত উৎপন্ন ক'রে যায়, ফলে ঘোর স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা রয়ে যায়। এই সত্য আমাদের নারীসমাজে প্রকাশ এবং নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে দুষ্ট প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাদের সামাজিক কর্ম্ম একটু বেড়ে যাবে, কিন্তু এর অন্য উপায় নাই, উপেক্ষা এবং অস্বীকারেও কোন শুভ ফল হবে না। এটা আপনারা মনে রাখবেন, এ আমাদের গায়ের ঘা—আরোগ্যের ব্যবস্থা করতেই হবে।

এখন দ্বিতীয়টি বলছি :—বর্ত্তমানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তা প্রধানতঃ হিন্দুবিদ্বেষ সম্ভূত বৃটিশ ষড়যন্ত্রের ফলেই কতকগুলি শব্দ সৃষ্ট হয়েছিল, আর দেশের অপরিণামদর্শী নেতারা তা মেনে নিয়ে ব্যবহার করেছিলেন, যেমন কাস্ট্ হিন্দু, সিডিউল্ড্ ফাস্ট্, তপশীলভুক্ত ডিপ্রেস্ড ক্লাস, পঞ্চমা হরিজন ইত্যাদি - এখন এগুলি চিরদিনের জন্যই ভারতের হিন্দু সমাজ থেকে লোপ করতে হবে। এই সঙ্গে আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রে থিয়েটার সিনেমা প্রভৃতি বিশেষ বিভাগের অভিনেত্রীবর্গের প্রতি বিকৃত অসঙ্গত ও অসংযত ভক্তির আতিশয্যে নটীগণের নামের শেষে দেবী শব্দের প্রয়োগ যথেচ্ছ চলেছে। এ ব্যভিচার আমাদের সমাজের আদর্শ বিকৃতির ফল। আমি শুধু বারবিলা-

সিনীদের বা সম্ভ্রান্ত অথবা সাধারণ প্রতিষ্ঠাপন্ন অভিনেত্রীদের নামের সঙ্গে দেবী শব্দের প্রয়োগ নিবারণ চাইচি না, আমি নবীন হিন্দুজাতির সাধারণ গৃহস্থ সকল নারী নামের শেষেই দেবী শব্দ নিষিদ্ধ করতে চাইচি। কলাবিদ নর-নারীর গৌরব তাদের সাধনা ও সিদ্ধিকে, তার মধ্যে দেবী বা দেবত্ব আরোপ মুগ্ধ ভাবাবেগপ্রসূত বিক্ষিপ্ত চিত্তের একটা দম্ভমাত্র। অসাধারণ চরিত্র এবং কর্ম্মশক্তির বিকাশে কোনও নারীর মধ্যে যথার্থ দেবীত্ব যদি প্রকাশ পায় তাতে আপামর-সাধারণ তাকে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিজদেরই অন্তর পূর্ণ করেন। সেই পবিত্র দেবা শব্দ যারা যথেচ্ছা প্রয়োগ করতে চান, তাঁদের আরোগ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিকাবের ব্যাপার। বর্ত্তমানের আবহাওয়ায় আমাদের এই দেশে অনুকরণ সঞ্জীবিত নাটক অথবা চিত্রাভিনয় প্রভৃতি কলাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আদর্শ তো যথেষ্ট প্রবল রয়েচে। এখন শ্রেষ্ঠ বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ যাঁরা তাঁদের নামের সঙ্গে স্টার, অনুবাদে তারকা, বলে গৌরব প্রচারের রীতি পাকা করলেই তো চুকে যায়। তাতে যদি মন না ভরে তাহ'লে তার চেয়েও উচ্চস্তরের শব্দ আবিষ্কার কববেন, যেমন নীহারিকা ইত্যাদি এবং নটী বা অভিনেত্রীবর্গেব পরিচয়ার্থে দেবী শব্দ নিষিদ্ধ ক'রে শব্দের মিথ্যা প্রয়োগ রোধ করতে হবে। এই ব্যবহাব আমাদের বাক্য সংযমে সাহায্য করবে।

১ম—বর্ত্তমানে মুখুজ্জে, বাঁড়ুজ্জে, চাটুজ্জে, গাঙ্গুলী, এঁরা ছিলেন উপাধ্যায় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; প্রথমাবস্থায় তাঁরা যে যে গ্রামে বসবাস আরম্ভ কবেন সেই সেই গ্রামের নামের সঙ্গে তাঁদের শ্রেণীগত নাম যুক্ত হয়ে বর্ত্তমানেও ঐ সকল বংশনাম চালানো হয়ে আসচে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যে ঐভাবের উপাধি ব্যবহারের আর আয়োজন থাকা উচিত নয়, কারণ ঐ উপাধির সঙ্গে উচ্চ নীচ এই সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে, সেইজন্য গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী বৃত্তি অবলম্বন করেই উপাধি নির্দ্দিষ্ট হবে। যখন এই অষ্টবর্ণেব লোক ইচ্ছামাত্রই হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের অধিকারী হচ্ছে এবং উচ্চ-নীচ ভেদের মূল বংশগত জাতি বা বর্ণ থাকচে না এবং বিহাহ আদি এই অষ্টবর্ণের মধ্যে অবাধে চলতে পারছে তখন ঐ পুরানো বর্ণ-নির্দ্দেশক চাটুজ্জে দত্ত রায় এসব তুলে নিয়ে নববর্ণের অর্থাৎ নামের আগে কিম্বা শেষে ঐ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য, শিল্পী, নৈতিক, বিজ্ঞানী, কর্মী এসকল যোজনা করা যেতে পারে, তা খারাপ শোনাবে না। বর্ত্তমানে যেসব উদ্ভট পদবী আছে তার তুলনায় এই সব

সমাজের বর্ণ-নির্দ্দেশকারী পদবী সুন্দর। তারপর রায়বাহাদুর, খাঁবাহাদুর, খাঁসাহেব, মজুমদার, জোয়ারদার, চোংদার প্রভৃতি যত উদ্ভট কুশ্রী লেজুড়গুলি লোপ ক'রে সহজ সরল মানুষের মত নামকেও সহজ মনুষ্যত্বের ছাঁচে ঢালতে হবে। এ সমাজে একজনের নামটাই হবে মুখ্য, আসল, তারপর বৃত্তি বা বর্ণ নির্দ্দেশক নাম।

২য়—ব্রাহ্মণের কিম্বা যে কোন বর্ণের যদি আটটি পুত্র থাকে ঐ আটটি পুত্র আজ আটটি বৃত্তি অনুসারেই পদবী গ্রহণ করবেন। যতদিন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট না হবে ততদিন নামের আদিতে শুধু কুমার থাকবে, পিতার বর্ণগত উপাধি বা পদবীতে পরিচিত হবেন না। নারীর পক্ষেও সুন্দর ব্যবস্থা হতে পারবে, কুমারী অবস্থায় কুমারীই ব্যবহৃত হবে ; তারপর বিবাহিত হলে স্বামীর পদবীই গ্রহণ করবেন। নারীমাত্রেই যে বিবাহিত হবেন অথবা বৃত্তিশূন্যা হয়ে স্বামীর বৃত্তি উপার্জ্জনের অংশভাগিনী থাকবেন এমন নাও হতে পারে তো। পরে তিনি যে বৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জন করবেন সেই বৃত্তি-সংকল্পিত বর্ণে পরিচিতা হতে পারবেন যদি ইচ্ছা করেন। সে সকল বিষয়ে পরিচয় সম্পর্কে তাঁর নিজ বৃত্তিই কার্য্যকরী হবে, এতে বাদ-প্রতিবাদের কারণ থাকা উচিত নয়।

৩য়—পূর্ব্বেই বলা হয়েচে বর্ত্তমানের এ নবীন হিন্দু জাতির অষ্টবর্ণের মধ্যে উচ্চ নিম্ন শ্রেণীভেদ থাকবে না। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত থেকে সকল বৃত্তি-অবলম্বী বর্ণের মধ্যে হিন্দুর দশবিধ সংস্কার ক্রিয়াশীল থাকবে। আর তাঁদের ইচ্ছামতই তা গৃহীত হবে। অবশ্য এখানে ভারতীয় হিন্দু জাতি সবাই দশবিধ সংস্কারে আস্থাশীল এই সত্য মেনে নিয়েই এটি প্রস্তাবিত হয়েচে। জাত সংস্কারের প্রথম এই অন্নপ্রাশনই ধরা হবে তারপর উপনয়ন বিবাহ, কুশণ্ডিকা ও শ্রাদ্ধ এই কয়টিই বর্ত্তমানে প্রতিপাল্য—বাকি বা মধ্যের যে কয়টি আছে বর্ত্তমান সমাজে তার আয়োজন নেই, তাই স্বতই অদৃশ্য হয়েছে। যেমন এখন আট-নয় বৎসরে বিবাহ উঠে গিয়েচে, কাজেই বিবাহের পর সন্তান প্রসবকালের মধ্যে যেগুলি, তাকে আর সংস্কার বলে ধরা হয় না বা তার প্রয়োজনের কথা সাধারণের মনে খুব বেশী সাড়া জাগায় না, অবশ্য তাতে পঞ্চগব্যাদি সেবনের যে বিধান আছে তা হয়তো সবার রুচিসম্মত হবে না, তাঁরা ওটা বাদ দেবেন। তবে ওর মধ্যে কতকগুলি পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে বিজ্ঞানসম্মত ক্রিয়াকর্ম্ম আছে তার বৈজ্ঞানিক তথ্য আমাদের অনেকের জানা নেই

বলেই ত ব্যবহার অনাবশ্যক মনে হয়। এক সময়ে যখন সর্ব্ববাদিসম্মত বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি জাতির বুদ্ধিগত হবে তখনই ঐ সকল ব্যবহারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। হিন্দু জাতীয়সংস্কারের যা কিছু সবই কুসংস্কার এ ধারণাও এখনকার দিনে মূঢ়তার নামান্তর। আমরা উপযুক্ত কল্যাণকর পরিবর্ত্তনেরই পক্ষপাতী। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে কতকগুলি সহজ প্রথার লোপ ক'রে আমাদের সামাজিক জীবনে সংযমের যে হানি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু তাতে আর জাতিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়; এখানে পাশ্চাত্ত্য সমাজের প্রভাব এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই কার্য্যকরী হয়ে উঠেছে, বর্ত্তমানে ওসব সংস্কার সমাজের পুরুষদের মনে মধ্যে নেই। কোন কোন সংসারের নারীদের মধ্যে হয়তো আছে। যাঁদের আছে তাঁরা করুন যতদিন পারেন তাতে কারো আপত্তির কারণ নেই। আমার নিজের মত এই যে সংযম ভিতর থেকেই ভালো, বাইরের কোন আচার বা অনুষ্ঠানকে ধরে সংযমকে মানানো অসম্ভব এবং প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ জাতির সংযম,—পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায়, প্রতি সংসারের মানুষের মধ্যে বুদ্ধি আর মনের সঙ্গেই বাঁধা, এর অন্য ভাবের ব্যাখ্যা নেই।

এখন এ নূতন হিন্দু জাতির যে কয়টি সংস্কার পালনীয় রইলো তার মধ্যে প্রত্যেক সংস্কারের কাজে সংস্কৃত মন্ত্র প্রথমে উচ্চারণ করে সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় সহজ সরল অনুবাদ আবৃত্তির দৃঢ় নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এখন থেকে প্রত্যেক শুভ কাজে—উপনয়ন, বিবাহ, কুশণ্ডিকা ও শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকালে, বিশেষতঃ বিবাহের সম্প্রদান ও কুশণ্ডিকা পাণিগ্রহণ প্রভৃতি সংস্কারের ক্রিয়ার প্রত্যেক সংস্কৃত মন্ত্রের নির্ভুল বাঙ্গলা অনুবাদ উচ্চারিত হবে। পাত্র-পাত্রী পুরোহিত প্রত্যেকেই সেই সকল মন্ত্রানুবাদ মনোযোগী হয়ে আবৃত্তি করবেন। যাঁরা সংস্কারে বিশ্বাসী তাঁরা প্রকৃত অর্থবোধ করবেন এইটিই ছিল প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য। এই অনুবাদ কার্য্যকালে পরিচয় দেবে এ জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ কত মহান ছিলেন। বর্ত্তমানের শিক্ষা এবং পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের চাপে জাতীয় সংস্কৃতির আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে গিয়েছে বলেই জাতি এতটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে কেবল উৎসবের দিকেই বেশী ঝুঁকচে, উৎসবের মূল সংস্কারের উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে। আমাদের জাতীয় সামাজিক অথবা পারিবারিক কল্যাণের মূল এই সংস্কার, এটি মনে রেখে প্রত্যেক মন্ত্রের সহজ সরল বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হবে। এটি উপেক্ষা করা চলবে না। আমি বিশেষ-

ভাবেই বিবাহ সংস্কারের উপর জোর দিয়েছি, তাতে হয়তো আ... আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন। দেশে সুস্থ উপার্জ্জনশীল যুবারা বিবাহ ক...ন কিন্তু জানেন না, সম্প্রদান এবং কুশণ্ডিকায় কি প্রতিজ্ঞা করে এক নিরী... বালিকার জীবনদায়িত্ব এবং পাণিগ্রহণ করলেন। নিজ মাতৃভাষায় উচ্চারি হলে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত হবেন, তাতে আত্মবিশ্বাস ... আত্মশক্তি বাড়বে। তার ফল যে কল্যাণকর হবে, এ বিষয়ে যাদের স...য় আছে তারা যেন এ সভার বাইরে থাকেন। উপনয়ন সংস্কারটিও যেন আপনারা উপেক্ষা না করেন। সত্য সত্যই সভ্য জাতির একজন ভা...নাগরিকের জীবনে একটা উচ্চ-সংস্কৃতির আরম্ভ বোধ হয় পৃথিবীর কো সভ্য সমাজে নেই। একটা জাতীয় সমাজে এক পরিবারের মধ্যে এক৷ নবীন ব্যক্তির জীবন সূর্য্যকে দেবস্থানে রেখে এই সম্বন্ধের আরোপ ক মহৎ শক্তি প্রসব করে একবার যেন অবিশ্বাসী ব্যক্তিরাও কিছুদিন পরীক্ষ ক'রে দেখেন ; যাঁরা হিন্দু সংস্কারের সর্ব্বথা উচ্ছেদ চান তাঁরা মোটেই ধীমন্ নন. তাঁদের গোড়াকার গলদ বিশ্লেষণযোগ্য নয়, সেটা বিষম সেই জন্য ত...তে বিরত হলাম। একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিক গঠনের পক্ষে এই সংস্কারটি যে ...ত বড় প্রবেশিকা তা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে গেলে অন্য একটি বিশাল আয়োজনে প্রয়োজন।

বিবাহ যেমন প্রয়োজনের প্রধান একজনের জীবনে, জাতীয় সামাজিক এবং সর্ব্ববিধ কল্যাণময় জীবন উপনয়নে সংস্কারেরও দৃঢ় প্রয়োজন আছে, জাতির সর্ব্বস্তরেই এটা স্মরণীয়, করণীয় এবং চিন্তনীয় বিষয় হয়ে থাকে। সময়ে এর ফল অনুভূত হবে।

আরও একটি বিষয়ে একটু মনোযোগী হতে হবে : এই যে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পুরোহিত শ্রেণী, তাঁদের উপজীবিকা ত ঐ দশবিধ সংস্কারের কাজ, অধ্যাপনা এই সব নিয়েই। তাইতেই তাঁদের সংসারের সর্ব্বার্থসিদ্ধি করতে হবে ত। সেইজন্য এখন যেভাবে দরিদ্রমতে পূজা প্রভৃতি কর্ম্মে দক্ষিণাদির ব্যবস্থা চলচে শিক্ষিত সমাজে তা অচল। এখনকার ব্যবস্থা যদি লক্ষ্য করা যায় সহজেই নজরে পড়বে যে হিন্দুজাতি বর্ত্তমানে কতটা অধঃপতিত এবং হীন মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে, বিশেষতঃ ধর্ম্মের নামে কল্যাণকর সামাজিক এবং পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানে। বিবাহের ব্যাপারে ঘটক অথবা দালালেরা কত রকমে কত বেশী উপার্জ্জন করে, কিন্তু বিবাহ-সম্পন্নকারী সদাচার-সম্পন্ন পুরোহিতের পাওনাটা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের যদৃচ্ছালাভের মত, এতই সংকীর্ণ যে

এটা বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে যে এই সামান্য দানে কেমন ক'রে তাঁরা সংসার পালন করেন এই বৃত্তির উপর নির্ভর করে? তার সঙ্গে এটাও লক্ষ্যের বিষয় হয়ে পড়ে যে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী পরিবারবর্গের সংকীর্ণ হীন মনোভাব জাঁকজমকের উৎসবে, প্রতিমাদি বাহ্য অনুষ্ঠানে সাজসজ্জায় ধুমধামে মোটা টাকা খরচ হয় তার তুলনায় পূজারী বা পুরোহিত-বিদায়টা একটু ভদ্রভাবের ভিখারী-বিদায়ের তুলনায় খুব বেশী তফাৎ নয়। একটা জাতির সামাজিক বিবেক এবং চরিত্রে এটা যে কিসের পরিচয় তা শিক্ষিত সাধারণকে স্থির মস্তিষ্কে আপন-পর ন্যায় বিচার করতে অনুরোধ করচি। এটা উপেক্ষাব বিষয় নয়। মনে রাখবেন আমার বাল্যকাল থেকেই ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের এবং জাতিগত গৌরবের দম্ভ অসহ্য ঘৃণার বিষয় ছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্ভুত সত্য এই সূত্রেই আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটা এই যে, যে সকল ব্রাহ্মণের যথার্থ শিক্ষা ও জ্ঞান এবং শাস্ত্র-বিচার তাঁকে যথার্থই উচ্চস্তরে রেখে আমাদের সমাজ গৌরববোধ করেছে, আমি ঘনিষ্ঠভাবেই তাঁদের সংস্পর্শে এবং ব্যবহারে এসেছি, তাঁরা কেউ দাম্ভিক তো ননই পরন্তু নিজ গুণগরিমার বিষয়ে সজাগ নন। তাতেই আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েচে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতিহীন যারা তাদের আর কিছু গৌববের নেই জেনে তারাই উচ্চজাত বলে দম্ভ প্রকাশ করতে চায়। আমাদেরও শিক্ষার অভাবে মনে বিদ্বেষ এসে পড়ে। জাতিগত পার্থক্যের দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় নিজেদের ছোট ভাবি বলেই কিছুতেই এই জাতি বা শ্রেণীগত বিদ্বেষের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই না। এখনও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির সংস্কৃতিতেই উজ্জ্বল এদেশের সব কিছু। অন্ধ বিদ্বেষে পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য মন আমাদের ব্রাহ্মণাদির শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য না করতেই প্ররোচিত করে, ফলে আমাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে বঞ্চিত হতে হয়।— আদর্শভ্রষ্ট হলেই তখন পরজাতীয় হিংস্র আদর্শ গ্রহণে প্রবৃত্ত করায়, ইচ্ছা হয় ঐ নিজ সমাজের শ্রেষ্ঠ, প্রতিষ্ঠাপন্ন উচ্চকে সমূলে বিনাশ ক'রে আমরাই একমাত্র উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকি এ দেশে। পাশ্চাত্যের নানা আদর্শ আমাদের সম্মুখে আজ জীবন্তভাবেই নৃত্যশীল, আমরা মূঢ়চিত্ত, ঠিক কোনটা কল্যাণকর আমাদের সমাজ-জীবনে, শান্তি ও স্বচ্ছন্দ আনতে পাবে কেবল সেইটাই গ্রহণ বিষয়ে বুদ্ধিহীন। রক্তচঞ্চলকারী আদর্শের মতই একটা কিছু যেন আমাদের চাই-ই যেহেতু প্রমত্ত মনের যুক্তি এই যে ঠাণ্ডা রক্ত আমাদের মরণের পথেই নিয়ে যেতে চাই তাই আদর্শ গরম চাই। কিন্তু আমরা বুঝি না যে প্রকৃতির

বিধানে আমাদের এই ভয়ঙ্কর গরম দেশে বাইরের এই ভীষণ তপ্ত আবহাওয়ায় অতটা গরম আদর্শ স্বাভাবিক নয়।

এখন আমার সর্ব্বশেষ কথা—মন, প্রাণ ও অন্তরাত্মা যতটা চেতনশক্তির অধিকারী আমি আমার সর্ব্বশক্তি নিঃশেষে প্রয়োগ করেই আপনাদের কাছে শেষ অনুরোধ এবং নিবেদনটি উপস্থিত করাচ, অধঃপতিত এই সমাজের পুরাতন অহমিকার জড়তা, উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদের দম্ভ নিঃশেষে লোপ করে এই জাতিকে বাঁচাতে,—বাঁচার মতই বাঁচাতে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে উচ্চস্তরের শক্তিশালী এবং সত্য সত্যই একটি মহৎ জাতিতে পরিণত করতে সহায়তা করুন। আপনাদের এই প্রবর্ত্তনা সারা ভারতকে উদ্বুদ্ধ করবে। সুতরাং পরোক্ষে আপনাদেরই সহায়তায় আপনাদের সন্তানেরাই সারা ভারতের অগ্রগতির গৌরবভাগী হবেন। ব্রাহ্মণে ও অব্রাহ্মণে এই বিশাল-শরীর হিন্দুসমাজক্ষেত্রে বর্ত্তমানে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই; সুযোগ এবং অনুকূল অবস্থা পেলে এক সাঁওতাল সন্তানও শিক্ষিত হয়ে দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে এবং সাফল্যলাভ করতে পারে, মানুষ হয়ে সর্ব্বস্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মহৎ হতে পারে। এমন কি নেতৃস্থানও অধিকার করে এই বিশ্বস্রষ্টার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং সার্থকতার শুভ পরিচয়ও দিতে পারে। এই অবস্থাই হিন্দু সমাজের চরম মুক্তির অবস্থা। দোহাই আপনাদের, আর ঐ গলিত শবদেহের মিথ্যা বর্ণ-গরিমায় এই বিশাল সমাজের সর্ব্বনাশ করবেন না। আর্য্যভারতের গৌরবের জ্ঞান ও শক্তি প্রসারের দিনে সমাজের এ কুৎসিত মূর্ত্তি ছিল না,—আমার আশা শুধু নয়, বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছায় শেষেও এ মূর্ত্তি থাকবে না, তাই না আজ আমি আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি এ সমাজের আগামী প্রতিষ্ঠা ও জয়ের সঙ্কেত নিয়ে। পরলোক যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে আর কিছু না পারেন আপনাদের বংশধরদের পথ—উদার সামাজিক মুক্তির পথ মুক্ত ক'রে দিয়ে যান, কায়মনোবাক্যে তাঁদের অগ্রগতির বাধা মুক্ত করে দিয়ে দেশের সামাজিক ইতিহাসে আপনাদের নিজ স্থান প্রতিষ্ঠিত ক'রে যান। সার্থক হোক আপনার জন্ম ও জীবন। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন চরিত্র এবং বাণী স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তিনি গত শতাব্দীর শেষদিকে একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, এই জাতিভেদ গায়ের ঘায়ের উপর মামড়ির মত (তখনকার দিনে), তাড়াতাড়ি ওটাকে টেনে ছিঁড়তে গেলে রক্তপাত হবে, ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ি আপনি খসে যাবে। আমার বিশ্বাস এতদিনে সে সময় এসেচে, তার যথার্থ কারণ এই

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর হয়ে গিয়েচে, এই কালের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিচ্চে এখন ঐ ব্যাধির শেষ,—সেইটি অনুভব ক'রে আপনারা এগিয়ে আসুন। প্রকৃতি অনুকূল হয়েচেন। সংস্কারে বদ্ধপরিকর হোন, না হয় মরণের পথে এগিয়ে চলুন। আমার বিশ্বাস উচ্চ-নীচ দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতিভেদ যে কতটা মিথ্যা তাঁর মত কেউ অনুভব করে নি তখনকার দিনে।

এখন সন্ন্যাসীদের কথা একটু আছে। সন্ন্যাসী বা গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগী, বৈরাগ্যবান যাঁরা তাঁরা এই অষ্টবর্ণের বাইরের মানুষ। তাঁদের পরিচয় তাঁদের আশ্রম বা গুরুসম্পর্কিত। শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি, সমাজের মধ্যে যাঁর ইচ্ছা তাঁদের ভরণপোষণের অথবা লোক বা সমাজ কল্যাণের কাজে সহায়তা করবেন; তাতে বাধ্যবাধকতা নেই। শাসন কর্ত্তৃপক্ষের অপরাধমূলক সাধারণ ন্যায়-নীতিসম্পর্কীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা সমাজ বা দেশরক্ষার আইন ব্যতীত অপর সামাজিক কোন আইন তাঁদের নিজ নিজ কর্ম্মপথের বাধা সৃষ্টি না করে, এ বিষয়ে সমাজপতিগণ সজাগ থাকবেন। এই যে সামাজিক ধর্ম্ম এবং সমাজ নব আদর্শে গড়ে তোলবার প্রস্তাব ক'রে গেলাম এর মৌলিক চিন্তা এবং বিচারপদ্ধতির সবটাই শৈবধর্ম্মের অধিকারের বিষয়। বর্ত্তমানে যে শৈবধর্ম্ম আমাদের সমাজকে বাঁচাবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, কারণ অন্য পথ নাই।

তারপর সব চুপচাপ।

এলোকেশী হঠাৎ আমার দিকে ফিরিলেন, মুখে একটা প্রসন্ন বিস্ময়ের ভাব আমাকে এখানে দেখিয়া। তারপর তাঁর আমার পানে লক্ষ্য রাখিয়াই এক পা এক পা অগ্রসর হওয়া,—তারপর দেখিলাম, প্রথমে কপালে তারপর আমার মাথায় তাঁহার ডানহাতের তালু রাখিলেন, বলিলেন,—হ্যাঁ, এইবার জ্বর ছাড়লো। অমৃতমধুর ঐ কথা কানে যাইতেই ঘুম আমার ভাঙিয়া গেল; আশ্রমের সেই ঘরে সেই শয্যায় শুইয়া আছি; উমাপতি বাবা আমার সামনেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিলাম এলোকেশী মাতা আমার মাথার শিয়রে, তাঁর হাত তখনও আমার মাথায়। আমায় জাগ্রত দেখিয়াই বলিলেন,—এতদিনে জ্বরটা ছাড়লো। বাবা হাসিতে হাসিতে আমার হাতে একখানা পোষ্টকার্ড পত্র দিলেন। পড়িয়া দেখি, টাকা পাঠানো হইয়াছে সেই খবর, আর বাড়ী ফিরিবার জন্য জোর তাগাদা। জ্বর আমার সত্য সত্যই ছাড়িয়াছিল, তারপর খুব খানিক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; ঘামে সর্ব্বাঙ্গ তখনও সিক্ত। যেন নীরোগ হইয়া গিয়াছি ভাবিয়া অন্তরে আনন্দ ও উৎসাহ। তখনই উঠিয়া বসিলাম।

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে টাকা পাইলাম এবং সেই দিনই বৈকালে যাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু উপাপতি বাবা এবং এলোকেশী বাধা দিলেন। এলোকেশী বলিলেন, আমি জানতাম আপনার ঘরের টান ধরেছে, আপনার সাধু সাজা কেন ?

আবার খোঁচা। কিন্তু স্বপনে তাঁকে যেভাবে এই হিন্দু সমাজ সংস্কারের বিষয়ে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহার একটি কথাও স্মৃতিভ্রষ্ট হয় নাই। আনুপূর্ব্বিক সকল কথা উভয়ের কাছেই বর্ণনা করিলাম। শুনিয়া উমাপতি বাবা একটু হাসিলেন; বলিলেন, সত্যসত্যই ও ভেবেছে। এই জাতির উদ্ধারের কথা, দেশের যথার্থ কল্যাণকামী বড় বড় চিন্তাশীল যাঁরা তাঁরা যতটা ভেবেছেন আমার ধারণা ও তাঁদের চেয়ে কম তো ভাবেই নি বরং অনেক বেশীই ভেবেচে। ঐটুকু তো ওর মাথার গঠন, কি করে যে অতটা গভীর সমাজ-সংস্কারের কথা ভাবতে পারে তা আমি ভেবে পাই না। ওর শেষের কথাটা বোধ হয় শোনো নি !

জিজ্ঞাসা করিলাম,—সেটা কি ?

তিনি এলোকেশী মাতার দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন—ও বলে, ওর ঐ মত মানতেই হবে একদিন। এ ছাড়া হিন্দুর বাঁচবার দ্বিতীয় পথ নেই; হিন্দু নাম হয় মুছে যাবে ভারত থেকে, না হয় শক্তিশালী হবে ওব প্ল্যানে সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কার করলে। পাছে লোকে পাগল বলে, সেইজন্য ও কারো কাছে এখনও পর্য্যন্ত বলে নি। আমার কাছে ওর কিছুই গোপন নেই। ওর সব বেশ ভাল ক'রে দস্তুরমত গুছিয়ে লেখা আছে, আমার ঐ আসনের পাশে ছোট সিন্দুকের মধ্যে।

আমি সে দিনটি সেই লেখা পড়িয়া কাটাইলাম। পরদিন দেশের দিকে যাত্রা করিলাম।

২৬

পথের বিপত্তি

যুবক হেমন্ত মিত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের অফিসে কাজ করিত। নূতন বিবাহ করিয়া বৎসর দুই মহা আনন্দে সস্ত্রীক কলিকাতায় কাটাইবার পর তাহার ডিস্‌পেপসিয়া ধরিয়া গেল। স্বামী পরমানন্দ তাহাকে ভালবাসিতেন। একদিন স্বামীজীর কাছে গিয়াছি—হিমালয় ভ্রমণে যাইব যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী প্রভৃতি কঠিন স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা, তাই যাইবার আগে শ্রীগুরুচরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইব এই উদ্দেশ্যেই গিয়াছি। তিনি সব শুনিয়া হেমন্তর কথা তুলিলেন। বলিলেন,—ও দু'মাস ছুটি পেয়েছে, ওকে সঙ্গে নাও না—কিছুদিন একটু সংসার থেকে তফাতে থাকলে ওর পক্ষে ভালই হয়। একই গুরুর সন্তান সেই সম্পর্কে গুরুভাই, কাজেই তাহাকে সঙ্গে লইতে হইল।

কলিকাতা হইতে মুসুরী আসিয়া হেমন্ত হিমালয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম তাহাকে মুসুরীতে রাখিয়া একলাই যমুনোত্রী যাইব। আমার যাইবার কথায় সে—আমিও যাইব, দাদা! বলিয়া নাচিয়া উঠিল। কঠিন চড়াই উৎবাইয়ের কথা শুনিয়াও ক্ষান্ত হইল না। কাজেই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার সঙ্কল্পই করিলাম। সে পাহাড়ে হাঁটিবার বুট কিনিল—আমি খালি পায়েই ভাল চলিতে পারি।

একটি দিনে যা কিছু সংগ্রহ করিবার করিয়া দুটি কুলীর পিঠে বোঝাই দিয়া পরদিন প্রত্যুষে আমরা মুসুরী হইতে ধরাসুর পথে যাত্রা করিলাম। মুসুরী পার হইলেই গাড়োয়াল রাজ্য আরম্ভ। হিমালয়ের প্রধান তীর্থগুলিই এই গাড়োয়াল রাজ্যের মধ্যে এবং অধিকারে।

মুসুরী পার হইয়া আমরা গাড়োয়াল রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। টিহরী গাড়োয়াল অতি প্রাচীন হিন্দুরাজ্য। পূর্ব্বে সবটাই টিহরী রাজ্য ছিল—সম্ভবতঃ ১৮৪০ সাল হইতে গঙ্গা বা অলকানন্দার দক্ষিণাংশ হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য ভূভাগ ব্রিটিশ সরকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ব্রিটিশ গাড়োয়াল নামেই নির্দ্দিষ্ট। টিহরী রাজ্য এখন ফেডারেটেড ইণ্ডিয়ান স্টেটসের

অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং রাজদরবারের কতকটা স্বাধীনতা আছে বৈকি। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া আর আর প্রায় সকল বিভাগেই তাহার নিজ কর্ত্তৃত্বাধীন। সুতরাং এই তীর্থযাত্রার মধ্যে যাহা কিছু পড়ে,—কেদার ও বদরীনারায়ণের মন্দির খোলা, যথাসময়ে বন্ধ করা, এ সকল টিহ্‌রী দরবারের ব্যবস্থানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পথঘাট সকল দরবারের খরচেই প্রস্তুত এবং মেরামত হইয়া থাকে।

মুসুরী হইতে যে পথ ধরাসু পর্য্যন্ত গিয়াছে উহা প্রায় ৪০ মাইল। পথের প্রথম ২০ মাইল প্রায় সবটুকুই সমতল, অতি চমৎকার, অক্লেশেই যাওয়া যায়। কঠিন চড়াই ত নাই-ই পরন্তু উৎরাইটি দীর্ঘ এবং সময় সময় একটু কষ্টকর। এমন সব স্থান দিয়া নামিতে হয় যেখানে এক পাশে গভীর খদ্ অপর পাশে ক্রমোন্নত জঙ্গল, মধ্যে সরু পথটুকু আবার নানা আকারের প্রস্তরখণ্ডসমাকুল —খালি পায়ে চলিতে আঘাত পাইতে হয়। এক একটা পাথর এমন তীক্ষ্মমুখ, ধারালো কোণ পায়ে ফুটিয়া যায়। আমার ঐরূপ একটা ধারালো পাথরের কোণ পায়ের তলায় ফুটিয়া কিছুদিন কষ্ট দিয়াছিল। মুসুরী হইতে সুয়াখালি নামক প্রায় ছয় মাইলের মাথায় একটি পড়াও। ইহার মধ্যে মধ্যে দুই তিন খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আমরা পার হইয়াছিলাম। সে গ্রাম কেবল যাহারা ক্ষেতিবাড়ি করে তাহাদের জন্যই। ধান ও গমের ক্ষেত্র সর্ব্বত্রই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। সুয়োখালি পর্য্যন্ত প্রায় সোজা পথ। তারপর সেখান হইতে উৎরাই, সেই উৎরাইয়ের কতকাংশ কঠিন প্রস্তরখণ্ডসমাকীর্ণ,—পাথরের ছোট বড় নানা আকারের টুকরো ছড়ানো। তখন পথ এই রকমই ছিল, এখন হয়তো ভাল হইয়াছে।

উৎরাই শেষে প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় এক পার্ব্বত্য নদী উপত্যকায় দাতুরী গ্রামে উঠিলাম। স্নানাহার বিশ্রামের প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইয়া আবার যাত্রা করিলাম। ও বেলা মাত্র ছয় মাইল চলিয়াছিলাম, এ বেলা একটু বেশীদূর যাইব সঙ্কল্প ছিল। হেমন্ত খুব চলিতেছে, তাহার ভারি আনন্দ,—উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথায় হিমালয়ের সৌন্দয্য বর্ণনার ফোয়ারা ছুটাইতেছে। বৈকালে দুটায় কিছু বিশ্রাম করিয়া আমরা আবার ওখান হইতে রওনা হইলাম। সোজা পথ— কোন কষ্টই নাই। হেমন্ত ভারি খুশি। সে ইতিমধ্যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে —ওঃ এই ত পথ, এরকম পথে লোকে আসতে ভয় পায় কেন? আমি সারা হিমালয় ঘুরবো আপনার সঙ্গে।

আমি বলিলাম,—মুসুরীর চড়াইয়ের কথাটা ভুলে গেলে নাকি? সে বলিল, কৈ আজ সারাদিন ত কোনোখানে সেরকম পথ দেখলাম না। সে বোধ হয় প্রথম দিকেই একটু ছিল, তারপর সব এই রকমই পাওয়া যাবে,—আপনি দেখবেন দাদা।

ভালো, দেখা যাবে। আরও অনেক পথ ত পড়েই রয়েচে আমাদের সামনে। মাইল পাঁচ, সাড়ে পাঁচ আসিয়া মোলধাব নামক গ্রামে পৌঁছিলাম। মূলধারা হইতে বোধ হয় মোলধার নামটি, কিন্তু কোন ধারা বড় একটা দেখি নাই। তবে ঝরণা একটা ছোট- শেষের দিকেই আছে, পাহাড়ের গায়ে। কিন্তু তাহাতে জলপানের সুবিধা মোটেই নাই। পাহাড়ের শেওলা-ঢাকা গা বাহিয়া জল ঝরিতেছে। সেই ধারা পার হইয়া চড়াই আরম্ভ হইল। এইবার হেমন্তর মুখটি চুন,— তবুও এই চড়াইটি খাড়া চড়াই নয়। এই তিনটি মাইল চড়াই উঠিতে সে যেভাবে মধ্যে মধ্যে বসিতেছিল তাহাতে আমি একটু ভীত হইলাম। ভয়টা এই যে পাছে সে সামলাইতে না পারে। মুসুরীতে যা বেড়ানো হইয়াছে এবং আজ—এই চড়াই তিন মাইল বাদে সবটাই সহজ এবং সুখের পথ। শেষেরটুকুই তাহার পক্ষে বিষম হইয়াছে বুঝিলাম। উৎসাহের মাত্রাটা বেশী ছিল তাই সে বড় উচ্চবাচ্য করিল না। প্রায় তিন মাইল চড়াই উঠিয়া পর্ব্বতের অপর দিকে কতকটা উৎরাইয়ের পর ঘোরিপা নামক গ্রাম। আজ এইখানেই আমাদের রাত্রিযাপন। প্রায় কুড়ি মাইল কাবার করিয়া শ্রমক্লান্ত শরীরে আমরা যখন গ্রামের দোকানে আশ্রয় লইলাম তখনও আমাদের কুলী-মহারাজ আসিয়া পৌঁছান নাই।

গ্রামের মুদি বানিয়া আমাদের যথেষ্ট সৎকার করিল। তাহার স্ত্রী ও একটি মেয়ে। তাহারাই রোটি পাকাইল আর শাক বানাইয়া শেষে একটু আচার দিয়া আমাদের ভোজন করাইল। হেমন্ত খুব তারিফ করিয়া খাইল। তারপর বিছানা পাতিয়া যে যাহার স্থানে শয়ন করা গেল।

প্রাতে উঠিয়া বেশ শীত বোধ হইল। হেমন্ত বলিল,—আচ্ছা দাদা, গরমের সময়েও হিমালয়ে যখন এতটা শীত তখন যথার্থ অগ্রাণ-পৌষ মাসের শীতের সময় এখানে কেমন লাগে, আর শীতই বা কেমন পড়ে?

আমি বলিলাম, তুষারপাতের কথা শোনো নি—তখন তো এসব জায়গা প্রায় সবই বরফে ঢাকা থাকে, ফাল্গুন মাসে যখন সেসব গলে যায়, তখনই ত আমাদের ভ্রমণের পালা।

এবার পথে কোন চড়াই উৎরাই নাই, সুন্দর পথ, মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর কখনও বা পাহাড়ের গা দিয়া পথ আঁকা-বাঁকা চলিয়া গিয়াছে, সুন্দর দৃশ্য। বরাবর একদিকে দেখিতে দেখিতে আমরা একটা ঝরণার কাছে আসিয়া পড়িলাম। হেমন্ত বরাবরই আমার সঙ্গে এক তালে আসিতেছে।

ঝরণার কাছেই আমরা কতটা ক্লান্ত অপনোদনের জন্যই দাঁড়াইলাম। তাহার পাশেই ছিল একটা পাকদণ্ডী। সেই পথে তর তর করিয়া একটি পাহাড়ী মেয়ে নামিয়া আসিল, পিঠে ঝুড়ি বাঁধা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই জায়গার নাম কি? সে বলিল, চাপ্রা। তারপর সে আমরা কোথা যাইব জিজ্ঞাসা করিল। শুনিয়া পরে বলিল,—খাল তিয়ায়হা মে হামারা বাবাকা দুকনহৈ, উহাঁ যায়কে রহনা, হামারা বাবা অচ্ছি আদমি।

তখন হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, তুম এখানে কাহে, বাবাকা পাসসে এতনা দূরমে রয়তা হায়?

সে একটু হাসিয়া উপরের দিকে দেখিয়াই বলিল, হামারা শশুরাল। মেয়েটি ভারি সরল। কালো কাপড়ের ঘাঘরা, কাপড়ের পুরা হাতঢাকা কাঁচুলী; পায়ে জুতা নাই, মাথায় একটা কাপড় চারপাট করিয়া ঢাকা দেওয়া,—উহাই তাহাদের আবরু বা ইজ্জৎরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। মেয়েটি আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, —তোমাদের দেশ কোথা? কলিকাতা বলাতে জিজ্ঞাসা করিল,—সে কোন্ দিকে। উত্তর না দক্ষিণ? পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে শুনিয়া একবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। যাই হোক, যখন আমরা চলিলাম, সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। বোধ হয় নূতন শশুরবাড়ী আসিয়াছে। তাহার বাবার দোকানে যাহাতে আমরা থাকি তাহার জন্য অনুরোধের কথা লইয়া হেমন্ত বলিল—দেখেছেন দাদা, বেনের মেয়ে, কেমন বাপের জন্য খানিকটা ক্যানভাস করে দিল? এরা বেশ কারবারটা বোঝে।

ঐ মেয়েটির কথা কহিতে কহিতেই আমরা চার মাইল পার হইলাম। অবশ্য তাহার কথা বলিতে হেমন্তকুমারই আগ্রহশীল, তাহা না বলিলেও চলে। এই চার মাইল তাহার কি প্রবল উৎসাহ! আজ তাহার উৎসাহের মূল উৎস ঐ বেনের মেয়েটি। আমরা ঘোরিপা হইতে চার মাইল সোজা পথ আধিয়ারীতে পৌছিয়া কিছু জলযোগ করিয়া লইলাম।

তিন-চার ঘর কৃষিজীবী লইয়াই এই পড়াও। আমরা ওখানে অতি অল্পক্ষণেই জলযোগ সারিয়া সোজা পথেই চলিতে শুরু করিলাম। এখন আমার আর একটি অশান্তি দেখা দিল।

হেমন্ত বড় বেশী কথা কয়—তার কথার ফোয়ারা ছুটিলে সহজে আর থামিতে চায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম উহাকে আগাইয়া দিয়া আমি পিছনেই যাইব। কিন্তু এতাবৎকাল মুসুরী ছাড়িয়া ও কোথাও আমার আগেও যাইবে না পিছনেও যাইবে না,— কেবল সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম কথা কহিতে কহিতে যাইবে। কাল এতটা বোধ করি নাই, আজ উহা অশান্তির পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। যদি আমি একটু আগে যাই তাহা হইলে ও ঠিক প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাইয়া দ্রুতপদে আমার কাছে পৌঁছিয়া কথা শুরু করিয়া দিবে। সকল কথার সার কথা তাহার শরীর খুবই ভাল আছে। এই দুইদিনে ওর মুখে কথাটা অন্ততঃপক্ষে বিশবার শুনিলাম। যাহা হউক তাহাকে জানাইতে হইবে যে, আমি একটু পিছনেই যাইতে চাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাকে বলিলাম,- ভাই হেমন্ত, তুমি খানিকটা আগে যাও, আমায় একটু পিছনে চলতে দাও।

শুনিয়াই সে অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন দাদা? আমার কি কিছু অপরাধ হয়েচে?

বড়ই মুশকিলে পড়িলাম। এমন লোকের সঙ্গে কি করিয়া ব্যবহার করিব? ভাবিয়া দেখিলাম আসল কথাটাই বা কি করিয়া বলিব? শেষে সত্যকে যতটা সম্ভব মনোহর করিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়া একটু ঘনিষ্ঠভাবে তাহার কাঁধে হাতটি রাখিয়া আবার বলিলাম,- দেখ হেমন্ত, পথে চলতে চলতে আমার জপ চলে। তুমি যদি আমার সহায় হও তাহলে আর কোন বাধাই হয় না।

শুনিয়া সে কি ভাবিল ভগবানই জানেন, কিন্তু যেন কতকটা তখন কৌতুহল মিশ্রিত হতাশ ভাবেই বলিল,—এ্যা, তাই নাকি, চলতে চলতে জপ? আসনে বসেই তো জপ করতে হয়,—কৈ স্বামীজী তো আমায় সে সব কিছুই বলেন নি?

বলিলাম,—তোমরা কলকাতার মানুষ, কলকাতার পথ চলতে চলতে তো জপের কাজ হবার নয়, তাই হয়তো বলেন নি। শুনিয়া সে মহাচিন্তায় পড়িয়া গেল। আমি তাহা দেখিয়া আবার বলিলাম,—তা ছাড়া তোমরা কর্ম্মী, গৃহী লোক কিনা, তোমাদের ওসব দরকারই নাই।

একথা শুনিয়া সে একটু বিষণ্ণ মনেই বলিল,—তাহলে আমায় কি করতে হবে?

কিছুই নয় কেবল একটু আগে পাছে করে গেলেই হবে—তারপর পড়াওতে পৌঁছে তখন কথার ফোয়ারা ছোটানো যাবে।

সে যে দুঃখিত হইল তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা গেল। আমি

তার সন্তোষার্থে ঈষৎ ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে বলিলাম,—আমায় দাদা বলেচ, তোমার কল্যাণের জন্য যদি একটা অনুরোধ করি তুমি কি তা শুনবে না ?

এবার তাহার ভাবান্তর হইল। তখন সে নিশ্চয় নিশ্চয় বলিয়া আমায় আরও কাছে আসিয়া চলিতে লাগিল। আমি তখন বলিলাম,—তোমায় একটু বাকসংযম অভ্যাস করতেই হবে। এই কথার মধ্যে দিয়েই আমাদের কতটা শক্তি নষ্ট হয়, তা জানো ?

সে বলিল,—স্বামীজীও একথা বলেছিলেন একবার, তখন অতটা বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেছি আপনি ঠিক বলেচেন। আচ্ছা দাদা, তাহলে আপনিই আগে যান।

আমি বলিলাম,—তা হবে না তুমিই আগে যাবে; তাতে আমার শান্তি থাকবে। সে রাজী হইল। এখন হইতে বেশ শান্তিতেই চলিতে লাগিলাম বটে কিন্তু একটি কথা মনে গাঁথিয়া রহিল যে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় হেমন্ত চলিতে হয়তো একটু দুঃখ অনুভব করিতেছে। তবে মানুষপ্রকৃতি নিঃসঙ্গ থাকিতেই পারে না— তাহার চিন্তাই তাহার সঙ্গী হইবে; তবে তাহার চিন্তা কোন্ পথে কোথায় তাহাকে লইয়া যাইবে, ইহাই হইল সংশয়।

এইভাবে চলিতে চলিতে আমরা প্রায় সাড়ে দশটায় তিয়ার-হা পৌঁছিলাম।

এতটা পথ সহজ ও সুন্দর - এ পথে চলিতে চলিতে যেন কিসের ধ্যান চলিতে থাকে। এমনই দৃশ্য সারাপথের মধ্যে দেখা যাইতেছিল, পথশ্রম কিছুমাত্রই বোধ হয় নাই। এবারে সম্মুখেই প্রায় চার মাইল চড়াই। হেমন্ত উহা জানিত না, যাহা হউক এখন পাঁচ মাইল আসিয়া তিয়ার-হাতে ত পৌঁছিলাম।

এই স্থানেই একটি ছোট পার্ব্বত্য স্রোতের উপর সেতু, উহা পার হইয়াই চড়াইটা আরম্ভ হইয়াছে। কি ঘন ভাঙ্গের গাছ এখন চারিদিকেই রহিয়াছে— ছোট একটি জঙ্গল। বড় গাছও একটি ছিল,—সেটি পাকুড়। অবশ্য নদী হইতে কতকটা দূর হইলেও এটি পূজার স্থান, বৃক্ষমূলে কয়েকখণ্ড শিলা—উহা সিন্দুরচর্চ্চিত দেখা গেল। তাহার নিকটেই একটি শুষ্ক বৃক্ষশাখায় অসংখ্য নানাবর্ণের কাপড়ের টুকরা দিয়া গাঁট বাঁধা, আবার ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড সুতায় বাঁধা ঝুলিতেছে দেখা গেল, সেখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। নটি মাইল সোজাপথে চলার আনন্দ ছিল, এইবার তাহার প্রত্যবায়। এইখানেই মধ্যাহ্ন-কালীন বিশ্রামের জন্য হেমন্ত অনুরোধসূচক কণ্ঠে বলিল,—দাদা, এইখানেই আসন ডেরা ফেলা যাবে নাকি ? আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম,—দেখো

ভাই, আর একটু চলিলেই শেষ, আজকের পথে আর একটি মাত্র চড়াই আছে —এসো না সেইটুকু কাবার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান, পানাহার এবং বিশ্রামটুকু সম্পূর্ণ করি। তারপর বাকী পথটুকু বিকালেই শেষ করে দেওয়া যাবে, কি বল তুমি?

সে আর কি বলিবে, সরল মনেই আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজী হইল। সুতরাং একটুখানি বসিয়া নদী হইতে দুই-চার অঞ্জলি জলপান করিয়া আমরা ক্রমোচ্চ পথে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। আমার যে এখানে একটা বিশেষ অন্যায় হইল তখন বুঝিলাম না, কিন্তু আমার অপরাধও বেশী ছিল না কারণ এই তিয়ারহা চড়াইয়ের নীচে অর্থাৎ নদীতীরে উৎরাই পর্য্যন্ত লোকালয় বা বিশ্রামস্থান নাই। তবে সঙ্গে রসদ থাকিলে ঐ পাকুড়তলায় বসিয়া রান্না-বান্না করিয়া খাওয়াদাওয়া করা যাইত।

হেমন্তকে লইয়া একবার একটু মুশকিলে পড়িলাম। যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই ঘটিয়া গেল। সে নিয়মিত আগেই যাইতেছিল, মাইল দেড় উঠিয়া সে ঘন ঘন দীর্ঘকাল ধরিয়া বসিতে লাগিল। তখন আর তাহাকে আগে যাইতে না দিয়া সঙ্গে রাখিলাম। আমারও এই চড়াইটা খুব লাগিয়াছিল। চড়াইটা প্রায় চার মাইল। প্রথমটা খাড়া নয়—সহজ চড়াই, তারপর মাইল দুই পর মধ্যে মধ্যে একটু বিশেষ রকমের খাড়া পর্ব্বত। তারপর এক এক স্থানে পথ বলিয়া কিছুই নাই—খানিকটা এলোমেলো উঠিয়া ঐ একটু দূরে আবার পথ দেখা যাইতেছে। এইভাবে যখন আমরা বারো আনা ভাগ আসিয়াছি, তখন হেমন্ত একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িল। তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—একটা উঁচু পাথরের উপরভাগ খানিকটা সমতল ছিল দেখিয়া সে তাহার উপরে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—দাদা, আর তো আমি পারি না। তারপর সে শুইয়া পড়িল। তখন ১টা বাজিয়াছে।

আমি তাহার পাশে বসিয়া মাথায় ও বুকে হাত বুলাইতে লাগিলাম। বলিলাম,—ভাই, আমার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে, তোমার কথাটা শুনলেই ভাল ছিল। এবেলা নীচে থাকলেই চলতো।

হেমন্ত বলিল,—আমাদের সঙ্গে তো রসদ কিছুই ছিল না। আমিও তাহা জানিতাম, কুলীরা কাছেও ছিল না। তাহারা রাত্রে সারাদিনের খোরাক সবটাই তৈরী করিয়া অর্দ্ধেক তখনই খায়, বাকী অর্দ্ধেক পরদিনের জন্য রাখিয়া দেয়,—সুতরাং আমরা কোথায় রসদ পাইতাম? আর এক সঙ্কট, এ পথে জল

নাই। সারাপথে কোথাও একটু ক্ষীণধারা পর্য্যন্ত দেখি নাই। সুতরাং হেমন্তের বেশী কষ্ট ঐ জলের অভাবে। আত্মগ্লানি ভিতরে চাপিয়া জলের সন্ধানে এদিক-ওদিক খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোথাও পাইলাম না। হেমন্ত স্থিরধীর পড়িয়া আছে—জলই তাহার ঔষধ। সেই জল নাই দেখিয়া সে বলিল,—দাদা আমি অনেকটাই ভাল বোধ করচি, আঃ, একটু জল পেলে এখনি উঠে চলতে শুরু করতাম।

তিয়ারহা খাল অর্থাৎ এই পর্ব্বতের শীর্ষদেশ আর বেশী দূর নয়। মনে মনে আন্দাজ করিলাম, প্রায় তিন মাইল আসিয়াছি, বাকী এক মাইলের কিছুটা হয়ত কমই হইবে। কিন্তু হেমন্ত যে কথাটি এখনই বলিল, উহা কেবল আমায় একটু সান্ত্বনা দিতে, যেহেতু তাহার এই অসুস্থতায় আমি মর্ম্মে মর্ম্মে কতকটা অনুতপ্ত তাহা সে বুঝিয়াছিল। উপায়ই বা কি? প্রায় আধঘণ্টা কাল কাটিলে আমি খুব ভাল আছি বলিয়া সে উঠিয়া বসিল। সত্যই তখন তাহাকে অনেকটাই সুস্থ দেখাইতেছিল। আমি বলিলাম, এখনও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো তারপর যা হয় হবে। সে প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে আমাদের কুলী বাহক আসিয়া পড়িল। তাহারা আসিয়াই একটা পাথরের উপর বোঝা রাখিয়া হাত ও মাথা হইতে চামের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল এবং মুখে একপ্রকার শিস দেওয়ার মত করিয়া শ্বাসত্যাগ করিতে লাগিল।

তাহাদের হেমন্তের জন্য একটু জল সংগ্রহ করিতে বলায় একজন বলিল যে, এখানে কোথাও জল পাওয়া যাইবে না, উপরে না উঠিলে কোথাও জল নাই। যেমন করিয়াই হোক খালের উপর উঠিতেই হইবে। শুনিবামাত্র হেমন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল, লাঠি লইয়া বলিল,—কুছ পরোয়া নেই দাদা, আমি অল-রাইট, চলুন, বলিয়া ধীরে অথচ দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল। আমিও চিন্তিতমনে তাহার পিছনে চলিতে আরম্ভ করিলাম। সত্য সত্যই সে আমায় বাঁচাইল।

যখন আমরা খালের উপর উঠিয়াছি তখন আড়াইটা। তারপর খানিক উৎ-রাইয়ের পর গ্রাম পাওয়া গেল। আমি বলিলাম,—আজ আর আমরা ধরাসু যাবো না, কোন রকমে এইখানেই থাকব, তোমার পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

হেমন্ত বলিল,—সে কথা পরে। এখন আসুন, খাবার যোগাড় করা যাক।

ভগবানদাস নামক বানিয়ার অতিথি হওয়া গেল। সর্ব্বসুদ্ধ একটি টাকা খরচ আর তাহার গৃহিণীর অনুগ্রহে আলুসিদ্ধভাত পর্য্যাপ্ত ঘৃতপক্ক উরুদ আর মসুর দুই মিশ্রিত ডাল আর শেষে দধি উপযোগ এবং পূর্ণ এক ঘণ্টা বিশ্রামের

পর হেমন্ত নাচিয়া উঠিল, বলিল,—আজই ধরাসু যাবো।

আমি রাজী নই, কিন্তু কুলী বলিল,—আজই যাওয়া ভাল, চলুন না। মোটে মাইল সাত মাত্র পথ আর সারা পথটাই উৎরাই- সামনের পাহাড়টার নীচেই ধরাসু।

হেমন্ত কোন কথাই আর কানে তুলে না, অগ্রসর হইয়া কতকটা পথ নীচে যাইয়া, আসুন দাদা, বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। কাজেই আমায় চলিতেই হইল। অতি আরামে আমরা এই সাত মাইল নামিয়া—প্রায় সন্ধ্যায় ধরাসুতে পৌঁছিলাম। আমাদের কুলী তাহার পয়সা চুকাইয়া তখনই বিদায় লইল, অবশ্য সে রাত্রিটুকু তাহারা ঐখানেই ছিল।

ধরাসুতে আসিয়া এখান হইতে যে পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিলাম তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। হিমালয় পর্ব্বতের কথা সেই শিশুকাল হইতেই কানে আসিতেছে। মনে আছে চাঁদিনী রাতে গরমের দিনে ছাদে শুইয়া মা আমাদের ভাইবোনগুলিকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, ছোটরা সব ঘুমাইয়াছে কেবল আমি শুইয়া শুইয়া বিস্ময়াকুল চক্ষে চাঁদের উপর দিয়া দ্রুতবেগে মেঘের দৌড় দেখিতেছি, অসংখ্য পাতলা মেঘদল চাঁদের উপর দিয়া কোথায় যাইতেছে। মাও বোধ হয় উহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—হ্যাঁ মা, মেঘেরা সব ছুটে ছুটে কোথায় যাচ্ছে?

মা আমায় তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—ওরা হিমালয় পাহাড়ে শালপাতা খেতে যাচ্ছে, আবার চলে আসবে যখন উলটো হাওয়া হবে।

তখন হইতে ঐ হিমালয়ের সঙ্গে মেঘের সম্বন্ধ আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তারপর কত বার কত ভাবে হিমালয়-কথা শুনিয়াছি—কত লেখা বইয়ে ও মাসিকপত্রে পড়িয়াছি। সেই সব মিলাইয়া হিমালয়ের যে কি রূপ এবং এই হিমালয় যে কত মহান্, কি অদ্ভুত দৃশ্যবৈচিত্র্য স্তরে স্তরে এই বিশাল পর্ব্বতমালার প্রত্যেক অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা যেমন একজন শিল্পীর চক্ষে ধরা দেয় তেমনটি সাধারণত তীর্থযাত্রী যাহারা তাদের চোখে পড়ে না। ক্রমেই হিমালয়ের রূপ আমাদের চক্ষে গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। সেকথা পরে বলিতেছি, এখন এই ধরাসুর কথা একটু বলব।

এই ধরাসু একটি পার্ব্বত্য গ্রাম, ইহার মধ্যে মুদির দোকান তো আছেই, আবার মনোহারীর দোকানও আছে, আবার দরজীর দোকানও কয়েকখানি আছে। ইহা ব্যতীত সরকারী বা দরবারী কালেকটারের অফিস প্রভৃতিও

আছে। এদিকে মুসুরী হইতে অনেক সাহেব-সুবা পর্য্যটক এবং শিকারী দলও আসা-যাওয়া করেন। এখানকার আসল শিকার হইল গো-হরিণ,—তাহাকে ইহারা গোডর বলে। আর বন্য মোরগ প্রভৃতি নানা ছোট শিকার পর্য্যটকগণের আহার ও আনন্দ যোগাইয়া থাকে। এখানে ব্রাহ্মণ, ছত্রি ও বানিয়া এই তিনটি জাতির বাস, ইহারা সবাই ক্ষেতিবাড়ি করে। প্রচুর ফসল পাওয়া যায়। এদিকে আখরোট, আপেল, পিচ প্রভৃতি ফলের গাছ চারিদিকেই দেখা যায়। বাজারের পার্শ্বেই একটি ধর্ম্মশালায় আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম। ধর্ম্মশালা বলিতে একখানি অন্ধকার ঘরে একটি মাত্র দ্বার, আর দ্বারের সম্মুখে খানিকটা চাতাল—সেইখানেই রান্না করিতে হয়। মুদীই হইল মালিক, এ সব তারই সম্পত্তি। তাহার পুত্রই সব কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিল। রাত্রের খাদ্য তাহার ঘর হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিল, কেবল দিনমানে আমরা ভাত, ডাল, আলুর তরকারি পাকাইলাম। এইভাবে একটি দিন ও দুইটি রাত্রি আমরা 'ধরাসু' গ্রামে কাটাইলাম। যাহাকে আমি গ্রাম বলিতেছি, পাহাড়ীরা ইহাকে শহর বলে। লোকসংখ্যা অনুমান করিতে পারি নাই ; তবে এই গ্রাম বা শহরে প্রায় এক-শত ঘর কিংবা আর কিছু বেশী হইবে লোকের বাস। ঘেঁষাঘেঁষি কয়েক ঘর দ্বিতল মকান এইখানে বাজারের মধ্যে আছে নীচে প্রায় দরজী, না হয় মুদী বা মশলার দোকান। তারপর বড় রাস্তাটি ছাড়াইলে ফাঁক ফাঁক বসতি। গলিঘুঁজি যেখানেই দেখিয়াছি মাছি ভন ভন করিতেছে আর আবর্জ্জনা স্তূপাকার পড়িয়া আছে। নীচেই গঙ্গা এবং আরও একটি ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গম। এই সঙ্গমের জন্যই ধরাসুর মাহাত্ম্য যা কিছু। মুসুরী ছাড়াইয়া এইখানেই কতকটা প্রাণের চাঞ্চল্য দেখিলাম। এই দুইটি দিন ভ্রমণের মধ্যে, আর আর যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, সব কয়টি স্থানই নীরব নিঝুম—জনমানবের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। হেমন্ত এখানে আসিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল। স্ত্রীকে পত্র লিখিল এবং আরও কাকে কাকে লিখিল।

পরদিনের জন্য দুইটি কুলী আমাদের চাই। হরিধন দুইজন বেশ মোটাসোটা কুলী লইয়া হাজির করিল, তারা বরাবর সঙ্গে যাইবে না। যমুনোত্তরীতেই আমরা প্রথমে যাইব, কারণ তাহাই সুবিধা। কুলী দুইজন বরাবর যাইতে চায় না। এখান হইতে ঐ দিকে প্রথম পড়াও বরমখেলা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে, মজুরী এক টাকা চার আনা। সে বলিল যে বরাবর যাইতে হইলে শুধু

যমুনোত্তরী যাতায়াতে পঞ্চাশ টাকা লইব। হেমন্ত বলে, কাজ নাই আর কুলীতে। শেষে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া হরিহর এক মতলব তাহার মাথায় ঢুকাইয়া দিল, রোজ এক টাকা চার আনা মজুরী হিসাবে পাইবে আর চার আনা খোরাকি, যত দিনই হোক না কেন। তাহারা রাজী হইল—আমরা বাঁচিলাম। ইহার পর আর মাল লইয়া কুলীর অভাব আমাদের সারা যাত্রার মধ্যেই হয় নাই। সে রাত্রিটুকু আমরা বেশ আরামে কাটাইযা প্রাতে বরমখেলা যাত্রা করিলাম। ধরাসু হইতে যমুনোত্তরী যাইতে ইহাই প্রথম পড়াও।

সেই হরিদ্বারের সঙ্গেই গঙ্গা ছাড়িয়াছিলাম, এতদিন পরে এই ধরাসুতে আসিয়া একবার মাত্র গঙ্গা পাইলাম। এখানে নামটি তাঁর ভাগীরথী।

বরমখেলায় আশ্রয়স্থানটি এক বানিয়ার দোকানের দাওয়া। পাথরের মকান, মেঝে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—একটুও ধূলাময়লা আবর্জ্জনা কোথাও নাই। আর সেই লম্বা দাওয়ার একপ্রান্তে মৃগচর্ম্ম-আসনে এক সাধুমূর্ত্তি বসিয়া। মূর্ত্তিটি দেখিলেই মনে হয গৃহী লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য যা যা দরকার তাঁহার সবগুলিই আছে। মাথায় জটাভার, গলায় রুদ্রাক্ষ, তুলসী, প্রবালাদি নানাবিধ প্রস্তরের মালা। গোঁফদাড়িতে মানানসই মুখখানি গম্ভীর। একগুচ্ছ ভ্রূর নীচে তীক্ষ্ণ লোকচরিত্র-অনুসন্ধানী ক্ষুদ্রায়তন চক্ষু। হেমন্ত তাহাকে দেখিযাই একেবারে ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণামান্তর পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার ভক্তি দেখিয়া আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। এ পথে এই প্রথম সাধুদর্শন।

অবশ্য আমাদের ভোজনের ব্যাপার এখানেই কিছু দক্ষিণা দিয়া এক ব্রাহ্মণকুমারকে ধরিয়া বেশ পরিপাটিরূপেই সম্পন্ন করা গেল। হেমন্ত প্রায় সর্ব্বক্ষণই সাধুর কাছে বসিয়া রহিল, আর অপরে না শুনিতে পায় এমন ভাবেই কথার পর কথা কহিতে লাগিল। শেষে একবার আমায় ডাকিয়া বলিল,—দাদা, একবার আসুন না, এঁর সঙ্গে একটু আলাপপরিচয় করুন না। আমি আগেই যাইতাম, কিন্তু তাহার জন্যই যাই নাই। এখন গিয়া নমস্কারান্তে তাহাদের কাছে বসিলাম।

হেমন্ত বলিল,—দাদা জানেন, ইনি খুব শক্তিশালী যোগী। ইনি অনেক কিছুই পারেন,—আমায় ঠিক ঠিক বলে দিয়েছেন সব।

সব ঠিক বলেছেন? জিজ্ঞাসা করিয়া আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া লক্ষ্য করিলাম—তাহার চক্ষু দুটি লাল হইয়াছে। যেমন নেশা করিলে হয় সে রকমই লাল।

সে বলিল,—আমার যে একটা দুর্ব্বলতা আছে সেটা তিনি আগেই ধরতে পেরেছিলেন। তাই আমি একটা ওষুধ চাইলাম। উনি একটা ওষুধ তখনি দিলেন, আমি খেয়েচি। তাইতেই হয়তো চোখটা লাল হয়ে থাকবে। কেমন একটা নেশার মত মনে হচ্ছে—যেমন সিদ্ধিটিদ্ধি খেলে হয়।

আমি তখন সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনে ইনকো ক্যা খিলায়া ?

সে বলিল,—সব ঠিক হো যায়গা, ভিতরকা গরম সব নিকাল যায়গা,—কুছ ফিকর মত করো।

হেমন্তকে বলিলাম,—তুমি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করোনি যখন, তখন আমি কিছুই জানি না। তোমার এতে কিরকমটা হবে তা তো বুঝতে পারচি না। কিরকম লাগচে তোমার এখন ?

বেশ একটা নেশার মতই লাগচে, আর কিছুই নয়,—আমি এখানে একটু শুই দাদা, কি বলেন ? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শুইয়া পড়িল ঐ সাধুর পাশে।

মৃদু হাসিয়া সাধুটি বলিলেন,—কুছ পরোয়া নহি, কুছ দুধ—গরম দুধ পিলায় দো।

মহা মুশকিল, এখন গরম দুধ কোথায় পাই! বানিয়া ভাইয়াকে ধরিয়া কহিয়া যখন দুধ লইয়া হাজির হইলাম তখন হেমন্তের আর সাড়াশব্দ নাই। অচৈতন্য অবস্থা দেখিয়া সাধুজি আবার বলিলেন,—কুছ ফিকর নহি, ও থোড়া দের মে ঠিক হো যায়গা, আর উসকো এইসাই রহনে দিজিয়ে, ঘণ্টা দো ঘণ্টা পিছে সব ঠিক হো যায়গা।

ততক্ষণে বানিয়া, বণিকপত্নী প্রভৃতি ঘরের সবাই আসিয়া চারিদিকে দাঁড়াইল। আমি সাধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—ই আপনে ক্যা কিয়া ? যদি উসিকো কুছ হোয় তো আপকো হাম নহি ছোড়েগা।

সাধুজী বিরক্তভরে বলিলেন,—আরে তু ক্যা করেগা মুঝকো! ফাঁসীমে লটকাওগে ক্যা, না শির লেওগে,—ঔর কুছ করোগে—ইয়ে অংরেজী মুলুক নহি!

তারপর যাহা হইল তাহা বড়ই অভাবনীয়, ততোধিক আশ্চর্য্য ব্যাপার। হেমন্তের ক্রমে ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ হইল, দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া বলিলাম,—আব ক্যা করোগে ? দেখিতে দেখিতে হাত-পা সটান, একেবারে সোজা হইয়া গেল এবং কঠিন হইল। মৃত্যুর চিহ্ন প্রকট দেখিয়া আমি স্থির থাকিতে

পারিলাম না, চিৎকার করিয়া 'হেমন্ত হেমন্ত' করিয়া ডাকিতে এবং তাহার মাথাটি নাড়িতে লাগিলাম। লোক জড়ো হইয়া গেল, বানিয়া ও তাহার বাড়ীর সবাই কোলাহল করিয়া উঠিল,—এ সাধুজী, আপ্‌নে ক্যা কিয়া? ইত্যাদি বলিতে লাগিল। আমাদের কুলী দুজন মুখ চুন করিয়া দুই হাত জোড় করিয়া সাধুজীর দিকে চাহিয়া 'রাম রাম' বলিতে লাগিল।

সাধুজী সব দেখিয়াও যেন কিছুই দেখিতেছেন না এইভাবে বসিয়া রহিলেন। আমার বুকটা ফাটিয়া যাইতে লাগিল, এই করতেই কি আমার সঙ্গে তুমি এসেছিলে হেমন্ত!—মনের মধ্যে এই কথাই তোলপাড় করিতে লাগিল, আমার চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। কি করি, এখানে তো অসহায়। শেষে সাধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—তুমহি উসকো মার ডালা শয়তান। সাধু বনকে আকর গৃহস্থ কো ইসিতরে জানসে মার দেতে। তোমকো পুলিসমে দেঙ্গে,—ফাঁসিমে লটকায়াগা।

সে কিছুই গ্রাহ্য করিল না, যেমন ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। বানিয়া তখন আমায় বলিল,- উহার মুখে একটু জল দিয়ে একবার দেখলে হয় না?

আমি তখন কেমন এক রকমই হইয়া গিয়াছি, তাহাই করিতে গেলাম। উহা দেখিয়া সেই পাষণ্ড সাধু বলিল,—কিসকো পিলাতে হো বো তো মুরদা বন গিয়া।

কি সর্ব্বনাশ, ও নিজে এখন স্বীকার করিতেছে যে হেমন্ত মারা গিয়াছে? আমি কি করিব? এ অবস্থায় বলিলাম, তোম উসকো ক্যা জহর খিলায়া?

সে বলিল,- আচ্ছা সমঝকে তো এক আচ্ছা জড়ি দিয়া থা, কৌন জানে বো বরদাস্ত করনে নহি শিকেগা! ক্যা করা যায়গা?

সত্যই কি হেমন্ত এইভাবে অকালে এই রাক্ষসের হাতে মারা পড়ল? কেমন করিয়া স্বামীজীর কাছে মুখ দেখাইব? আজ দু বৎসর বিবাহ করিয়াছে —তাহার স্ত্রীকে এ খবর পাঠাইব কেমন করিয়া? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মত ছুটিয়া সাধুজীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িলাম,—আপ বাঁচাইয়ে বাবা, বলিয়া তাহার পায়ে জোরে জোরে মাথা ঠুকিতে লাগিলাম।

সে আমাকে তাহার সবল হস্তে ধরিয়া তুলিল এবং ইহাঁ বৈঠ যা, বলিয়া পাশেই বসাইয়া দিল। আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। যেন নিশ্চিন্ত হইয়াই বসিয়া রহিলাম, ক্রমে আমার দৃষ্টিশক্তি যেন ক্ষীণ হইয়া আসিল, মাথার মধ্যে তুষারশীতল ধারা ঝরিতে লাগিল—আর কোন জ্ঞান রহিল না।

*   *   *   *

যখন সম্বিৎ ফিরিল, দাদা দাদা, দেখুন আমার দিকে একবার—এই শব্দ, এ যে হেমন্ত। চক্ষু চাহিয়া দেখি, হেমন্ত হাতে জল লইয়া আমার মুখে-চক্ষে ঝাপটা দিতেছে—তাহার চাহনি ব্যাকুল। আমায় চক্ষু খুলিতে দেখিয়া তাহার মুখে আনন্দের আভাস পাইলাম। তখন তাহার সাহায্যে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম।

সাধুজী গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন, মৃদু হাসিয়া এখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—অব কুছ আচ্ছা মালুম হোতা?

এই যে ব্যাপারটি ঘটিয়া গেল, ইহার পর সেখান হইতেই তো হেমন্ত দেশে ফিরিল, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাকি সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া দীর্ঘকাল পরে ফিরিয়া শুনিলাম যে, হেমন্ত ফিরিয়া একেবারে কলিকাতায় আসে এবং তৃতীয় মাসের শেষেই মারা যায়।

২৭

আজ আমার দিনে আঁধার, রাতে আলো।

প্রায় সারাটা দিন মেঘের উপর জমাট মেঘের স্তর হিমালয়ের আকাশ এমনভাবে জুড়িয়াছিল যেন মহাপ্লাবন আসিল বলিয়া। মাঝে মাঝে চিক্কুর হানাহানি, আর গর্জ্জনের পর গর্জ্জন - গ্রামবাসীর প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার করিতে ত্রুটি করে নাই। এতটা গর্জ্জনের ফল যাহা হইয়া থাকে—বর্ষণের নামগন্ধ নাই; অবশেষে বৈকালের দিকে দেখা গেল, পশ্চিমের প্রবল হাওয়া উঠিয়া মেঘের জমাট ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। সত্য সত্যই পবন দেবতা আসিয়া অল্পক্ষণেই আকাশের এই ঘোর ঘনঘটা যেন যাদুমন্ত্রে উড়াইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে পাতলা হইয়া গেল মেঘের গতাগতি, ক্রমশঃ পশ্চিমের দিকে প্রথমে হাল্কা পীত ও লোহিত, তারপর নীলাভ ও সঙ্গে সঙ্গে সকল রঙে রঙীন হইয়া উঠিল সারা আকাশ। তারপর স্পষ্ট ফুটিল গোলাপী ও বেগুনী মেঘের কোলে কোলে ফিকা নীল, হলুদ, সিন্দূর, তাহার তলে ধূসর রঙ-এর খেলা। তারপর পশ্চিম আকাশের পটভূমি আলোকিত করিয়া উজ্জ্বল সিন্দূর মাখা অস্তগামী মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি সারা দিনের পর লোকচক্ষুর গোচরে যেন হঠাৎ দ্রুতগতিতে নামিয়া আসিলেন এবং একবার মাত্র নয়নবিমোহন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াই নীচে নীলাভ ধূসর পর্ব্বতমালার মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। সারাটি দিনের আলোয় বঞ্চিত করিয়া যাইবার সময় যাঁহাদের রাত্রি সম্মুখে আসিতেছে

তাহাদের নিকটে যেন সলজ্জ হাসিমুখে বিদায় লইয়া গেলেন। আর এদিকে বর্ণমালার উৎসব ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া গেল।

তারপর পার্ব্বত্য নদীর বাঁকের মুখে ওপারের পূর্ব্বাকাশে গোধূলি লগ্নে পূর্ণ চন্দ্রের উদয়, দিনের দুঃখ ভুলাইতে। জনবিরল গ্রাম্য মন্দির হইতে যেন শাঁখের সুর শুনা গেল, গাছপালায় পাখীর কলবরও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। তারপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা-প্রকৃতির উপর মায়ার একটি স্বচ্ছ আবরণ পড়িয়া গেল সুধাকরকে কেন্দ্র করিয়া। আমার অন্তরের মধ্যেও এ পরিবর্ত্তন অপরূপ হইয়া উঠিল, তাই আজিকার এখানে থাকা সার্থক হইয়াছিল।

হাঁটাপথে চলিয়াছিলাম গঙ্গোত্তরীর উদ্দেশে। কাল সন্ধ্যায় যখন এখানে পৌঁছিলাম, এখানকার এই মনোহর দৃশ্য আমায় এমনই আকৃষ্ট করিল, মনে হইল, এখানে দুই-একদিন থাকিয়া গেলেই বা কেমন হয়, হয়ত কখনও আর এ দৃশ্য দেখিতে পাইব না। গ্রামখানি ক্ষুদ্র, এদিকে টিহরি, শ্রীনগর প্রভৃতি যে সকল পার্ব্বত্য নগর তাহার সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না। নাকোরি ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম বা পাড়া, দূরে দূরে আট-দশখানি কুটীর। আর চটি বলিতে দু তিনখানি ঘর দেখিতে পাওয়া যায় অদূর সম্মুখেই, পথ হইতে কোনটা একটু উঁচু, কোনটা বা একটু নীচের দিকে। গঙ্গার ধারে-ধারেই পথ, আর স্রোতটি খুব নীচে।

পথের ধারেই একটি উঁচু জমির উপর একখানি বেশ প্রশস্ত মকান প্রস্তুত হইতেছিল। তিনদিকের দেয়াল ও উপরে দুদিকে ঢালু ছাদ প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু চারিদিকে কাঠকুটা, পাথর এমনভাবে স্তূপাকার পড়িয়া আছে যে কাহারও তাহার কাছে যাইতেই ইচ্ছা হয় না, মনে হয় যেন একটা বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। আশপাশের জঙ্গল এখনও পরিষ্কার করা হয় নাই। কাল সন্ধ্যার আগে যখন এখানে আসি, তখন এই গৃহখানির পরিচয় পাই নাই। আজ শুনিলাম এখানকারই এক মহাজনের পুণ্যের সাক্ষী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত হইতেছে,—একদিকে যাত্রীগণ থাকিবে, অন্যদিকে দোকান। আমি কিন্তু কাল রাত্রে এই অসম্পূর্ণ ঘরের মধ্যেই রাত কাটাইয়াছিলাম। এক পিশুর উৎপাত ব্যতীত ভয়ের কিছুই ছিল না, এই সব আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যেই পিশুর জন্ম এটি ভালই জানা ছিল। যাহা হউক খাবার কিছু সঙ্গেই ছিল; গঙ্গাতীরে জলযোগ শেষ করিয়া ঐ নবনির্ম্মিত গৃহের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলাম; গ্রামের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা ছিল না, চটিতেও উঠি নাই।

প্রভাতে ঘুম ভাঙিবার পর আকাশের মূর্ত্তি দেখিয়া পা দুইটি আর চলিতে চাহিল না। কাজেই বিধাতার বিধানে আজ এখানে থাকিয়া গেলাম। আজ কতদিন পর তবে গঙ্গাদর্শন হইল। উঁচু পথ হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্রোতটি চোখে পড়িতেই শরীর পুলকে পূর্ণ হইল। এখানে গঙ্গা খুব প্রশস্ত নয়; তবে পাড় এতটা উচ্চ যে মনে হয়, গভীর খাত কাটিয়া স্রোতস্বতীর পথ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার গর্জ্জন এমনই অপূর্ব্ব, শুনিলে অন্তরে আনন্দ ভয় ও বিস্ময় মিলিয়া একটি ভাবের ঘোর লাগে। এতটা নীচের শব্দ কি করিয়া উপরে আমার কানে এত গম্ভীরভাবে, এতটা স্পষ্টরূপেই বাজিতেছে! একটানা শব্দ অবিরাম চলিতেছে; ঠিক এই একই স্বর-তাল মিলিয়া শব্দ-তরঙ্গ আমার পূর্ব্বে কত কত মানুষে শুনিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। এই এক রকমই তো শুনিয়াছে? বিরামশূন্য, অনলস, ক্ষিপ্র যেন প্রবাহিনীর শব্দময়ী মূর্ত্তি। অচিন্তিতপূর্ব্ব এই স্বরটি, যেমনটি আমি শুনিতেছি, কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া হয়ত কতজনই শুনিবে। এ স্বর যেন অনাহত ধ্বনির আভাস, কালের মধ্য দিয়া প্রকৃতির পরম গুহ্যলীলা যেন দুর্জ্জেয় এক আভাস দিতে দিতে দিবারাত্র অক্লান্তগতিতে চলিবে,—হয়ত সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত। যে শুনিবে সেই-ই ধ্যানস্থ হইবে। প্রকৃতি জননীর নির্জ্জন, পার্ব্বত্য বনাকীর্ণ ভূভাগের মধ্য দিয়া চলিয়াছে এই স্বচ্ছতরল বিদ্যুৎ-প্রবাহ কোনো এক পরম গুহ্যবার্ত্তা বহন করিয়া। যে ভাগ্যবান শুনিবে, সে-ই মুগ্ধপ্রাণে অনুভব করিবে বৈচিত্র্যময় এই প্রবাহবার্ত্তা, ধন্য হইবে তাহার অস্তিত্ব, সার্থক হইবে তাহার পর্য্যটন, অন্তরক্ষেত্র স্নিগ্ধ এবং শান্ত হইবে তাহার পথশ্রম। সে অমর হইয়া যাইবে। ইহারই আকর্ষণে সুদূর সমতল হইতে আসিয়াছি। আজ এখানে রহিয়াও গেলাম ইহারই আকর্ষণে।

দিনটি কাটাইয়া দিলাম এইভাবে, এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আঁধার আকাশতলে বিচিত্র দৃশ্যের মধ্য দিয়া। পথের ধারে বেশ বড় একটি বটগাছ, তাহার মূলে বড় ছোট সিন্দূরমাখানো নুড়ি, তাহার পাশেই একটা উঁচু জায়গা। পাথরের উপর পাথর, ফাটলে ফাটলে তৃণজাতীয় একপ্রকার গুল্ম; মধ্যে প্রকৃতি রচিত বেশ প্রশস্ত একখানি আসনের মত হইয়াছে। এখানেই আমি কম্বলখানি বিছাইয়া আমার দিনের আসন করিয়াছিলাম। অবশ্য বৃষ্টি আসিলে আমায় উঠিতে হইত, কিন্তু উঠিতে হয় নাই। এখন সন্ধ্যা, রাত কাটাইতে আবার ঐ ধর্ম্মশালার বারান্দায় যাইতে হইবে।

অল্পবিস্তর ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু প্রবল বাতাস ছিল। পরিষ্কার আকাশে চাঁদের আলোয় খানিকটা বাহিরেই কাটাইব স্থির করিয়া এখানেই বসিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাণে আনন্দ, বিস্ময়, ভয় মিলিত এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ।

যেখান হইতে গঙ্গার ধারা ঈষৎ উত্তর-পূর্ব্ব মুখে বাঁকিয়াছে, সেদিকে অনেকটা দূর পর্ব্বতশীর্ষ অবধি দেখা যায়। জ্যোৎস্নালোকে উহার ঊর্দ্ধে শুভ্র মেঘলোকের আভাস, তাহার নীচে কুয়াসার আবরণ যেন মায়াময় স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে; অন্তরের আভাস পাইয়া আমি যেন আমার অমরত্ব খুঁজিতেছি। কল্পনা কিনা জানি না, আমায় আর যেন মানুষ নামরূপধারী মরলোকের অভাবগ্রস্ত ক্ষুদ্র জীব বলিয়া স্মরণ নাই;—আমি পূর্ণ, মহিমময়, অখণ্ড সত্তা এমনই; কিছু অনুভবের নেশা, গভীর এক আবেশ, যাহা কথায় বুঝাইতে সাধ্য নাই তাহাতেই ডুবিয়া ছিলাম, কতক্ষণ যে জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ যেন আবার মাটির মানুষের অনুভব ফিরিয়া আসিল,—দেখা ও শোনার রাজ্যে। সম্মুখেই এক ভৈরবী মূর্ত্তি, যা এ পথে প্রায়ই দেখা যায় না। কারণ শক্তি বা তান্ত্রিক সাধকেরা বড় একটা এ তীর্থে আসা-যাওয়া করেন না। হঠাৎ ঐ অপরূপ মূর্ত্তি,—কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বোধ হইল আমার সম্মুখে ব্যস্তভাবে হাত নাড়িয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না কি ভাষায় কথা কহিলেন,—সেটা না হিন্দী না পাঞ্জাবী না মারাঠী,—সে এক রকম স্বর, আগে এমন শুনি নাই।

আজ বৈকালে দেখিয়াছিলাম এখানে দুইজন তিনজন যাত্রী আসিয়াছিল। তাহারাও কাল উত্তরকাশীর পথে যাইবে, আমিও তাহাদের সঙ্গে যাইব স্থির করিয়াছিলাম। তাহারা গ্রামের মধ্যে থাকিবার স্থান করিয়াছে,—আমি একটু নিরিবিলি থাকিতে চাই তাই সেদিকে যাই নাই। এ পথে বেশী যাত্রী আসে না, বিশেষতঃ এই সময়ে, ইহা আমি জানিতাম। এখন এই ভৈরবী মূর্ত্তির কথা না বুঝিয়া, ওদিকে যেখানে অপর যাত্রী দুজন গিয়াছে দেখাইয়া বলিলাম, উধার যাইয়ে, পড়াও হ্যায়। সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু আমার দিকে এমন ভয়ঙ্কর এক দৃষ্টি হানিয়া গেল,—তাহাতেই বুকটা দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। আমার ধ্যান ভাঙিয়া গেল, কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিয়াই উঠিলাম এবং একটু দূরে খানিক চলিয়া গেলাম। ভৈরবীর বয়স বোধ হয় ৩২।৩৪ হইবে, কিন্তু গলার স্বরে কোমলতা নাই। বেশ উজ্জ্বল না হোক গৌরবর্ণ

বটে, তবে পথশ্রমে কিঞ্চিৎ বক্তাভ। এক হাতে ত্রিশূল, অপর হাতে ক্ষুদ্র একটি পুঁটুলি।

বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরিয়া সেই পূর্ব্বস্থানে আসিলাম, যেখানে বসিয়া ছিলাম। দুঃখের কথা মন কিন্তু আমার শান্ত হইল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিলাম। ততক্ষণে জ্যোৎস্নায় দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

চাহিয়া দেখি এক পাশে দাঁড়াইয়া সেই ভৈরবী—সেই এক হাতে ত্রিশূল, অপর হাতে সেই ছোট বোঁচকাটি। একেবারে যেন পাথরের পুতুলের মতই স্থির। যন্ত্রবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভয় ও বিস্ময়ে আমার বুকটা আবার ধক ধক করিয়া উঠিল। এখন ভৈরবী পরিষ্কার বাঙ্গলায় আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি বাঙ্গালী? একে প্রথম সম্ভাষণেই তুমি, তার উপর কথার মধ্যে একটু পূর্ব্ববঙ্গের টান ছিল—ইহাতে আমার ধারণা হইল, হয়ত এ ভৈরবী মূর্খ, বিদ্যার সম্পর্ক নাই ইহার সঙ্গে। যদিও আমি তাহার কথার উত্তর দিলাম এক কথায় এবং ভদ্রভাবে—এখন তাঁর সে রুদ্র ভাব নাই, যেন শান্তমূর্ত্তি, পরম বন্ধুর মত কথা।

তুমি বুঝি গঙ্গোত্তরী যাবে? আমিও যাব। ভাল হল তোমার সঙ্গে পেয়ে, একসঙ্গেই যাওয়া যাবে। আজ আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো—ওখানে ওদের সঙ্গে আমি থাকতে পারবো না, ওরা নোংরা।

কি সর্ব্বনাশ! আবার সঙ্গে থাকা—আমার প্রতি এ কি অনুগ্রহ!

মনে মনে অবশ্য একটা এড়াইবার ফন্দি খাটাইয়া তাঁহাকে বলিলাম,—আমি তো চটিতে থাকবো না, ঐ যে একটা পোড়ো ঘর দেখছেন ঐখানে আমি থাকবো। ওখানে জায়গা আছে বটে, তবে বড় নোংরা,—চারিদিকেই জন্তু-জানোয়ারের ময়লা।

এত সহজে ছাড়িবার পাত্রী তিনি নন। তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—তা হোক, একটু সাফ করে নিলেই হবে। আহা, যখন দেশের লোক পাওয়া গেল তখন আর কোথায় যাব? বলিয়া ত্রিশূলটা ঐখানেই একটা পাথরের গায়ে রাখিয়া বোঁচকাটা খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে একখানি লাল রঙের ছোপানো তোয়ালে বাহির করিয়া,—এগুলো দেখো, এখানেই রইলো, আমি একবার আসছি গঙ্গা থেকে, বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেলেন গঙ্গার দিকে।

এবার মনের অবস্থা এমনই হইল যে কম্বলখানি আর পাত্রটি লইয়া এই ক্ষণেই সরিয়া পড়ি! কিন্তু কোথা যাইব? উত্তরকাশীর পথে চলিতে কি

আমি পারিব এই রাত্রে? বন-জঙ্গলের পথে ভয়ের কারণও আছে, বিশেষতঃ সাপ আর বিচ্ছুর ভয়টা সব চেয়ে বেশী যে।

মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া দ্বন্দ, সঙ্কল্প-বিকল্পের প্রবাহ চলিল—শেষে এক চমৎকার মীমাংসায় আসিয়া স্থির হইলাম। আমি কেন কল্পনায় ভয় পাইয়া অশান্তির সৃষ্টি করিতেছি, নিজের মধ্যে শান্তি নষ্ট করিতেছি? কিসের ভয়? সঙ্কোচই বা কিসের? উহা হইতে আমার কোন আশঙ্কাই নাই—বরং এই দূর বন্ধুহীন প্রবাসে ঐ নারীই আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, বন্ধুভাবে বিশ্বাস করিয়া একেবারেই আপন ভাবিয়া অবলম্বন করিয়াছে। এটি আমার কত বড় গৌরব, আমার অস্তিত্বের এতটা গুরুত্ব যিনি বাড়াইয়া দিলেন—আমারই ত কৃতজ্ঞ থাকিবার কথা তাঁর কাছে!

যাহা হউক গঙ্গা হইতে আসিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আপনিই মুদির দোকানে গেলেন। নিজহাতে কিছু কিছু জিনিস আনিয়া আমায় বলিলেন,—চল তো ভাই, দেখি কোথায় থাকা হবে। সকল কিছু নিজের হাতেই লইয়া সেই অসম্পূর্ণ ধর্ম্মশালার বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিনিসগুলি রাখিয়া তাঁহার পুঁটুলি হইতে একটা বাতি ও দেশলাই বাহির করিলেন। জ্বালা হইলে চারিদিক দেখিয়া বলিলেন,—কৈ না, এখানে নোংরা ত কোথাও নেই—বেশ থাকা যাবে। আমাকে ভাগাবার জন্যে বুঝি মিথ্যা বলছিলে?

আমার কথা নাই।

এমন অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দোকানীর নিকটে কাঠকুটা এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং দুজনের জন্য ঘৃতসিক্ত রুটি ডাল ও আলুর তরকারি বানাইলেন দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। আমায় যেন সম্মোহিত করিয়া ফেলিলেন। আমাকে পরিপাটি ভোজন করাইয়া নিজের অংশ তুলিয়া রাখিলেন, এখনই খাইবেন না। তারপর স্থানটি পরিষ্কার করিয়া এক সতরঞ্চি ও তাহার উপর কম্বল বিছাইলেন, আমাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পেট ভরেছে?

আমি বলিলাম,—আপনি না এলে আমার খাওয়াই হোত না।

কেন?

পয়সা ছিল না, তা ছাড়া এক-আধদিন উপবাস অভ্যাস আছে।

শুনিয়া যেন বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। বলিলেন,—নিঃসম্বলে এতদূর তীর্থ করতে এসেছ, কেন বল তো? ব্যাপার কি, তোমার ঘরে কে আছে? তখন

আদি-অন্ত পরিচয়ের পালা চলিল। সব শুনিয়া ভৈরবী বলিলেন,—তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ জগদম্বার ইচ্ছাতেই হয়েছে, তুমি বিশ্বাস কর ?

আমি বলিলাম,—অন্ততঃ ভোজনের ব্যাপারে করি।

তোমরা স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণমনের মানুষ কিনা। বিনা স্বার্থে কিছু মানো না, বিনা স্বার্থে কিছু শোনো না,—স্বার্থ বিনা কারো সঙ্গে ব্যবহারও করো না।

হয়ত আপনার কথাই ঠিক, কিন্তু আমি জীবনে অনেক নিঃস্বার্থ লোকের সঙ্গ পেয়েছি।

না না, তারা নিঃস্বার্থ কখনই নয়.—বড় বড় স্বার্থ নিয়ে কারবার করে তারা, সেটা বাইরে থেকে ঐ রকম নিঃস্বার্থ দেখায়। যাক এখন এক কাজ করবে, আমার একটা কথা শুনবে ?

আপনার স্নেহ, আপনার উপকার ভুলতে পারব না, বলুন কি করতে হবে আপনার ?

গঙ্গোত্রী করিয়ে আমায় বদরী-কেদার ঘুরিয়ে দেশে পৌঁছে দিতে হবে। সব খরচ আমার, তুমি আমার সহায় হয়ে থাকবে কেবল,—পারবে ?

এটা ত খুব ভাল কথা, আমারও ঐ সব স্থানে যাবার আন্তরিক ইচ্ছা রয়েছে, তবে জানি না শেষ অবধি কি রকম ঘটবে! আপনি কি তান্ত্রিক ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তোমার কি ভাব,—তোমরা কোন্ সম্প্রদায় ?

আমি কোন সম্প্রদায়েরই নয়, কেবল নিজের জন্য একটা সাধনের পথ ঠিক করে নিয়েছি এইমাত্র। তবে তন্ত্র সম্বন্ধে আমার কিছু জানবার ইচ্ছা আছে, আপনার কাছে হয়ত জানতে পারবো।

তাই বলো,—তোমার আসল কথাটা কি ? যা জানি তা বলবো, বলিয়া এমন সোজা হইয়া আসন করিয়া বসিলেন যেন সমাধিস্থ হইবেন। অন্য সময় হইলে ঐ ভাব দেখিয়া হাসি আসিত।

যাহা হোক, এখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তন্ত্রমতে সাধন করলে ভগবান পাওয়া যায় কি না ?

এই কথা,—ভগবান পাওয়ার কথাটা বড়ই জটিল, কারণ সেই বস্তু সম্বন্ধে নানা জনের নানা রকম ধারণা। তারপর পাওয়া,—সেটা আবার আরও জটিল। কারণ সেটা টাকা পাওয়া, বিষয় পাওয়া, কোন বস্তু পাওয়া যেমন,—সে রকম পাওয়া নয়। তারপর ভগবান পাওয়া,—যে কোন ধর্ম্মের মধ্যে দিয়ে হতে পারে, আবার কোন ধর্ম্মের মধ্যে না থেকেও হতে পারে। সকলের

চেয়ে আরও জটিল কথা এই যে, ভগবান যাকে লক্ষ্য করে বলচ তা পাবার জিনিস নয়। কেমন সন্তুষ্ট তো?

তবে তন্ত্র-ধর্ম্মের যে সাধন তার প্রত্যক্ষ ফল কি? যাঁরা তান্ত্রিক বা সিদ্ধ কৌল তাঁরা কি পান?

যাঁরা যা উদ্দেশ্য নিয়ে সাধন করেন তাঁরা তাই পান। তবে আসলে তন্ত্র-ধর্ম্মের যেটা বীরাচার তার মূল উদ্দেশ্য পাশমুক্ত হওয়া। কারণ পাশবদ্ধ অবস্থায়ই যা কিছু দুঃখ। পাশমুক্ত হলেই জীব নিজ শক্তি অর্থাৎ আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়। তাতে যদি সেই শক্তি নিজ ভোগে লাগায় তার ফল মহা বিপাক, আর সেই শক্তি যদি জীব-জগতের কল্যাণে লাগানো যায় তাতে মহৎ ফল লাভ হয়—দেবত্ব লাভ হয়। এই আর কি!

এই পর্য্যন্ত বেশ শান্তভাবে স্থির যুক্তিপূর্ণ কথা হইল, তারপর যখন আমি বলিলাম, আচ্ছা ভগবান পাওয়ার ব্যাপারে আপনি যা বললেন আমার তা হেঁয়ালির মত বোধ হয়। কেন? জীব কি ভগবান পেতে পারে না?

তোমায় যা বলেছি বুদ্ধিমান হলে তুমি আর প্রশ্ন করতে না। তুমি দর্শনশাস্ত্র পড়েছ, আচ্ছা বলো তো কতগুলি শাস্ত্র আছে, আর সকলের মত কি এক? ভগবানের কথা ছেড়ে দাও, এখন তোমাদের শক্তিলাভের জন্য যে সাধনা দরকার তা কি তুমি করেছ? তুমি উঠেপড়ে লেগে যাও, ভাগবতী শক্তি তোমার সহায় হয়ে সিদ্ধি এনে দেবে এইটুকু আমি শপথ করে বলতে পারি। এ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। আগে শক্তিমান হও, তোমার মধ্যে কতটা শক্তি আছে তা জানো, তার সৎ ব্যবহার কর, তখন ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝবে। আগে শক্তিমান হও, বুঝেছ আগে শক্তি—বুঝলে? বাজে তর্ক ক'রো না।

দেখিলাম উত্তেজিত হইয়া তিনি কথা বলিতেছেন, একটু ভয় হইল। প্রথমে যে ভাবের মুখ-চোখের চাহনি দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম, এটা সেই ভাবের মুখ। চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি কিন্তু আবার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—যত সব চ্যাংড়া ছোঁড়া, ইস্কুল-কলেজে থেকে দু'পাতা ইংরিজি পড়ে কেবল তর্ক, তর্ক, তর্ক শিখেছেন। ভগবান নিয়ে তর্ক, প্রকৃতি ও শক্তি এই সব নিয়ে তর্ক করতেই শিখেছেন। জানোয়ারের বাচ্চা সব জানোয়ার। শক্তিহীন মেধাহীন বীর্যহীন বাপ যারা, তাদের এই রকম ছেলে হবে না তো আর কার হবে? কোঁচা দুলিয়ে, সিগ্রেট খেয়ে, সাহেবের দুয়ারে লাথি

খেয়ে, ঘরে যক্ষ্মারুগী মাগ-ছেলে-মেয়ের উপর ঝাল ঝাড়বে, তারপর বুকের রক্ত মুখে উঠে মরবে। দূর, দূর, দূর,—খবরদার তুমি আমার সঙ্গে তর্ক ক'রো না।

আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এ কি ব্যাপার, উন্মাদ নাকি? মনে এই কথাটুকু ভাবিতেছি মাত্র, যেন বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভৈরবী চীৎকারে ঘরখানা ফাটাইবার যোগাড় করিলেন,—কি? আমি উন্মাদ? আমার শক্তি জানো? সর্ব্বনাশ হবে বাঙ্গালীদের। তুমি বাঙ্গালীর ছেলে, আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, ভগবতীর অভিশাপের ফলে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছি। দেখো অন্য কেউ হলে আমি কথা কইতুম না, তোমার মুখ দেখে একটু মানুষের মত মনে হয়েছিল বলেই কথা কয়েছি তোমার সঙ্গে। খবরদার তর্ক করো না আমার সঙ্গে, আমি তোমার সর্ব্বনাশ করতে পারি তা জানো? আবার ভালও করতে পারি তোমার, মানুষ করে দিতে পারি,—দেখবে তুমি?

ভয়ে আমার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল স্থিরদৃষ্টিতে মাটির পানে চাহিয়া মনে মনে ত্রাহি মধুসূদন ডাকিতে লাগিলাম। সেই মূর্ত্তি এমন সুন্দরী নারী, যেন পৈশাচিক উন্মাদনায় বিভীষণা হইয়াছে, তাহার কথার উত্তরই বা কি আছে? সুমুখ হইতে চলিয়া যাইব কিনা ভাবিতেছিলাম।

ভৈরবী আসিয়া খপ্ করিয়া আমার দক্ষিণ হাতের কবচ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—পালাবে কোথায়? তোমার সাধ্য আছে আমার কাছ থেকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পালাবার! তোমার মত একজনকে আমি পোকা মনে করি, জানো! তোমরা কি মানুষ? ঘরে মাগ-ছেলে রেখে ঢং করে ধর্ম্ম করতে বেরিয়েছ,—মুখ্যু কোথাকার! বেদান্ত পড়েছ, অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে সমাহিত হবে—ছাই হবে, তোমাদের মুখে ছাই! ভোগ হলো না, শক্তি নেই, ভোগ করবার উদ্যম নেই, ভোগ্যবস্তু উপার্জ্জন করবার সাহস নেই। বাপ-মা বিয়ে দিয়েছে, একটা মেয়েকে গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে, তাই ভোগের নিয়মরক্ষা চলেছে—তাতে যে কটা ছাগল জন্মায় জন্মাক। এঁ্যা, মুখ্যু কোথাকার! ভোগ হলে তবে হয় যোগ, জানা আছে কি?

ভয় ও আত্মগ্লানি বুকের মধ্যে এতটা গভীর পীড়ন করিতেছিল, তাহাতেই যেন আমার চৈতন্যলোপের উপক্রম হইল। আমি যেন ধীরে ধীরে নেশার ঘোরে অন্ধকার রাজ্যে নামিয়া যাইতেছি। ভৈরবী আমার সঙ্কটময় অবস্থাটা অনুভব করিতে পারিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তিনি বিষম জোরে একটা

ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন, তুই যোগ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস কোন্ সাহসে?' ভোগে তোর বিরাগ এসেছে কি? বল সত্যি আমার কাছে—নিজের ভেতরটা দেখে বল্ তুই!

আমি যেভাবে ছিলাম, ঠিক সেইভাবে মাথাটি নীচু করিয়াই রহিলাম। আমার মুখ হইতে কেবলমাত্র 'না' এই শব্দটি বাহির হইয়া গেল, জানি না ইহা তাঁহার কানে পৌঁছাইল কিনা।

ইহার পর তিনি যে ভাবে, যে ভাষায়, যেরূপ বিচিত্র ভঙ্গিতে তাঁর অন্তরের ব্যাকুল চিত্ত-উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলেন তাহা বলিতে যতটা সংকোচ—লিখিতে তাহাপেক্ষা বহুগুণ অপ্রবৃত্তিই অনুভব করিতেছি। কথাগুলি শুনিবামাত্রই আমার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে বোধশক্তি রহিত হইবার উপক্রম। এই ভৈরবীর প্রকৃতি কি অদ্ভুত। তাহার এইরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্যের যথার্থ স্বরূপটা কি—কিরূপ স্বভাবের ফল তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিলেও আমি সম্মোহিতের মত তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া বলিলাম,—আপনি আমার মা, আমায় রক্ষা করুন। আমি যথার্থই অতি মূর্খ, দুর্ব্বলচিত্ত, মানুষ নামের অযোগ্য, আর আমায় কণ্ঠ এমনভাবে রুদ্ধ হইল যে কথা আর বাহির হইল না।

এইবার বোধ হয় ভৈরবী শান্ত হইলেন।

আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন, তারপর দাড়িতে হাত দিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিলেন যেমন করিয়া মা স্নেহ বিগলিত চক্ষে অসহায় শিশু-সন্তানকে নিরীক্ষণ করেন। সেইভাবে ভৈরবী আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—বাতির আলো তাঁহার মুখে পড়িয়াছিল, অপরূপ স্নেহ-লাবণ্যে উদ্ভাসিত সে মুখ। ক্রমে চক্ষে তাঁহার জলধারা বহিতে লাগিল, আমার গালের উপর টপ্ টপ করিয়া পড়িতে পড়িতে বুকের দিকে নামিতে লাগিল সেই তপ্ত অশ্রু। তাহার প্রভাবে আমার অন্তরের যত কিছু গ্লানি সব ধুইয়া যেন স্বচ্ছ নির্ম্মল হইয়া গেল। ভৈরবীর ঠোঁট কাঁপিতেছে, যেন কিছু বলিতে উন্মুখ। ভাবের বেগ প্রশমিত হইলে উন্মাদিনী ধীরে ধীরে বলিলেন, -তুই আমায় কি ভেবেছিস, বল তো? রাক্ষসী না পিশাচী না আর কিছু! বল্ বল্ -আমি পাগল, য়্যাঁ! বল্ না যা খুশি বলে যা!

আমি ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিতে করিতে বলিলাম,— কিছু তো বলিনি আমি।

শুনিবামাত্র সেই উন্মাদ-ভাব আবার প্রকট হইবার লক্ষণ দেখিলাম মুখে। ছাড়ানো হাতখানা আবার ধরিয়া বলিলেন, -তোরা কি মানুষ হবি না?

পুরুষের মত পুরুষ হবি না ? তোদের ধাতে কি তেজ, শক্তি এসব আসবে না ? আমি কতদিন থেকে মনের মত একজন মানুষ খুঁজছি, যার পায়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনাকে ফেলে দিতে পারি,—তোকে দেখে মনে হল বুঝিবা এতদিন পরে একজন পেলুম। ছি ছি, এই কি পুরুষের মত ব্যবহার ! এতটা নরম, একেবারে কাদা, তুই কি একটা পুরুষ—দূর দূর দূর ! মেনিমুখো ব্যাটাছেলে দুচক্ষে দেখতে পারি না। তুই কি করিস, কি করে সংসার চালাস বল তো ? কি তোর বৃত্তি ?

ছবি আঁকার কথা শুনিয়া একেবারে যেন জল হইয়া গেলেন, প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—য়্যাঁ, ছবি আঁকিস ! তাতে পয়সা হয় ? কি রকম ছবি আঁকিস ?

মানুষের মূর্ত্তি, দেব-দেবীর মূর্ত্তি—সব রকমই করতে হয়।

য়্যাঁ ! ধ্যানমূর্ত্তি আঁকিস ? ঠিক আঁকতে পারিস ? আমায় একখানা ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি এঁকে দিবি ? ওকে কেউ আঁকতে পারে না !

ও ছবি তো বাজারে বিক্রি হয়—ছ' আনা আট আনা হলেই একখানা ছাপা ছবি পাওয়া যায়।

শুনিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলেন, সে হাসি আর যেন থামিতে চায় না। য়্যাঁ - বাজারে ছাপা ! ছিন্নমস্তা ! য়্যাঁ, ছ' আনা আট আনায় পাওয়া যায় ! য়্যাঁ, কি বললি রে পাগল ! আরও কত কি বলবি তাই ভাবচি, অবাক কল্লি আমায় যে রে !

আমি বলিলাম —শুনেছি বড়ই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নাকি ছিন্নমস্তার !

মুখের কথাটা শুনিয়াই আবার সেই বিকট চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া আমায় সন্ত্রস্ত করিয়া হাঁকিলেন,—ওরে বোকা, তোদের মত মেয়েমানুষেরও অধম মরদ যারা তাদের পক্ষে তো ভয়ঙ্কর হবেই ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি। রক্ত দেখলে যাদের প্রাণ দেহছাড়া হয়ে যায়, তারা কি ঐ মূর্ত্তির মাধুর্য্য দেখতে পায় ? পাপ আর পুণ্য, স্বর্গ আর নরক কল্পনা করতে করতেই যাদের দিনগত পাপক্ষয় হয়—লক্ষ্মী, সরস্বতী বীণা হাতে, কেষ্ট ঠাকুর বাঁশী হাতে এই সব মূর্ত্তিই তো তাদের মানায় ! দূর দূর হতভাগা, একটা মেয়েমানুষ যার কাছে ভয়ের ব্যাপার, মহাশক্তির মূর্ত্তি দেখে তার ভয় হবে না তো কার ভয় হবে ?

তারপর আমার গলায় হাত দিয়া ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন,—যা যা, গলায় দড়ি দিয়ে কলসী বেঁধে ঐ গঙ্গায় ডুবে মরগে যা। আর মরবার সময় জগদম্বার কাছে এই বলে প্রার্থনা করবি, হে মা জগদম্বা, পরজন্মে যেন শক্তিমান হয়ে জন্মাতে পারি, আর যদি নেহাৎ শক্তিলাভের অযোগ্য হই, তাহলে

এইটুকু করো হে মা, শক্তি যে কি বস্তু তা যেন বুঝতে পারি আর যেন এরকম মেনিমুখো বাঙালীর ঘরে এয়োস্ত্রীর বেটাছেলে হয়ে না জন্মাতে হয়। দূর হয়ে যা!

বলিয়া আমায় ঠেলিয়া নামাইয়া দিলেন। নামিয়া আমি কতকটা দূরে গেলাম, তখন আমার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত, আমি চলিতেছিলাম গঙ্গার দিকেই—হঠাৎ খিল্ খিল্ হাসির শব্দে পিছনে ফিরিয়া দেখি ভৈরবী সেখানে নাই, 'এবার সম্মুখে ঐ খিল্ খিল্ শব্দ, -কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া দাঁড়াইলাম, সুমুখে চাহিয়া দেখি পাঁচ-ছয় হাত দূরে কে একজন গঙ্গার জলের পানে নামিতেছে।

আমি দ্রুত অনুসরণ করিলাম। তাহার গতি আমা অপেক্ষা অনেক দ্রুত। জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইতেছি, যেন ভৈরবীর মতই—আমি দৌড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলাম, ভৈরবী কিন্তু সহজভাবেই চলিতেছেন।

দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান—একটা কথা আছে!

মূর্ত্তি কর্ণপাত করিলেন না! আমি যখন দশ-বারো হাত কাছে, তখন ধীরে ধীরে যেন হিম-শীতল জলে অবগাহন করিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশরীর ডুবাইয়া একবার মাত্র আমার দিকে দেখিয়া ডুব দিলেন,—তাঁহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না।

সারারাত গঙ্গাতীরেই কাটাইলাম।

২৮

আয়েঙ্গার বাবা

বৃন্দাবনে একজন মহাপুরুষ ছিলেন, প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে,—জগদীশবাবা বলেই তাঁকে ওখানকার সবাই জানত। কিন্তু যেমন হয়ে থাকে, একদল লোক তাঁকে মোটেই সাধু মনে করতো না। এমন কি তারা তাঁকে ভণ্ড বলে উপহাস করতো,—যেমন শুনেছি পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকেও আমাদের দেশের কত লোকে করতো যখন তিনি বেঁচে ছিলেন, মন কি তার পরেও।

তখন আমি কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে রাধাবাগেই থাকি। একদিন একজন অদ্ভুত লোক এলো। অনেকটা পাগলের মতই তাঁর ভাব। ভিতরে কৌপীন, তার উপর সর্ব্বাঙ্গে সেই শ্রাবণ মাসের গরমে একখানা মোটা কম্বল জড়ানো—আর কিছু নেই কোথাও কোন অঙ্গে। কখনও বা সেখানা কোমর থেকে তুলে এক কাঁধে ফেলা, কোন গ্রাহ্য নেই কোন দিকে।

এসে বসলো কেশবানন্দজী যেখানে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বসে আছেন এক বিকেল বেলা। পাঁচ-ছয় বছর বয়স একটি শিশু ব্রহ্মচারী, নামটি তার সত্যানন্দ,—তাকে নিয়েই তখন চলছিল অভিনয় কেশবানন্দ সবার সামনে তাকে প্রশ্ন করলেন,—সত্যানন্দ, তোমার ঘর কোথায় ?

সত্যানন্দ চক্ষু দুটি নীচে কেশবানন্দের পায়ের দিকে নামিয়ে বললে,--ঐ গুরুদেবের চরণে।

তার কথা শুনে আমরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করছিলাম, এমন সময় ঐ মূর্ত্তি ঝড়ের মত এসে উপস্থিত। কোন নমস্কার, শিষ্টাচার কিছু না—এসেই বসে একদিকে চেয়ে রইলো। কেশবানন্দজী বললেন,—স্বামীজী, ইয়ে ধাম্ মে কব্ আয়া ?

সে বললে,– উসসে তুমারা ক্যা মৎলব ? অবতো কুছ খানেকো মাঙ্গাও।

শুনে তিনি কিছু খাবার আনতে বলে দিলেন নিত্যানন্দকে।

ওখানে যে ভাবে যে সব কথা চলছিল, সব চুপচাপ বসে এ ওর মুখের দিকে তাকায়, অবস্থাটা দেখে আগন্তুক লোকটি বললে,—লেও, তোমলোক বাৎ করো, সব্ চুপ কাহে ?

তখন কেশবানন্দজী বললেন,–আপ তো কুছ শুনাইয়ে, কুছভি পরমার্থকি বাৎ—

সে লোকটা যেন রেগে উঠলো, চিৎকার করে বললে,—ইয়ে চোট্টা লোককো সাথ পরমার্থ কি বাৎ! কোন্ মাঙ্গতে তুমারা পরমার্থ—দেবুয়া ঔর কসবীকী পিছে কস্ রহা যো সব, পয়স পয়সা করকে মরতে, পয়সাওয়ালাকো পায়ের চাটনেওয়ালালোককে পারমার্থকি বাৎ ক্যা শুনাউ ? শুনেভি কৌন, ওর চাহেভি কৌন,—সব ঝুঠা, চোর--ব্যস্ ব্যস্ চুপ রহোজী।

কেশবানন্দজী একটু হেসে বলিলেন,—স্বামীজী, দুনিয়াকো সবহি এক কিসিমকো তোন হি রহতা,—

শুনে সে ব্যক্তি ক্রোধে জ্বলে উঠল, আবার বললে,—সব্ সব্ সব্ শালা চোট্টা, যেতনা আশ্রমী, লোটা-কম্বলবালে বিলকুল ঝুঠা—পয়সাকো লিয়ে সবকুছ করতে ; ফির বাৎ মাৎ করো, বৈঠা রহো জি মজেমে।

এমন সময় খাবার নিয়ে এসে তার সামনে দেওয়া হোলো, সে তা থেকে একটা লাড্ডু তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলে।

লোকটির তেজস্বিতা দেখে আমার প্রাণের মধ্যে কেমন একটা শ্রদ্ধা, একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম। মনে হল এ কখনই সাধারণ নয়। সেই যে একটিমাত্র

মিষ্টি তুলে নিয়ে খেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো, ততক্ষণ সবাই চুপচাপ, কারো সাধ্য নেই যে একটা কথা কয়। আমি কেবলই তার মুখের দিকে চেয়ে আছি। কেশবানন্দজী নির্ব্বাক। সত্য বলতে কি, লোকটার ব্যক্তিত্ব এমনই প্রবল যে সেই জায়গায় আমরা সবাই যেন স্তম্ভিত হয়ে আছি।

খানিক পরে সে আরও একটি খাবার হাত দিয়ে মুখে তুলে খেতে আরম্ভ করলে, দৃষ্টি তার ঠিক ঐ আকাশপানেই রয়েছে। সেটা শেষ করে লোটায় জল খেলে আর হাতটা নিয়ে মুছলো তার বাঁ কাধেব কম্বলে। তার পর উঠে দাঁড়ালো—এক পা এক পা করে প্রাঙ্গণের বাগানের মধ্যে ঢুকলো।

তখন তার অগোচরে, যাবা যেখানে ছিল কথা ফুটলো তাদেব। কেশবানন্দজী বললেন,—গাঁজা খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে গেছে ও। মাঝে মাঝে কখনও কখনও এসে উপস্থিত হয়, দক্ষিণের লোক, এখানে এক বিকানীয়ের মহাজনের বাড়িতে থাকে।

আর একজন বললে,- বোধ হয় যেন গুপ্তচর, সরকারী কাজে ঐরকম করে সব জায়গায় বেডায় ও।

আর একজন বললে,—পাগলই বটে, আপনি যা বলেছেন। না হলে ওরকম অসভ্যের মত যা তা বলে ?

যাই হোক সেই ব্যক্তি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেরিয়ে আবার এসে বসলো। এসে যখন বসলো, তখন আমার মনে হোলো, এ কখনই দীর্ঘকাল এখানে বসে থাকবে না। যখনই এখান থেকে উঠবে আমিও তার পিছু নেবো,—এই ভেবে আমি যেন এইবার উঠবো এইভাবে ধীরে ধীরে সরে বসলাম, তার পর আস্তে আস্তে উঠে ধীরে ধীরে একটি থামের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় আছি,—যেই সে উঠবে আমিও সরে পড়বো ঐ আসর থেকে। সে আসরে কাজের কথা কিছুই হচ্ছিল না,—হচ্ছিল কেশবানন্দজীর এক শিষ্যের অসুখের কথা। তিনি দেখতে এবং চিকিৎসা করতেও বটে,—গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছেন নিরাশ হয়ে। তার আর বাঁচবার কোন আশাই নেই, সেই কথাই চলছিল—এমন সময়ে ইনি বাগান থেকে দ্বিতীয়বার এসে আবার ওলটপালট করে দিলেন।

যাই হোক, এখন এসে বসলেন বটে কিন্তু কোন কথাই কইলেন না - কেবল ঐ আকাশের দিকেই চেয়ে রইলেন। কেশবানন্দজী তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—স্বামীজী, অব্ কিধার জানা ?

সে বললে—কাহে? ইহাঁ কুছ তকলিফ হৈ তুমরা, হামারা রহনে সে? তুম বাৎ করোনা, আপনে বাৎ!

কেশবানন্দজী বললেন,—নহিজী, হামারা তো কোই বাৎ এয়সা নহি যো আপকা সামনেমে হো নহি কর্তা।

আচ্ছা আচ্ছা, অব হাম যায়েগা,—দো আনা তো দেও। শুনিবামাত্রই নিত্যানন্দ উঠিল, পরে তাকে ইশারা করতেই সে এনে দিল, ততক্ষণে আমি সরাসর একেবারেই ফটকের ধারে এলাম, যাতে সঙ্গ নিতে পারি।

হন হন করে লোকটি এলেন, সদর দরজা পেরিয়ে পথে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর আশ্চর্য্য, পরিষ্কার ইংরাজিতে বললেন—তুমি বাঙ্গালী বুঝি! কলকাতার দিক থেকেই এদিকে এসেছ, নয় কি? আমার উত্তরে তিনি যেন খুশী হয়ে বললেন,—চলো আমার সঙ্গে।

আমি ত তাই চাইছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে যেতে একটা এমন আনন্দ, এমন মুক্ত ভাবের আস্বাদন পেলাম, যা এর আগে এখানে পাইনি। লোকটি চলেন অত্যন্ত দ্রুত। আমার বাপের বয়সী,—প্রায় পঞ্চাশ হবে, মাঝমাথায় টাক। কাঁচাপাকা ছোট ছোট চুল দুধারে ও পিছনে, প্রায় এক হপ্তা না কামালে যেমন হয় তেমনি দাড়ি-গোঁফ। চক্ষু দুটি অতি ভয়ানক উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। তাঁর চাউনিটি সাধারণের অসহ্য। কেমন করে উনি জানলেন যে আমি ইংরাজী বুঝি তা জানি না, তবে কথা তিনিই বললেন। পরে ক্রমে ক্রমে আমার কাঁধে হাত রেখে চলতে লাগলেন, আর আপন ভাবেই ইংরাজিতে বকে চলেছেন। তাঁর তাড়াতাড়িতে বলার জন্যই হোক অথবা আমার অনধিগত বিষয়ের জন্যই হোক, আমি তাঁর কথার কিছুই বুঝলাম না, ভাষাটা ইংরাজী সেটা বুঝলাম মাত্র। এখানে একটা কথা বলে রাখি, তিনি যে তালে চলছিলেন, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়েছিলেন, ততক্ষণ আমি কিছুতেই তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিলাম না। ঠিক সেটা বুঝেই তিনি আমার সঙ্গে যেন একটা ঘনিষ্ঠ ভাব দেখিয়ে নিকটে এলেন, তার পর আস্তে আস্তে বাঁ হাতখানা আমার কাঁধে রাখলেন। তার পর থেকেই দুজনে সমান ভাবেই চলতে লাগলাম। আমার আর শক্তির অভাব হয়নি।

প্রথমে আমরা আশ্রমে থেকে বেরিয়ে যমুনা-তীরে এলাম, তারপর আবার চলতে চলতে একটা পথ দিয়ে আবার শহরের মধ্যে ঢুকে আর একটা পথ দিয়ে

গোপীনাথের মন্দিরের দিকে আসতে লাগলাম। আমায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি গাঁজা খাও ?

আমি বললাম,—না।

সামনেই গাঁজার দোকান, তিনি দাঁড়ালেন, আমায় সেই দু আনাটা দিয়ে বললেন,—গাঁজা কিনে আনো। নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, রাখো তোমার কাছে। আবার আমরা চলতে লাগলাম।

একটি ছোট্ট ঝুপড়ির কাছে এসে ডাকলেন,—শাস্ত্রজী! ভিতর থেকে এক মূর্ত্তি বেরিয়ে এলো। ছেলেমানুষ। এত অল্প বয়সের সাধু দেখেছি বলে মনে হয় না, পনেরো কি ষোল বছরের বেশী তার বয়স হবে না। তাকে বললেন,—মাল হৈ!

সে বললে, জরুর! আমায় ইঙ্গিত করতে তার হাতে মালটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর দুজনে বসলাম, সেই নবীন মাল তৈরী করতে লেগে গেল

আমিই এবার প্রশ্ন করলাম,—আচ্ছা কি বলে তোমায় ডাকবো ?

সে বললে, আমার নাম পার্থসহায় আয়েঙ্গার। ম্যাড্রাসের কাছেই আমাদের বাড়ী। অবশ্য ইংরাজীতেই আমাদের কথা হোলো, কারণ আমি দেখলাম তাঁর পক্ষে ইংরাজীতে কথা বলা মাতৃভাষার মতই সহজ।

তাঁকে আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা তুমি সাধুদের উপর এতো বিরক্ত কেন ? এই যে তারা সংসার ত্যাগ করে সব ছেড়ে ভগবানকে ডাকচে—

বাধা দিয়ে তিনি 'থামো, থামো' বলে আমায় থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—তুমি ছেলেমানুষ, কিছু জানো না,—এরা কিছুই ত্যাগ করেনি আর ভগবানকেও ডাকে না; ভগবান তো দূরের কথা, এরা নিজেদের পরিচয় জানে না,—এরা গৃহস্থদের এক্স্প্লয়েট করে ঘাড় ভেঙে কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে আসচে। কিছু ভাল নয় তাদের ব্যাপার—

আমার তখন তর্কপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলো, বলে ফেললাম—সবাই একেবারে খারাপ এ কেমন কথা! প্রকৃতির রাজ্যে এমন বৈষম্য—

এবারও আমায় থামিয়ে কথাটা জোর করে তিনি বললেন,—ঐ ভগবান শব্দটাই যত গোল বাধিয়েছে। যে বস্তুর সঙ্গে মানবের কোন সম্বন্ধ নেই, তার জন্য তপস্যা করার কোন মানে হয় ? যত্তো সব অপোগণ্ড ভূত-প্রেতের কাণ্ড!

কি সর্ব্বনাশ, এ লোক বলে কি ? ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নেই ? সবই 'সেন্টিমেন্ট—ভাবপ্রবণতা'! জিজ্ঞাসা করলাম,—মানুষ কি ভগবানকে জানতে পারে না ?

আবার সেই রকম চীৎকার করে তিনি বললেন,—না, না, না। মানুষ ভগবানকে ভাবতেই পারে না—সে বস্তু মানুষের জানা অসম্ভব। 'No man can know God. If God is known by man, then it is a magnified man—don't talk about God, speak something else.'

আমি—ভগবৎ-বিশ্বাস না যদি থাকে তা হলে তো সর্ব্বনাশ।

সে তাড়াতাড়ি বললে,—মানুষসমাজ উৎসন্ন যাবে, এই তো? তা যাক্, যেতে দাও। যে অবস্থা মানুষের হয়েচে তা উৎসন্নের চেযে কম কিছু? এরকম মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামো, ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, খুন, পরস্বাপহরণের চেয়ে কোন্ অংশে ভালো? ভণ্ডজীবন কোন দিক দিয়ে সমর্থন করা যায় না।

আমি—মিঃ আয়েঙ্গার, তোমার কথা আমি সমর্থন করতে পারি না। তুমি সাধু হয়ে যথার্থ সাধু একজনও দেখোনি, এ আমি বিশ্বাস করতে পারচি না।

তিনি—হাঁ একজন দেখেছি. এইখানেই সে আছে—ঐ একজনই দেখেছি যাকে আমি ঠিক ত্যাগী সাধু বলতে পারি, আসল সাধু।

তখন আমি কেমন বিহ্বল হয়ে গেলাম। এই ভয়ঙ্কর লোকটি, ঐ যে একটিমাত্র সাধু দেখেছেন, আর সেই সাধু এখানেই আছেন শুনে ইচ্ছা হল যে এখনই ছুটে যাই। বললাম,—কে তিনি মহাশয়, তুমি বলো আমি দেখব তাঁকে।

ঐ যমুনার তীরে,—বলে সে লোকটি দেখিযে দিলে যমুনার দিকে, তারপর বললে—জগদীশ বাবা তাঁর নাম, তুমি তাকে কখনও দেখোনি।

আমি বললাম না—দেখিনি বলেই না এতটা চাই তাঁর কাছে যেতে—

তিনি বললেন—তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি অতীব প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন, ইচ্ছা করলেই তাঁকে দেখা যাবে না জেনো।

এমন সময় গাঁজা তৈরী হয়ে কলকেতে চড়ে তাঁর হাতে এসে পৌঁছালো।

তিনি উবু হয়ে বসলেন, তারপর আর কোন দিকে না দেখে টানে মন দিলেন। প্রথম দু'একটা ফুকো টান, তারপর এমন জোরে একটা শেষ টান দিলেন যার ফলে কলকের মাথাটা দপ্ করে জ্বলে উঠলো। তারপর ধোঁয়া না ছেড়ে কুম্ভক অবস্থায় কলকেটা সেই চেলার হাতে দিলেন বাড়িয়ে। তার

কতক্ষণ পর অল্প অল্প করে ধোঁয়া ছেড়ে দেওয়া হলো,—খুব পাতলা ধোঁয়া।

চেলাও প্রসাদ পেয়ে আবার গুরুদেবের হাতে দিলে। গুরু আবার সেই রকম দম, আবার ধোঁয়া গেলা, আবার কুম্ভক, আবার চেলার হাতে দেওয়া —এইভাবে তিনবার হোলো; শেষে ভস্মটা মাটিতে ঢেলে কলকেটা ঝুলির মধ্যে তুলে রাখা হলো, চেলা তারপর জোড়হাতে বসে রইল তাঁর সামনে।

আমি তখন বললাম,—এইবার চলুন সেই জগদীশ বাবার কাছে।

তিনি বললেন,—না, এই সন্ধ্যাবেলা কি তাঁর দেখা পাওয়া যাবে! কাল হবে। আজ চলো আর এক জায়গায় যাই।

ভাবলাম,—হয়তো কোন সাধুসন্ত মানুষের কাছেই যাবেন। রাজী হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, তখন আয়েঙ্গার বাবাজীও উঠলেন, বললেন,—তুমি তো দেখছি অত্যন্ত সাধু ভক্ত লোক। ইয়ং ম্যান (তখন আমার বয়স ২৫।২৬ হবে), বৃথা ঐ সব বাজে অকর্ম্মা বিপথগামীদের উপর অত তোমার আকর্ষণ কেন? জীবনে অনেক কিছু উন্নত কাজ করবার আছে, এখন থেকে ঐ দিকে গেলে তোমার ভবিষ্যৎটা আমি দেখছি—তুমি একটা বিশ্রী অকর্ম্মাই হয়ে পড়বে। যেমন অলস অকর্ম্মণ্য ঐ শ্রেণীর লোকে হয়ে থাকে, গৃহস্থদের ঘাড় ভেঙে খায় আর নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যই দেখে থাকে! তাদের কাছ থেকে গৃহস্থরা কিছুই পায় না—পায় কেবল ধোঁকা, ভগবানের নামের ধোঁকা, বুঝলে? হাঁ—

আমি দেখলাম আমার তর্ক করা অসম্ভব এরকম একজন কঠিন, শক্তিশালী লোকের সঙ্গে। চুপ করেই রইলাম। তারপর বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরে পিঠে হাত দিয়ে মৃদু মৃদু চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন,—দেখো আমার বয়স যখন তোমার মত ছিল, আমি তোমার মত সৎ বুদ্ধিমান ইন্‌টেলিজেন্ট ছিলাম না। আমার গোড়া থেকেই স্বভাব-চরিত্র খারাপ ছিল, বোকার মত সুখের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতাম। বোধ হয় মাত্র দশ-বারো বছর আগে আমার পরিবর্ত্তন এসেছে—সাধু দেখবার, বুঝবার ক্ষমতা হয়েচে এখন।

আমি তাতেও কোন কথা কইলাম না দেখে তিনি বলতে লাগলেন,—চলো, আর এক জায়গায় তোমায় নিয়ে যাবো। চলতে চলতে তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে হন হন করে চলতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন,—তুমি শুনচ!

বললাম, হাঁ, নিশ্চয়ই।

তিনি—দেখো তুমি আশ্চর্য্য শক্তি দেখতে চাও কিছু, যাতে শক্তিশালী লোকেদের চেনা যায়?

আমি পরমহংসদেবের কথাটা বললাম,—যারা শক্তি দেখিয়ে বেড়ায় তারা ভগবানের সাক্ষাৎ পায় না।

তিনি বলিলেন, আবার ভগবানের সাক্ষাতের কথা! বললাম না তোমায়, ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হতে পারে না। ওগুলো এক-একজনের মনের বিকার। তুমি কল্পনা করে একটা কিছু বিরাট বস্তু ভাবতে থাক, ঐকান্তিক চেষ্টা থাকলে তোমারও ভগবান বলেই একটা কিছু দর্শনলাভ হবে, তোমার সঙ্গে কথা হবে, এমন কি তোমার অপরিস্ফুট শক্তিও পরিস্ফুট হয়ে তোমায় লোকচক্ষে শক্তিমান করে দেবে। তুমি যাই ইচ্ছা করবে তাই ভোগ করতে পারবে, যা চাও তাই পাবে। এমন কি তুমিও লোকচক্ষে ভগবান বলে সম্মানিত হয়ে পড়তে পারবে।

আমি তো অবাক্! ইনি বলেন কি? এখন পর্য্যন্ত লোকটির ইতি করতে পারিনি, কেবল ধোঁকা, একটা বিস্ময়,—এমন কি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি ওঁর কথা শুনে, ওঁর সম্বন্ধে একটা কিছু নির্দ্দিষ্ট ধারণাও করতে পারিনি - এ কেমন মানুষ!

চলতে চলতে এসে পড়লাম একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে। খুব উঁচু ফ্লোরের উপর দোতলা পাথরের বাড়ী। আমায় বললেন,—এখানে যারা আছে তারাই আমার আশ্রয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভক্ত? কি রকম?

তিনি বললেন—এরা চায় আমার সেবা করতে, আমার কাছে তত্ত্বকথা শুনতে। এমন কি এদের দেশ হল রাজপুতানায়, ঐখানে আমাকে নিয়ে যেতে চায়।

আমি বললাম,—তা হলে তুমিও তো এক সাধু হয়ে গেলে, এই সব গৃহস্থকে এক্সপ্লয়েট করচ—নয় কি?

সে বললে—না, না, আমি চাই নি এদের, এরাই আমায় চায়। আমি গ্রাহ্য করি না।

বিকানীরের এক মহাজনের বাড়ী। স্ত্রী-কন্যাদি নিয়ে এখানে বাস করে, ছেলে নেই। বাইরে ছিল একজন চাকরগোছের মানুষ, তাকে হাঁক দিয়ে বললেন—এই, হামকো লে চলো।

সে একবার তাঁর আর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—খেট্ অবি ঘরমে নেহি জি।

এমন সময় একটি পরমাসুন্দরী যোড়শী উপর থেকে তরতর করে নেমে এলো। জোড়হাতে নমস্কার করে বললে,—আইয়ে বাবাজি, চলো উপর চলো। বলে আগে আগে যেতে লাগলো।

আমরা উপরে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। সে ঘরটায় যে সব জিনিস বাইরে থেকে দেখা যায় আর ঘরটি বড়ো যতটা বোধ হয় তার চেয়ে ঢের বড়ো আর তার মধ্যে নেই এমন জিনিস নেই। সবই তাদের সংসারের। মেঝের তিনদিকে তিনটি ধবধবে বিছানা পাতা, একধারে একখানা চমৎকার কারুকার্য্যপূর্ণ বিছানার উপর সবটাই রঙ্গীন চাদর ঢাকা দেওয়া। আর একদিকে চকচকে বাসনকোসন সাজানো থরে থরে, যেমন দোকানে সাজানো থাকে। নানা আসবাব, বেশীর ভাগই কাঠের উপর বাটালির কাজ, যেমন সূক্ষ্ম কাজ তেমনই পরিপাটি তার রচনা।

আমরা যেতেই এক লোটা জল এনে সেই মেয়েটি আমার সঙ্গীর পা ধুইয়ে দিলে নিজের হাতে। আমাকেও সাধু মনে করে নিঃসঙ্কোচে এলো পা ধুইয়ে দিতে। আমি অতটা নিঃসঙ্কোচ হতে পারিনি, বললাম, হাম সাধু নহি।

নিজেই পা ধুয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলাম। ইতিমধ্যে দেখি সেই আয়েঙ্গার বাবা মশাই একেবারে সেই খাটিয়াতে গিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন, যেন কতই ক্লান্ত।

এবার এলো গৃহস্বামিনী—সোনায় ভরা হাত, গলা, বুক আর মাথা। পায়েও প্রত্যেক আঙুলে আংটি। প্রায় প্রৌঢ় বয়স। এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই পা বাড়িয়ে দিলেন, সে নিঃসঙ্কোচে বসে গেল পা-তলায় খাটিয়ার উপরে, পা টিপে দিতে। চমৎকার! তারপর মেয়েটি দুই থালে খাবার এনে রাখলে আসনের পাশে।

তিনি বললেন,—এ আমার ভারি আরামের জায়গা। এই বৃন্দাবনে আমি এলে এদের কাছে থাকি, এরা আমায় অন্য কোথাও থাকতে দেয় না।

তারপর মেয়েটিকে বলে দিলেন যে, আমি খাব না, খাবার তুলে নিয়ে যাও। উনি খাবেন তো খান। আমি বললাম—আমিও এখন খাব না, কারণ এটি ঠিক খাবার সময় নয়।

কিন্তু মেয়েটি জোড়হাতে এমন মিনতিপূর্ণ করুণ স্বরে বললে তার নিজ

ভাষায়, অবশ্য সেটা ঠিক হিন্দী নয়, কিন্তু মর্ম যা বুঝা গেল যেন সে বললে,— কেন তুমি খাবে না, আমাদের কি কিছু অপরাধ হয়েছে?' নিশ্চয়ই কিছু কসুর হয়ে থাকবে, তাই বুঝি তুমি খাচ্ছো না? সাধু এসে বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে ইত্যাদি। আমার ভাষা নেই তাকে বুঝিয়ে দিতে। শেষে হলো এই যে, আমায় কিছু খেতে হলো কোন রকমে। এড়ানো গেল না,—তাদের সরল যুক্তি আর মিনতির প্রভাব কম নয়।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো, ঘরে দীপ জ্বালা হোল আয়েঙ্গার বাবা তথনও শুয়ে রয়েছেন, ওঠবার নামই নেই, আমার তো আর ধৈর্য্য থাকে না বসে বসে দেখছি আর ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠছি। মেয়েটি আয়েঙ্গার বাবার মাথার কাছে বসে তার টাকমাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এ আরাম ছেড়ে তাঁর ওঠবার কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। আমি কি করি—মনে মনে ভাবচি, জগদীশ বাবার কাছে গেলে হত, এখানে কি ছাই দেখতে এলুম! বিকানীরের নারী-রূপ? মনে মনে এ সব ভাবচি, এমন সময় লোকটি একবার কাশলো, ভিতরে শ্লেষ্মা থাকলে যেমন কাশে সেই রকম কাশি।

ফিরে দেখি, উঠে বসে বাবাজী প্রদীপের দিকে চেয়ে আছেন। এ কি দেখলুম, এ তো পার্থসহায় আয়েঙ্গারের মূর্ত্তি নয়! এ যে অপূর্ব্ব কমনীয় যুবাপুরুষ, অতীব উজ্জ্বল গৌরবর্ণ স্বস্তিকাসনে বসা। হাতের উপর দিকে কবচ, নিচের হাতে কঙ্কন, পরনে রেশমের উজ্জ্বল সোনালি পাড়বস্ত্র, বাঁ কাঁধ থেকে নেমেছে উত্তরীয়, অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি,—এমন কখনও দেখি নাই তো জীবনে!

মা ও মেয়ে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে সামনে, অপলক নেত্রে চেয়ে আছে ঐ মূর্ত্তির দিকে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—সে মূর্ত্তি এত স্থিরনিশ্চল, মনে হয় যেন পাথরের তৈরী। এ কি আমার চক্ষের ভ্রম, মরীচিকা দেখচি ঘরের মধ্যে বসে? এই বৃন্দাবনে এসে এইবারেই এই পার্থসহায়ের সঙ্গে দেখা, এতক্ষণ একভাবেই দেখে এসেছি—আধপাগলা, প্রৌঢ়, বদমেজাজী একটা মানুষ—তবুও তার বাইরেটা দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সঙ্গ ছাড়িনি, এখন দেখি তার আর এক ভাব। রূপবদল। এ বিভূতি? সিদ্ধযোগী যাঁরা তাঁরা এসব পারেন—শুনেছি অনিমা লঘিমাদি সিদ্ধি থাকলে এরকমটা হওয়া খুব সম্ভব। এই সব মনে মনে তোলপাড় করচি, হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে ঐ মূর্ত্তি একটু প্রসন্ন হাসিমাখা মুখে মাথাটি একটু নিচের পানে ঝুঁকিয়ে ইঙ্গিত করলেন, এদিকে এসো।

আমি উঠে গেলাম তাঁর কাছে, খাটের ধারে দাঁড়ালাম। তিনি দীর্ঘ হাতখানা

বাড়িয়ে যেন আমায় জড়িয়ে অতি সহজে তাঁর বুকের কাছে নিয়ে এলেন, আমার শরীর তখন থরথর করে কাঁপতে লাগলো, তারপর আমি একেবারে জ্ঞান-চৈতন্য হারালাম, কিছু বোধ রইলো না আমার।

যখন জ্ঞান হল, সামনে এক প্রৌঢ় সাধুমূর্ত্তি, বেশ উজ্জ্বল বর্ণ তাঁর, কপালে চন্দনের ছাপ, কৌপীন পরা, ডানদিকে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। আমি বসে আছি। আমার পাশে দাঁড়িয়ে পার্থসহায় বাবাজী। জ্ঞান হারাবার সঙ্গে সঙ্গে, যেন মনে করতে চেষ্টা করলাম, কোথায় যেন দেখেছি এ মূর্ত্তি। সঙ্গে সঙ্গে পার্থসারথি বলেছিলেন আমার কানে কানে,– এই জগদীশ বাবা, এঁকে প্রণাম করে চলো এখন আমরা যাই। কাল আবার তুমি আসবে—আর আমার সঙ্গে আসবার দরকার হবে না।

আমি প্রণাম করে উঠলাম। তাঁর কুটির থেকে বেরিয়েই একটি কুঞ্জবন, দূরে দূরে বড় বড় গাছ পেরিয়ে যমুনার ধারে এসে পড়লাম। আয়েঙ্গার বাবা আমার কাঁধে হাত রেখে চললেন। কেশী ঘাটের কাছে এসেই বললেন,—চলো, এবার আমরা যাই যেখানে থেকে বেরিয়েছিলাম। বলতে বলতে তিনি আমায় জড়িয়ে ধরলেন, আবার আমি কেমন একটা বিহ্বলতা অনুভব করলুম, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানলোপ, আর কিছুই দেখাশুনার বাইরে চলে গেলাম। তারপর—যখন পুনরায় চৈতন্য হোলো দেখি আমি সেই বিকানীর কুঠিতে প্রকাণ্ড ঘরখানার মেঝেতে বসে আছি আর আয়েঙ্গার বাবাজী খাটে শুয়ে পায়ের দিকে মায়ের আর মাথার দিকে মেয়ের সেবা নিচ্চেন। আবার তার কাশির শব্দে ভাল রকম চৈতন্য হতেই চেয়ে দেখি আমার দিকে জ্বলজ্বল চক্ষে চেয়ে দেখছেন, একটু কেমন অদ্ভুত পরিহাসের হাসি তাঁর মুখে প্রকাশ পাচ্চে।

আমি উঠে দাঁড়াতেই বললেন,—এখন যাও, কাল সকালে জগদীশ বাবার কাছে যেও, রাস্তাটা কেশী ঘাটের উপর দিয়ে সোজা, ঠিক যমুনার ধারে ধারে—এ্যা, মনে থাকবে তো ?

আমি প্রণাম করে বললাম,—হাঁ নিশ্চয়ই থাকবে।

মৃদু হেসে পার্থসহায় বললেন,—এবার আমার উপর ভক্তি হয়েচে, না!

২৯

যাইতেছিলাম গেঁউলা, কল্যাণী হইতে যমুনোত্তরীর পথে। পথের কোন কষ্টই ছিল না,--সোজা পথ, বেশী চড়াই উৎরাই নেই, দৃশ্যও মনোরম, তার উপর মহাভাগ্য,—এরা বড়ই যত্ন ও খাতির করে, দেবতার মত শ্রদ্ধাভক্তি করে তীর্থযাত্রীদের অথচ নিজের দুঃখ ও দারিদ্র্য, তার পরিমাণ যে কতটা তা যিনি এ অঞ্চলে ঘুরেছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন। দেখেছি যদি কোন তীর্থযাত্রী এসে দাঁড়ায়, নিজ মুখের গ্রাস তার জন্য উৎসর্গ করতে কোন সংকোচ নেই। যাই হোক যোগাযোগটা ছিল ভালো, এই গেঁউলার পথে এক গাড়োয়ালী মালগুজারদারের সঙ্গে পথে চলছিলাম,—পথের বন্ধু বড়ই আদরের।

প্রৌঢ় লোকটি বাণিয়া,—সাধু-সন্ন্যাসীর উপর ভক্তি তার যথার্থই ছিল। কথা কইতে কইতে প্রায় সাত মাইল পথ শেষ করে বিকালে প্রায় তিনটার সময় আমরা গেঁউলাতে পৌঁছে গেলাম। এটা তার নিজ স্থান, বললে, এখানে তার একখানা বড় মকান আছে, কারবারও আছে। কিছুদিন যদি এখানে থেকে যাই তাহলে সে খুব সুখী হবে। ঘরে তার স্ত্রী আর এক দাসী, আর কেউ নেই। দেখলাম সত্য সত্যই নদীতীরে উঁচু জায়গায় তার পাহাড়ী মকান, —দৃশ্যটি চমৎকার, সেখানে থাকা লোভনীয় বটে। একে আরামপিয়াসী আমরা—কোথাও একটু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পেলে সহজে নড়ি না—তার উপর এখানকার কঠোর এই পর্য্যটক জীবন। এখানে কিন্তু আরাম করা ঘুরে গেল আমার আজ এই প্রথম রাত্রেই।

কঠিন পরিশ্রমের পর, রাত্রে পরিপাটি ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল তার স্ত্রী। অতি চমৎকার আলুর শাক, ভাজি, আমের আচার আর পরোটা,—

এই সব দিয়ে আমাকে যথেষ্ট পূর্ণ পরিতৃপ্ত করলেন। শেষে প্রায় সেরখানেক ঘন দুধ এনে হাজির, খেতেই হোলো। তারপর যখন আলস্য ও ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন, তখন শুয়ে পড়া গেল। একটা বড় ঘর, তার পাশেই একটা ছোট ঘর—সেই ঘরেই একখানা ভাল ফিতাবাঁধা খাটে সুকোমল শয্যা ; বোধ হয় শুতে যা দেরি। বেশ মনে আছে, যেন একেবারে গভীর নিদ্রার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটি কোমল, অতি সন্তর্পণ করস্পর্শে। কে—কে ? বলে তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। আমার পা কোলে নিয়ে সেবারতা বণিকের স্ত্রী। ধীরে কণ্ঠে সে বললে, সেবা করনে আয়া মহারাজ, আপকো সেবিকা সমঝিয়ে। ইয়ে হামারি ধরম হৈ।

কুন্ঠিত ভাবেই বললাম,—মাতাজি, হাম তো সন্ন্যাসী নহি, হামভি আপকী মাফিক গৃহস্থ আদমী। আপকী ঐসি সেবা লেনা হমারা ধরম নহি।

কোনক্রমে তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরের বার করে দিয়েছি, দরজায় খিল লাগাতে যাচ্ছি, তার স্বামী এসে ঢুকলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে যে কথা হোলো, সংক্ষেপেই বলে এ পালা শেষ করে দিতে হয়।

এদের মধ্যে প্রথা আছে যে, যেদিন কোন নিঃসন্তান নারী ঋতুস্নান করে, সেইদিন বা রাত্রে যদি কোন সাধু-সন্ন্যাসী সেই গৃহে আসেন, তাহলে ঋতুরক্ষা তিনিই করবেন। এদের বিশ্বাস এই সংসর্গের ফলে যে সন্তান হবে, সে মহাপুরুষ অথবা অসাধারণ ব্যক্তি হবে। শুনেছিলাম পাঞ্জাবে কোথাও কোথাও এ প্রথাটি তখনও ছিল, কিন্তু এদিকে এই সব লোকের মধ্যে ঐ সংস্কার আছে দেখে আশ্চর্য্য হলাম কম নই। যাই হোক, এই গৃহস্বামীকে বুঝাতে পেরেছিলাম যে সাধুর পবিত্র স্পর্শে তাঁর স্ত্রী ধন্যা হতে পারতেন সে সাধু ব্যক্তি আমি নয়। আরও একে তো আমরা বাঙ্গালী, ভ্রষ্টাচারী, তার উপর আংরেজী লেখাপড়া শিখে সরকারী গোলামী করে বংশানুক্রমে পতিত হয়েছি, তার উপর আমি বিবাহিত গৃহী,—গৃহত্যাগী সাধু মোটেই নয়, কেবল ভ্রমণ করাই উদ্দেশ্য, তীর্থকর্ম্মের ধার ধারি না, আমার মত একজনের ও-কর্ম্ম অতীব গর্হিত।

এইভাবে সেরাত্রে এক অচিন্তনীয় নাটকের অভিনয় সাঙ্গ করে পরদিন প্রাতে পথে পা বাড়ালাম।

গত রাত্রের ব্যাপারটি, কি জানি কেন, মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝড়

তুলেছিল - তার জের আজও বহুক্ষণ অবধি ছিল। কেমন ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ এরা, কি ভাবে এবং কোন্ সূত্রে এমন অদ্ভুত সন্তান উৎপাদনের রীতি এদের সমাজে স্থান পেয়েছিল, যার জের এখনও অবধি চলেছে! এখন চলতে চলতে এর নিমিত্ত ও উৎপাদন,—দুই কারণই যা আমার মনে এসেছিল, তা নিয়ে এখন আর বেশী নাড়াচাড়া করে কাজ নেই, পরে কোন সময় অন্য ক্ষেত্রে আলোচনা করা যাবে ভেবে পথের দিকেই মন দিলাম। তবে সাধারণভাবে এর সূত্র সেই মহাভারতের আমলের ক্ষেত্রজ পুত্র দিয়ে স্বামীর অক্ষমতাহেতু ঔরস-পুত্রের কাজ নিষ্পন্ন করার বিধানও এর মধ্যে থাকতে পারে, এবং এইটাই এর মূলে আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

এখন এখানকার—অর্থাৎ গেঁউলার ঐ এক রাত্রের স্মৃতি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা সোজা রাস্তা—তখনো গেঁউলার সীমানা ছাড়াইনি, যেতে যেতে দুজন ভদ্রঘরের ছেলে—তারা মুসৌরীতে পড়ে, পথেই দেখা হয়ে গেল। আমার বেশভূষার রকম দেখে বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয়ে তারাই কথা আরম্ভ করে দিলে। কোথাকার লোক, কি করি, কি উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে শুভাগমন করেছি ইত্যাদি প্রশ্ন প্রথম আরম্ভ করলে। বাঙ্গালী বুঝতে পেরে তারা ধরে বসলো আমায় তাদের বাড়িতে যেতে এবং আতিথ্য গ্রহণ করতেই হবে। বাধ্য হয়েই তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তায় কাটিয়ে, পথে আমার বিলম্ব হলে বিশেষ ক্ষতি হবে—আজ আমার গাংনানী পৌঁছানো চাইই, শেষে বুঝিয়ে ছুটি নিতে পেরেছিলাম। বড়ই আগ্রহে শুনলো, স্বদেশী মুভমেণ্টের ইতিহাস, আগাগোড়া,—তারপর এখন কেমন চলছে ঐ কাজ বাংলা দেশে ইত্যাদি কথা। যেহেতু আমি বাঙ্গালী, ভারতের সকল প্রদেশের শ্রেষ্ঠ প্রদেশের একজন মানুষ, সুতরাং যথার্থ ই শোনাবার অধিকারী। এদের ধারণা বাঙ্গালীরা জনে জনে এক-একজন সুরেন বাঁড়ুজ্যে, বিপিন পাল,—সকলেই বিরাট কর্ম্মবীর। যাই হোক, শেষ অবধি অনেকটা আনন্দ, আশা আর দেশ স্বাধীন করবার শক্তির উত্তেজনা তাদের মধ্যে জাগিয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম। সেই দিনটা শিলকিয়ারী নামক পড়াওতে কাটিয়ে পরদিন আবার যাত্রা।

অতঃপর এখান থেকে যে পথে গেলাম, সে পথে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত বেশী চড়াই বা উৎরাই ছিল না। যখন উপত্যকাভূমির ওপর দিয়ে একটি ছোট সেতু পেরিয়ে এসেছি, তখন চড়াই আরম্ভ হোলো। আড়াইটি মাইলের সেই

আরোহণ। যাকে বুকভাঙা চড়াই বলে এটা সেই চড়াই। তা শেষ করে প্রায় তৃতীয় প্রহরে এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম, সেখান থেকে গাংনানীর পড়াওটা আরও চার মাইল হবে।

কি জানি আজ প্রথম থেকেই একলা আপন মনে চলে এসেছি কেমন একটা অসহায় ভাব নিয়ে। সারা পথটা একজন মানুষের মুখ দেখিনি। খানিক জঙ্গলও ছিল, ভয়ে ভয়ে পেরিয়েছি, এমন নির্জ্জন পথটা আগাগোড়াই যেন রহস্যঘেরা। যমুনার কুলুকুলু—দু'একটা পাখীর ডাক, তার সঙ্গে যেন একই সুরে বাঁধা—তাই শুনতে শুনতে আসছি। সঙ্গে কিছুই খাবার নেই—দুই চার আঁজলা ঝরণার জল ছাড়া আর কিছুই জোটেনি; তারপর বিশাল চড়াই ভেঙে ক্ষুধায় মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল। এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে একটু দম নিচ্চি। চারদিকে একবার চেয়ে দেখলাম। বিজন স্থানের একটা মাহাত্ম্য আছে, সেটি আমি বিশেষভাবেই অনুভব করেছিলাম প্রথম থেকেই। কিন্তু ক্ষুধার জালা বড় জালা,—যার অভিজ্ঞতা আছে, সে-ই জানে।

কাছেই একটি ছোট গাছ, সেই গাছের উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে অবাধ,—তাতে সুমুখে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে একটি ঝরণা দেখা যাচ্ছিল। ঐ ঝরণার কাছেই আমায় যেতে হবে—ঐখানেই খানিক জিরিয়ে নিয়ে দু'চার আঁজলা জলপান করে আবার যাওয়া যাবে। এই মনে করে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নজর পড়লো সামনের ঐ ছোট গাছটির ওপর। সাড়ে তিন হাত উঁচু হবে গাছটা, কিন্তু তার আকৃতিটি যেমন অদ্ভুত তেমনি অদ্ভুত তার পাতা, ডালপালা, সব কিছুই। এমনটি আমি আগে কখনও দেখিনি। তার পাতার গড়ন বড়ই বিচিত্র, অনেকটা কচুপাতার মত—অথচ বড়ই বিচিত্র তার রঙ। সবুজ মোটেই নয়, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন ছাই রঙ; খুব কাছে দেখলে হালকা নীল, তাতে সবুজের আভা—তলায় হালকা বেগুনী। পাতার উপরটি ভেলভেটের মতই নরম; ডালপালার রঙ এমন উজ্জ্বল যেন রূপালি, আবার কোথাও শেওলা ধরা, গাঁটে গাঁট ভরা সব ডাল ও পালা। আবার সেই গাঁট থেকেই নূতন ডাল বেরিয়েছে। ঝাঁকালো গাছটি, বোধ হয় সাত-আট হাত জায়গা জুড়ে আছে। গুঁড়ি প্রায় দেখা যায় না, ঝোপঝাড় লতায় ভরা।

যাঁরা হিমালয়ে বেড়িয়েছেন তাঁরা অনেক রকম গাছই দেখেছেন, বিশেষতঃ যাঁরা এদিকে চক্ষুষ্মান—গাছপালা বেশী ভালবাসেন, তাঁরা নিশ্চয় মুগ্ধ হয়ে যান নানাপ্রকার গাছপালা, ভাল কথায় এই গিরিরাজের কোলে তরুলতা গুল্ম

অথবা অসংখ্য রকমের বনৌষধি এবং বনস্পতি লক্ষ্য করে। বড় বড় গাছ প্রায়ই এক একটি বিশেষ জাতের হয়ে থাকে, তাদের নামও বিচিত্র। বাঞ্জ, যার বিলাতি ভদ্রনাম ওক্,—দেওয়ার, কেলু, পাইন প্রভৃতি;—কিন্তু ছোট ছোট জাতের গাছ যে কত রকম, তাদের নামও যেমন সাধারণের জানা নেই, তাদের সংখ্যাও কম নয়। বিশেষতঃ যে গাছটি আমি এতক্ষণ দেখছিলাম, আর কোথাও সে গাছ দেখিনি। এটা কি গাছ জিজ্ঞাসা করবারও লোক ছিল না এ পথে।

এখন এতটা পরিশ্রম, ক্লান্তি, ক্ষুধার পীড়া হঠাৎ এক ব্যাপারে যেন নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমাব লক্ষ্য যখন ঐ গা'ছর মধ্যেই নিবদ্ধ সেই সময় আমায় চমকে, এমন কি একেবারেই স্তম্ভিত করে দিয়ে বেরিয়ে এলো এক দীর্ঘকায় মানুষ ঐ গাছের ভিতর দিক থেকে উলঙ্গ,—কেবল তার কাঁধের উপরে একখানা কি ঝুলছে,—নাহলে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ বলাই সঙ্গত। একখ'নি কৌপীন পর্য্যন্ত নেই সেই ঋজু অঙ্গে।

গাছটির অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতির কথা আগেই ত বলেছি। এখন এই যে এক মানব-মূর্তি আমার সুমুখে আবির্ভূত হয়ে আমায় চমৎকৃত করেছিল, তার রূপ ও প্রকৃতি সমভাবে অদ্ভুত। যেন ভিতরে বসেছিল, উঠে বাইরে এলো, এমনভাবে তার উপস্থিতি। একেবারে আমার সুমুখেই, বলেছি; সত্যই এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ একজনের আবির্ভাব আর একজনের সামনে—আর তা এমনই অকস্মাৎ যে তার বর্ণনা অসম্ভব।

দীর্ঘ শরীর তার, বোধ হয় ছ-ফুটের কিছু উপর, পাতলা রোগা ধরন। মুখখানি ছোট—তাইতেই শরীর তার খুবই লম্বা দেখায়। কিন্তু সেই মাথায় জটার বহর এতটাই ঘন যে, সহজেই মনে হয় এত ভার কেমন করে এই রোগা লোকটি বয়ে বেড়াচ্ছে ঐ ছোট মুণ্ডের উপর! জটার রঙ তামাটে,—তার গায়ের রঙের সঙ্গে যেন সহজ নিয়মেই মেলানো। চারদিকেই ছড়ানো খোলা জটার মাঝে তার ছোট্ট মুখখানি দেখলে মনে হয় যেন অন্ধকার আকাশের ঊর্দ্ধপ্রান্তে একখানি মলিন পূর্ণ চাঁদের উদয। অল্প অল্প গোঁফ, দাড়ি। সে অল্পতা, অল্প বয়সের জন্য নয়, স্বাভাবিক বাড় কম ঐ দুই জায়গায়। মুখের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তার চক্ষু দুটি। এমন চঞ্চল অথচ পলকহীন তার দৃষ্টি,—দীর্ঘকালের মধ্যে একবারও তার চোখের পাতা নড়তে বা পড়তে দেখিনি। একবার মাত্র ঝটিতি আমার চোখের উপর কটাক্ষপাত করে সেই মূর্ত্তি আমার ঠিক সুমুখে এসেই দাঁড়ালো, আর তার সেই দৃষ্টির তাড়িত শক্তি আমার মধ্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন করলে তা ভাষায় প্রকাশ করাই দুরূহ। তবে তার আভাস একটু দেওয়া যায়, যেমন এক অন্ধকার পথে যেতে যেতে হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ-চমকের ফলে ঝটিতি অনেকটা দৃশ্য একসঙ্গে চক্ষের গোচর হয়, তারপর আবার অল্পক্ষণেই ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়; আমার যেন সেই রকমই হয়েছিল—একবার হঠাৎ আমার সব অনুভূতি এক হয়ে অনেকটা অপার্থিব সত্তার আলোকে অন্তরক্ষেত্র আলোকিত হয়ে উঠলো, তার পরই আবার সহজ অবস্থা এলো। তখন সেই পুরুষমূর্ত্তিকে সামনে দাঁড়ানো দেখে আমি 'নমো নারায়ণায়' বলে নমস্কার ও সম্ভাষণ করলাম, কারণ সাধু-সন্ন্যাসীদের ঐভাবে সম্ভাষণ করাই সনাতন আর্য্যরীতি, তা আমার ছেলেবেলা থেকেই জানা ছিল। এ যেন কলের মতই করে গেলাম,—না ভেবে, না বুঝে, না চেষ্টায়, না ইচ্ছায়। এই সম্ভ্রমবোধ তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এটি আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে, তার উপর তখন কোন শ্রদ্ধার বিশেষ ভাব ছিল না, অথবা ঘৃণা বা তুচ্ছ ভাবও ছিল না। যেন কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগশূন্য ভাব, যা ঠিক বলা যায় না কোনও শক্তিমানের প্রভাবে হয়ে থাকে।

সে ব্যক্তি আমায় তখন কয়েকটা কথা বললে। কি যে বললে তখন বুঝতেই পারিনি। তার ভরাট গম্ভীর স্বর বা ধ্বনি আমার কানের মধ্যে দিয়ে অন্তরে একটা আলোড়ন শুরু করেছিল। সে ধ্বনি উপভোগেরই বিষয় বা

বস্তু। পরে যখন তার অর্থবোধ হলো তখন বুঝলাম—আমায় সে জিজ্ঞাসা করছে,—তু যমুনোত্তরী কি আসামী? আমি বললাম,—জী হাঁ মহারাজ। যোগী বা সন্ন্যাসীদের রাজা সম্বোধন সনাতন ভারতীয় প্রথা।

উত্তর শুনেই ধীরে ধীরে মূর্ত্তিমান পথের দিকে ফিরে চলতে চলতে বললে, —মেরে সাথ ত চল্, হাম ভি উধার যাউংগা।

সুতরাং আর বলা কওয়ার কোন দরকার নেই, আমি যন্ত্রচালিত পুতুলের মতই চললাম তার পিছনে পিছনে। কে যেন আমায় পাশে বেঁধে নিয়ে চলেছে। কিন্তু ক্ষুধাবোধ! সেও সঙ্গে চলেছে আর মধ্যে মধ্যে চেতনায় আঘাত করে যেন জানিয়ে দিচ্চে, আমি নিতান্তই আছি।

চলেছি কৌতুহল নিয়ে, সুমুখে যে মূর্ত্তি সচল তার পিছন শরীরটি আমি বেশ দেখছি আর কত কি যে ভাবছি তা আমিই জানি না। তবে ক্রমে ক্রমে একটি কথা তখন চিত্তের মধ্যে কেবলই ঘোরাফেরা করছিল,—ভগবান নবরূপ ধরে ছলনা করতে বা আমার মন বুঝতে এভাবে এলেন নাকি? ভগবানের ছলনা—কোনও সাধকের কাছে আসা তাকে পরীক্ষা করতে, এসব ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে সংস্কার হয়েছিল।

আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই কথা তোলাপাড়া করছি যখন মনে মনে, তখন অগ্রগামী সেই মূর্ত্তি চলতে চলতেই অকস্মাৎ আমার দিকে ফিরে একটু মুচকি

হেসে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে। তখন আমার মনে হলো, যদি ভগবান নাও হয় এ ব্যক্তি তা হলে নিশ্চয়ই কোন শক্তিমান যোগী,—অন্তর্যামী তো বটেই ; বিশেষতঃ এ ধরনের শরীর যোগীরই হতে পারে।

যখন ঝরণার কাছে এসে পৌঁছেচি, তখন সে মূর্ত্তি একেবারে পথ থেকে সরে গিয়ে জলের খুব কাছেই একখানা পাথরের উপর একটা পা দিয়ে দাঁড়ালো ; পিছনে একবার ফিরেও দেখলে না আমি তার পিছনে আছি কিনা। ঐভাবে দাঁড়িয়ে সে ঘন ঘন হাতে হাতে তালি দিয়ে যেমন করে গানের তাল দেয় তেমনি করে তাল দিতে দিতে, বেশ সুর করে ডাকতে লাগলো,—গাঁঙনী, গাঁঙনী, গাঁঙনী! উচ্চারণটি তার ঠিক গাঁঙনী, গাঁঙনী, গাঁঙনী— এই রকম। বোধ হয় মিনিট দুই-তিন পরে একটি অপরূপ লাবণ্যবতী মেয়ে,—কেঁও যোগী, বলে ধীরে ধীরে ঝরণার ধার দিয়ে সোজা চলে এসে দাঁড়ালো তার কাছে।

সত্যই অপরূপ লাবণ্যবতী সেই মূর্ত্তি, পরনে তাঁর ঐ পাহাড়ী আর্য্য ব্রাহ্মণদের মেয়েরা যেমন পরে ঠিক সেই রকম পোশাক। নীল রঙের ঘাগরা, উপরে কাঁচুলী, তার উপর একটা সাদা ওড়না, কিন্তু মাথায় ঢাকা নয়। একবার মাত্র তাঁর মুখের দিকে চাইতে পেরেছিলাম, কিন্তু তারপর তাঁর পায়ের উপর থেকে আমার দৃষ্টিকে আর তুলতে পারিনি। সুতরাং চক্ষু-ঝলসানো তার মুখের কথা না বলে তার পা দুখানিতে যা দেখেছি তাই বলছি। তবে বেশী বলব না—সংক্ষেপেই বলবো, কারণ তাঁর আবির্ভাব ও স্থিতি দুই-ই খুব সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে ঘটেছিল।

পা দুখানি —মেয়েদের পা আমরা অনেক দেখি, এখন অবশ্য স্লিপার অভ্যস্ত হয়ে আমরা আসলে তাদের পায়ের মূর্ত্তি বা রূপ খুব কম দেখতে পাই— কারও হয়ত মুখখানি বেশ সুকুমার, শ্রীমণ্ডিত কিন্তু তার পায়ের দিকে চাইলে আর দেখতে প্রবৃত্তি হয় না, পায়ের যে একটি রূপ বা সৌন্দর্য্য আছে আর সেই বোধ আমাদের ভারতীয় জনসাধারণের মনে যেমন প্রবল এমন বোধ করি জগতে আর কোথাও নেই। শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি বদ্ধমূল হয়ে আছে ঐ বোধটি। আমরা শিল্পী,— তাই সকল ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য্যটুকুই লক্ষ্য করে থাকি। যে হিসাবে মুখমণ্ডল শ্রেষ্ঠ বলা হয়েচে সেই হিসাবে চরণের স্থানও কম নয়। যে কোন মহৎ ব্যক্তিত্ব অথবা দেবত্বের অধিকারে সম্ভাষণ বা বরণ বা বন্দনা ঐ চরণ থেকেই শুরু করে থাকি, চরণ শব্দটির সঙ্গে এমনিই একটি রূপ বা পবিত্র সৌন্দর্য্যবোধের সহজ অনুভূতি সংস্কারগত হয়ে আছে আমাদের মনে। যাঁরা

বোদ্ধা সহজেই বুঝতে পারবেন চরণের উপর আকর্ষণটি আমাদের হিন্দু মনে কতটা কাজ করে থাকে।

এখন এই গাংনীর সুগঠিত পা দুখানিতে যে সৌন্দর্য্য এই চোখে দেখেছি তা এমনই সুন্দর, এমনই অনুপম তার রেখায়তনভঙ্গি - সত্য সত্যই যা থেকে চক্ষু ফেরানো যায় না। পায়ের বড় আঙ্গুলটিতে একটি সোনার আঙট, মধ্যে রত্ন সংযুক্ত চুটকী, আর ঠিক তার পরের সব কটি আঙ্গুলেও ঐ রকম সোনার আঙটি,—ঐরূপই তার কারুকার্য্য, আয়তনক্রমে চমৎকার ভঙ্গিতে পরা। অন্য নারী হলে এসব কেমন মানাতো জানি না, কিন্তু আমার চোখে দৈব সম্পৎ অলৌকিক রূপলাবণ্যবতীর অনুপম শ্রী-যুক্ত চরণ-যুগলই যেন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এর যেখানে যেটি ঐ অঙ্গের অলঙ্কার হয়ে শোভা করে আছে, সেখানে তা না থাকলেও যেন অশোভন হোতো না। মাথার চুল, চকিতের মতই দেখেছি, খয়েরি রঙের সঙ্গে সোনালি ও লালের মেশামেশি—তা আবার চূড়াবাঁধা বাঁদিকে। সেই চূড়ার চারিধারে নানা রত্নখচিত এক অলঙ্কারের শোভা, মুকুটের মত উজ্জ্বলরত্নমণ্ডিত—একজনের দৃষ্টিকে চকিত করে।

চলন তাঁর, সেও অলৌকিক, যেন হাওয়ার উপর পা ফেলে অথবা ভেসে চলে এলেন, এমনই হাল্কা শরীর—মনে হয় যেন পৃথিবীর পরশ তাতে লাগতেই পারে না। এসে দাঁড়াতেই যোগী বললে, -হামলোক উপর যাতে, অব ইহাঁ কুছ্ খিলায় পিলায় তো দে।

নারীপ্রতিমা যেন স্মিত বদনে সঙ্গীতের মাধুর্য্য ছড়িয়ে বললেন, আচ্ছা। তারপর কমনীয় ডান হাতের তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে ঝরণার ধারে একটি স্থান দেখিয়ে আবার বললেন,—বৈঠ যা। তারপর ধীরে ধীরে যেন নৃত্যের ছন্দে, সামনের ঝোপের দিকে চলে গেলেন, আর তাঁকে দেখা গেল না।

আমার সঙ্গী আমায় তখন সঙ্কেতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হতে আদেশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বসলেন সেই দেবী-নির্দ্দিষ্ট স্থানে ;—পাশেই আমি গিয়ে বসলাম। বসবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই লাবণ্যবতীর আবির্ভাব, হাতে প্রকাণ্ড দুখানি পাতায় খাদ্য, আমাদের সুমুখে অপরূপ ভঙ্গিতে সেই পাতা দুখানি নামিয়ে, খা-লে বাচ্চা, খা-লে। এই কথা বলেই আবার সেই ঝোপের আড়ালে চলে গেলেন। চমৎকার যোগাযোগ, যেন এসব খুবই স্বাভাবিক, এমনটি তো হয়েই থাকে।

সেখানে কোন কুটির নেই, কোন লোকের বাস নেই—একথা আমি খুব ভালই বুঝেছিলাম ঐ ঝোপটি হোলো নেপথ্য। কেবল একটু আড়াল—

লোকচক্ষুর অগোচরে যাওয়ার জন্য ঐ ঝোপটি ব্যবহৃত হোলো মাত্র। সে-সব কথায় কাজ নেই, এখন পাতায় কি পেলাম তাই বলচি।

একটি বড় পদ্মপাতা যত বড় হয় অত বড়ই একটি খুব পুরু হাল্কা সবুজ রঙের পাতা; যে গাছের পাতা সে গাছ ও-অঞ্চলে দেখতে পাইনি কোথাও দিন,—তার আগেও নয়, পরেও নয়। আর পাতার উপরে রাখা আছে দুটি ফল,—কি মিষ্ট ফল, যখন খেলাম মনে হলো অমৃতের স্বাদই এই। আর ছিল চাকা চাকা পুরু পুরু চারখানা রুটির মত—উপরে গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ, তখনও তপ্ত। এই বস্তুটি কিন্তু আমার পাতাতেই ছিল, আমার উলঙ্গ সঙ্গীর পাতায় ঐ দুটি ফলমাত্র, আর কতকটা পিণ্ডাকার পদার্থ। অবশ্য পথশ্রমে আমার যতটা ক্লান্তি না হোক, ক্ষুধায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম। এই সামান্য ভক্ষ্যদ্রব্য অল্পক্ষণেই শেষ করে দিলাম। প্রথম ফল দুটি ভক্ষণের পরে যে বস্তুটি খেলাম তার গুরুত্ব বুঝলাম অল্প কয়েক মুহূর্ত্ত পরে। শরীরে একটি শক্তি এবং স্ফূর্ত্তি অনুভব করতে বেশীক্ষণ গেলো না। তারপর প্রফুল্ল ভাবের সঙ্গে একটি মত্ততার সচেতন তৃপ্তির ফলে যা হয়ে থাকে তাই হয়েছিল আমার মধ্যে। আরও একবার গাংনীর দেবীমূর্ত্তির যদি দেখা পাই সেই আশায় ঐ ঝোপের পানে চেয়ে রইলাম। তাই দেখে ভোজনরত আমার ঐ উলঙ্গ সঙ্গী প্রফুল্লমুখে আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুটি করলেন। বুঝলাম আর দেখা হবে না।

এর পর আমি উঠে ঝরণার ধারা থেকে তিন অঞ্জলি জলপান করে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ালাম যোগীবরের কাছে। আমার সঙ্গী তখনও খাচ্ছিলেন। এত ধীরে ধীরে তিনি খাওয়ার কাজ করছিলেন—তাতে আমার মনে হোল যে হয় তাঁর ক্ষুধা ছিল না, না হয় তাঁর আর কোন কাজই ছিল না খাওয়ার পর। যাই হোক, এখন তাঁর খাওয়া শেষ হতেই কোন কথা না বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আরও একবার আমার দিকে চেয়ে চলবার জন্য পা বাড়ালেন। এবার আমরা চললাম আমাদের পড়াওর দিকে—যেটা এখান থেকে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে।

এখন বড়ই আরামে পথ চলেছি, এত আরামে যে এই সকল পথ চলা যায় আজ প্রথম উপভোগ করতে করতে চলছিলাম। কাছে কাছে দেওদার গাছ, বেশ বড় বড় গাছ,—তা থেকে অল্প তফাতে নীচের দিকে শস্যক্ষেত্র নেমে গিয়েছে। আগে চলেছেন আমার নাঙ্গা যোগী সঙ্গী, দুই-তিন হাত মাত্র

পিছনে আমি। আমার মধ্যে দুটি চিন্তা বড়ই প্রবলভাবে চলছিল। প্রথম ঐ গাংনীর রূপের বিষম আকর্ষণ—তারপর তার অতিথিসৎকার আর তাঁর সঙ্গে এই যোগীর সম্বন্ধ। আমার তখন পূর্ণ জোয়ান অবস্থা, তার উপর শিল্পীয় মন।

যদিও পথটা উৎরাই, আমরা ধীরে ধীরেই চলছিলাম। আমার দ্রুত চলা ত সম্ভব নয়। কাজেই এখানে আমি ধীরে ধীরে চলতেও যেমন বাধ্য, চিন্তার তরঙ্গে উঠা-নামা করতেও তেমনি বাধ্য। যখন ঐ সব কথা চলেছে মনের মধ্যে তখন আমার অগ্রবর্ত্তী যোগী একটু দূরে দেখিয়ে বললেন,— বো পড়াও দেখো।

কাজেই আমি বললাম,—জি হাঁ।

এবারে যোগী জিজ্ঞাসা করলেন,- তু ক্যা শোচতে? ফির তু ক্যা মাংতা? এমনভাবে বললেন যেন আমার আর কিছুই চাইবার নেই,—যা কিছু চাইবার তা সবই যেন পাওয়া হয়ে গেছে।

বললাম,—এক বাৎ সমজমে নহি আতি।

শুনে সে বললে,-- ক্যা বাৎ?

বললাম,—বো গাংনী, গাংন. বোলানা, ঔর খানাপিনা মিলানা, যব উঁহা কোই আদমী ভি নহি, ঘর কোটরী ভি নহি, কোই চোপড়ি ভি নহি, বো কৈসে হুয়া?

এ কথার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ,—কোন উত্তর না দিয়ে সে বললে,—ঔর ক্যা সাওয়াল তুমহারা, বোলো?

এবারে বাঙ্গলায় অর্থাৎ আমার আপন কথায় বলচি। আমি বললাম,— আপনাকে আমি যোগী বলেই মনে মনে বুঝেচি,—এমন কি আমার মনে হয় আপনি সিদ্ধযোগী। আমার যোগ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নই, আমার কি যোগসাধনা হতে পারে,-- অনুগ্রহ করে আমায় কি শিষ্য করবেন?

তিনি বললেন,—তোমার বিবাহ হয়েছে কি? উত্তরে স্বীকার করলাম হয়েচে। তখন তিনি ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি হেনে আমার দিকে এমনই একটি কথা বললেন যা লিখে এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মোট কথা যাকে দুদিন বাদে স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে হবে তার অত যোগবিদ্যার কথায় দরকার কি?

কথা কইতে কইতে আমরা যমুনার ধারে এসে পডলাম; পুরা উৎরাই শেষ হয়ে গেল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, শুক্লপক্ষের চাদ ছিল আকাশে। যোগী একখানা পাথরের উপর বসেছেন, আমি তাঁর প্রায় সামনে। দূরে দোকানপাট, ধর্ম্মশালা

ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—আপনার যোগবিভূতি কিছু দেখতে বড়ই ইচ্ছা হয় আমার। কথাটা বলেই, নিজের মধ্যেই যেন একটা চাবুকের আঘাত পেলাম; আর ওদিকে কথাটা শুনেই তিনি আমার দিকে এমন একটি দৃষ্টি হানলেন,—আমার শরীরের প্রত্যেক সন্ধি, এমন কি মর্ম্মস্থান হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠলো। তারপর এলো একটা ভয়। ভয়েতে আমি নির্ব্বাক, নীচের দিকে দৃষ্টি, চুপ করে বসে আছি; বুকটা ধক্‌ধক্ করচে।

তিনি বললেন,—আরে অন্ধ্যা! তু ক্যা দেখা? ভুখে মরতে বখৎ, গাঙনীকী মিলি নহি? বো খিলায়া পিলায়া নহি?—অব ঠাণ্ডা হোয়কে যোগ বিভূতি দেখনে মাংতে! তু অন্ধ্যা, বাঙ্গালী লোগু!

যোগীকে পরক্ষণেই আর দেখতে পেলাম না, অথচ উঠে যে তও দেখিনি। প্রাণ আমার যেন শূন্য হয়েই গেল,—সে বেদনা আমার স্মৃতিতে এখনও ধরা আছে।

৩০

ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য

তখন কার্ত্তিক মাস, প্রথম শীতের অল্প মধুর স্পর্শ। প্রফুল্ল মন, সুস্থ শরীর, আর অন্তরে উদ্দাম আশা লইয়াই পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছি। এখন বৃন্দাবন যাইতেছি, মথুরায় দুই-একদিন থাকিয়া কেশবমন্দিরের স্থান,—যে পুণ্যক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কংসরাজের যে কারাগার মধ্যে দ্বাপর যুগে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই চিহ্নিত স্থান যেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ সকল দেখিয়া তারপর বৃন্দাবন যাইব। একলা মানুষ, আশ্রয়ের কোনও হাঙ্গামা নাই,—এক ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। যমুনায় স্নান করিয়া বিশ্রাম ঘাটের দেবমন্দিরে প্রসাদ পাইলাম, তারপর বাহির হইলাম কেশবমন্দিরের স্থান দেখিতে।

সুপ্রাচীন ঐ মন্দির এবং কংসকারাগার স্থান প্রভৃতি লইয়া যে বাহিরে এতটা শোরগোল হইতেছে, ওখানকার স্থানীয় অধিবাসী কারো কোন ধারণাই নাই এ সম্বন্ধে। তাছাড়া ওদিকটা মুসলমান বস্তি,—একা, টাঙ্গা প্রভৃতি দাঁড়াইবার জায়গা; আর গরীব শ্রমজীবীদের গতাগতি—চত্বরের মত একটি স্থান, তার চারিদিকেই ছোট ছোট দোকান।

মন্দিরটি কবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন এক গয়লার খাটাল সংলগ্ন কতকটা উচ্চভূমি, তাহা লইয়াই বড় রকমের একটি কীর্ত্তি,—শ্রীকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠার কথা। তাহারই আয়োজনের কানাঘুষা চলিতেছে। যা দেখিলাম, কল্পনার একেবারেই বিপরীত—তৃপ্তি তো পাইলামই না, বরং এ স্থানে আসাটা একেবারেই বৃথা হইয়াছে মনে করিয়া একটা ক্লান্তি অনুভব করিলাম। কম নয়—প্রায় দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় তিনটি ঘণ্টা বৃথা কাটাইলাম। শেষে কেমন একটা নৈরাশ্যজনিত অবসাদ অনুভব করিয়া যমুনাপুলিনের পথে পা বাড়াইলাম।

হাতে, পায়ে, নাকে, কানে, মুখে, চোখে পথের যত ধুলা,—যমুনার জলে ধুইয়া স্নিগ্ধ হইলাম এবং পুনরায় বিশ্রাম-ঘাটেই স্থির হইয়া বসিলাম। তারপর সন্ধ্যায় আরতি দেখিলাম। এ আরতি পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, কিন্তু আজ,—যেন একটা নূতন কিছুর সন্ধান দিয়ে গেল। সাত্ত্বিক উপাসনার সঙ্গে অপূর্ব্ব শিল্প-

রচনার সমাবেশ,— এমনটি ভারতের আর কোন তীর্থে নাই। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটেও আরতি আছে। বিরাট হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গার বিরাট উপত্যকার উপর সে আরতির অনুষ্ঠান অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রকৃত বিশালতার মধ্যে সেই গম্ভীর জলকল্লোল যেমন সহজে মিলিয়া যায়, আরতির দীপগুলি তেমন করিয়া মিলিতে পারে না—ক্ষুদ্র, অবান্তর হইয়া যায়। কিন্তু এখানে বিশ্রাম ঘাটের আরতি যেন যমুনাকে তাহার অঙ্গে মিলাইয়া এক করিয়া লয়। আরতির পরও তাহার রেশ অনেকক্ষণ থাকে। বসিয়া বসিয়া একটি অপূর্ব্ব তন্ময়তা অনুভব করিতেছিলাম।

কত ভিড় জমিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। ঘণ্টার আয়াব আর তার তালমান নাই, যাহারা যখনই খুশি তালে বেতালে ধ্বনি উঠাইয়া গেল—ঠং ঠং, ঠং ঠং। কত নরনারী আসিল, চলিয়া গেল। কয়েকটি প্রৌঢ় ঘাটের সিঁড়িতে সন্ধ্যা-বন্দনায় বসিয়া, কতক্ষণ পর আচমন করিয়া চলিয়া গেল। কত দেশীবিদেশী, মধুরহাসিনী, কত মথুরাবাসিনী আনন্দের রেশ ছড়াইয়া গেল দেখিলাম। প্রায় এক প্রহরের পর—ধর্ম্মশালায় যাইব বলিয়া উঠিলাম।

ঘাটের কাছেই, রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া এক মুসলমান,—সাধারণ নয়, ভদ্র এবং কতকটা আধুনিক বলিয়াই বোধ হইল। কাঁচাপাকা, ছাঁটা গোঁফদাড়ি—যেমন পশ্চিমা মুসলমানদের হইয়া থাকে সেই রকম; রৌদ্র-দগ্ধ লালিমায় উজ্জ্বল মুখ তাহার উপর ক্ষুদ্র চক্ষুতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি। যেন কিছু হারাইয়াছে তাহারই অনুসন্ধানে তৎপর এই ভাবটা তাহার মধ্যে প্রকট। আমার দিকেও তাহার একটা লক্ষ্য আছে দেখিলাম। দুজনে চোখাচোখি হইবামাত্র আমায় অনুসন্ধিৎসু অথবা কৌতূহলী করিয়া তুলিল। পায় পায় আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেলাম। প্রৌঢ় বয়স হইলেও চেহারায় একটি ভব্যতা ছিল। পান-দোক্তার রসে ঠোঁট প্রায় কালো হইয়া আছে।

আবার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,—আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার নিজ মুষ্টিটা মুখের উপর আনিয়া কয়েকবার কাশিল,—ভিতরে হাঁপের অসুখ থাকিলে যেমন কাশি, হয় সেই রকম কাশি, তারপর আমার দিকে চাহিয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যেন কথাটা আগে আমাকেই কহিতে হইবে,—গরজটা যেন আমারই। তখন আমি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপ ইঁহা কইকো সোচতা হোগা, মুঝকো ঐসা মালুম হোতা!

সে ব্যক্তি,—জি হাঁ,—শুধু এই কথাটুকু বলিযাই স্থির হইযা রহিল। কতক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করিল,—আপ বাঙ্গালী ?

এই বাঙ্গালী শব্দটা এমনই কটু, বিদ্বেষ বেশপূর্ণ যে শ্রবণমাত্রই কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিলাম। তা সত্ত্বেও উত্তর দিলাম,—জি হাঁ। এখন হইতে আমাদের কথা আর হিন্দীতে না বলিয়া নিজ ভাষাতে বলিব, কারণ কথা অনেক, আর আমাদের সবার পক্ষেই ও অঞ্চলের উর্দ্দু হিন্দী তেমন রুচিকর হইবে না।

সে বলিল,—বোধ হয মথুরা বৃন্দাবন তীর্থে এসেছেন ? উত্তর দিলাম। সে আবার বলিল—কলকাতার লোক ? স্বীকার করিলাম। মনে মনে সন্দেহ একটা জাগিযা উঠিল, পুলিস নযতো ? ইতিপূর্ব্বে সে অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট ছিল—বঙ্গ-সন্তানের বিদেশেও রেহাই নাই।

সে আর কোন কথা না বলিয়া একবার চারিদিক দেখিযা লইল তারপর কতকটা চেষ্টা করিযাই একটু বিনয মিশাইয়া নরম স্বরে বলিল,—সাধুজি, বড ফটকের কাছেই আমার গরীবখানা, কিছু কথা আছে, একবার অনুগ্রহ করে যাবেন কি ?

গরীবখানা,—বিনয বচন, শুনিয়াই মনে হইল হযতো দৌলতখানাই হইবে।

কাছেই বড ফটক, সুতরাং অল্প সমযেই তার দৌতলখানায পৌছিযা যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আর অগ্রসর হইবার উৎসাহ রহিল না। মানুষের চেহারা ও বেশভূষার সঙ্গে আবাসস্থানের সম্বন্ধ যে কতটা বিপরীত হইতে পারে সে বৈষম্য যে কতটা তীব্র তা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয না, হইবার কথাও নয। যাক্ সে কথা এখন আমার মনোমধ্যে একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল, বলিলাম,—যমুনাতীরেই চলুন। সেইখানে গুমটিতে বসিযা কথা কইতে পারিবে। লোকটা মনের কথা বুঝিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল। সুতরাং আবার আমরা যমুনতীরেই আসিয়া একটা আচ্ছাদিত চত্বরে বসিলাম। রেলের পুলটি নিকটেই ছিল, গাড়ী চলিয়া গেল, ভদ্রলোক সেই দিকেই চাহিয়া আছেন। আমার চিত্ত এখন অস্থির হইযা উঠিল। বলিলাম,—এখন বলুন যা বলবার কথা।

হাঁ বলচি, সাধুজি,—আমার একটি ছেলে, ঐ একটিই ছেলে আমার—আজ দশ-বারো দিন নিরুদ্দেশ—

শুনিয়াই আমি উত্তর করিলাম,—তা আমি কি করতে পারি ?

সে ব্যক্তি এখন বেশ একটু কাতরভাবেই বলিল,—শুনুন আপনি

সব কথা,—তারপর যা ইচ্ছা হয় বলবেন। তাহার কাহিনী সে বলিতে লাগিল।

আমার ছেলেটির কথা বড়ই অদ্ভুত। তার স্বভাবও ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। আমরা মুসলমান,—আপনি জানতে না পারেন আমরা বাদশার জাত, স্থলতান আলমের আমল থেকেই দিল্লীতে আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, একসময় সারা হিন্দুস্থান আমাদের হুকুমেই চলতো, ডাক্‌রাইন লাট আমাদের জায়গীর দিয়ে আগ্রায় বসিয়েছিল—আখবরেতে এসব কথা ছাপার হরপে লিখা আছে।

আমার পক্ষে অসহ্য হইল। এই সব হইতে উদ্ধারের আশায় ব্যাকুল ভাবেই প্রার্থনাস্থচক কণ্ঠে বলিলাম,—দোহাই শাজাদা সাহেব, এখন আপনার ছেলেটির কথা—

হাঁ হাঁ—তাই বলচি, কিন্তু কি জানেন ঠাকুরজী, আমাদের খানদানের কথাটা না জানলে কত বড় ঘরের ছেলে হয়ে সে কি আহাম্মকী করেচে তা বুঝবেন কি করে? তাই গোড়ার কথাটা—

আমি জোড়হাত করিয়া বলিলাম,—এখন যদি আসল কথাটা আরম্ভ করেন!

তখন তিনি আবার আরম্ভ করলেন,—হ্যাঁ, তাই বলছিলাম, এই যে ধর্ম্ম আমাদের—সারা তুনিয়ায় একসময় এই ইসলাম ধর্ম্মকে নিতেই হবে,—নাহলে কেউ কখনও উদ্ধার পাবে না। আমরা সেই মুসলমান; হিন্দু আমাদের কাছে কাফের,—প্রত্যেক হিন্দু, সে যত বড় হোক না কেন, আমরা তাদের কাফের বলেই জানি, আমাদের মোল্লারা তাদের ছায়া স্পর্শ করে না। আমাদের এই খোদার অনুগ্রহপূর্ণ ধর্ম্মের মহিমা কাফেররা যদি বুঝতে পেরে কখনও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহলে তাকে আমরা আপন জনের মতই করে নিই, কিন্তু তা বলে কাফরদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব চলে না—

অসহ্য! কি যন্ত্রণায় পড়িলাম,—কিন্তু উপায় ছিল না, শুনিতেই হইবে। এখন ধর্ম্মের মহিমায় ভাসিয়া চলিলাম। ফলে স্রোতে পড়িয়া আমার মধ্যে কোন কৌতুহলও রহিল না—তার ছেলের অদ্ভুত গল্প শুনিব। কিছুক্ষণ শুনিয়া শেষে অসহ্য হইল, বলিলাম,—আচ্ছা আপ বৈঠিয়ে, অব্ হাম ঘর যায়গা—বলিয়াই উঠিলাম এবং একবার হাত তুলিয়া সেলামের ভাব দেখাইলাম।

সে ব্যক্তি অবাক হইয়া যেন আমি একটা কি বেয়াড়া কাজই করিয়াছি এমনই ভাবে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল,—বৈঠিয়ে, এখন কেবল ছেলের কথাই বলচি।

যেন বাধ্য হইয়াই বসিলাম, তখন সে আরম্ভ করিল,—কি জানেন, আমাদের উদার ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুদের পুতুল-পূজামূলক ধর্ম্মের তুলনাই হয় না। কোরাণ সরিফেই আমাদের বিশ্বাস। তাতেই বলেচে যে হিন্দুরা কখনই স্বর্গে যেতে পারবে না, জাহান্নামেই যেতে হবে তাদের। সেইজন্যই আমাদের ঘরানা ঘরের ছেলে যারা তাদের বাল্যকাল থেকেই যাতে ধর্ম্মে মতি ঠিক থাকে তাই শিক্ষা দিয়ে থাকি। দেখিলাম ভিতরে একটা প্রবল রোষ তাহাকে পীড়া দিতেছে; না বলিলেও নিষ্কৃতি নাই।

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম,—এইবার বলুন এখন আপনার ছেলের কথাটা?

হাঁ, তাই বলচি, আমার ছেলেটি, নামটি তার দাদার রহমান, সে মোক্তবায় লেখাপড়া করতো, দু-তিনখানা ইংরেজী বইও পড়েছিল, শান্ত স্বভাব তার, সবাই তাকে ভালবাসতো, একটু মুখচোরা ছিল, কইয়ে-বলিয়ে তেমন ছিল না। আমরা তবুও তাকে কড়া শাসনেই রেখেছিলাম, আমাদের খানদানের নিয়মই তাই কিনা। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে একজন খাঁটি মুসলমান হয়ে উঠবে কোন দিন। এখন তার বয়স প্রায় ষোল হবে। একদিন সে তার মায়ের কাছে এক বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসলো। সে বলে কি জানেন? বলিয়া হাঁ করিয়া সে ব্যক্তি আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, যেন আমিও অবাক হইয়া গিয়াছি কিনা দেখিতেছে।

আমি বলিলাম,—কেমন করে জানবো, আমি তো সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না সেখানে।

সে কি বললে জানেন? বলে, আম্মা, তোমরা হিন্দুদের কাফের বল কেন? বলো, আমায় আজ বলতেই হবে। আম্মা তো মেয়েমানুষ, কিছুই বলতে পারলে না। রাত্রে আমায় বলে দিলে যে, ছেলে এই কথা জিজ্ঞাসা করেচে। শুনে আমার গা জ্বলতে লাগলো; একেবারে তার কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে উঠানে নিয়ে এসে সপাসপ বেত লাগাতে লাগাতে বললাম, যারা এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম বিশ্বাস না ক'রে পুতুলপূজো করে তাদের কাফের বলে, এই কথা কোরাণে আছে, তুমি আর কখনও ও-কথা জিজ্ঞাসা করবে? হিন্দুর নাম নেবে? সে একটাও কথা কইলে না, আমার কথার কোন উত্তরও দিলে না। আমার হাঁপ ধরে গেল, বলিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল। তারপর বলিল,—আমরা খোদাতালার পয়দা হওয়া জীব—আমাদের ছেলে মুখে ওসব কথা কেন?

যাক ও-কথা, এখন ছেলেটি ঐ দিনের পর থেকে আর কাকেও কোন কথা

জিজ্ঞাসা করেনি, কেমন একটা গম্ভীর ভাবে, কারো সঙ্গে কথা না কয়ে চুপচাপ দিন কাটাতে লাগলো। আমি মনে করলাম, ঐ রকম কড়া শাসনে তার জ্ঞান হয়েচে।

এখন কাসেম বলে আমার এক ভাইপো, সে তারই সঙ্গে পড়তো। কাসেম এই বয়সেই পাঁচবার নমাজ পড়ে, যা আমরা পারি না, সে খুব উঁচুদরের মুসলমান, পরে সে একজন নামজাদা মানুষ হবে তা আমরা সবাই বিশ্বাস করতাম। ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরে কাসেম চুপি চুপি এসে সন্ধ্যানামাজের পর আমায় বললে, চাচাজী, দাদার একেবারে কাফের হয়ে গেছে। হিন্দুদের মন্দিরে যে দেওতা আছে তার দিকে চেয়ে থাকে, দরওয়াজার পাশে দাঁড়িয়ে চুপটি করে দেখে, আবার বিড় বিড় করে কি সব বলে কে জানে, আবার কাঁদে। ওর চোখে জল দেখা যায়। আমি দেখেছি।

মুসলমান-প্রবর একটু দম লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—কাসেমের মুখে ঐ কথা শুনে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে দরগা সরিফে, যেখানে আমাদের মোল্লা, হাপিজি, হাকিম সব থাকেন সেইখানে গেলাম। তিনি কাসেমকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করলেন, নিজের চোখে সে ঠিক ঠিক যা দেখেছে। সব কথাই তখন কাসেম বললে যে পরশুদিন একসঙ্গেই মক্তব থেকে বেরিয়ে যখন ঘরে আসছিলাম, সে আমায় বললে, তুই ঘরে যা আমি একটু পরে যাচ্ছি। আমি জানতাম পথে ঐ যে কাফের হিন্দুদের দেও মন্দির আছে ও ঠিক সেইখানে যাবে বলেই আমায় ভাগাতে চাইচে; আমি ওকে বললাম তা আমি তোকে ঐখানে যেতে দেবো না, গেলে তুই কাফের হয়ে যাবি। শুনে ও বলে কি, ভাইয়া, তুই ঐ মন্দিরের দেওতা কিষণজি আর তার বিবিকে দেখেছিস! আমি বললাম যে, ওসব কি আমাদের দেখতে আছে রে? আমরা যে বিশ্বাসী পবিত্র মুসলমান। আমার কথা দাদা কানেই নিলে না, সে কত কি সব বলতে লাগলো, শেষে বললে, খোদাই তো সব পয়দা করেছেন, তবে আমরা কেন দেখবো না তাঁর সৃষ্টিতে যা আমাদের ভাল লাগবে? এতে তো কারো কোনো লোকসান, কোনো গুণা নেই কারো, আমার যদি ভাল লাগে দেখতে দোষ কি? ওর ঐ কথা শুনে আমার রাগ হোলো, আমি বললাম, তুই তো নিশ্চয়ই কাফের হয়ে গেছিস। আমাদের আল্লা তাহলে তোর উপর গোসা করবেন, তোকে নিশ্চয়ই ঐ কাফেরদের সঙ্গে জাহান্নামেই পাঠাবেন। সে আমার কথায় রাগ করলে না, শুধুই এই কথাটি

বললে, খোদা তো সব কিছুই দেখছেন, আমি যখন কোন অন্যায় করিনি তখন কেন তিনি আমার উপর রাগ করবেন? হাঁ, আরও সে এই কথাটা বললে যে, আমাদের মত দুর্ব্বল ছোট মানুষের মত আল্লার কি রাগ-হিংসা আছে? মহব্বৎ না হলে কি আল্লাকে পাওয়া যায়? যেখানে মহব্বৎ সেখানে গোসাগুণা এসব কখনও থাকতে পারে?

হাপিজি একমনে সকল কথা শুনে বললেন,—নিশ্চয়ই কাফের পাণ্ডাদের ছেলেরা কেউ তার পিছনে লেগেছে আর এই সব কাফেরি শিখিয়েছে।

কাসেম বললে,—পাণ্ডাদের কোন ছেলের সঙ্গে তাকে কখনও কেউ দেখেনি। তা ছাড়া আমরা তো কখনও ওদের ছেলেদের সঙ্গে মিলি না, না ওরা আমাদের সঙ্গে মেলে।

এই সব শুনে হাপিজি মোল্লা ফিরুকসার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন, আমরা চলে এলাম ঘরে। এসে দেখি দাদার বাড়িতে একলা চুপটি করে বসে আছে। তার মুখখানা দেখে মনে হয় না যে, তার মধ্যে কোন পাপ বা অন্যায় আছে। সে এমন শয়তান, নিজের মনের মতলব বেশ প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে। কে তার পরামর্শদাতা, কোন্ কাফের বাচ্চা তাকে এইসব হদিস দিয়েচে, এই সব কথা তার মুখ থেকে বার করবার জন্য তাকে সেরাত্রে যে প্রহার করেছিলাম—অজ্ঞান হয়ে গেল তবু বললে না।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আমার কেমন একটা গ্লানি, এদের অজ্ঞান বুদ্ধি কতদূর নীচে নামিতে পারে, কেমন করিয়া সে অবস্থায় একটা সত্য বস্তু চাপা দিয়া মিথ্যার ইমারত খাড়া করিতে পারে, তাই ভাবিতে মনটা শ্রদ্ধাহীন, তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ছেলেটির কথা পরে হইবে—কারণ তাহার দৈবানুগ্রহ-জনিত প্রেমধর্ম্ম তাহার পিতা বা সমাজের অজ্ঞাত; সহজ চক্ষে যেটা দেখা যাইতেছে তা এই ব্যক্তি দেখিবে না, দেখিবে যাহা নয় তাই, নিজ নিজ ঈর্ষা-দ্বেষ প্রসূত কল্পনার চক্ষে। আমি বুঝিলাম এদের সন্দেহটা এই যে কোনও পাণ্ডা বা তাহাদের ছেলে কেউ এই ধর্ম্মবিশ্বাসী মুসলমানের ছেলেটিকে সরল পাইয়া হিন্দু করিবার চেষ্টা করিয়াছে। একটা কথা এক্ষেত্রে না বলিয়াও পারিলাম না, যদিও বুঝিলাম আমার এটা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আচ্ছা মিঞা সাহেব, আপনার বয়স তো পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে—

সে বলিল, পাঁচপন হয়ে গেছে এই রমজানে।

বেশ, আপনি কখনও হিন্দু একজন মুসলমানকে হিন্দু করবার চেষ্টা করেছে,

এরকম দেখেছেন কি?

সে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—আগে দেখিনি বটে তবে এখন শুদ্ধি আরম্ভ হয়ে গেছে যে।

সেটা তো খাঁটি মুসলমানদের জন্য নয়, যারা আগে হিন্দু ছিল, কোন কারণে জাতের বার, সমাজের বার হয়ে গিয়েছে বা মুসলমান হয়েছে তাদেরই জন্যে না শুদ্ধির ব্যবস্থা? তাদের কেউ যদি আবার ফিরে আসতে চায়,—

তা বটে, এই রকম কথাই চাউড় করে বাইরের লোককে জানানো হচ্চে, ভিতরে ভিতরে তাদের কি মতলব তা কে জানচে? তবে এটা ঠিক, খাঁটি মুসলমানকে তো কখনই পারবে না, এখন ছোট ছোট ছেলে হাল্কা মন যাদের তাদের চেষ্টা করে দেখচে হয়তো—

এ কথার পর আর কথা চলে না, তবুও বললাম,—মিঞা সাহেব, আপনি কি শোনেননি যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে না? হিন্দুদের ধারণা যে হিন্দু হয়ে না জন্মালে হিন্দু হওয়া যায় না!

মিঞা সাহেব বলিলেন,—হাঁ, তা শুনেচি বটে কিন্তু—

ঐ কিন্তুতেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে। যাহা হউক দেখিলাম এবার যেন একটু আর্দ্র হইয়াছেন। এখন করুণ নেত্রে বলিলেন,—তারপর শেষ কথাটা শুনুন, যেদিন সে নিরুদ্দেশ হয়, তার দুই-একদিন আগে থেকে সে কেমন এক অদ্ভুত ভাবে থাকতো। তার মা আমায় বললে যে, তুমি ছেলেটার দিকে দেখচো না, আমার বোধ হয় ওর ওপর কোন দেওতার ভর হয়েচে—নাহলে ওর চক্ষু সব সময়েই লাল কেন? আর যেন জলে ভরেই আছে। কারো সঙ্গে কোন কথা কইতে গেলে ঝর ঝর করে তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। কেউ কাছে গেলে সেখান থেকে সরে যায়, একলাই থাকতে চায়। আমার তো ভয় করে ওরকমটা দেখলে।

তার মায়ের কথা শুনে আমি সেই রাত্রেই আলো নিয়ে তার বিছানায় গিয়ে দেখি সে নেই। কোথায় গেল? কাসেম ও সে এক জায়গায় থাকে, দেখি কাসেম ঘুমিয়েছিল, তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সে যেন ভেবে বললে,—আমি তো কিছুই জানি না কখন উঠে গেছে! এ রকম তো সে রোজই করে, খুঁজতে খুঁজতে দেখি একটা কুয়ার ধারে, অন্ধকারে চুপ করে বসে আছে। ধরে এনে বেদম প্রহার লাগালাম। মারের চোটে কেমন করে ভূত ভাগাতে হয় তা আমরা খুব ভালই জানি। কিন্তু ঐ বিষম প্রহারেও তার কিছু হোল

না, সে শয়তান শয়তানই রয়ে গেল। আশ্চার্য্য, এতটা মার খেয়েও কিন্তু সে একটাও রাগের কথা বলেনি কোনদিন। তারপর যেদিন আমার স্ত্রীর কথায় মৌলালী থেকে এক গুণিনকে নিয়ে এলাম, তখন সে পালিয়েচে। যাবার আগে কাসেমকে বলে গেছে যে, আমার আশা ছেড়ে দাও, লাডলী আমায় ডেকেচে। আমি একেবারেই কাফের হয়ে গেছি।

সেই থেকেই সে নিরুদ্দেশ, আমি কিন্তু আশা ছাড়তে পারিনি, আজ প্রায় দু'হপ্তা হয়ে গেল, রোজ একবার করে এই সব জায়গায় খুঁজে বেড়াই। অতএব একটা ঘরের ছেলে শেষে কাফের হয়ে যাবে এটা কি সহ্য করা যায়!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তা আমায় আপনি কি করতে বলেন?

মিঞা বলিল,—আমার ঐ একটিমাত্র ছেলে, আমি এখনও তাকে ফিরে পেতে চাই। আপনি যখন ঘাটে বসেছিলেন, তখন থেকেই আপনাকে দেখছি, তারপর যখন উঠে এলেন মনে হোল হয়তো আপনার দ্বারাই তার সন্ধান হবে।

আমি বলিলাম, আপনার ছেলে তো কাফের হয়েই গেছে স্ব-ইচ্ছায়, এতটা পীড়ন সত্ত্বেও যখন সে আর ঘরে থাকতে চায় না, তাকে সন্ধান পেলেও ঘরে নিতে পারবেন?

উত্তরে সে বলিল,—সে ছেলেমানুষ, না বুঝে একটা কাজ করে ফেলেচে; তার ভুলটা তাকে বোঝাবো, আমাদের দরগায় সব বড় বড় সাধু-মহাত্মা আছেন, তাঁদের কাছে নিয়ে যাবো, তাঁদের শক্তির প্রভাবে তার মতিগতি বদল হয়ে যাবে, আমার বিশ্বাস।

বলিলাম,—আচ্ছা যদি কখনও কোথাও সন্ধান পাই তো জানাবার চেষ্টা করবো। তিনি তাঁর পাত্তা দিয়া দিলেন যেখানে তাঁহার নামে খৎ দিলে ঠিক জায়গায় পৌঁছাইবে। এই পর্য্যন্ত কথা। পরদিন আমি মথুরা ত্যাগ করিলাম।

বৃন্দাবন আমার পরিচিত এবং অতিপ্রিয় স্থান, অনেকবারই ঐস্থানে যাতায়াত ঘটিয়াছে। শুধু তা নয়, এইখানেই সাধনজীবনে যে রত্নলাভ করিয়াছি, তাহা চিরজীবনের সম্বল হইয়া আছে,—আজও পর্য্যন্ত।

রাধাবাগের ব্রহ্মচারী আশ্রমেই আমার আস্তানা। এবং ঐখানেই কেশবানন্দের আশ্রমে আমার দীর্ঘকাল কাটিয়াছে। সেইখানেই উঠিলাম। পরদিন মেঘে ঢাকা বৈকালে একটু ভ্রমণের জন্য যমুনাতীরে গিয়াছি, যেখানে বনচারী সাধুদের আশ্রম। তাহার নিকটেই ঘুরিতেছিলাম। পরপারের দিকে যমুনার

বিস্তৃতি, বহুদূর-প্রসারিত তটভূমি, মধ্যে মধ্যে দুই-একটা গাছ; তাহার পশ্চাতেই সুদূর বৃক্ষশ্রেণীর গাঢ় নীলাভ রেখাটি দিকচক্রবাল ব্যাপিয়া আকাশ প্রান্তে মিলিয়াছে।

যেখানে বসিয়াছিলাম, তার অল্প কিছু দূরে অপূর্ব্বদর্শন তিনটি প্রকাণ্ড শিশু বৃক্ষ। চমৎকার, সুপরিষ্কৃত তৃণহীন ভূমির উপর লম্বা বড় বড় গাছ তিনটির

মূল এমনই সমান্তরালে অবস্থিত যাহাতে এক সুডোল ত্রিকোণ ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি রচিত এমন ক্ষেত্র প্রায়ই দেখা যায় না, এ যেন কোন যোগীর আসন। উহা শূন্য নয়। দেখিলাম, ঐ ত্রিকোণের মধ্যে কৌপীনবন্ত মূর্ত্তি, অপরূপ ভঙ্গিতে বসে আছে। সে ভঙ্গি এমনই চিত্তাকর্ষক যে, আমার দৃষ্টিকে সবলে আকর্ষণ করিল, এবং সেই দৃষ্টিতে প্রথমেই ঐ মূর্ত্তিটি বৈষ্ণব এবং যোগী বলিয়া মনে হইল, উপবেশন ভঙ্গি তাঁহার যোগীর মতই।

বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি চঞ্চল বলিয়া কোন সাধুমূর্ত্তি বড়ই

আকর্ষণের বস্তু। বিশেষতঃ শান্ত ধীর প্রকৃতির সাধু দেখিলে প্রাণ যেন চঞ্চল হইয়া উঠে পরিচয়ের জন্য। মনে হয় যেন তারা আমার জন্মজন্মান্তরের আপন জন। কাজেই এক্ষেত্রে আর স্বস্থানে স্থির থাকিতে না পারিয়াই উঠিয়া পড়িলাম এবং নিমেষ-মধ্যেই যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম অপরূপ এক বালক মূর্ত্তি। স্বাস্থ্যবান পূর্ণায়ত শরীর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, পরনে কৌপীন। যেন ব্যাসপুত্র পরমহংস শুকদেবকেই শরীরী দেখিতেছি। রূপ দেখিয়া নির্ব্বাক, পলকহীন হইলাম। শিল্পীর উপর রূপের বিষম প্রভাব একথা সবাই জানে। অবশ্য রূপটি বাহ্য হইলেও এক্ষত্রে অন্তরের সম্পদ সে রূপকে ঐশ্বরিক লাবণ্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে,- যাহা জ্যোতিরই নামান্তর। যথার্থ এই রূপই শিল্পীর কাম্য।

তখন একটু শীত ছিল, কিন্তু তাহার গায়ে কোন বস্ত্রই নাই, হয়তো প্রয়োজনও নাই। কিন্তু আমার স্থূল শরীরগত বুদ্ধি তার শীতবোধটা নিজের উপর আরোপ করিয়া গায়ের গরম কাপড়খানি তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দিলাম। কোন কথা নাই, অপলক দৃষ্টি যমুনার দিকেই স্থির। ভাবিলাম বনচারী বৈরাগীদের বালকভক্ত কেহ হইবে। সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে বালক ব্রহ্মচারী অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু এমন চক্ষু খুব কমই দেখা যায়,—পদ্মপলাস চক্ষুর কথা হয়ত অনেকেই শুনিয়াছে, সেই চক্ষু অরুণবর্ণ, তাহাতে জল টল টল করিতেছে যেন এখনি উপচিয়া পড়িবে। এমন একটি কিশোর সাধুমূর্ত্তি জীবনে এই প্রথম দেখিলাম।

মথুরা হইতে আসিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত সেই গোঁড়া মুসলমান ভদ্রলোকটির পুত্র দাদার রহমানের কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার অন্তরে প্রেমধর্ম্মের স্ফুরণের কথা, তাহার প্রতি এত অত্যাচার সহ্য করিয়া অক্রোধ, স্থিরবুদ্ধি বালকের গৃহত্যাগ, তারপর কোথায় অন্তর্দ্ধান এই সব কথাই তোলাপাড়া করিতেছিলাম, যেইমাত্র মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিলাম মন হইতে সে সব কথা একেবারে নিঃশেষে মিলাইয়া গেল, চিত্ত এই মূর্ত্তির উপর আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল ; প্রশ্ন করিব কিনা ভাবিতেও প্রবৃত্তি হইল না। বসিয়া বসিয়া দেখিতেই লাগিলাম।

একটি ব্রজবাসিনী, ঘাঘরা কাঁচুলি ও ওড়না সবগুলিই মনে হয় নীলবর্ণ, হাতে একটি থালায় কিছু খাদ্য কাপড়ে ঢাকা, অন্য হাতে একটি ঝকঝকে মাজা ঘটিতে পানীয়, সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতি কমনীয় তাহার

মুখ, অপূর্ব্ব লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে হাতের জিনিসগুলি ঐ কিশোরের সম্মুখে রাখিয়া দিল, বলিল,—দুলাল আমার, এবারে একটু খেয়ে নাও তো, আমি এখনি তোমায় খাইয়ে ঘরে যাব, তারপর সেখানকার কাজ সেরে আবার সন্ধ্যায় এখানে এসে তোমায় নিয়ে যাব সেথায়।

ও অঞ্চলে যে ভাষায় কথা চলে, মধুর ব্রজবুলিতে কথাগুলি বলিয়া, তাহার মুখের দিকে স্নেহাকুলিত নয়নে চাহিয়া রহিল। আমি যে একজন তাহার অপরিচিত এখানে আছি সেদিকে তাহার লক্ষ্যই নাই, ঠিক যেন তাহার সম্মুখে ঐ কিশোর ব্যতীত আর কেহই নাই। তাহার কথাগুলি কি মিষ্টি, ভাষার সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়া যেন সঙ্গীতের সৃষ্টি করিল। সে ভাষার অধিকার নাই, তাই আমার কথাতেই বলিব।

সাধুর কোন ভাবান্তর নাই, ঠিক যেমন অপলকনেত্রে যমুনাপানে চাহিয়া-ছিল তেমনই বসিয়া রহিল, তাহা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে ঐ ব্রজাঙ্গনা 'মেরে লাল' বলিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিল। তখনি ঐ ধ্যানস্থ কিশোর যেন চমকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু দৃষ্টি অপলক, একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, চম্পা হামকে লে চলো, লে চলো, বলিয়া উঠিতে যায়। জননীর মতই স্নেহে হাতে জড়াইয়া ঐ ব্রজনারী সেইরূপ মধুর ভাষায় তাহাকে বলিতে লাগিল,— অঁবহি নহি মেরে লাল; এখন একটু খেয়ে নাও—তারপর সন্ধ্যায় এসে আমি নিয়ে যাবো, বলিয়া খাবারের থালা হইতে এক গ্রাস লইয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিল। দুই-এক গ্রাস মাত্রই খাওয়া হইল। তাহাকে বহু সাধ্য-সাধনাতেও আর খাওয়াইতে পারা গেল না। শেষে ঘটির দুধ একটু পান করিয়া আবার সেই কিশোর সমাহিতচিত্তে যমুনাতীরে বন যেদিকে সেই দিকেই চাহিয়া রহিল। এখন আমার দিকে চাহিয়া সেই ব্রজবালা মিনতিপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে এই কথাগুলি বলিলেন,—বাপ, তুমি যদি এখানে কিছুক্ষণ থাক তাহলে কি তোমার লোকসান হবে?

আমার উত্তরে তিনি সুখী হইলেন বটে, কিন্তু ঐ বালকের দিকে ফিরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন,—কালই আমার লাডলী বলে দিয়েছিলেন যে, ওর সব সময়ে ধেয়ান চলেছে, ওর হুঁশ নেই, ওকে খাইও, না হলে শরীর থাকবে না। দশ-বারো দিন খোরাক নেই, সামান্ত একটু দুধ,—এই খেয়ে শরীর থাকবে কি? তারপর চকিত হরিণীর মত ফিরিয়া ঐ কিশোরের দিকে চাহিয়া বলিল,—কি করবো আমি এখন, থাকো তাহলে আমার গোপাল, আমি ঘরে যাই, কাজের ঘর

আমায় ডাকচে। সেখান থেকে এসে সন্ধ্যার সময় তোমায় নিয়ে যাবো, কেমন?

কিশোর নির্ব্বাক সমাহিতচিত্ত নিস্পন্দ, আপন আসনে বসিয়া রহিল। ব্রজবাসিনীর অন্তর্দ্ধানটি একটি অদ্ভুত ব্যাপার মনে হইল। যখন আমি ঐ ধ্যান-মগ্ন যোগীমূর্ত্তির পানে দেখিতেছিলাম, ফিরিয়া তাহার সে ঘটিটি হাতে অপর হাতে খাবারের থালা ধরা, পিছন ফিরিল এইটুকুই দেখিলাম। তারপর সে তাহার সম্মুখের পথে অগ্রসর হইতে হইতে যেন মিলাইয়া গেল। অথচ আমার দৃষ্টিপথে কোনও গাছ বা কোন প্রকার বাধা ছিল না, স্পষ্টই মনে আছে।

মেয়েটির আসা-যাওয়া আর এই অল্পক্ষণ থাকা, ইহার মধ্যে যাহা দেখিলাম তাহাতে এইটুকুই মনে হইল, এক মহা আনন্দময় অপার্থিব নাটকের খেলা চলিতেছে এই বৃন্দাবনের যমুনাতীরে উপবিষ্ট কিশোর বৈরাগীকে লইয়া।

জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষ আমরা,- ভক্তিধর্ম্ম, প্রেমধর্ম্ম, এ সকল সাধুমুখে শুনিয়া থাকি, কখনও কখনও অভিমানে মনে হয় যেন উহার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগবানই জানেন বুঝিবার মত সার্থক বুদ্ধি আমাদের আছে কিনা! এখন এসব দেখিয়া বুঝিয়াই বলিতেছি, এখানকার সবই অদ্ভুত। এবারে সেই মথুরায় পদার্পণের দিন হইতেই সব কিছুই অদ্ভুত অপূর্ব্ব এবং অপ্রত্যাশিত ব্যাপারই দেখিতেছি। এমনই আকর্ষণ এই বস্তুটির, আমায় যেন স্তম্ভিত করিয়া দিল।

এদিকে সন্ধ্যা হয়। যমুনাতীরে বেশ হাওয়া চলিতেছে। অথচ যোগীর দিকে দেখিয়া মনে হয় না যে, বাইরের আকাশবাতাস তার ইন্দ্রিয়-গোচরে কোনরূপ কার্য্য করিতেছে। এখন আমার কথা কহিতে প্রবল ইচ্ছা হইল। জিজ্ঞাসা করিলে কি কিছুই হইবে না? প্রথমে হরি হরি হরি হরি শব্দ তাহার কানে পৌছায় এমনভাবে কয়েকবার উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। তারপর ঐ শব্দ কানে পৌছাইতে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেই যেন আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। তখনই আমি বলিলাম,—বাবাজী, তোমার কি কষ্ট হচ্চে? কথা অবশ্য হিন্দীতেই বলিলাম।

ধীরে ধীরে এবার সে বলিল, কষ্ট আমার নেই তো, আমি যে বৃন্দাবনে, যখন মথুরায় আপনজনের কাছে ছিলাম, বাপ মা ভাই সব আমায় না বুঝে কত মেরেচে, তাদের মনের মত হতে পারিনি বলে,—আঃ, এখন সে কথায় আর কাজ নেই! একটু থামিয়া আবার বলিল,—তারা জানে না ধর্ম্ম

(ইমান) কি (চিজ) বস্তু, তাই পাছে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়, কাফের হয়ে যাই সেই ছিল তাদের ভয়। তাই তো লাডলী, তাই তো কাহনাইয়া, এই পর্য্যন্ত বলিতেই,—চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একটু

থামিয়া আবার বলিতে লাগিয়া গেল,—কত দয়া, গোবিন্দজী শ্রীরাধকা—রাধ, রা,—আঃ— ব্যাস্, আর কথা বাহির হইল না। দেখিলাম সংজ্ঞা-শূন্য হইলে যেমন হয় ক্রমে সেই অবস্থা, চক্ষু কিন্তু অপলক। দেখিয়া ভয় হয়, কেমন অস্বাভাবিক চক্ষু। দেখিতেছিলাম—অল্পক্ষণ পরেই, বন্ধু! (দোস্ত) তুমি রাধাকুণ্ড কোথায় চেনো? বলিয়া ব্যাকুলভাবে দেখিল আমার দিকে।

বলিলাম,—চিনি।

শুনিয়াই মহা উৎসাহে—তা হলে আমায় নিয়ে যাবে সেখানে? আবার কি মনে হইল, তৎক্ষণাৎ বলিল,—না না, সেখানে তো তুমি যেতে পারবে না। ব্রজরাণীর দয়া না হলে সেখানে কারো যাবার যো নেই যে, আমায় চম্পাস খীই নিয়ে যাবে,—তার আসতে দেরি আছে কিনা! থামিয়া থামিয়া আমায় ধীরে ধীরে অতীব মৃদুস্বরে কথাগুলি বলিল।

রাধাকুণ্ডের কথা একটু বলবে কি? শুনতে আনন্দ হয়। আমার মুখের ঐ কথাটি শুনিবা মাত্রই তাহার মুখমণ্ডলে গাঢ় আনন্দের পুলক,—সঙ্গে সঙ্গে অনির্ব্বচনীয় এক শিহরণের ভাব খেলিয়া গেল ঐ কিশোরের মধ্যে। মুখে যে জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল তাহার বর্ণনা অসম্ভব!

বলবো কি,—সেখানে প্রেমের আকাশ (আসমান মহবৎসে ভরা হুয়া), প্রেমের বাতাস, সে কি বলা যায় সাধুজী! সেখানে সখী সখা সব চলা-ফেরা করচে, যেন নাচের ছন্দ। কথা, গান, তার প্রত্যেকটি সুর আপনাকে

ভুলিয়ে দেয় বন্ধু। পাগল হয়ে যাবার মত হয় কিছু অল্পক্ষণ থাকলে। আঃ হা!

কিছুক্ষণ স্থির সমাহিত, তারপর আবার,—সেখানে কি আলো (রোশনাই), তাদের মূর্ত্তি দেখতে যদি সন্তজি,—প্রতিমা, স্বর্গের রূপ; কি মুখর তাদের পায়ে গুজরীপঞ্চমের ধ্বনি (আওয়াজ), যেন যন্ত্রের ঝঙ্কার, আঃ, আমার কৃষ্ণজী, আমার—আমার জীবন সফল। এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর কথা নাই; আমি বলিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে মৃদুস্বরে সেইরূপ কণ্ঠে আবার বলিল,— বংশীপীঠে বসে তাঁর বাঁশী শুনেছো, বাবাজী! সে তান জীবন্ত সুর তোমার ছাতির মধ্যে যেন বেজে উঠবে। আমি যাবো - সেখানে যাবো, আর ফিরবো না,—না। দরদরধারায় অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল,—অতঃপর সে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

তাহার সংসর্গে আনন্দ-আতিশয্যে আমারও যেন চৈতন্য লোপ হইবার মতই অবস্থা হইল। কিন্তু আমার মধ্যে দীর্ঘকাল সে অবস্থা রহিল না। তার পর প্রত্যক্ষদর্শী এই সকল উক্তি, তাহার সবটুকুই জীবন্ত সত্যের প্রভাব-বিশিষ্ট, প্রাণহীন পশু এমন কে আছে ঐ সব শুনিবার সম্ভাবনা থাকিতে, ঐস্থানে যাইয়া ঐ সকল দেখিতে শুনিতে প্রত্যক্ষ করিতে যাহার প্রাণের মধ্যে তীব্র লালসা জাগরিত না হয়? মনোমধ্যে উত্তর-উত্তর লোভটা আমার খুব বাড়িতে লাগিল। আমি তাহার কর্ণগোচর হয় এমন ভাবেই আবার হরি হরি করিতে করিতে যেই দেখিলাম তাহার অবস্থা কতকটা বহির্মুখী হইয়াছে অমনি বলিয়া ফেলিলাম, বাবাজী, তোমার মত মহাভাগ্য সবার হয় না। আমায় একটু দয়া করবে, আমায় কিছু দেখাবে?

কথা শুনিয়া তাহার এখন নিকট বাহ্য হইল, বলিল,—আ আমার বন্ধু (দোস্ত), আমার সাধ্য কি! সেখানে ঐ চম্পা সখী তোমায় নিয়ে যেতে পারবে। ও আমার গুরু, ও আমার চক্ষু, - ও না নিয়ে গেলে আমি আপনি কোনমতেই যেতে পারবো না,—

এমন সময়ে ঐ দূরে চম্পার মূর্ত্তি দেখা গেল, দেখা মাত্রই সেই কিশোর এইবার যাবো, দেখা পাবো, শ্যামসুন্দর, রাধিকা রাণী,—বলিতে বলিতেই তার চক্ষু স্থির হইয়া গেল, আর মুখে কথা নাই। হঠাৎ এ কি ভাবান্তর!

চম্পা যখন আসিল, স্তম্ভিত হইলাম তাহার সেই রূপ দেখিয়া,—এ যেন সে ব্রজনারী নয় যিনি আমায় এখানে থাকিতে বলিয়াছিলেন। বেশভূষাও

সেইরূপ নয়, এ এক প্রকার অপূর্ব্ব বেশ,—পূর্ব্বে এখানে কাহাকেও এমন পোশাকে দেখি নাই। সব কিছুই পাতলা, এমন হালকা যেন উড়িতেছে,—অপূর্ব্ব তাহার গতিছন্দে একটি মনোহর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে।

বালককে স্পর্শ করিবা মাত্রই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, নির্ব্বাক চম্পা আগে, তার পশ্চাতে ঐ বৈরাগী কিশোর--ধীরে ধীরে আমার সম্মুখেই অন্তর্দ্ধান করিল। কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাবে জড়ীভূত অনেকক্ষণ ঐখানেই বসিয়া রহিলাম। কোন কথাই মুখে যোগাইল না।

পরদিন বৈকালে সেইখানে আবার আসিলাম, যেখানে যমুনাতীরে তিনটি গাছের মধ্যে সেই ত্রিকোণ ক্ষেত্রে সেই কিশোর বৈরাগীর আসন।—আজ সে আসন শূন্য, সেখানে কেহই নাই।

তার বাবাকে খবর দেওয়ার কোনও সার্থকতা আর আছে কি !

মুস্থরী যাইতেছিলাম।

পথে ঝরিপানীর উত্তরে পরাছেত নামক স্থানের কথা শুনিলাম, সেইখান হইতে প্রায় দুই-তিন মাইল উত্তরে একস্থানে খবর পাইলাম একটি এমন অদ্ভুত সাধু আছেন, যিনি কেবল শয়ন করিয়া থাকেন, কিছুই খান না ইত্যাদি। তীর্থ করিতেও কত লোক যায়, আমি ভাবিলাম সাধুদর্শন করিয়াই আসা যাক। আরও আমার মুস্থরীতে কর্ম্মস্থলে ২৫শে হাজির হইবার কথা, আজ মোটে ২০শে: যথেষ্ট সময় আছে। কাজেই যাওয়াই স্থির করিলাম।

এই ঝরিপানী এবং সেখান হইতে পরাছেত,—পথটি যে খুব বেশী তা নয়, তবে আমার পক্ষে প্রথমে যে প্রকার সঙ্কটময়, পরে বিস্ময়কর হইয়াছিল তাহার কথাটাই বলিব।

যাঁহারা মুস্থরী গিয়াছেন তাঁহারা ভালই জানেন যে, দেরাদুন হইতে মুস্থরী যাইতে চড়াইয়ের নীচে বড় রাস্তার মুখেই একটা ফটক আছে, উপরের গাড়ীগুলি নামিয়া বাহিরে আসিলে তবে ফটক দিয়া মুস্থরীর যাত্রীদের যাইতে দেওয়া হয়। সেইখান হইতে ডানদিকেই পথ। প্রথমে কতকটা উত্তরপশ্চিম কোণের দিকে, তারপর কতকটা উত্তরদিকে মাইল দুই গেলেই ঝরিপানী পাওয়া যায়। আর সেখান হইতে উত্তরপূর্ব্ব কোণের দিকে মাইল দুই যাইলে ঐ পরাছেত; সেখান হইতে আবার কিছু উত্তরে সেই স্থানে যেখানে সাধুর কাছে যাইতেছি। চালচিঁড়া বাঁধিয়াই যাইতে হয়। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, মুস্থরী যাইবার পথ যখন এত ভাল তখন ঝরিপানী অথবা পরাছেতও ঐরকমই

হইবে। কিন্তু হায় অদৃষ্ট, কল্পনা আর বাস্তবের পার্থক্য তখনও ভাল বুঝি নাই।

এই যে পথটি, মুসুরী যাইতে ফটকের ডানদিকে,—কয়েকখানি বাংলো আছে সেখানে, তাহার একখানিতে একজন প্রৌঢ়া, নামটি তাঁহার ভুলিয়া গিয়াছি, ইউরোপীয় মহিলা ভারতীয়ার পোশাকে সর্ব্বদাই সজ্জিত থাকেন। তিনি আমার তৃষ্ণার জল, পথের খাবার, আর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে একটু স্থান দিয়াছিলেন। আমার মালপত্রও তাঁহার আশ্রয়েই ছিল। বেলা এগারটা নাগাদ আমি চলিতে শুরু করিলাম,—যে বন্ধু-ব্যক্তি আমায় পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিল, সে মুসুরীতে এক বিলাতী ঔষধের দোকানে কাজ করে, এমনভাবে আমায় পথের কথা বলিয়াছিল, যাহার মধ্যে কোনরূপ জটিলতা থাকিতে পারে কল্পনা করিতে পারি নাই।

পথটা প্রথমে আঁকাবাঁকা কতকটা, তারপর চড়াই আরম্ভ হইল। মুসুরী পাহাড় যে স্তরে এই স্থানটি ঠিক সেই স্তরে নয়, কিছু নিচু স্তরে একথা ঠিক। কারণ মুসুরী উঠিতে যতটা চড়াই ভাঙিতে হয়, এখানে যাইতে প্রায় অর্দ্ধেকটা হইয়াছিল। ঝরিপানীর কথা কিছু বলিব না, কারণ মুসুরীর মত ঝরিপানীও একটা পাহাড়ী স্বাস্থ্যনিবাস, তবে খুব বিরল বসতি। বেশী লোক সেখানে থাকে না, যত বেশী মুসুরীতে থাকে। অনেকেই ঝরিপানীর কথা জানেন। মাত্র একটি ঝরণা ব্যতীত উহার আর কিছু বিশেষ আকর্ষণ নাই।

যাহা হউক, সেদিনটা ঝরিপানীতে কাটাইয়া পরদিন যাত্রা করিলাম। সেই সময় বৃটিশ অফিসার কয়জন ওইখানে ছিলেন, অবশ্য তাঁহারা শিকারের জন্যই আসিয়াছিলেন।

প্রায় আধ মাইল উৎরাইয়ের পর এক উপত্যকার মধ্য দিয়া কতকটা পথ, তারপর আবার চড়াই আরম্ভ হইয়া গেল। তাহার উপর আবার জঙ্গলও আছে। এ জঙ্গলে অনেক রকমের গাছ, বেশ বড় বড় গাছই দেখিলাম, সে ধরনের গাছ অন্যদিকে পূর্ব্বে হিমালয়ের যে সব অঞ্চলে বেড়াইয়াছি দেখি নাই; এ গাছ আমাদের বাঙ্গলায় তো নাইই, পরন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও কোথাও দেখি নাই।

যাহা হউক, নানাপ্রকার অপূর্ব্ব বৃক্ষলতাপূর্ণ জঙ্গলও একপাশে রাখিয়া চলিয়াছি,—চলিতে চলিতে আমার যেমন হয়, চিন্তার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি, হঠাৎ গতিরুদ্ধ হইল একটা বিরাট আওয়াজে। সেটা যে কোন্ দিক

হইতে আসিল ধরিতে পারি নাই। থামিয়া কিছুক্ষণ ইতস্তত দেখিতে দেখিতে আবার সেই শব্দ! এ শব্দ তো মানুষের নয়, অনুমান করিলাম, আমার দক্ষিণ হইতেই ওটা আসিতেছে, ফিরিলাম; খানিকটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, বেশ সরু পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া নীচের দিকে গিয়াছে। অনেক দূর অবধি পথটা দেখা যাইতেছে, আমি আর বেশীদূর যাইব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময়ে আবার সেই বিকট করুণ স্বর। এবার আর বেশী দূর নয়,—বোধ হয় রশিখানেক তফাতে বোধ হইল। একটা বনজ গাছের গোড়ায় একটা চতুষ্পদ মৃত্যু-যাতনায় কাতর, সেই স্থান হইতেই দেখিতে পাইলাম।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া দেখি একটা নীল গাই, বেশ বড় সাইজ, বুকের একটু নীচেয় গুলি বিঁধিয়াছে, রক্তের ধারা বহিতেছে। আমি কাছে যাইতেই ধড়ফড় করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আর পারিল না,—সুমুখের পা দুইখানি সোজা করিয়া, এমন করুণভাবে চাহিল যে দৃশ্য আর দেখা গেল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কোন শিকারী ইহাকে মারিয়াছে, কখন কোথায় মারিয়াছে জানি না। বোধ হয় অনেক দূরেই নীল গাইটা গুলি খাইয়াছিল, তারপর অনেক দূর ছুটিয়াছে তবে তো পড়িয়াছে; আমি জানিতাম হরিণ মাথায় বা রগে গুলি না খাইলে কখনও কাছেপিঠে পড়ে না। এটা মাত্র একটি গুলি খাইয়াছে, তাও বুকের নীচে,—কাজেই বেশ বুঝা যায় বেশ অনেকটাই ছুটিয়াছে আর শেষে এইখানেই পড়িয়াছে। এখন যিনি হত্যা করিলেন তিনি কোথায়? এতক্ষণ হয়তো রক্তচিহ্ন দেখিতে দেখিতে আসিতেছেন!

আমার তখন এমন অবস্থা, অনেক দূর যাইতে হইবে সেটিও অন্তরে খোঁচাইতেছে, অথচ একে ফেলিয়া যাইতেও পা সরিতেছে না। আমি যে ইহার কি করিব,—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, কোথাও ঝরণা দেখা যায় কিনা,—একটু জল যদি উহার মুখে দিতে পারি, কিন্তু কোথাও জল দেখিলাম না। কি করিব খানিকক্ষণ ভাবিলাম। এ অবস্থায় কিন্তু কিছুই করিবার নেই।

আমি আর কি করিব তোমার বন্ধু, তোমার কাল ফুরাইয়াছে, তুমি যাও, আমারও কাল ফুরাইলে আমিও যাইব। তবে দুঃখ এইটুকু রহিল যে, তোমার যাওয়া এইভাবে আমাকে দেখিতে হইল।

আসিয়া আবার পথে উঠিলাম। উভয় দিকেই চলিয়াছি,—যদিও বনপথ এদিক ওদিক ঘুরিয়া গিয়াছে। প্রায় মাইল খানেক আসিয়া আবার একটা

চড়াই পাইলাম। বেলা পড়িয়া যাইতেছে; তাড়াতাড়ি উঠিতে লাগিলাম। পথের বর্ণনায় জানিয়াছিলাম, এই চড়াই উঠিয়া অপরদিকে কতকটা নামিয়া একটা বড় ঝরণা পাইব, সেই ঝরণার ধারেই একটি গুহা,—সেইটিই তাঁহার আশ্রয়।

যত তাড়াতাড়ি উঠিতে চেষ্টা করিতেছি, বুকে ততই টান ধরিতেছে। কেহ যেন পাহাড়ে কখনও তাড়াতাড়ি চড়াই উঠিতে না যান, দেরি তো হইবেই, শরীরও শীঘ্র শীঘ্র কাহিল হইয়া পড়িবে।

যাহা হউক, এখন একবার বিশ্রাম একটু করিতেই হইবে। তাহার পর ধীরে ধীরে পাহাড়টা পার হইয়া অনেকটা নামিবার পর, খানিকটা অল্প নিচু অল্প উঁচু পথ গিয়াছে দেখা গেল; তাহাকে ঠিক চড়াইও বলা যায় না, উৎরাইও নয়,—এমন একটা পথে কতক দূরে আসিয়া একটা বটগাছ দেখিলাম, তাহার তলায় দুটি-তিনটি বড় বড় নোড়ায় সিন্দূর মাখানো। গাছটা খুব বড় নয়, অত উঁচুতে বড় গাছ হয় না। মাঝারি গাছ কিন্তু খুব পুরানো। তাহার একটা ডাল পথের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে কয়েক খণ্ড রঙীন কাপড় বাঁধা। নীচের দিকে অল্প একটু দূরে একটি ঝরণা।

আকণ্ঠ পান করিয়া প্রথমে তৃষ্ণা মিটাইলাম। তারপর বটতলায় ফিরিয়া আসিয়া গাছের তলায় বসিয়া নানা কথাই ভাবিতেছি। এমন সময়ে ছাগলের ডাক, তারপরেই বাঁকের মুখ ঘুরিয়া একটি পাহাড়ী মরদ আর যুবতী আসিতেছে দেখা গেল। আর তাহার পশ্চাতে কপালে ফোঁটা, রুদ্রাক্ষমালা এবং উপবীত শোভিত বক্ষ, মাথায় কাপড়ের পাগ বাঁধা, কোমরে চাদর জড়ানো, পায়ের একটা আঙুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—বিবর্ণ একটা ক্যাম্বিশের প্রাচীন জুতাপরা ব্রাহ্মণ আসিতেছে। ক্রমে আরও চার-পাঁচজন তাহার পশ্চাতে দেখা গেল।

প্রথমে যে আসিতেছে তাহার মাথায় একটা বাজরাজাতীয় আধারমধ্যে অনেক জিনিসপত্র আছে, আর সেটা বেশ ভারী। পিঠে বোঝা না লইয়া মাথায় কেন লইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। হিমালয়ে এটা অস্বাভাবিক। যুবতীর মাথায় কাপড় আর কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, ছাগলটাকে সে-ই টানিয়া আনিতেছে। ব্রাহ্মণটি কিছু দূরে। দেখিতে দেখিতে তাহারা আসিয়া পড়িল সেই বটবৃক্ষের ছায়ার মধ্যে। আমার দিকে চাহিয়া, অগ্রগামী ব্যক্তি বোঝাটি নামাইতে সাহায্যের প্রয়োজন, যেন তাহারই ইঙ্গিত করিল। অন্ততঃ আমি তাহাই বুঝিলাম এবং উঠিয়া নামাইতে সাহায্য করিলাম। নামানো হইলে

দেখিলাম তাহার মধ্যে উপরেই প্রকাণ্ড এক রামদাও রাখা আছে। বুঝিলাম এইবার এখানে জগদম্বার পূজা ও বলি হইবে। আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়াই উঠিয়া পড়িলাম।

আমায় চলিতে দেখিয়া পুরোহিত—তিনি পুরোহিতই হইবেন, হাত দেখাইয়া বলিলেন,—বৈঠো বৈঠো, আরও কি কি সব বলিলেন বুঝা গেল না। আমি কিন্তু তাহাতে উৎসাহিত না হইয়া একেবারেই চলিতে শুরু করিয়া দিলাম। আগেই এক হত্যা দেখিয়া মনটা ভাল ছিল না, তাহার উপর আবার এই একটা অনুষ্ঠান, যাহা সাধ করিয়া দেখিবার মত মনোবৃত্তি আমার কোন কালেই নাই; এখানে বিশ্রামের প্রয়োজনও আর ছিল না। হায় জগদম্বা, এই হিমালয়ের সমাজও তোমার কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারে নাই!

যখন পর্ব্বতশীর্ষে উঠিলাম তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর—সেখানেও একটু বসিতে হইল। বসিয়া বসিয়া উচ্চে সুমুখের দিকে চাহিয়া দেখি, নীল আকাশের কোলে তুষারশিখরেব অনেকটাই দেখা যাইতেছে। আঃ কি চমৎকার,—মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, যেন স্পষ্ট অতি নিকটেই বোধ হইতেছে। পরিষ্কার আকাশময় নীলের আভা পশ্চাতে লইয়া যেন শুভ্রকায়, জটাজুট-সমন্বিত, হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি। তুষার-স্তূপের এক-একটি অংশ যেন পর পর মিলিয়া একখানি প্রশস্ত চিত্রপটের সৃষ্টি করিয়াছে,—নীল আকাশ তার ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড বা পশ্চাৎক্ষেত্র-পট। দেখিতে দেখিতে ভুলিয়া গেলাম কোথায় যাইতেছি। যখন সেকথা মনে হইল, তখন দৃষ্টি ফিরাইলাম।

এবার নীচের দিকে যতটা দেখা যায় তাহাই দেখিতেছি। অনেকটা দূরেই যেন ঝরণার মত একটা মনে হইতেছে। ঐ যে আমার গন্তব্য দেখা যাইতেছে না? আর ক্লান্তি নাই, অল্পক্ষণেই পৌঁছাইব। আজ রাত্রে ওখানে নিশ্চয়ই আশ্রয় পাইব। তারপর কাল ভোরে উঠিয়াই হাঁটিব, সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই ঝরিপানী পৌঁছাইব। রাত্রি কাটাইয়া আবার কাল সকালে রওয়ানা হইয়া মুসুরী বেলা দু'টার মধ্যে পৌঁছিব। এই সকল কর্ম্মতালিকা ঠিক করিয়া ফেলিলাম। বুকে বল আসিল।

অনেকটা নীচে উপত্যকা দেখা যাইতেছে, স্রোতটা ঠিক স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু স্থানটি অনুমান করিতে ভুল হয় না। উপত্যকা ভূমি হইতে আমার গন্তব্য স্থান প্রায় দুইশত ফুট উচ্চ হইবে। আর আমি যেখানে বসিয়া আছি, সেখান হইতে প্রায় দেড়শত ফুট নীচে হইবে।

চারিদিকে দেওদার,—কি চমৎকার দৃশ্য, উপভোগের আকর্ষণ স্বতঃই আসিয়া পড়ে, উঠিতে ইচ্ছা হয় না।

যাঁহারা পাহাড়ে ভ্রমণ করেন তাঁহাদের শরীরের ক্লান্তি দুর্ব্বলতা, চড়াই উঠিবার কঠিন বেদনা, ঐ এক দৃশ্য সম্ভোগেই প্রচুর পুরস্কৃত হয়, না হইলে হিমালয় ভ্রমণের কোন সার্থকতা থাকে না। ঝরিপানীর দৃশ্যও উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু এখানকার তুলনায়,—বলিয়া কাজ নাই, একটাকে ছোট করিবার ইচ্ছাও নাই; আর হিমালয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচার কোন্‌টা অল্প কোন্‌টা বেশী সুন্দর বলাও অশোভন; কারণ এর সবটাই সুন্দর, যার যখন যেটা ভাল লাগে; তবে একটা কথা বলিতেই হয় যে, যে দৃশ্য যেখানে বিস্তৃত হইয়া ক্রমে বিশালত্বে পরিণত ও অনন্তের দিকে গতি পাইয়াছে মনে হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিতেই হয়; শুধু ভাষায় নয়, অন্তরের অনুভূতিতেও। সেইজন্য এখানে বসিয়া বসিয়া কেবল উপরের দিকেই দেখিতেছিলাম। এই শরৎ শেষের নীল আকাশে একটুকরাও কালো মেঘ নাই, ছোট ছোট সাদা দুই-এক খণ্ড পাতলা পেঁজাতুলার মতই ভাসিয়া ভাসিয়া শীর্ষদেশে আসিয়া লাগিল, কোনটা বা তুষারশরীরে মিলাইয়া গেল। তারপর সেই খণ্ড খণ্ড শ্বেত লঘু মেঘগুলি ভাসিতে ভাসিতে আরও নীচে আসিয়া যেন এক স্থূলরেখায় পরিণত হইল। গাছপালার সবুজের ভিতর দিয়া সেই ক্ষীণ ধবল বর্ণাভাস সত্যই নয়নাভিরাম, সেই নীলধূসর বড়ই মনোরম। যেন স্থানটি ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল, এখন তো আর বসিয়া বসিয়া দৃশ্য উপভোগ করিলে চলিবে না। আমার ধারণা হইল যে, গন্তব্য যখন এখান হইতে দেখা যাইতেছে, তখন অল্প সময়ের মধ্যেই পৌছাইয়া যাইব। এই বিশ্বাসেই দৃশ্য উপভোগে একটু বেশী কালক্ষেপ করিয়াছিলাম। এখন উঠিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে অর্থাৎ নামিতে লাগিলাম, কারণ আর চড়াই ছিল না।

উপরে বসিয়া যেখানে ঝরণা দেখিয়াছিলাম, পথটা যেন সেদিকে যাইতেছে না মনে হইল। যে স্তরে ঝরণা এবং গুহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এমন অনেক দূর নামিয়া মনে হইল যেন সেটা আরও উঁচুতে ছিল। তবে কি অন্য একটা পথ আছে যেখান দিয়া গুহায় পৌছানো যায়!

আবার ফিরিলাম। কতক দূর উঠিয়া এদিক-ওদিক দেখিতে সরু একটা বনপথের মত বোধ হইল, যেন দেখিতে পাইলাম, মনে হইল সেটা ঐ গুহার

দিকেই গিয়াছে। ভগবানকে স্মরণ করিয়া ঐ পাকডাণ্ডি ধরিয়া পা বাড়াইলাম ও এবার দৃঢ় বিশ্বাসে হন্‌হন্ করিয়া চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে তাড়াতাড়ি যতটা চলা যাইতে পারে ততটা চলিতেছি, যেন রুদ্ধশ্বাসেই, চলিতে লাগিলাম। ভরসা হইতেছে যে, এবার ঠিক পাইব। ভাগ্যে পথটা চড়াই ছিল না!

যখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বন ছাড়িয়া কতকটা ফাঁকায় আসিয়া পড়িলাম তখন দেখি,—আগেই ঝরণাটি দেখা যাইতেছে, তাহারই কতকটা উপরেই গুহাটা মনে হইল। এখনও বেলা আছে, তবে খুব কম; ইহাকে বেলা না বলিয়া আলো বলিলেই ঠিক হয়। ঝরণার কাছে আসিয়া একটু বসিলাম, আর যেন পারি না। স্নায়বিক উত্তেজনায় একটু দুর্ব্বল হইয়াছি,—মনে হইল, যদি গুহার পথ না পাই, পাইব না কি? এতটা পথ যখন আসিয়াছি, নিশ্চয়ই পাইব।

বোধ হয় পাঁচ মিনিট কাল বিশ্রাম করিলাম, তাও অনেক মনে হইল। এখন ঝরণার পাশের পথ ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম, ঠিক এইখানেই গুহা। অনুমান করিয়া টপ্‌টপ্ পা ফেলিয়া উঠিতে উঠিতে অন্ধকার গুহামুখ দেখিতে পাইলাম। আঃ—আর ভয় নাই, পাইয়াছি, এবার সার্থক হইল সারাদিনের পরিশ্রম। গুহার কতকটা নীচে সম্মুখের দিকে আসিয়া একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম, সেখান হইতে আরও একটু উঠিলেই একেবারেই গুহায় প্রবেশ করা যায়।

গুহাটি অন্ধকার, একটা আমার মত পুরা মানুষ দাঁড়াইয়া ঢুকিতে পারে বটে, কিন্তু তারপর যেন আরও একটা ছোট গুহা, তার উচ্চতা দুই হাতের বেশী হইবে না। সেইটি গাঢ় অন্ধকার, এমন কি সুমুখে দাঁড়ালেও ভিতরে কিছুই দেখা যায় না। যেখানে আমি বসিয়াছি, সেখান হইতে মোটেই দেখা যায় না।

যতক্ষণ পথ চলিতেছিলাম ততক্ষণ ক্লান্তি ছিল, এখন আর কোন গ্লানি নাই শরীরে, সাধুদর্শনের আশায় যেন সব কিছু আয়াস প্রাপ্তির আনন্দে পরিণত হইয়াছিল। উঠিয়া ঠিক গুহামুখে আসিয়া দেখি অত্যন্ত অপরিষ্কার, মানুষে যেখানে থাকে সেখানে কি করিয়া এতটা আবর্জ্জনা থাকিতে পারে? শুকনা ডালপালায় যেন ভরা, তাহার পর গুহার ভিতর কিছুই দেখা যায় না, চামচিকার মত দুই-একটা কি আনাগোনা করিতেছে--এদিকেও অন্ধকার

ঘনাইয়া আসিতেছে। তবে কি এখানে কেউ নাই নাকি! যা থাকে কপালে, বাবাজী! বলিয়া একটা হাঁক দিলাম। উত্তর নাই। কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া আমার মধ্যে তখন যেন ভয় চাপিয়া বসিল। তবে তো কেউ নাই এখানে, এক ধাপ উঠিয়া পা বাড়াইলাম। শুকনা পাতার উপর পায়ের চাপ পড়িতেই যে ধরনের শব্দটা হইল, নিজেই তাহাতে একটু চমকিত হইলাম— আরও একটু অগ্রসর হইয়া মুখ বাড়াইয়া গুহার ভিতরটা দেখিতে চেষ্টা করিলাম। ঘোরান্ধকার ভিতরে,— ও কি? কাহার দুটি চক্ষু যেন জ্বলিতেছে! আমায় গুহামুখে দেখিয়া খসখস শব্দ করিতে করিতে সেই দুটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল বিন্দু সরিয়া যাইতেছে বোধ হইল। জঙ্গলের মধ্যে এই গুহা, বাঘ থাকা অসম্ভব নয়। হে ভগবান, সাধুদর্শনে আসিয়া শেষে কি এই গতি হইল?

আমি পাশের দিকে সরিয়া আসিতেই সে তড়বড় করিয়া তীরবেগে ভিতরের গুহা হইতে বাহির হইয়া গেল; যেটা গেল, সেটা বাঘ নয়, শৃগাল জাতীয় জীব। ভয়টা যেন কাটিয়া গেল। বুঝিলাম এখানে মানুষ বাস করে না।

কি করা যায় এখন, রাত তো কাটাইতেই হইবে, ভাবিতেছি এই শুকনা পাতার উপর, উপরের জামাটা বিছাইয়া কোন রকমে রাতটা কাটাইয়া কাল ভোরেই পাড়ি দিব। ভাবিয়া আমি গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

সেখান হইতে কতকটা নীচে যে ঝরণার কথা বলিয়াছি, বেশী দূর নয়। আমার বোধ হইল যেন সেই ঝরণার দিকে মানুষের গলার স্বর। যেন দুজনে কথা কহিতেছে। আলো আরো কমিয়া আসিতেছে, তবে একেবারে অন্ধকার হয় নাই। নামিতে লাগিলাম। যত নামি তাহাদের কথাও স্পষ্টতর শুনিতে পাইতেছি। কতকটা আসিয়া দূর হইতে দেখিলাম, একজন আর একজনের পিঠে একটা বোঝা যেন তুলিয়া দিতেছে। উচ্চৈঃস্বরে, এ জী, বলিয়া আমার হাতটি উঁচু করিয়া তাহাদের দাঁড়াইতে সংকেত করিলাম। তাহাতে যে ব্যক্তি বোঝা তুলিয়া দিতেছিল সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল। তাহারা ভয় পাইয়াছে বুঝিয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—হিঁয়া এক সাধু-বাবাকো দর্শন করনে আয়াথা, মিলা নহি। কথাগুলি শুনিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং বোঝাটি আবার নামাইয়া রাখিল। ততক্ষণে আমি তাহাদের আরও নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে দেখিয়া তাহাদের ভয় কাটিয়া

পাহাড়ী শ্রমজীবী এরা, স্ত্রী-পুরুষে জঙ্গলের কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে—আর জল লইয়া যাইবে বলিয়া ঝরণায় আসিয়াছে। তাহাদের কথা বুঝা মুশকিল। আমার সকল কথা শুনিয়া তাহারা যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, এখানে কোন সাধু থাকে না—এ পাহাড়ের ওপারে একজন সাধু থাকেন, আজ রাত্রে তো সেখানে যাওয়া হইতেই পারে না। আজ রাত্রে তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া কাল সকালে সেখানে যাইতে পারিব এবং সে-ই পথ দেখাইয়া দিবে। এখন তাহাদেব আশ্রয় ব্যতীত আর তো স্থান নাই ভাবিয়া তাহাদের সঙ্গেই যাইতে রাজী হইলাম।

অনেকটা উঠানামা করিয়া পাহাড়ের কোলে তিনখানি ঘর একটু দূরে অবস্থিত দেখা গেল; তাহার একখানিতে তাহাবা ঢুকিল। বাহিরে আমি একটা পাথরের উপর বসিলাম। আমার কাছে পয়সাকড়ি ছিল, এখন ভয় হইল রাত্রে আমাকে অসহায় অবস্থায় মারিয়া যদি কাড়িয়া লয়! পাহাড়ীরা এমনটা কিন্তু কখনও করে না। তাহারা সরল, এমন কি মিথ্যা কথা বলে না বলিয়াই জানি। কিন্তু উপায়ই বা কি, যখন আসিয়া পড়িয়াছি!

আমায় তাহারা খাইতে দিল একটা পাতায় করিয়া কিছু ছাতু, দুটি কলা ও একটু গুড়। একখানি চারপাই ভিতর হইতে আনিয়া দাওয়ায় রাখিয়া দিল, দড়ি তার আলগা হইয়া ঝুলিতেছে। আমি ভগবান স্মরণ করিয়া সেই ঝোলায় শুইয়া রাত কাটাইলাম। প্রভাতে হাত-মুখ ধুইয়া, আমার আশ্রয়-দাতার সঙ্গে সাধুর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

পথের কোন বিশেষত্ব নাই, তবে আসল গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, যে স্থানটি লেটাবাবা আশ্রয় করিয়াছেন দেখিলাম, তাহার সংস্থিতি, আশ-পাশের দৃশ্য, সকল দিক এমনই চিত্তাকর্ষক, যাহার তুলনা নাই। আমাদের হিন্দু তীর্থগুলি যাঁহারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন, তখনকার দিনে তাঁহাদের সৌন্দর্যজ্ঞান, প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সম্বন্ধ, স্থানবিশেষের উপযোগিতা জ্ঞান, একটা রহস্যময় অন্তর্দৃষ্টি কতটা পরিমাণে প্রখর ছিল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখনকার দিনে আমরা যতই উন্নত যতই প্রগতিশীল সবুজ মনোভাবাপন্ন ও বৈজ্ঞানিক শক্তির শরণাগত হই না কেন তাঁহাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়া কিংবা শান্তিময় জীবন পূর্ণভাবে উপভোগে প্রবণতা লক্ষ্য করিলে আমরা যে বড় বেশী উন্নত বা অগ্রসর হইয়াছি এ কথাও মনে হয় না।

যাহা হউক এ গুহাটি, চারিদিকেই লতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র পুষ্পবৃক্ষে অলঙ্কৃত। গুহার মধ্যে আরও একটি ছোট গুহা, তাহার মধ্যেই লেটাবাবা শুইয়া আছেন। যখন গেলাম তখন তিনি একটি দীর্ঘ ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর পাশ ফিরিয়া উপাধানের পরিবর্ত্তে হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিলেন। দীর্ঘ জটাজুট, মুখখানি শীর্ণ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ। পদতলে একজন পাহাড়ী শ্রমজীবী বসিয়া। আমি গিয়া প্রথম গুহায় উঠিতেই তিনি চক্ষু চাহিয়া আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বৈঠো, বৈঠো! এবং তাঁহার কাছে গিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম। প্রথমেই বলিলেন, কলকত্তাওয়ালা বাবু? আমি কহিলাম, জী হাঁ মহারাজ। তিনি বলিলেন, কাল বহোত তকলিফ উঠায়া, সন্ধ্যাতক! আমি বলিলাম, হাঁ মহারাজ। তিনি বলিলেন, মুসৌরী আয়া কামমে, বো কাম এক মাহিনেমে খতম হোয়েগা।

এখন বলিয়া রাখি ছয় মাসের এগ্রিমেণ্ট করিয়াই আসিয়াছিলাম, কিন্তু পরে এমনই ঘটিয়াছিল যে, মুসুরীতে একমাস পুরা থাকিতে পারি নাই। লেটাবাবার কথায় তখন বিশ্বাস করি নাই, আমার ধারণা ছিল যে ভবিষ্যৎ বলা বড়ই কঠিন। কিন্তু আমি কলিকাতায় থাকি, মুসুরীতে কাজেই আসিয়াছি, এই দুইটি কথা প্রথমেই আমাকে মোহিত করিয়াছিল।

বাবাজী আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন, আমি কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। নীচু দিকেই চাহিয়া রহিলাম।

তোমারা পিতা গুজর গয়া, আজ চারো বয়স হোগা কি নহি? সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, তবসে তো ধীরে ধীরে দুর্ভাগ আ গয়া আপনা জীবনমে। সত্য। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, ইসিসে ভি জবর পিছে আয় রহা। সর্ব্বনাশ! আরও দুঃখ আসিতেছে! নিজের দুঃখে ভয় হয় না, হতভাগ্য পোষ্যবর্গ, সন্তান, তাদের লইয়াই তো বিপদ। বলিলাম, দোহাই বাবা এর কিছু প্রতিকারের কথা বল। ফিরিয়া শুইয়া তিনি খানিকটা উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; ঠিক যেন ঐ স্থান হইতেই কথাগুলি আনিতেছেন; বলিলেন, ডরতে হো? তনিসে দুঃখমে জীবন শুদ্ধ হো যাতে, খবর নেহি তুম্‌হারা—?

তাই তো এমন মিষ্ট প্রতিকারের কথা শুনি নাই। প্রাণের ভিতরটা

যেন শীতল হইয়া গেল। কতক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—বো আতে যানেকো বাস্তে, চলা যায়েগা, ফির তো আচ্ছা হৈ। কোই কো মদৎ মৎ লেও—কোই কো মৎ বোলা করো,—তব দুঃখ জল্‌দি উতার যায়গা। অব বোল তু, সাধুদর্শন কো আয়া, ফির ক্যা লেয়ায়া?

আমার ঝুলিতে খোবানী আর কিছু খেজুর ও আখরোট ছিল। সেগুলি আমি তাঁহার কাছে রাখিবা মাত্রই তিনি একটি মাত্র খোবানী গ্রহণ করিয়া মুখে পুরিলেন। তারপর বাকীটা লইয়া আমারই থলিতে পুরিতে বলিলেন।

তারপর কিছুক্ষণ কথা হইল। দেখিলাম যে ব্যক্তি পদতলে বসিয়াছিল তাহাকে কি যেন বলিলেন, সে উঠিয়া গেল, এবং বোধ হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে বড় একটা পাতায় করিয়া, উপরেও পাতায় ঢাকিয়া খাদ্য আনিয়া আমার সুমুখেই রাখিয়া দিল। বাবাজী তখন বলিলেন,—অব কুছ্ তো খা লে বাচ্চা।

পাতা তুলিয়া দেখি, গরম আটার হালুয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আর দুইখানি পুরা অর্থাৎ মোটা আটার মালপুয়া। ভগবান জানেন কোথা হইতে আসিল। আমার আকণ্ঠ ভোজনের পরেও অর্দ্ধেকটা রহিয়া গেল। তাহা বাবার সেই সেবকটি লইয়া গেল। যতক্ষণ কাছে ছিলাম, কিছুতেই কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই। বিস্ময় ভয়ভক্তি সব মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িল যখন বাবা আমাকে তাড়াইয়া দূর করিলেন।

আমার ভোজনের পর বাবা বলিলেন,—থোড়া লেট যা! আমার যেন প্রকৃতই আলস্য বোধ হইল, একটু শুইয়া পড়িলাম, বাহিরের গুহায়। অল্পক্ষণেই উঠিয়া পড়িলাম, তখন বাবা বলিলেন, অবতো যানে কা বখৎ—। সে কি কথা! বলিবার যে কত কথা ছিল, আমার কতই না জিজ্ঞাসা ছিল। আর কিন্তু কিছুই হইল না। আমি প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—অব কিধার যাওগে? বলিলাম, ঝরিপানী। তিনি হাত নাড়িয়া বলিলেন,—নহি নহি, তুম মুসৌরী যাওগে—বলিয়া তাঁহার সেবকটিকে বলিলেন—ইনকো ল্যাণ্ডর পৌছাও। আবার প্রণাম করিলাম। কত কথা মনে হইয়াছিল, যেন নৈরাশ্যে আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনি বোধ হয় দেখিতে পাইয়া থাকিবেন, বলিলেন,—তুহার বড়া ভাগ,—মিলতো গেয়া তেরা মারগ—

—— * এখন আমি গৃহী সন্তানাদি হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, গুহা হইতে বাহির হইয়া সে আমায় একটা পথে তুলিয়া দিল, খানিকটা সে আসিলও আমার সঙ্গে, তারপর বলিল,—ডর নেহি, সিধা চলা যাও, পৌঁছ যায়গা।

বোধ হয় মাত্র এক ঘণ্টা, বড় জোর দেড় ঘণ্টা চলিয়াছি, তারপর সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই আমি দেখিলাম যে সত্য সত্যই ল্যাণ্ডরের প্রান্তে আসিয়াছি।

এতটা বিস্ময় জীবনে কখনও ভোগ করি নাই।

৩২

সিদ্ধজী

পাহাড়ের গায়ে কালো কালো দাগ, তা দূর থেকে দেখায় যেন বস্থধারা, খুব উঁচু থেকেই নীচে ঝরেচে। দেখতে কালো কালো বেশ চওড়া ধারাগুলি সোজাসুজি নেমে একেবারেই নীচে পাথরস্তূপের উপড় পড়েচে। আমার সঙ্গে, কাছেই ছিল একটি অল্পবয়স্ক সাধু, বোধ হয় দক্ষিণ দেশের লোক কিন্তু অনেক জায়গায় ঘুরেচে এই উত্তরাখণ্ডে, তার সঙ্গে কেদারের পথে এক চটিতে দেখা। তাকে জিজ্ঞাসা করবার আগেই বললে,—

ই'য়ে, বো দেখো শিলাজিৎ—

একটা গন্ধও আছে,—বলে কপিমূত্রবৎ গন্ধ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে। অপ্রিয় গন্ধটা কিন্তু একটুও সংগ্রহ করবার যো নেই, পাথরের সঙ্গে ধূলায়, কাঁকরে এমন ভাবে মিশে গেছে, ওর মধ্যে কিছ সার পদার্থ যে আছে—তা কে বুঝবে?

খানিকটা আরও যেতে হবে, তবে বিশ্রামের স্থান। চলতে চলতে একটা ছোট ঝরণা, ঝিরঝির করে সামান্য জল পড়চে,—দেখা গেল,—উপর দিকটা গাছপালায় ঢাকা, তার নীচে জল-বিছুটির-জঙ্গল।

হন্ হন্ করেই চলেছি আমরা। কয়েকজন শ্রমজীবী বাঁ হাতে ঘিয়ের ভাঁড় ডান হাতে লাঠি; তার শেষ দিকে একটি বোঝা ঝুলচে, তারা আসছিল তাদের গ্রাম থেকে। অগস্ত্যমুনি কত দূর? জিজ্ঞাসার উত্তরে বললে, দুসরে চড়াই। অর্থাৎ আরও একটা চড়াই পেরিয়ে। সন্ধ্যার আগেই আমরা যাতে সেখানে পৌঁছে যেতে পারি, এমনই সংকল্প করে জোর জোর পা চালালাম।

এবার সঙ্গী সাধুটি পিছনেই পড়েচে। স্থমুখেই দেখি, এক বাঁকের মুখে প্রকাণ্ড একটি ঝরণা—বিশাল ঝরণাটি। সেই ঝরণার নীচে, জলের গতিভঙ্গে যেন কুজ্ঝটিকার স্থষ্টি করেচে। খানিক এগিয়ে আরও কাছ থেকে ভাল করে দেখতে সামনে অনেকটাই চললাম; বড় কাছে নয়, আরও অনেক চলতে হবে—তবে ওকে পাওয়া যাবে স্থবিধামত দৃশ্যের মধ্যে। পথ থেকে নামলাম, আবার এসে ওঠা যাবে,—পথ তো পড়েই আছে, হারাবার ভয় নেই এখানে।

ভরসা ছিল খুব, তাই অত জোর করে চলতে পেরেছিলাম। আরও একটু, আরও একটু করে পথ ছেড়ে অনেকটাই নেমে চলেছি; একবার পিছন ফিরে দেখছি কতটা বিপথে এসেছি, সুমুখে মুক্ত জলপ্রপাতের মোহতেই চলেছিলাম। এইবার পিছন ফিরে দেখি, সঙ্গী সাধু এসে পথে দাঁড়িয়েছে, দূর থেকে ছোট্ট দেখাচ্ছে। আমায় দেখতে পেয়েছে কিনা জানি না,—বোধ হয় সে ঝরণার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে।

আমি এখন বুঝলাম, যে স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করতে আমি এগিয়ে চলেছি, ঠিকমত জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে খানিকক্ষণ ভাল করেই দেখব মনে করে চলেছি, সেখানে যাওয়ার ঠিক অর্থ ঐ প্রপাতের কাছেই যাওয়া—যা প্রায় মাইল খানেকের মতন। মন্ত্রমুগ্ধের মতই চলেছি, মনেই নেই যে আজই সন্ধ্যার আগে অগস্ত্যমুনি শৃঙ্গে উঠতে হবে। এখন আমি যে ক্রমে নেমে চলেছি, আমার ভবিষ্যৎ পথের চড়াই বাড়চে একথাও মনেই নেই। আনন্দে বিহ্বল হয়ে যেন মরীচিকার নেশায় চলেছি সামনে, ঐ যে,—আরও খানিকটা, নামা-উঠা করতে করতে হঠাৎ দেখি সেই ঝরণার মনোহর দৃশ্য সামনে আর নেই।

এবার খানিকটা ঘুরে আবার একটু উঠলেই দেখতে পাবো এই মনে করে সম্মুখে চললাম।

একটা প্রকাণ্ড গহ্বর,—তার বাইরে, বড় পাথর তিন-চারটে রেখে যেমন চুলা তৈরী করে সেই রকম দু'তিনটে চুলা আর পোড়াকয়লা ছাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত,—পোড়াকাঠ দু'চার টুকরো আছে এদিকে ওদিকে। এখানে মানুষ ছিল সম্প্রতি তারই লক্ষণ। গুহার ভিতরটা অন্ধকার, খানিকটা তফাৎ থেকেই দেখছি কালো মিশমিশ করচে, প্রায় তিন হাত উঁচু হবে প্রবেশদ্বার। এ আবার কোথা এলাম! ঝরণারও কোন চিহ্ন নেই!

একটু খানিক উঠলে তবে গুহার মধ্যে ঢোকা যাবে, কিন্তু গুহায় ঢুকতে যাব কেন? মানুষ যে ওর মধ্যে নেই তা সহজেই মনে হচ্ছে। যদি কোন হিংস্র জন্তু থাকে? কাজ কি, উদ্দিষ্ট পথেই যাওয়া যাক। এই ভেবে পা চালিয়ে দিলাম। কিন্তু দোলায়মান উদ্‌ভ্রান্ত মন ছোঁক ছোঁক করচে, ঐ গুহার মধ্যে না জানি কি রত্ন থাকতে পারে—তারই উদ্দেশে যাবার জন্য। কাজেই আবার ফিরে গুহার দিকেই চলতে লাগলো আমার অক্লান্ত পা দুখানি। গুহার ঠিক সুমুখে গিয়ে কিন্তু এমনই কিছু আরও দেখা গেল, যাতে মনে হোলো এখানে এসে বোকামি করিনি। দেখলাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঐ গুহাদ্বার যেন মানুষের হাতের যত্ন আর চেষ্টার ফলে ধূলিশূন্য, আর ঠিক প্রবেশ পথের উপরেই একখানি খড়্গ ঝোলানো যা প্রথমে দেখা যায়নি। এ বস্তুটির উপর লক্ষ্য পড়তেই এখানে মানুষ থাকে যেমন বুঝা গেল, তেমনি একটু ভয়ও হোলো-- এ পবিত্র স্থানে খড়্গ কেন?

ঐ খড়্গ দেখে যেন স্বতই মনে হোলো, গুহায় প্রবেশ নিষেধ। একটা যেন প্রতিবাদ, গুহার যিনি অধিকারী ঐটি তাঁরই নির্দেশ—বাইরের কোন আগন্তুকের প্রতি, কাজেই বাইরে দাঁড়িয়েই চিন্তিত মনে ভিতরের দিকে চেয়ে রইলাম। এমন অবস্থায় ফিরে যাবার আগেই একবার এখানে কে আছে বা থাকে না জেনে তো যাওয়া যায় না,—তাই একবার পরিমিত চীৎকার করে দেখতে ক্ষতি কি?—কে আছে ভিতরে?

পথ থেকে ধীরে ধীরে উঠছে একটি মূর্তি—মাথায় দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, উলঙ্গ নয়, কটিদেশে একখণ্ড কৌপীন বস্ত্র জড়িত, জানুর উর্দ্ধেই তা শেষ হয়েছে। গৌরবর্ণ সুকুমার মুখাকৃতি, গোঁফদাড়ির রেখা অল্পই; দক্ষিণ হাতে ভারী জলের পাত্র। কমণ্ডলু নয়, লোটা। আমায় দেখেই প্রসন্ন মনে, যেন কৃতার্থ

হয়েছে এমনই ভাবে, আইয়ে, ঠারিয়ে—বলে সেই যুবা সামনের চত্বরের মত স্থানটিতে জলভার নামিয়ে রাখলে। আমার আনন্দ হোল একজন নূতন মানুষ পেয়ে, পরক্ষণেই একটু দুঃখও হোল এই ভেবে যে, হয়ত সঙ্গীছাড়া হলাম এখানে এসে। যাই হোক, সাধুটি আমায় জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলে আমি কোথা থেকে আসছি এবং যাবো কোথা।

গিরিগুহার অধিবাসী এই যে সাধুমূর্ত্তি, তার বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যেই হবে, তার দুই ভ্রূতে কেশের ভাগ এতই কম যে নেই বললেই যেন ঠিক হয়, তার উপর বড় বড় চক্ষু দুটি ভয়ঙ্কর দেখায়, পাতায় লোম নেই। হিন্দী কথা তার ঠিক ঐদেশীয় লোকের মত। আমায় বসতে বলে মাথাটি নীচু করে গুহার মধ্যে প্রবেশ করলে এবং অল্পক্ষণ পরেই বেরিয়ে এলো বড় একটি লোটা হাতে করে।

আমি একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই তাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি কি সুমুখের ঐ বড় ঝরণা থেকে জল আনলেন?

সে হেসে বললে,—নহি নহি। তা তো বহোত দূর, ইহাঁসে থোড়া নীচে ঔর ধারা হৈ, জল উহাঁসে লায়া।

আমার প্রথম অনুমানমূলক মনোভাব, এক কথায় ঐ সাধুর সম্বন্ধে ধারণা তেমন প্রীতিকর হয় নি। ঐ যে ভ্রূহীন চক্ষু তার, বোধ হয় সেইটাই আসলে বিরুদ্ধ ভাবে ক্রিয়া করেছিল মনের মধ্যে। সেই ভাবটি বদ্ধমূল হোল যখন দেখলাম একটি নারী,– কোলে তার একটি স্বাস্থ্যবান পাঁচ-ছয় মাসের শিশু— হঠাৎ সেই গুহার দক্ষিণ দিক থেকে এসে উপস্থিত হোল আর আমাকে দেখেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, যেন র‍্যাফেলের সিস্‌টাইন ম্যাডোনা; সেই নারী যুবতী, অপরূপ সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু উজ্জ্বল তাম্রাভ শ্যামামূর্ত্তি, তাকে গৌরবর্ণও বলা যায়,—মুখশ্রী অতীব সুন্দর; অবিন্যস্ত ঘন চুলে দীর্ঘ বেণী, ঘাঘরা পরা বুকে ওড়না, মাথায় কাপড় নেই,– যেন অভ্যস্ত গৃহস্থালীর মধ্যে কর্ম্মরত একটি নবীনা গৃহিণী। শিশুটি মায়ের কোলে চঞ্চলভাবে হাত-পা নাড়ছিল। খুব হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ শিশুটির নীলবর্ণ দুটি চক্ষু এবং পিঙ্গলবর্ণ চুলগুলি,—কিন্তু ঐরকমই ভ্রূহীন মুখখানি, সাধুটির অনুরূপ।

অল্পক্ষণের মধ্যে এই যে ব্যাপার ঘটলো তাতে আমার মধ্যে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবটাই প্রকাশ পেল। এক্ষেত্রে কি আমার করা উচিত এইটিই মনের মধ্যে তোলপাড় চলেছে, কিন্তু চট্ করে কোন মীমাংসায় আসতে

পারিনি। মেয়েটি কিন্তু তার সংকোচ অতি শীঘ্রই চমৎকার সামলে নিলে, আমাকেও যেন নিঃসংকোচ করে দিলে। সে এগিয়ে আমার সামনে এসে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললে,—আপ্‌কো বাঙ্গালী শরীর?

জী হাঁ, বলে আমি তার কথার উত্তর দিলাম। মনে মনে তার অসাধারণ আত্মসংযমের প্রশংসা না করে পারিনি। একবার কোলের ছেলে, আর একবার মায়ের মুখে দিকে দেখছিলাম,—যেন মনের অজ্ঞাতসারেই দেখলাম যে মায়ের ডানদিকের ভ্রূর উপরে একটা কাঁচা দাগ—সেটা সম্প্রতিই আরোগ্য হয়েচে বোধ হোল। আমার ঐ দিকে দেখা মেয়েটি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে,—বোধ হয় আমার লক্ষ্যটি সেই দিক থেকে ফেরাবার উদ্দেশেই সে তখন সাধুটির উদ্দেশ্যে বললে,—সিদ্ধজী! আপকা দেশকী মূর্ত্তি হৈ, কি নহি?

ক্যা মালুম, মৈনে অভিতক কুছ তো পুছা নহী. অবহি তুরন্ত মিলা, না!

আমায় তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি তখন বললে,—বৈঠিয়ে সন্তজী, তারপর সিদ্ধজীকে,—এক আসন তো দেও; বলে সেই চত্বরের দিকে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে, প্রফুল্ল মুখে ছেলেমানুষের মত সহজ ভাবেই আমার দিকে চেয়ে রইল। দেখছিল বোধ হয় বাঙ্গালী সাধু আর একজন কেমন।

সিদ্ধজী দুইখানা মৃগচর্ম্ম বার করেছিল, একখানা আমার দিকে দিয়ে অপরখানি একটু দূরে ছুড়ে দিল। দেখতে দেখতে তাঁর মুখখানা বড় গম্ভীর, যাকে আমরা অপ্রসন্ন গোমড়া মুখ বলি সেই রকম হয়ে গেল। আমি বসলাম বটে, আর কতকটা সঙ্কোচ কাটাতে পারলেও অন্তরে ঐ গোমড়া মুখখানার জন্য একটু বিব্রত বোধ করলাম। তারপর যখন আমায় ভাগাবার উদ্দেশ্যে সিদ্ধজী হিন্দীতে নয় এবারে বাঙ্গলায় বললে,—এখান থেকে একটু সকাল সকাল না উঠলে সন্ধ্যার আগে অগস্ত্যমুনি পৌঁছাতে পারবেন না, তখন অন্তরে একটা কি রকম আঘাত অনুভব করলাম। আমার যাওয়াই দরকার, এখানে রাত্রিবাস অসম্ভব, একথা আমার মধ্যে উঠলেও যেন এতক্ষণ চাপা ছিল।

আর হিন্দী না বলে বাঙ্গলায় আপন ভাষায় বলছি। মেয়েটি কিন্তু একেবারে নিঃসঙ্কোচেই সিদ্ধজীর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি এঁকে চলে যাবার কথা বলচ?

হাঁ, একটু সময় থাকতে না বেরুলে,—

কেন, সময় থাকতে বেরুতে যাবেন উনি? আজ আমাদের এখানে থাকবেন না?

না, উনি থাকবেন না,—আমি জানি।

থাকতে অনুরোধ করেছিলে?

না, যখন জানি থাকবেন না,—বৃথা কেন অনুরোধ করব?

না, তুমি ওঁকে থাকতেই বলো, আমাদের বলা উচিত—আমরা কতদিন একলা আছি, আজ যদি ভগবানের ইচ্ছায় একজন এসেছেন, মেয়েটি যেন বেশ অনুযোগের সুরেই বললে,—তাকে ভাগাবার চেষ্টা কেন?

সিদ্ধজী হয়ত আশা করেননি যে মেয়েটি এতটা আগ্রহ প্রকাশ করবে আমাকে রাখতে। কাজেই বাধ্য হয়েই যেন আমার কাছে এসে পরিষ্কার বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,—আমাদের এখানে থাকবেন কি?

আমি তখন সকল কথা বললাম। বেণীনাগের পথে যেতে যেতে ঐ সুদৃশ্য প্রপাতটি দেখেই এদিকে এসে পড়েছি,—ধারণা ছিল যে ওটা খুব কাছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এতটা এসে দেখি আরও অনেকটা দূরে তারপর আপনাদের গুহাটি চোখে পড়লো, -তাই এসেছি। এখন বিদায় দিন চলে যাই। এখন না উঠলে সন্ধ্যার মধ্যে অগস্ত্যমুনি পৌঁছাতে পারবো কি?

কোন বিশেষ কাজ সেখানে যদি না থাকে তবে আজ আমাদের আশ্রমে অতিথি হলে ক্ষতি কি?

দেখুন ইচ্ছা আমার খুবই ছিল, এখনও আমার এখানে কিছুই দেখা হয়নি; তা ছাড়া ঐ সুন্দর জলপ্রপাত না দেখে এখনও আমি যাবো না। যদি এখানে সুবিধা না হয় তাহলে—আমার যেখানে সেখানে পড়ে থাকার অভ্যাস আছে, আজ রাতটা কোথাও কাটিয়ে সব দেখেশুনে চলে যাবো।

তখন সেই মেয়েটি, বোধ হয় সব কিছু শুনে, একটা ধারণা করে আমায় বললে,—আজ ইহাঁ ঠার যানা সাধুজী। কুছ তকলিফ না সমঝো, হরজা ন হো তো রহ যাইয়ে; হামলোক একেলা। তখন আমি তাকে আবার বুঝিয়ে দিলাম, এখানে থাকতে আমার আপত্তি নেই, ঐ ঝরণা দেখতে এসেছি, এখানে থাকলে আমার কোন অসুবিধা নেই—যদি অসুবিধা হয় তো সে আপনাদের।

যাই হোক আমার সম্মতি পেয়ে মেয়েটি সুখী হোল, আমিও ঘাড় থেকে কম্বলখানা নামিয়ে রাখলাম, লোটা আর লাঠিটা আগেই রেখেছিলাম, এখন বললাম,—আমি একটু ঘুরে দেখে আসি, ঐ ঝরণাটা এখান থেকে কত দূর!

মেয়েটি বললে,—ঐ কালী ঝোরা? না, ওখানে আজ যাওয়া হবে না।

তবে বেশী দেরি করবেন না,—সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসবার আগেই আসা লো, এখানে ভয়ের কারণ আছে।

পরে জেনেছিলাম,—বাঘ আর সাপও বটে এখানকার ভয়। আরও একটা ভয় আছে সেটা দিনেও যেমন রাতেও তেমন—সেটা হলো বিচ্ছু। সে বিচ্ছুর চেহারা আমাদের দেশের কারো ধারণা নেই, মিশমিশে কালো চকচক করচে, তিন ইঞ্চি লম্বা, পিছনের হুলটি উপরদিকে যখন গুটিয়ে রাখে তখন ছোট দেখায়। কেউটে সাপের মতোই তার বিষ প্রাণঘাতী, সে তীব্র বিষের প্রতিকার নেই। শুনেছি কেউ কেউ যারা প্রতিষেধক জড়িবুটি জানেন তাঁদের পাওয়াও ভাগ্যের কথা। মেয়েটির মুখেই এই সব কথা শুনলাম, সিদ্ধজী কতক্ষণ কাজে রইলেন। মেয়েটি এই সব বলে সাবধান করে আমায় ছেড়ে দিলে।

মা শিশু ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে বসে এমনভাবে একজন অপরিচিত লোকেব সঙ্গে সহজ আন্তরিকতাপূর্ণ সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা কইলো, আগে কোথাও প্রত্যক্ষ করিনি। বাঙ্গালীর উপর তার সহজ শ্রদ্ধা, যেন তার নিজেরই জাতি।

ওখান থেকে বেরিয়ে যেদিকে ঝরণা ঠিক সেই দিক অনুমান করেই চললাম। খানিক উঠানামার পর আবার সেই মুক্ত জলপ্রপাতটি সামনেই দেখা গেল। আঃ, কি আনন্দই ছিল তার মধ্যে! এ কটা শিলার উপরে বসেছিলাম। ইচ্ছা হয় এখানে একটি কুঁড়ে বেঁধে সারাজীবন কাটিয়ে দিই। সিদ্ধজী কেন যে এমন দৃশ্যটিকে ছেড়ে এব আড়ালে ঘর করলেন! বোধ হয় পাহাড়ের গায়ে প্রকৃতির তৈরী গুহাটি পেয়ে,—না হলে আর কি কারণ হতে পারে?

খানিকটা নীচেই ঐ স্রোতটা চলেছে, শব্দ পাওয়া যাচ্চে,—সেই শব্দের মধ্যে মোহিনী শক্তি আছে, শুনতে শুনতে তন্ময়তা আসে। তার গতিবেগ এমনই প্রখর—খানিক চেয়ে থাকলে মনে হয় আমায় যেন তার সঙ্গে নিয়ে চলেছে।

এখন ছবি আঁকবার সরঞ্জাম কিছুই সঙ্গে নেই, দুঃখও নেই তাতে। কারণ সত্য বলতে এসব দৃশ্য আঁকার কাজে মনকে ছলনা করতে হয়, তারপর শেষ অবধি প্রকৃতির এই মহান্ সৃষ্টি, সম্পূর্ণ রূপ রেখা ও বর্ণবিলাসের কথা দূরে থাক, শত ভাগের এক ভাগও হয় কিনা সন্দেহ; সরঞ্জাম নিয়ে যদি ঐ দৃশ্যের প্রতিচ্ছবির কাজে আমার সকল উদ্যম, উৎসাহ নিয়োজিত করতাম, তা হলে আমি নিশ্চিত বলতে পারি এই মহান দৃশ্যটি এমন গভীর ভাবে উপভোগ করতে পারতাম না।

দূরে কাছে এই সব অনেক কিছু নয়ন-বিমোহন দৃশ্য দেখতে দেখতে উঠবার

কথা আর মনেই থাকে না। কিন্তু সুমুখেই আকাশে সন্ধ্যা নেমে আসে সন্ধ্যা হোলো, এবার উঠতে হবে। আজ এক নূতন ঘরে অতিথি আমি ঐ মেয়েটির কথা মনে হোলো তখন। কি জানি কেন, সিদ্ধজীর সঙ্গে তা সম্বন্ধের কথাটা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যায়। আজ নিশ্চয়ই এদের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে—অন্ততঃ আশা আছে, জানতে পারবো।

আমার ওখানে থাকতে ইচ্ছা ছিল না, একটা কৌতূহলই কাজ করেচে সাধু হয়ে বেরিয়ে এসে আবার সংসার করা গৈরিক পরে, এ যে ব্যভিচার বিশদৃশ ব্যাপার এসব জেনেও আমার এখানে থাকা ঘটলো কেন? ঐ নারী প্রভাব যে এর সঙ্গে আছে তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই; তবে সবটাই তা ন এটাও সত্য।

এক অবধুতের সঙ্গে আমার কিছুদিন সঙ্গ হয়েছিল,—তিনি অসাধার মানুষ। তিনি বলতেন,

ইমলি খায়কে লাগায় ধ্যান, গৃহী হোয়কে বাতায় জ্ঞেয়ান
যোগী হোয়কে ঠোকে ভগ্, ইয়ে সব আদমী কলিকা ঠগ

এ শুধু এখনকার কথা নয়, প্রাচীন কাল থেকেই এ ভাবের ব্যাপার সা সম্প্রদায়ের মধ্যে চলেচে,—কত কত উপজাতির সৃষ্টি হয়েচে এই থেকে তা সংখ্যা নেই। এই সব থেকেই এই গৃহস্থ সমাজে অনেক সাধু, ব্রহ্মচারী গিরি, পুরী, ইত্যাদি পদবীর উদ্ভব হয়েচে। অনেক জনার পথভ্রষ্ট অবস্থ জারজ সন্তানকে শিষ্য বলে প্রচার করা,—এ সব দেখা আছে প্রথম থেকেই পরে যখন সমাজের সঙ্গে মিশে যায় তখন আর মোটেই বিসদৃশ লাগে না কিন্তু প্রথম অবস্থায়? সমাজের বাইরে থেকেই যেন একটা বিধি বহির্ভূত কাজ করিয়ে প্রকৃতি এদের সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। অদ্ভু আমাদের এই সমাজের ইতিহাস আর তার তত্ত্ব-কথা!

সন্ধ্যার একটু আগেই উঠতে হলো, আমার আজকার আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এসে মেয়েটিকেই দেখলাম চত্বরে,—কোলে ছেলেটি ঘুমিয়েছে পাশেই একখানি আসনের উপর একটু বিছানার মত, মাথার একখানি কাপা পাট-করা শিশুর বালিশের কাজ করছে। আমায় দেখেই,—আইয়ে আইয়ে বলে সম্ভাষণ করে সে ছেলেটিকে শয্যায় শুইয়ে দিলে—দিয়েই উঠলো, ঐ ওঠবার সময়েই দেখলাম, তার চোখে যেন জল,—কেঁদেছে মনে হলো।

বাবাজীর আবির্ভাব, যে দিকে মেয়েটি গেল সেই দিক থেকেই। আমি উঠে গিয়ে তাঁর কাছে বললাম,—দেখুন, আমি বেশ বুঝতে পারচি আজ আমিই আপনার শান্তিভঙ্গ করেছি, যদি এখনও উপায় থাকে আমি চলে যেতে রাজী আছি।

বাবাজী বললেন, মুখে তাঁর শ্লেষপূর্ণ হাসি,—যাওয়া আপনার উচিত ছিল আগেই কিন্তু রূপবতী যুবতীর মোহেই তা যখন পারেন নি, তখন এখন আর ওসব কথায় কাজ কি ?

আঃ! কানে মোচড় দিয়ে ঠিক যেন সজোরে ঠাস করে গালে আমায় এমন চড় বসিয়ে দিলে আমার মাথা ঘুরে গেল। একটু সামলে বললাম,—দেখুন, আপনি বাঙ্গালী বলেই আজ বলচি, অন্য কেউ হলে বলতাম না। আমাদেরই একজন বঙ্গসন্তানকে এই অবস্থায় এখানে দেখবো এ আসা করি নি, যতটা গভীর বিস্ময় ততটাই মর্ম্মান্তিক বেদনা যে আমি ভোগ করচি তা বোধ হয় আপনি অনুমানও করতে পাবেন নি। গৈরিক পরে নারী-সঙ্গ —আবার নামে সিদ্ধজী,—

বাধা দিয়ে তিনি বললেন,—না না, সিদ্ধজী আমার নাম নয়। সাধু-সন্ন্যাসী সমাজে কোন নতুন লোক এলে, তাব নামটি জানা না থাকলে তাকে সিদ্ধজী, মহাত্মাজী, বাবাজী, সন্তজী ইত্যাদি নামেই ডাকা হয়। ঐ মেয়েটি কনকা, সেই হিসাবেই আমায় উদ্দেশ করে কিছু বলতে সিদ্ধজী বলেন। আমার নাম দেবানন্দ। আজ যখন বিধাতার নির্ব্বন্ধে আপনার এখানে থাকবার যোগাযোগ হয়েচে, আর আপনি আমার স্বদেশী স্বজাতি তখন আমার জীবনকাহিনী সংক্ষেপেই আপনাকে শুনাতে চাই,—শুনে বিচার করে আপনি দেখবেন আমার অবস্থায় পড়লে যে কেউ—

অসহ্য হলো এবার, বললাম,—আচ্ছা, থাক এখন একথা।

সুমুখেই দেখি কনকা একটি লণ্ঠন নিয়ে এসে রাখলে, তারপর বললে,—এখানে আমরা ঠিক এই সময়েই খেয়ে নি। আপনারা বসুন, আমি খাবার নিয়ে আসি।

আমার ভিতরে যথেষ্ট ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছিল কিন্তু খেতে ইচ্ছাই ছিল না, বিশেষতঃ পাশাপাশি,—দেবানন্দের সঙ্গে। কিন্তু আহার আমায় করতেই হলো। নীরবেই আমরা উপভোগ করলাম, গরম রুটি,—সুপক্ক ও উত্তমরূপে ঘৃতসিক্ত শাক, আর আমলী মশলা দেওয়া তেলে ফেলা। শেষে দুধ।

যখন ভোজনপালা শেষ হলো তখন কনকা নিঃসঙ্কোচে এসে বসলো

আমাদের সঙ্গে,—আর ততোধিক নিঃসঙ্কোচে আমার পরিচয়, জীবন-কথা জানতে চাইলে। সে স্পষ্টভাবেই জানতে চায়, কেন আমি বেরিয়েছি—আর কি পেয়েছি। অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিক্ষিতা মেয়ে,—অসাধারণ তার সব কিছুই জানবার আগ্রহ। যখন আমার কথা সব তার শোনা হলো—তখন অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা। বলে বসলাম আমি,—এইবার আপনাদের কথা শুনতে হবে,—বলুন।

আমার কথা, কনকা বললে,—খুব বেশী নয়, যেটুকু বিশেষ তার মধ্যে সেইটুকুই বলছি, শুনলেই বুঝতে পারবেন। আমার বাবা ছিলেন কাশীতে, অনেকদিন ভুগে, বড় কষ্ট পেয়েই মারা গিয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষিত উকিল,—একমাত্র মেয়ে আমি। আমার যখন নয় বৎসর বয়স আমার মা মারা যান; তারপর বাবা আমার সন্ন্যাসী-বৈরাগীর মতই হয়ে পড়েন;—একেবারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যান নি কোথাও,—তবে কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে শাস্ত্রচর্চ্চা জপধ্যান এই সব করতেন। সাধু-সন্ত দেখলে যত্নে করে ঘরে আনতেন; সেবা করতেন। ভজন-সাধনের উপদেশও নিতেন। বারো বৎসরে তিনি আমার বিবাহ দেন তাঁরই বন্ধু কোন উকিলের ছেলের সঙ্গে। তারপর আমার স্বামী বিসূচিকায় মারা যান বিবাহের এক বৎসর তিন মাস পরে। সেই থেকেই বাবা আমায় তাঁর সকল কাজেরই সাথী করে রাখলেন। প্রথম প্রথম তাঁর ইচ্ছা ছিল আবার আমার বিবাহ দেবেন। বাবার একদল বন্ধু ছিলেন স্বপক্ষে, আর সনাতনপন্থী একটা বড় দল ছিল এর বিপক্ষে, কিন্তু বাবার জেদ ছিল তিনি ঠিক আমার বিবাহ দেবেন। একজন ধনী প্রতিবেশী তাঁর ছেলেকে বিলাত পাঠিয়েছিলেন, ছেলে পরে ব্যারিস্টার হয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বারে প্র্যাকটিস করছেন। বিবাহ হতো তাঁর সঙ্গেই, দুটি কারণে সেটা ভেঙে গেল পাকা কথা হবার পর। প্রথম, সেই ব্যারিস্টার সাহেব একটা মোটা টাকা চেয়ে বসলেন বাবার কাছে থেকে, আর সেই টাকা,—তাঁর বিধবা মেয়েকে বিবাহ করছেন বলেই চাই। আর দ্বিতীয় কারণ, খবর পাওয়া গেল তিনি অতি দুশ্চরিত্র লোক। ঐখানেই এক-জন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির মেয়েকে নিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়ে দিনকতক গা-ঢাকা দিলেন,—তারপর নাকি সে ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। তাঁর আরও গুণের কথা জানা গেল, তিনি জুয়ার ভক্ত। ইতিপূর্ব্বে জুয়াতে

শুনে বাবা মত পরিবর্তন করলেন। তিনি সমাজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষে আমায় নিয়ে হিমালয়ে গেলেন। মুসৌরীতে আমরা প্রায় চার বৎসর ছিলাম। সেইখানেই আমার অধ্যয়ন আরম্ভ হলো। আমিও সঙ্কল্প করলাম তত্ত্ব-জ্ঞান আলোচনায় জীবন কাটাবো।

সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত এই তিনটি দর্শনশাস্ত্র আমি পাঁচ বৎসর ধরে একান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়েছিলাম। পড়ার দিক থেকে খাঁটি ছিলাম। শব্দ-অর্থবোধ আমাব মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু যে সাধনে সিদ্ধির পথে যাওয়া যায় সেদিকে যাবার যত্ন তখন ছিল না। বাবার ধারণা ছিল, একটু বেশী বয়স, অন্ততঃ পঁচিশ থেকে ত্রিশ বৎসর না হলে, মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ পুষ্ট না হলে সাধন বা সিদ্ধির কখনই সম্ভব হয় না। অসময়ে তাড়াতাড়ি কাঁচা বয়সে সাধন কখনই শুভ হয় না। তাই তখনকার অধ্যয়নই ছিল আমার তপস্যা। তিন বৎসর পর আমরা আবার ফিরে এলাম।

বাবা আমাদের শহরের বাড়ী ছেড়ে গিয়ে অসির তীরে, শহর থেকে অনেকটা দূরে একটি ছোট বাগানের মধ্যেই আমায় নিয়ে থাকতেন। যখন আমার বয়স প্রায় আঠারো বৎসর,—তখন এক অদ্ভুত যোগাযোগে এই সিদ্ধজী এসে উঠলেন অতিথি হয়ে আমাদের আশ্রমে। বাবার কেমন একটা স্নেহ, মমতা হয়েছিল এঁর উপর এঁর জীবনকথা শুনে, তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন না। অবশ্য সেই সময়ে বাবা পীড়িত হয়েও পড়লেন, বাতে পঙ্গু হয়ে ছিলেন। এঁর সেবা দ্বারা তখন তাঁর অনেক কাজ হয়েছিল, তাই এঁকে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করেছিলেন। তা ছাড়া আমার পাঠ-অধ্যাপনার ভার এঁর উপরই দিয়েছিলেন। তাঁর সামনেই পাঠ-ব্যাখ্যা চলতো। এঁর ব্যাখ্যান বাবার খুব ভালো লাগতো। উপ.দশ করবার ভঙ্গী ছিল চমৎকার,—বাবাও ভারি পছন্দ করতেন। বাবার শরীর উত্তর উত্তর খারাপ হয়েই চলেছিল। আমরা দুজনেই তাঁর সেবা করতাম,—তিনি বলতেন, এ অবস্থায় ঘর ছাড়া ভাল হয় নি তোমার। তিনি যেন বুঝলেন, আমরা দুজনেই ক্রমে ক্রমে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়চি। তিনি বলতেন,—সংসারভোগ প্রবৃত্তিটি সূক্ষ্ম,—স্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়মেই এটা হয়। ওটা সূক্ষ্মভাবে যুবা সাধুদের মনের মধ্যেও থাকে, তার ফলে তাদের নেমে আসতে হয়। সংসারভোগ করে নিয়ে তার সাধন-মার্গে নামা উচিত্। তোমার মনে কোন পাপ রেখো না,—এ আকর্ষণ তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আমি চাই তোমরা বিবাহিত হয়ে গার্হস্থ্যজীবন যাপন কর,—আর সেই

সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে মানব-জন্ম সফল করো।

ক্রমে তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন, একদিন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়লো; আমাদের দুজনকে দুদিকে রেখে দুজনের দুই হাত এক করে দিয়ে বললেন, আমি যাচ্ছি, আমার আশীর্ব্বাদ রইল তোমাদের উপর; তোমরা সুখী হয়ে তোমাদের গার্হস্থ্য আর অধ্যাত্মজীবন সফল করো। সমাজের মধ্যে সব রকমের জীবনই দেখতে পাওয়া যায়। কোনটাই ফেলবার নয়, প্রকৃতি জননী সকলেরই, আপনার কোলে স্থান দিয়েছেন; যদি তোমরা কুসংস্কার-মুক্ত হয়ে জীবনকে উন্নত করতে পার,—তাহলেই আমার সে উদ্দেশ্য সার্থক হবে, তোমাদের এক করে দেওয়াতে। তোমাদের উপরে ভার রইল তোমরা বিবাহিত হয়ে জীবন আরম্ভ করবে অথবা বিবাহ-সংস্কার বাদ দিয়েই করবে। তবে আমার মনে হয় আমাদের প্রবৃত্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সংস্কার ত্যাগ করা উচিত নয়। আমার আর কিছুই বলবার নেই। বাবা আমার সেই দিনই মারা যান। তিনি এক সময়ে উপার্জ্জন করেছিলেন অনেক। মা মারা যাবার পর কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে ঘরে বসেও অনেকদিন কিছু কিছু উপার্জ্জন করতেন, যে কাজ সামনে হাতে এসে পড়তো।

হিমালয় আমাদের দুজনেরই ভাল লেগেছিল, আমরা তাই ওখানকার সব কিছু ব্যবস্থা করে হিমালয়েই থাকতাম। নানা স্থান বেড়িয়েছি। কেদারবদরী, নন্দকোট, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী প্রায় এদিককার সকল তীর্থই ভ্রমণ করে গত বৎসর থেকে এইখানেই আমরা আছি। আমাদের সন্তানটি এইখানেই হয়েচে।

এতটা বলেই কনকা চুপ করে রইলো। দেবানন্দ বেশ স্থির হয়েই সব কিছু শুনছিলো,—এখন যেন একটু চঞ্চল হয়েই কনকার মুখের দিকে চাইলে, তারপর আমায় বললে,—আমার বলবার আর কিছু রইলো কি?

আমি বললাম,—আপনার পূর্ব্ব-পরিচয়, সেটা আমার আর জানবার ইচ্ছে নেই।

ঠিক সাত বৎসর পরে, আমি তখন বরোদা যাচ্ছি, মথুরা ষ্টেশনে বেলা তিনটায় নেমেছি, রাত দশটায় বম্বে মেল ধরতে হবে। অনেকটা সময়, গিয়ে ওয়েটিং রুমে দেখি একজন মধ্যবয়সী গৌরবর্ণ ভদ্রলোক সুট পরা, তাঁর সঙ্গে স্ত্রী, দুটি ছেলে, একটি বছর দুই—অপরটি সাত-আট বছরের। ছেলে দুটি গৌরবর্ণ,

করে উঠলো। তাড়াতাড়ি সামনে যেতেই স্মৃতির আলো জ্বলে উঠলো সেইক্ষণে, বললাম,—সিদ্ধজী নাকি?

ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন, তাঁর স্ত্রী কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন, আমার দিকে ফিরে তিনি একটু হেসে বললেন,—কালী ঝোরা কি পাশ গুফা কি পরচয়,—এক সাঁঝ,—হৈ কি নহি?

জী হাঁ,—কনক দেবী,—ধন্যবাদ আপকি ইয়াদ, নমস্কার!—

তখন দেবানন্দজি উত্থিত ভ্রূ নামিয়ে বললে,—ওঃ - ওঃ—অতটুকু সময়ের পরিচয় আপনার মনে আছে? তারপর অনেকখানি কথা। শুনলাম বম্বে চলেছেন, প্যাসেজ বুক করা হয়ে আছে;—তাঁরা য়ুরোপ ও অ্যামেরিকা ভ্রমণে চলেছেন। একই গাড়িতে আমরা যাত্রা করলাম, তবে পৃথক শ্রেণীতে। দেবানন্দ বললেন, আশ্চর্য্য।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, - কোন্‌টা আশ্চর্য্য? এখানে দেখা হওয়াটা, না অবস্থার পরিবর্ত্তনটা?

দেবানন্দ বললেন, উভয়ত।

—শেষ—